নাট্যসাহিত্যের আলোচনা

ও

নাটকবিচার

॥ দ্বিতীয় খণ্ড ॥

ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য

। জাতীয় সাহিত্য পরিষদ ।

১৪ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট কলি: ৯

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম প্রকাশ ; পৌষ, ১৩৭৬

প্রচ্ছদ : প্রণব শূর

১৭, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯ জাতীয় সাহি
থেকে এস. দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত এবং ৬০, পটুয়াটোলা।
রূপলেখা প্রেস হইতে অজিতকুমার সাউ কর্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গ

সোদরোপম

ডঃ শ্রীঅজিত কুমার ঘোষের

করকমলে—

সাধনদা

সূচীপত্র

গ্রন্থকারের নিবেদন

নাট্যসাহিত্যের আলোচনা ও নাটকবিচার গ্রন্থমালার দ্বিতীয় খণ্ড, নূতন পরিকল্পনায় প্রকাশিত হ'ল। নূতন পরিকল্পনায় বলছি এই কারণে, যে পূর্বের দ্বিতীয় খণ্ডে যেসব নাটক স্থান পেয়েছিল এখণ্ডে সেসব নাটক নেই। এ খণ্ডে স্থান পেয়েছে — গিরিশচন্দ্রের সিরাজদ্দৌলা ও বিল্বমঙ্গল, দ্বিজেন্দ্রলালের চন্দ্রগুপ্ত ও সাজাহান এবং যোগেশ চৌধুরীর দিগ্বিজয়ী। এই নাটকগুলির মধ্যে সিরাজদ্দৌলা, সাজাহান এবং দিগ্বিজয়ী ট্র্যাজেডি শ্রেণীর এবং বিল্বমঙ্গল ও চন্দ্রগুপ্ত কমেডি শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। তিনখানি ট্র্যাজেডিই ঐতিহাসিক এবং রোমান্টিক ট্র্যাজেডি বলতে যা বুঝায় তাই। বিল্বমঙ্গল ধর্মমূলক এবং চন্দ্রগুপ্ত ঐতিহাসিক কমেডি। ট্র্যাজেডির রস সম্বন্ধে এবং ট্র্যাজেডি-রস সৃষ্টি করতে হলে কি কি উপাদান আবশ্যক সে সম্বন্ধে আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি এবং এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছতে চেষ্টা করেছি যে উপকরণের চেয়ে উপকরণের সংযোগে যে বস্তুটি উৎপন্ন হয় সেইটিই আসল বিচার্য। প্রকৃত প্রস্তাবে ঘটনার বৈশিষ্ট্য নায়কের যোগ্যতা প্রভৃতি পৃথক পৃথক ভাবে বিচার করার আগে ট্র্যাজেডি-রসাস্বাদ জাগাতে নাটকখানি সক্ষম হয়েছে কিনা সেইটিই প্রথমে নির্বাচন করতে হবে। আর একটি কথাও মনে রাখতে বলেছি ট্র্যাজেডি বললেই একই আস্বাদের নাটক বুঝায় না, প্রত্যেক ট্র্যাজেডির আস্বাদ স্বতন্ত্র। প্রাচীন যুগের ট্র্যাজেডির আস্বাদের সঙ্গে আধুনিক যুগের ট্র্যাজেডির আস্বাদ কোনভাবে এক হতে পারে না, যেমন প্রাচীন যুগের একই নাট্যকারের সব নাটকের আস্বাদ এক হয়নি। এইস্কিলাসের নাটকের সঙ্গে সফোক্লিসের নাটকের এবং সফোক্লিসের নাটকের সঙ্গে ইউরিপিডিসের নাটকের আস্বাদগত পার্থক্য রয়েছে। তেমনি গ্রীক-ট্র্যাজেডির সঙ্গে শেকস্‌পীয়রের ট্র্যাজেডির, শেকস্‌পীয়রের সঙ্গে অন্যান্য এলিজাবেথীয় যুগের ট্র্যাজেডির এবং নব্য-ক্লাসিক

যুগের ফরাসী নাটকের পার্থক্য পরিস্ফুটাকারে রয়ে গেছে। আধুনিক যুগের ট্র্যাজেডিগুলিকে প্রাচীন যুগের পরিমণ্ডল বা আবহাওয়া না পেয়ে যাঁরা খুঁত খুঁত করবেন, গার্হস্থ্য ও সামাজিক ট্র্যাজেডিতে ঐতিহাসিক নাটকের উদ্দীপনা (এক্জালটেশান) না পেয়ে যাঁরা গার্হস্থ্য সামাজিক ট্র্যাজেডিকে ট্র্যাজেডি-পদবাচ্য করতে চাইবেন না আধুনিক ট্র্যাজেডিতে পৌরাণিক ট্র্যাজেডির পাপপুণ্য-বোধ, ঈশ্বরবিশ্বাস এবং দুঃখভোগের মূলে অতিপ্রাকৃতিক হেতুর নির্দেশ না পেয়ে আধুনিক ট্র্যাজেডিকে ট্র্যাজেডি বলতে চাইবেন না, তাঁরা গোড়াতেই দেশকালপাত্রজ্ঞান হারানোর ভুল ক'রে বসবেন এবং প্রত্যেক ট্র্যাজেডিতে একই ধরনের আস্বাদ পেতে গিয়ে বিভ্রান্ত হবেন। ট্র্যাজেডির সামান্য ধর্ম খুঁজতে গেলে দেখা যাবে—বিপত্তি, দুঃখভোগ ও শোচনীয় পরিণাম প্রত্যেক ট্র্যাজেডিতেই থাকে তবে দ্বন্দ্বের প্রকৃতি বিপাকের পরিস্থিতির অনিবার্যতার মাত্রা, দুঃখদুর্ভোগের তীব্রতা, পরিণামের ভয়ঙ্করতা ট্র্যাজেডিতে ট্র্যাজেডিতে ভিন্ন হয়, কারণ ভিন্ন হ'তে বাধ্য। সিরাজদ্দৌলার ট্র্যাজেডি ও সাজাহানের ট্র্যাজেডি এক নয়, তেমনি সাজাহানের ও নাদিরশার ট্র্যাজেডিও এক নয়। ভিতরকার পরিবেশের অর্থাৎ চারিত্রিক প্রবৃত্তির ও বাইরের পরিবেশের দায়দায়িত্ব এক এক নাটকে এক একরকম, কোথাও ব্যক্তি দুর্বল, পরিবেশ প্রবল, কোথাও ব্যক্তি প্রবল, পরিবেশ প্রথমে দুর্বল শেষে প্রবল। এই দুই মেরুর মধ্যে নানা বিন্দু সম্ভব এবং যত বিন্দু সম্ভব তত সৃষ্টির বৈচিত্র্য। এ কথা শুধু ট্র্যাজেডি পক্ষেই প্রযোজ্য নয়, কমেডির পক্ষেও এ কথা সত্য। কমেডির এক মেরুতে স্থূল হাস্যরসাত্মক প্রহসন, অন্য মেরুতে ট্র্যাজেডিরই মত গুরুগম্ভীর দ্বন্দ্ববিক্ষুব্ধ, সমস্যাসমালোচনা পূর্ণ, অথচ মিলনান্ত "সিরিয়াস কমেডি"। এক্ষেত্রে রসের আস্বাদ এক নয় একখানি প্রহসনের আস্বাদ থেকে একখানি কৌতুকাবহ ঘটনার উপস্থাপনাময় (গে-কমেডি) নাটকের আস্বাদ একখানি ধর্মমূলক অর্থাৎ ধর্ম মোক্ষ পুরুষার্থ সিদ্ধির নাটকের আস্বাদ সমস্যামূলক মিলনান্ত নাটকের আস্বাদ থেকে অথবা

দ্বন্দ্বসংঘাতময় বীররসাত্মক নাটকের আস্বাদ থেকে ভিন্ন। বিল্বমঙ্গল নাটকের রসে এবং চন্দ্রগুপ্ত নাটকের রসের মিল শুধু এইটুকুই যে উভয় নাটকেই নায়ক তার অভীপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পেরেছে, নানা বিপত্তির সম্মুখীন হয়েও বাধা অতিক্রম করতে পেরেছে এবং সব ক্ষয়ক্ষতির ও বেদনার পরিপূরণ ক'রে নিজের মন [illegible] তাপ থেকে মুক্ত হয়েছে। যদিও আলোচনাতেই এই সব বক্তব্য সংক্ষেপে স্থান পেয়েছে তবু নিবেদনেও একবার বিষয়গুলির দিকে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। অবশ্য নতুন জ্ঞানের ও উপলব্ধির আলোকে আলোচনাকে সংস্কৃত করতে পারলে খুবই ভাল হ'ত কিন্তু তা করতে পারিনি। সংশোধনের জন্য যে শ্রম ও সময় দেওয়া আবশ্যক তা দিতে পারিনি।

এ জন্যই আমি এই গ্রন্থখানির 'নাট্যসাহিত্যের আলোচনা ও নাটকবিচারের' দ্বিতীয় সংস্করণ বলে ঘোষণা করিনি। বলা বাহুল্য, পরিমার্জন ও পরিবর্ধনের অবকাশ সব সময়েই থাকে এবং তাতে গ্রন্থের ত্রুটিবিচ্যুতিও অনেক পরিমাণে কমে যায়। কিন্তু যেখানে সিদ্ধান্তের পরিবর্তন অত্যাবশ্যক না হয় সেখানে পরিমার্জন, পরিবর্ধনে বিলম্ব ঘটলে মারাত্মক ক্ষতি কিছু হয় না। এ ক্ষেত্রেও তেমন কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নেই এবং সেই বলেই আমি সংস্করণের জন্য তেমন আগ্রহী হইনি। সংস্করণের জন্য অপেক্ষা করলে আমি জানি গ্রন্থটির নতুন প্রকাশ বিলম্বিত হবেই। তাই আমি সংস্করণের চেয়ে পুনঃপ্রকাশকেই অধিকতর আগ্রহে কামনা করেছি। 'জাতীয় সাহিত্য পরিষদ' এই গ্রন্থমালা প্রকাশের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ইচ্ছাপূরণের সুযোগ করে দিয়েছেন, এজন্য আমি প্রকাশক শ্রীযুক্ত সুনীল দত্ত মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বাংলার প্রতিনিধিস্থানীয় নাট্যকারের ও নাটকের মূল্য বিচার করবার উদ্দেশ্যেই আমি নাট্যসাহিত্যের আলোচনা ও নাটকবিচার গ্রন্থমালা রচনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছি। পাঁচখণ্ড গ্রন্থ ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে তাদেরই দু'খণ্ড 'জাতীয় সাহিত্য পরিষদ' কর্তৃক পুনঃপ্রকাশ পেল। [illegible] খণ্ড, আশা করি অবিলম্বেই প্রকাশিত হবে।

নাট্যসাহিত্যের অধ্যাপক, ছাত্র এবং রসপিপাসু পাঠক গ্রন্থখানি প'ড়ে তৃপ্তিলাভ করলে আমি গ্রন্থকার হিসাবে নিজেকে ধন্য মনে করব। আমার আলোচনা নির্দোষ এবং সিদ্ধান্ত অখণ্ডনীয়, এ অভিমান যেমন আমি পোষণ করিনে তেমনি যাঁরা আমার যুক্তি ও সিদ্ধান্তকে ভিন্ন কথায় প্রকাশ ক'রে গ্রন্থকার গৌরব লাভ করতে চেষ্টিত তাঁদের প্রতিও আমার কোন আক্রোশ নেই। আমি নাট্য-সমালোচনার উন্নত মান স্থাপন করার উদ্দেশ্যেই সমালোচনায় প্রবৃত্ত হ'য়েছিলাম, আজও সেই উদ্দেশ্য নিয়েই আমি চলছি। নিরপেক্ষভাবে দোষগুণ বিচার করাকেই আমি সমালোচনার আদর্শ ব'লে মেনে নিয়েছি। আমার ছাত্রছাত্রীদের এবং পাঠকদের মধ্যে এই নিরপেক্ষ দৃষ্টি জাগাতে পারলেই আমি কৃতকৃতার্থ।

এই গ্রন্থের প্রকাশে অনেকেই আমাকে সাহায্য করেছেন। তাঁদের সকলকেই আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমার পুত্র শ্রীমান দীপঙ্কর ভট্টাচার্যেরও এ ব্যাপারে একটি সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে। তা উল্লেখ না করলে অন্যায় হবে। নিবেদন ইতি—

সাধনকুমার ভট্টাচার্য

সিরাজদ্দৌলা

ভারতবর্ষ শুধু একটি দেশ নহে—একটি মহাদেশ, ভারতবর্ষ 'মহামানবের সাগরতীর,' এই সকল উক্তি লইয়া আমরা গর্ব ও আক্ষেপ দুইই করিতে পারি, বরং গর্ব অপেক্ষা আক্ষেপ করিবার ইচ্ছাই বেশী জাগে। মহাদেশত্ব ভারতবর্ষের অন্যতম গৌরব বটে কিন্তু অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে উহাই ভারতের বড় দুর্বলতা—জাতীয়ত্ব-উন্মেষের প্রবল অন্তরায়। 'নানা জাতি নানা ভাষা নানা পরিধান' এইটুকু যত সত্য, 'বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান'—তত বাস্তব সত্য নহে। দ্রাবিড় চীন শক-হূন দলের কথা যাহাই হউক, পাঠান মোগল ভারতের দেহে তেমন বেমালুম ভাবে লীন হইতে পারে নাই এবং পারে নাই বলিয়াই ভারতে হিন্দু-মুসলমান জাতির দ্বন্দ্ব সন্তোষজনক মাত্রায় আজিও প্রশমিত হয় নাই—আজও ভারতে হিন্দু-মুসলমান-সমবায়ে অখণ্ড একটি জাতি সম্পূর্ণভাবে গঠিত হইতে পারে নাই। এই জাতি-দ্বন্দ্বের দুর্যোগের সুযোগ লইয়াই 'সাত সমুদ্র তের নদীর পারে'র ইংরেজ বণিকরা একদিন ভারতের স্বাধীনতা হরণ করে—ফলে, ভারত ইংলণ্ডেশ্বরের একটি সাম্রাজ্যে পরিণত হয়। ভারত 'মহামানবের সাগরতীর' হওয়ায় আর যাহাই বৃদ্ধি পাক ভারতের রাজনৈতিক সংহতি যে বৃদ্ধি পায় নাই এবং সেই সংহতির অভাবে ভারতবাসী বিদেশী শাসনে-শোষণে যে জর্জরিত হইয়াছে, এবিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। এই জাতীয়তা-বোধের অভাবের ছিদ্রপথেই বৈদেশিক জাতি ভারতে প্রবেশ করিতে পারিয়াছে। পলাশীপ্রান্তরে বাংলার স্বাধীনতা বিক্রীত হইয়াছে।

সিরাজদ্দৌলার প্রতিনায়ক ভবন

সিরাজদ্দৌলার ইতিহাস ভারতীয় ইতিহাসের অন্যতম যুগ-সন্ধির ইতিহাস—

ক্রান্তি পর্বের ইতিহাস। আর্য-অনার্যের সংযোগকে **প্রথম সন্ধি** এবং মুসলমান অধিকারকে **দ্বিতীয় সন্ধি** বলিয়া গ্রহণ করিলে, বলা যাইতে পারে সিরাজদ্দৌলার ইতিহাস **তৃতীয় সন্ধির** ইতিহাস—ইংরেজ-অধিকারের আরম্ভের ইতিহাস। যুগ সন্ধির ইতিহাস বলিয়া সিরাজদ্দৌলার ইতিহাসের বিশেষ একটি গুরুত্ব আছে। আরো একটি কারণে সিরাজের ইতিহাস খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এই তাৎপর্য—নব জাতি-চেতনার তাৎপর্য।

'জাতি' শব্দটিকে ব্যাপক ও শিথিল অর্থে প্রয়োগ করা যাইতে পারে—ভারত-ইতিহাসের আদিম (অন্ধকার) যুগ, আর্য অনার্যের জাতিদ্বন্দ্বের বক্ষোভের মধ্য দিয়া বহিয়া আসিয়াছে। আর্য জাতির অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে বিজিত অনার্যকে আত্মসাৎ করিয়া শূদ্র অথবা পঞ্চম বর্ণের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া দিয়া, আর্য সংস্কৃতি ও সমাজব্যবস্থা জয় যাত্রার পথে অগ্রসর হয় এবং ক্রমে ক্রমে সমগ্র আর্যাবর্ত ও দাক্ষিণাত্যে সম্প্রসারিত ও প্রতিষ্ঠিত হয় তথা ভারতবর্ষ ন্যায়তঃ আর্যভূমিতে পরিণত হয়। তারপর, ভারত ভূমিতে, ইতিহাসের কারখানায় আর্য-অনার্যের সমবায়ে আর্য-সংস্কৃতি-সম্পন্ন একটি জাতি গঠনের কাজ অবিরাম চলিয়াছে। অবশ্য তাই বলিয়া সব অনার্য জাতিই আর্য হইয়াছে বা সব অনার্য জাতিই নৃ গোষ্ঠীর হিসাবে শূদ্র শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে তাহা নহে। দ্রাবিড় জাতির প্রত্যেকটি গোষ্ঠীই যে শূদ্র হয় নাই বা পঞ্চম বর্ণ বলিয়া চিহ্নিত হয় নাই, দাক্ষিণাত্যের ইতিহাস তাহার বড় প্রমাণ। যাহা হউক, বৈদিক যুগ হইতেই ভারতবর্ষীয় সমাজ যেমন **শ্রেণী-ভেদযুক্ত**, তেমনি **বর্ণ-ভেদযুক্ত** অর্থাৎ ভারতবর্ষীয় সমাজে (ইতিহাসের স্বাভাবিক নিয়মেই) একদিকে চলিয়াছে শ্রেণীদ্বন্দ্ব অন্য দিকে চলিয়াছে—জাতিদ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে—নানা গোষ্ঠীকে নিজ সমাজদেহে আত্মসাৎ করিতে করিতে আর্য সমাজ রূপ রূপান্তরের মধ্য দিয়া, অগ্রসর হইয়াছে—দ্রাবিড় চীন শক-হুন প্রভৃতি আগন্তুক নৃ-গোষ্ঠীরা

আর্য-সংস্কারে-সংস্কৃত হইয়া বৃহত্তর আর্য-সমাজ (হিন্দু জাতি) সৃষ্টি করিয়াছে। আর্য-সংস্কৃতি-সম্পন্ন এই বৃহত্তর আর্য-সমাজ'ই ভারতীয় ইতিহাসে সংক্ষেপে 'হিন্দুসমাজ' বা হিন্দু জাতি নামে পরিচিত। 'হিন্দু' বলিতে এক নৃ-গোষ্ঠী এক ভাষা-ভাষী এবং সমান লোকাচার-সম্পন্ন কোন জাতি বুঝায় না। অর্থাৎ 'হিন্দু' এই অর্থে জাতি নহে যে সমগ্র ভারতের হিন্দু এক ভাষায় কথা বলে, একরূপ লোকাচার মানে, একরূপ পরিচ্ছদ ব্যবহার করে এবং এক রাজার বা শাসন-ব্যবস্থায় অধীন। হিন্দু—সংস্কৃতি-ভিত্তিক জাতি। সংস্কৃতিগত স্বকীয়তায় হিন্দু অন্য সংস্কৃতি-গোষ্ঠী হইতে পৃথক—এই অর্থে হিন্দু' পৃথক জাতি বলিয়া পরিচিত এবং এই হিন্দু জাতির ইতিহাসই ভারতবর্ষের ইতিহাসে "হিন্দু-যুগ" নামে চিহ্নিত। বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া মুসলমান-শাসনাধিকারের আরম্ভ সীমা পর্যন্ত (২০০০? খ্রীঃ পূঃ হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত) এই হিন্দু-যুগের অভিব্যাপ্তি।

এই যুগের পরে, ভারতবর্ষের ইতিহাস নূতন এক প্রকার জাতি-দ্বন্দ্বের জটিল পর্যায়ে প্রবেশ করে। এই পর্যায়ের ইতিহাস 'মুসলমান-যুগ' নামে পরিচিত—মুসলমান ধর্মাবলম্বী তুর্কী-পাঠান-মোগল জাতির শাসনাধিকারের ইতিহাস। ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত এই যুগের ব্যাপ্তি। পলাশীর প্রান্তরে ইংরেজবাহিনীর হস্তে সিরাজদ্দৌলার পরাজয়ে—এই যুগ কার্যতঃ পরিসমাপ্ত হয়। তালিকাকারে ইতিহাসটুকু সম্মুখে রাখা যাউক।

১। দাস বংশ—(১২০৬—১২৮৮)
২। খিলজী বংশ—(১২৮৮—১৩২১)
৩। তুঘলক বংশ—(১৩২১— ৪১২)
৪। সৈয়দ বংশ—(১৪১৪—১৪৪৪)

* ৬। তৈমুর বংশ (মোগল)
(ক) বাবর—(১৫২৬—১৫৩০)
(খ) হুমায়ুন (১৫৩১—১৫৪০)
* [শেরশা (১৫৫৫—১৫৫৬)]
(গ) আকবর—(১৫৫৬—১৬০৫)

৫। লোদী বংশ—(১৪৫০—১৫২৬) (ঘ) জাহাঙ্গীর—(১৬০৫—১৬২৭)
(ঙ) শাজাহান—(১৬২৭—১৬৫৮) (চ) ঔরংজীব—(১৬৫৮—১৭০৭)প
(ছ) বাহাদুর শাহ—(১৭০৭—১৭১২) জ) জাহান্দর শাহ—(১৭১২-১৭১৩)
(ঝ) ফারুকশিয়র—(১৭১৩-১৭১৮) (ঞ) মহম্মদ শাহ—(১৭১৯—১৭৪৮)
(ট) আহম্মদ শাহ—(১৭৪৮—১৭৫৪) —*আলীবর্দী খাঁ—১৭৪১—১৭৫৬
(ঠ) দ্বিতীয় আলমগীর (১৭৫৪-১৭৫৯)—* পলাশী-যুদ্ধ (১৭৫৭)
(ড) দ্বিতীয় শাহ্ আলম—(১৭৫৯—১৮০৬)—

পলাশী যুদ্ধের পরে

* [তৃতীয় পাণিপথ-যুদ্ধ ১৭৬১— মারাঠা-শক্তি পর্যুদস্ত, মোগল-শক্তিও বিলুপ্তপ্রায়]

* দেওয়ানী হস্তচ্যুত ১৭৬৫—*ফৌজদারী ও বিচার বিভাগ হস্তচ্যুত ১৭৯০

(ঢ) দ্বিতীয় আকবর (১৮০৬-১৮৩৭)
(ণ) বাহাদুর শা—(১৮৩৭-১৮৫৮) *[সিপাহী-বিদ্রোহ। ভারত ইংলণ্ডের সাম্রাজ্যে পরিণত * কোম্পানীর রাজত্বের অবসান।]

মুসলমান শাসনের রাজনৈতিক তাৎপর্য

মুসলমান শাসকগণের এই তালিকাটি, মুসলমান-যুগের বাহিরের রূপটিকে রেখারূপে প্রকাশ করিতেছে বটে, কিন্তু মুসলমান-যুগের ভিতরের রূপটির আসল তাৎপর্য রহিয়াছে আরো গভীরে—যেখানে আর্য-অনার্য সংস্কৃতির সহিত নূতন একটি সংস্কৃতির বুঝাপড়া চলিয়াছে—মুসলমান সংস্কৃতিসম্পন্ন বৈদেশিক জনগোষ্ঠী ভারতকে মাতৃভূমি হিসাবে গ্রহণ করিয়া ভারতের স্বার্থের সহিত নিজেদের স্বার্থ মিলাইয়া দিয়াছে—হিন্দু-মুসলমানের মিলিত ভারত গঠিত হইতে চলিয়াছে। আপেক্ষিক দৃষ্টিতে, হিন্দুর কাছে মুসলমান-শাসন ভিন্ন জাতির আধিপত্য বলিয়া মনে হইয়াছে এ কথা সত্য কিন্তু তত সত্য এই কথাটুকুও যে মুসলমানীকরণের ফলে

ভারতেরই জনসংখ্যার একাংশ মুসলমান-ধর্মে দীক্ষিত হওয়ায় এবং মুসলমান বাদশাহরা ভারতকে বাসভূমি হিসাবে গ্রহণ করায়, শেষের দিকে মুসলমান শাসকেরও শাসনের বৈদেশিকতার মাত্রা অনেক পরিমাণেই হ্রাস পাইয়া যায়। মুসলমান সংস্কৃতি ভারতবর্ষে আগন্তুক, মুসলমান দেশের রাজা এবং হিন্দু ভারতের রাষ্ট্রভাষা (?) সংস্কৃতের আসনে 'পারসী' ভাষা অধিষ্ঠিত হওয়ায় ভারতীয় সমাজের স্বাভাবিক গতি ব্যাহত—তথা হিন্দু অভিমান ক্ষুব্ধ, হিন্দু—মুসলমানের মধ্যে জাতি-দ্বন্দ্বের বিক্ষোভ সমাজ দেহে ব্যক্ত-অব্যক্তকারে প্রবাহিত—এ সবই স্বীকার্য; তেমন স্বীকার্য—রাষ্ট্রভাষা পারসী হইলেও, মুসলমান আমলে, প্রাদেশিক ভাষা ও সাহিত্যকে কেন্দ্র করিয়া প্রদেশে প্রদেশে—সংকীর্ণ ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে এক জাতীয়তার অভিমান দানা বাঁধিয়া উঠিতে থাকে। যেমন ধরা যাক…বাঙালী হিন্দু ও বাঙালী মুসলমানের কথা। ধর্মীয় সংস্কারে পৃথক হইলেও বাংলাভাষাভাষী বলিয়া বাংলার অধিবাসী বলিয়া তাহারা 'বাঙালী' পরিচয়ে বিশেষিত হয়—মোটকথা ভাষা ও বাসভূমিকে কেন্দ্র করিয়া একটা ঐক্যের বৃত্ত রচিত হয়। দ্বিতীয়তঃ—"ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং পরাধীনতা" প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র 'পরাধীনতা'র যে লক্ষণ নিরূপণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন সেই লক্ষণটি প্রয়োগ করিয়া বলা যাইতে পারে—"যে দেশের রাজা অন্য দেশের সিংহাসনে আরূঢ় এবং অন্য দেশবাসী, সেই দেশ পরতন্ত্র"—এই সূত্রানুসারে মুসলমান শাসনাধীন ভারতকে পরতন্ত্র বা পরাধীন বলা যায় না। বঙ্কিমের প্রশ্নটি—"যদি প্রথম জর্জ-শাসিত ইংলণ্ডকে বা ত্রেজান-শাসিত রোমকে পরাধীন বলা না গেল তবে শাহজাঁহা-শাসিত ভারতবর্ষকে বা আলিবর্দী-শাসিত বাংলাকে পরাধীন বলি কেন? এখানে "বলা যায় না"—এই সিদ্ধান্তেরই রূপ লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। অর্থাৎ এই কথাই প্রচার করিতেছে যে মুসলমান-যুগটি এক হিসাবে বৈদেশিক শাসনের যুগ নহে। অবশ্য বঙ্কিমের দৃষ্টি—ঊনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস-নিয়ন্ত্রিত দৃষ্টি—এবং সেই দৃষ্টি—যে দৃষ্টিতে—"ইহা নিশ্চিত যে ইংরেজের অধীন আধুনিক

ভারতবর্ষ পরতন্ত্র রাজ্য বটে।" -এই সত্য স্পষ্টাকারে প্রতিভাত হইয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর দৃষ্টির সহিত অষ্টাদশ শতাব্দীর দৃষ্টির ঐক্য থাকিবে সে আশা করা যায় না—মুসলমান-যুগের হিন্দুর দৃষ্টি ইংরেজ-যুগের হিন্দুর দৃষ্টির সহিত পুরোপুরি মিলিয়া যাইবে এমন কথাও বলা যায় না। এইরূপ অবস্থায়, মুসলমান-যুগকে হিন্দুজাতির পরাধীনতার যুগ হিসাবে যেমন দেখা যাইতে পারে* তেমনি হিন্দু মুসলমানের সমবায়ে বৃহত্তর ভারতীয় জাতি গঠনের প্রস্তুতি হিসাবেও দেখা যাইতে পারে, আবার হিন্দু ও মুসলমান জাতির দ্বন্দ্বের ইতিহাস রূপেও ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। অবশ্য জাতি-দ্বন্দ্ব এত স্পষ্ট যে ঐটাই আগে চোখে পড়ে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর আগেই,—ঔরংজীবের হিন্দুদ্বেষী শাসন-ব্যবস্থার ফলে ভারতবর্ষে জাতি-দ্বন্দ্বের রূপটি উৎকট আকারে আত্মপ্রকাশ করে এবং রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলায় সমগ্র শাসন ব্যবস্থার ভিত্তি ধ্বসিয়া পড়িতে থাকে। উত্তর ভারতে রাজপুত-জাতির আত্মরক্ষার চেষ্টায় বা প্রতিরোধে এবং দক্ষিণ ভারতে মারাঠা-জাতির অভ্যুদয়ে মোগল-আধিপত্য সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। ঔরংজীবের মৃত্যুর পরে, সত্যই 'শবলুব্ধ গৃধ্রদের বীভৎস চীৎকারে মোগল মহিমা রচিল শ্মশান শয্যা —মুষ্টিমেয় ভস্ম রেখাকারে হ'ল তার সীমা।' মহম্মদ শাহের রাজত্বকালে (১৭১৯-১৭৪৮) মোগল-সাম্রাজ্য, যাহাকে বলে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যাওয়া তাহাই হয়—প্রধানমন্ত্রী নিজাম উল্ মুলক দাক্ষিণাত্যে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন, অযোধ্যার শাসনকর্তা সাদৎ খাঁ এবং * বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার শাসনকর্তা আলিবর্দী খাঁও কার্যতঃ স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। রোহিলের নায়ক আলিমহম্মদ খাঁ রোহিলখণ্ডে রাজ্য স্থাপন করেন, গুজরাটে, মালবে, মারাঠা প্রভুত্ব স্থাপিত হয়,—পাঞ্জাবে শিখগণ প্রবল হইয়া উঠে। যেটুকু বাকী থাকে তাহার বেশ কিছু শেষ করে— *নাদির শাহের আক্রমণে (১৭৩৮-৩৯)—কাবুল ও উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশও বাদশাহের হস্তচ্যুত হয়। আর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করে নাদির-সেনাপতি আহ্‌মদ শাহ দুররাণীর

(আবদালী) উপর্যুপরি আক্রমণে—[১৭৪৮, ১৭৫০, ১৭৫২, * (১৭৫৬-৫৭), ১৭৫৯, ১৭৬১, ১৭৬২, ১৭৬৪, ১৭৬৫, ১৭৬৭,] মোগল মহিমার শ্মশান শয্যাই বটে। কেন্দ্রীয় শাসন বলিতে আর কিছুই থাকে না—বাদশাহী শাসন নামমাত্রে পর্যবসিত হয়। হিন্দু ও মুসলমান সামন্তগণ যেন ভারতবর্ষকে নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা ক'রয়া লইতে উদ্যত হন এবং একে অন্যকে গ্রাস করিয়া আপন অধিকার বৃদ্ধি করিতে মরিয়া হইয়া উঠেন। মারাঠারা 'হিন্দুপাদশাহী'র স্বপ্ন দেখেন বটে কিন্তু অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে তৃতীয় পাণিপথের যুদ্ধে ১৭৬১) সেই স্বপ্নের সমাধি ঘটে। এই বিশৃঙ্খলার মূলে দেখা যায় একদিকে আছে জাতি-দ্বন্দ্ব, অন্যদিকে আছে—সামন্ত-শ্রেণীর আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রতিযোগিতা। পারস্পরিক দ্বন্দ্বে ও গৃহবিবাদে—ক্রমে হিন্দু-মুসলমান উভয় শক্তিই অবসন্ন হইয়া পড়ে।

এই রাজনৈতিক দুর্যোগের সুযোগেই—"আনিল বণিক লক্ষ্মী সুড়ঙ্গ পথের অন্ধকারে রাজসিংহাসন"—"বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল রাজদণ্ড রূপে"—ভারতে ইংরেজ-রাজত্বের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মহাদুর্যোগই ইংরেজের পক্ষে মহা সুযোগ। বাদশাহের শাসন অটুট ও প্রবল থাকিলে, গৃহ-বিবাদে শক্তিগুলি শ্রান্ত-ক্লান্ত ও ব্যতিব্যস্ত না থাকিলে বণিককে 'মানদণ্ড' লইয়াই কুর্ণিশ করিতে করিতে জীবন কাটাইতে হইত। ভাগ্য তাঁহাদের সুপ্রসন্ন। ভারতের রাজনৈতিক আকাশ ঘন-দুর্যোগে পূর্ণ হইয়া যায়। অন্তর্বিপ্লবে ও বহিরাক্রমণে ছিন্ন-ভিন্ন ও বিপর্যস্ত ভারত, বণিক লক্ষ্মীর পক্ষে সুড়ঙ্গ পথ খননের অনুকূল হয়। গৃহবিবাদের সুযোগ লইয়া, বা গৃহ-বিবাদে উসকানি দিয়া বৈদেশিক বণিকগণ নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করিতে থাকে এবং প্রত্যেকটি সুযোগের সদ্ব্যবহার করে। প্রথমতঃ কর্ণাটক ও হায়দরাবাদের গৃহ-বিবাদকে কেন্দ্র করিয়া ফরাসী ও ইংরেজের শক্তিপরীক্ষা বা প্রতিযোগিতা ব্যক্ত রূপে আত্মপ্রকাশ করে। দ্বিতীয় চেষ্টা দেখা দেয়—বঙ্গদেশে—সিরাজদ্দৌলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়ায়। ছলে-বলে কৌশলে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করাই

তাঁহাদের উদ্দেশ্য। এই ষড়যন্ত্রের পরিণাম—পলাশী-প্রান্তরে সিরাজদ্দৌলার পরাজয় তথা ইংরেজ বণিকের সামরিক জয় ও প্রতিষ্ঠা এবং তাহার ফলে ক্রমে 'বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল রাজদণ্ড রূপে।' সিরাজদ্দৌলার ইতিহাস এই কারণেই—যুগ-সন্ধির ইতিহাস—ইংরেজ নামক বৈদেশিক জাতির কাছে পরাজয়ের ও আত্মসমর্পণের ইতিহাস। সিরাজদ্দৌলা এই হিসাবে আলিবর্দীর দৌহিত্র বা সামান্য 'একজন' নবাব মাত্র নহে—**সিরাজদ্দৌলা বৈদেশিক ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিযোদ্ধা; সিরাজ শুধু একজন ব্যক্তি নহেন—সিরাজ একটা যুগের শেষ প্রতিনিধি।** বলা যাইতে পারে —ভারতের সিংহাসন, ইংরাজরা সিরাজদ্দৌলার বক্ষঃপঞ্জর হইতেই ছিনাইয়া লইয়া যায়। **পলাশীর যুদ্ধ শুধু মাত্র গৃহযুদ্ধ নহে, অত্যাচারী বা দুর্বিনীত কোন নবাবকে গদিচ্যুত করিবার জন্য ক্ষমতাশালী আমির ওমরাহদের সশস্ত্র বিদ্রোহ নহে—পলাশী বাংলার শেষ স্বাধীন নবাবের ও বাংলার স্বাধীনতার সমাধিক্ষেত্র, বৈদেশিক শক্তির কাছে স্বাধীনতা বিক্রয়ের কালোবাজার—ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের সূতিকাগার।**

এই কারণেই—ইংরেজশাসনাধীন হিন্দু মুসলমানের চোখে পলাশীর যুদ্ধ বাংলার স্বাধীনতারক্ষার যুদ্ধের সহিত—সিরাজদ্দৌলার পরাজয় বাঙলার তথা ভারতের পরাজয়ের সহিত ও স্বাধীনতা হারানোর বেদনার সহিত এক হইয়া গিয়াছে। একথা সকলেই উপলব্ধি করিয়াছেন যে **হিন্দু-মুসলমানের-দেশ ভারতবর্ষের** পরতন্ত্রতার ইতিহাসের ভূমিকা পলাশীর প্রান্তরে মীরমদন-মোহনলালের রক্তে—সিরাজদ্দৌলার রক্তে রচিত হইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী ও ভারতবাসী সিরাজদ্দৌলাকে এই দৃষ্টিতেই দেখিয়াছেন—ঐতিহাসিকদের অনেকে সিরাজকে এই উজ্জ্বল বর্ণেই অঙ্কিত করিয়া দেখাইয়াছেন। সিরাজদ্দৌলার এই **রাজনৈতিক তাৎপর্য** খুবই লক্ষণীয়।

এ কথা অবশ্য সত্য—সমসাময়িক ঐতিহাসিকেরা—কি দেশী কি বিদেশী—

সিরাজদ্দৌলার চরিত্র গাঢ় কালিমায় লিপ্ত করিয়া দেখাইয়াছেন। বিরুদ্ধপক্ষীয় গোলাম হোসেন সাহেবের কথায় বিশ্বাস না করিলেও নিষ্কৃতি নাই, কাশিমবাজারের ফরাসী কুঠিয়াল মঁসিয়ে লা (Jean Law)—যিনি সিরাজের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিলেন—তিনি পর্যন্ত লিখিয়া গিয়াছেন—"The character of Siraj-ud-daulah was reputed to be one of the worst ever known. In fact he had distinguished himself not only by all sorts of debaucheries, but by a revolting cruelty. The Hindu women are accustomed to bathe on the bank of the Ganges Siraj-ud-daulah, who was informed by his spies which of them were beautiful, sent his satellites in little boats to carry them off. He was often seen, in the season when the river overflows, causing the ferry boats to be upset or sunk, in order to have the cruel pleasure of seeing the confusion of hundred people at a time, men, women and children .....Everyone trembled at the name of Shiraj-ud-daulah' সিরাজের চরিত্রে বিদেশী কুঠিয়ালরা অনেকক্ষেত্রেই জনশ্রুতি সম্বল করিয়াই লিখিয়া গিয়াছেন। অঙ্কনের সময় নানা মনোভাব তাহাদের মধ্যে যে কাজ করিয়াছে সে বিষয়ও সন্দেহ করা চলে না। তবে সিরাজকে একেবারে **ধোয়া-তুলসী প্রমাণ করিবারও কোন কারণ নাই।** আর যাহাই সত্য হউক আর না হউক সিরাজের নামে অনেকেরই হৃদকম্প হইত—বিশেষতঃ বিদেশী কুঠিয়ালদের যে হইত, তাহার প্রমাণ আছে! তারপর, চুল-চেরা ও গভীর গবেষণার আলোকে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের চিত্রটি খুব চিত্তাকর্ষক বলিয়া মনে নাও হইতে পারে। হিন্দু-জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠার দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিতে গেলে দেখা যাইবে—মুসলমান অধিকারে ভারতবর্ষীয় প্রাচীন সংস্কৃতির ধারা আচ্ছন্ন ও ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছে—হিন্দু-সমাজ কোণঠাসা পরাধীন জীবন যাপন করিয়াছে, হিন্দু-

নানা দৃষ্টিকোণে সিরাজ

সম্প্রদায়ের জীবন-যাত্রা, মুসলমান শাসকগণের অনুকম্পার আশ্রয়ে কূর্মবৃত্তি অবলম্বন করিয়া কোনও প্রকারে টি কিয়া আছে—**মুসলমানে বিজয়ীর অভিমান, হিন্দুতে বিজিতের** দৈন্য। (অবশ্য মানসিংহ, রাজবল্লভ, জগৎশেঠাদি প্রসাদজীবীদের কথা সবযুগেই স্বতন্ত্র।) হিন্দু-জাতির অভিমান লইয়া দেখিতে গেলে দেখা যাইবে—মুসলমান শাসনের অবসান, হিন্দু সংস্কৃতির পক্ষে রাহু-গ্রাস হইতে মুক্তি—হিন্দু-সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের শুভ-লগ্ন-রূপেই উপস্থিত। ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিহাসকে অবশ্যই তাহার বড় প্রমাণ হিসাবে দাখিল করা যাইতে পারে। ১৯৪৭ পর্যন্ত মুসলমান-শাসন অব্যাহত থাকিলে, সমাজে অর্থনৈতিক শ্রেণী-বিন্যাসের রূপ যাহাই হউক, হিন্দু-সংস্কৃতির দুর্যোগ বাড়িত বই কমত না। অবশ্য যে হিন্দু মুসলমান ঐক্যের জন্য আমরা ইংরেজ-আমলে মাথা কোটাকুটি করিয়াছি এবং শেষ পর্যন্ত ঐক্য আনিতে না পারিয়া **জিন্নার দ্বিজাতিবাদকে কার্যতঃ স্বীকার** করিয়াছি, সেই ঐক্য আন্দোলনের কোন প্রয়োজন হয়ত থাকিত না। হিন্দু-কুল ভাঙিয়া মুসলমান-কুল গড়িয়া উঠিত। এইরূপ দৃষ্টিতেও অনেক ঐতিহাসিক মুসলমান যুগকে দেখিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় সিরাজদ্দৌলার পতনকে 'ভারতের চির অমানিশা' বলিয়া স্বীকার করেন নাই—"Sadists like Siraj" প্রভৃতির শাসন হইতে দেশ মুক্ত হইয়াছে—ইহাতে তিনি যেন আনন্দিত, তাঁহার কাছে—"In June, 1757 we crossed the frontier and entered into a great new world…"অধিকন্তু" it was the beginning, slow and unperceived, of a glorious dawn……On 23 June, 1757, the middle ages of India ended, and her modern age began."

সত্য বটে—ঐতিহাসিক সরকারের পক্ষে, ইতিহাস এই অপ্রিয় সত্যের সমর্থন করিয়াই সাক্ষ্য দিতে পারে এবং শেষ বিচারে হয়ত এই অপ্রিয় সত্যই জয়ী হইতে পারে, কিন্তু যে দৃষ্টি সিরাজদ্দৌলাকে বাঙলার শেষ স্বাধীন নবাবের

ও বাংলার স্বাধীনতা-রক্ষকের মর্যাদা দিয়াছে, সে দৃষ্টিকেও একেবারে মায়া বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। উনবিংশ শতাব্দীর কবি যাঁহাকে মহাকাব্যের নায়ক রূপে নির্বাচন করিতে দ্বিধা করেন নাই, তিনি যে বাঙালীর হৃদয়ে আগেই সহানুভূতির আসনখানি অধিকার করিয়াছেন তাহা নিঃসংশয়েই বলা যাইতে পারে।

নব জাতীয়তাবাদের দৃষ্টিকোণ।

ইহা অবশ্যই স্বীকার্য—ব্রিটিশের অধীনতাপাশে আবদ্ধ হওয়ার পরে হিন্দু-মুসলমান সমানভাবে নিজেদের দৈন্য ও অবস্থা উপলব্ধি করিতে থাকে এবং সেই উপলব্ধি হইতেই স্বাধীনতালাভের জন্য, বৈদেশিক শক্তির শাসন হইতে মুক্ত হইবার জন্য প্রেরণা লাভ করে। ইংরেজ-বিদ্বেষ বা ইংরেজ বিরোধী মনোভাব তখন হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই—কোথাও ব্যক্ত কোথাও অব্যক্ত। স্বাধীনতাকামী হিন্দু-মুসলমান মাত্রেই তখন এই ধারণার বশবর্তী যে পলাশী-যুদ্ধে—পরাজয় হইতেই জাতির পরাধীনতার ইতিহাস আরম্ভ হইয়াছে, পলাশীতেই আমরা স্বাধীনতা হারাইয়াছি, সিরাজদ্দৌলা পলাশী-যুদ্ধের নায়ক, সুতরাং স্বাধীনতারক্ষার সংগ্রামের নায়ক—তথা জাতিরই নায়ক। সিরাজের চরিত্র ভাল ছিল না, তাহা সত্য—তবে নবাব হওয়ার পর চরিত্র মন্দ করিবার মত সময়টুকুও তিনি পান নাই—ইহাও একেবারে মিথ্যা নহে, আর সর্বাপেক্ষা বড় সত্য এই যে সিরাজ বৈদেশিক বণিক—ফিরিঙ্গীদের সুনজরে দেখেন নাই এবং আলিবর্দীর চোখ দিয়া উহাদের স্বরূপ ভাল করিয়াই চিনিয়াছিলেন। পরাধীনতার পটভূমিতে, ফিরিঙ্গীদ্বেষী সিরাজের এই চিত্র স্বাভাবিকভাবেই যে উজ্জ্বল বর্ণে প্রতিভাত হইবে, জাতীয় বীর যোদ্ধার মর্যাদা লাভ করিবে তাহা বলাই বাহুল্য। ইহাও ঐতিহাসিক সত্য—উনবিংশ শতাব্দীতে জাতীয়তা-বোধের **নবজাগরণের** দিনে, দেশবাসীর নূতন উপলব্ধির কাছে, সিরাজদ্দৌলা স্বাধীন বাঙলার শেষ নবাব, সাম্রাজ্যলোভী ইংরেজ-জাতির প্রধান শত্রু—দেশদ্রোহী হিন্দু মুসলমান সামন্তদিগের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে

বদ্ধপরিকর। প্রায় সকলেরই ধারণা—দেশের শাসনাধিকার যাহাতে বিদেশী জাতির হস্তে না চলিয়া যায়, ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য জাতীয় স্বার্থ—দেশের স্বার্থ যাহাতে বিসর্জিত না হয় এই জন্যই সিরাজ প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। সিরাজের চেষ্টা সফল হয় নাই বটে, কিন্তু তাহার সাধনার মহিমা অস্বীকার করিতে পারে—শুধু ঐ মিরজাফরের বংশধরেরাই। *উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালা সিরাজকে এই দৃষ্টিতেই দেখিয়াছেন।

এই কারণেই, সিরাজদ্দৌলার ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনেকখানি। স্বাধীনতা-কামী বাঙালী বা ভারতবাসীর মনে সিরাজের নাম আর আতঙ্কের বা ঘৃণার উদ্রেক করে না, সিরাজদ্দৌলা কথাটিতে আজ নূতন শক্তিগ্রহ ঘটিয়াছে—নূতন ও গভীর ব্যঞ্জনা যুক্ত হইয়াছে। বাঙলা শুধু হিন্দুর নহে, বাঙলা শুধু মুসলমানের নহে—বাঙলা বাঙালীর—এই নব-জাতীয়তার প্রধান উদ্গাতার মহিমাই সিরাজ কথাটিকে ঘিরিয়া আছে। নবজাতীয়তা-সাধের কাছে সিরাজ বলিতে—এক সঙ্গে মনে আসে পলাশীর প্রান্তরের জাতিদ্রোহীদের দেশ বিক্রয়ের কালো ষড়যন্ত্র, বিদেশী বণিকের ছল-বল-কৌশলের হীন আচরণ—এই সকলের বিরুদ্ধে অল্পবয়স্ক সিরাজের নিষ্ফল ও নিরুপায় সংগ্রাম এবং—অতিকরুণ পরিণাম, ক্লাইভের জয়ে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ভিত্তিস্থাপনা—পরাধীনতার সূচনা। *যদিও-মুসলিম লীগের **দ্বিজাতি-বাদের আন্দোলন** এবং সেই **আন্দোলনের ফলে দেশ বিভাগ,** হিন্দু-মুসলমান ঐক্য-বোধে ফাটল সৃষ্টি করিয়াছে—হিন্দু-মুসলমান সমবায়ে জাতি গঠনের ধারাকে ব্যাহত ও ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিয়াছে, ইহাও সত্য—বাঙলার স্বাধীনতার জন্য মীরমদন-মোহনলালের প্রাণোৎসর্গ সিরাজের প্রাণপণ সঙ্কল্প, সাময়িক দুর্যোগে আচ্ছন্ন হইলেও, স্বকীয় মহিমা কোন কালেই হারাইবে না। যতদিন বাংলা ও বাঙলী, ততদিন সিরাজ বাঙলার শেষ স্বাধীন নবাব, **যতদিন বাঙলা হিন্দু-মুসলমানের মাতৃভূমি ততদিন সিরাজ বাংলার অন্যতম জাতি প্রতিনিধি।**

সিরাজদ্দৌলার রাজত্বের আর্থ-রাজনৈতিক পটভূমি

সিরাজদ্দৌলার ইতিহাসকে আমরা এক হিসাবে নবাব আলিবর্দীর ইতিহাসেরই 'পরিশিষ্ট' বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই এপ্রিল আলিবর্দীর মৃত্যু আর ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২রা জুলাই সিরাজদ্দৌলার হত্যা—মোট **পনেরো মাসের নবাবীর** ইতিহাস। এই কারণেই রাজনৈতিক কয়েকটি ঘটনা বাদ দিলে, সিরাজদ্দৌলার ইতিহাসের পটভূমি এবং আলিবর্দীর পটভূমি প্রায় একই। প্রথমে এই পটভূমিরই একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাউক।

সাধারণ রাজনৈতিক পরিস্থিতি

পূর্বেই বলা হইয়াছে—অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতীয় ইতিহাস, জাতি-দ্বন্দ্বে ও সামন্তবর্গের প্রতিযোগিতায় ও বিদ্রোহে বিক্ষুব্ধ। মোগল-বাদশাহের সহিত উত্তর ভারতীয় রাজপুত জাঠ ও শিখের এবং দক্ষিণ ভারতীয় মারাঠা-জাতির সংগ্রামে জাতি-দ্বন্দ্বের উৎকট রূপটি প্রকাশ পায় এবং সুবাদারদিগের স্বাধীনতা ঘোষণায় বা স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করার মধ্যে সামন্ততান্ত্রিক মনোবৃত্তি চরম রূপে আত্মপ্রকাশ করে। কেন্দ্রের দুর্বলতার সুযোগে হিন্দু ও মুসলমান সকল সামন্ত-শক্তিই মাথা তুলিয়া দাড়াইতে চেষ্টা করে কিন্তু পারস্পরিক দ্বন্দ্বের ফলে সবগুলিই ক্রমে-ক্রমে দুর্বল হইয়া পড়ে। এই দুর্বলতার ও বিশৃঙ্খলার সুযোগ লইয়াই বিদেশী বণিক কোম্পানীগুলি নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করতে চেষ্টা করে। কেন্দ্রের এই দুর্বলতার সুযোগেই, মহম্মদ শাহের রাজত্বকালেই আলিবর্দী কার্যতঃ স্বাধীনতা অবলম্বন করেন এবং বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যার অধিপতি হইয়া বসেন। **আলিবর্দীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস**—আলিবর্দী জাতিতে তুর্ক-আরব। তাঁহার পিতামহ—জনৈক মোগল মনসবদার এবং পিতা ঔরংজীবের তৃতীয় পুত্র আজম শাহের 'পাত্র-বাহক'। আলিবর্দী নিজে প্রথম জীবনে—পিলখানার (হাতীশালা) এবং 'জারদোজ্‌খানা'র (জরিদার

আলিবর্দীর পরিচয়

বস্ত্রাদির) অধ্যক্ষ এবং ক্রমে অধ্যবসায় ও বুদ্ধি-কৌশলের প্রভাবে এবং সুজা-উদ্-দিনের প্রসাদে—১৭২৮ খৃঃ রাজমহলের ফৌজদার নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে পাইয়াছিলেন—'আলিবর্দী' উপাধিটি। আলিবর্দীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হাজি আহ্মদ সুজা-উদ্দীনের প্রধান পরামর্শ-দাতারূপে মুর্শিদাবাদে ছিলেন। হাজির জ্যেষ্ঠ পুত্র মহম্মদ-রজা (আলিবর্দীর বড় জামাতা) হইলেন—নবাবফৌজের 'বকসী' ও শুল্কবিভাগের অধ্যক্ষ, দ্বিতীয় পুত্র মহম্মদ সইদ (মধ্যম জামাতা) হইলেন—রংপুরের ফৌজদার এবং কনিষ্ঠ মীর্জা মহম্মদ হাসিম (পরে জৈনদ্দিন ও ছোট জামাতা—সিরাজের পিতা) লাভ করেলেন—'খান' উপাধি। ১৭৩৩ খৃঃ আলিবর্দীর কপাল খুলিল বিহার বাঙলা সুবার সহিত যুক্ত হইলে আলিবর্দী বিহারের সহকারী শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলেন। সুজা-উদ্দৌলার অনুরোধে বাদশাহ তাঁহাকে 'মহাবৎজঙ্গ' উপাধি দিলেন, 'পাঁচ হাজারী মনসবদার' করিলেন এবং পাল্কী ও পাঙ্খা ব্যবহারের অধিকারও দিলেন। ক্রমে নাদিরশাহের আক্রমণের দুর্যোগকে মহাসুযোগে পরিণত করিয়া দুর্বল সরফরাজের হস্ত হইতে তিনি 'বাঙলা' ছিনাইয়া লইলেন (গিরিয়া-যুদ্ধ— ১৭৪০, ৯ই এপ্রিল)। ভ্রাতুষ্পুত্র (বড় জামাতা) নোয়াজেস্ মোহম্মদকে খাস্তালুকের দেওয়ান এবং ঢাকার শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন—হোসেনকুলকে করিলেন তাঁহার সহকারী; (সিরাজদ্দৌলার পিতা) জৈনুদ্দনকে বিহারের সহ-শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন, মীরমহম্মদ জাফর খাঁকে করিলেন—পুরাতন ফৌজের বকসী, চিন রায় হইলেন, পেশদস্তির ও খালসার দেওয়ান—জানকীরাম হইলেন—সর্ব-বিষয়ের দেওয়ান—প্রধান, গোলাম হোসেন হইলেন—"হাজিব" এইভাবে শাসন-ভার বণ্টন করিলেন। তারপর, ১৭৪১ খৃঃ উড়িষ্যাতে আধিপত্য বিস্তৃত হইলে, দ্বিতীয় ভ্রাতুষ্পুত্র এবং জামাতা সৈয়দ আহ্মদ খাঁনকে (সৌকৎজঙ্গ) উড়িষ্যায় প্রতিনিধি নিযুক্ত করিলেন।

কিন্তু আলিবর্দী স্বস্তিতে রাজ্যাধিকার ভোগ করিতে পারেন নাই।

বৈদেশিক শক্তির বার বার আক্রমণে কেন্দ্র দুর্বল হওয়ায় প্রদেশে স্বাধীনভাবে কার্য করার সুবিধা হইলেও, দাক্ষিণাত্যের মারাঠা-শক্তির অভিযান আলিবর্দীর আহার নিদ্রা কাড়িয়া লইয়াছিল। (প্রথম মারাঠা-অভিযান ১৭৪২, দ্বিতীয়—১৭৪৩, তৃতীয়—১৭৪৪)। আফগান-বিদ্রোহও (১৭৪৫) তাঁহাকে কম যন্ত্রণা দেয় নাই। ১৭৫১ খৃঃ সন্ধি-প্রস্তাবপত্র স্বাক্ষরিত হইলে আলিবর্দী একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিবার সুযোগ পান। এই সকল যুদ্ধের ফল আলিবর্দীর জীবনে শুভ হয় নাই। যুদ্ধের ব্যয়ভার বহন করিতে তিনি জমিদার-জায়গীরদার, বণিক-সম্প্রদায় সকলের নিকট হইতেই অর্থ আদায় করিয়াছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের অসন্তোষও কুড়াইয়াছিলেন (১৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য), অধিকন্তু যাহাকে বলে 'ঘর ঠিক করা' তাহা করিয়া যাইতে পারেন নাই। জমিদার জায়গীরদারদিগের অসন্তোষ আর ঘরের এক কোণে আগুন ধরিয়া যাওয়া—একই কথা। কারণ আলিবর্দী বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব হইলেও ন্যায়তঃ তিনটি প্রদেশেরই হর্তাকর্তা-বিধাতা হইলেও বস্তুতঃ দেশের ভূ-সম্পত্তি, কয়েকজন ভূম্যধিকারীর অধিকারেই ছিল এবং তাঁহারাই ছিলেন দেশের প্রকৃত মালিক। প্রজার সহিত প্রত্যক্ষযোগ ছিল এই ভূস্বামিগণেরই আর এই সকল ভূস্বামীরা ছিলেন এক একজন খুদে নবাব। মোগল-অধিকারের শেষ দিকের বাঙলার জমিদার-বর্গের পরিচয়, ঐতিহাসিক কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 'বাঙলার ইতিহাস' হইতে সংগ্রহ করিয়া দেখান যাইতে পারে। এই গ্রন্থে এই সময়কার জমিদার-বর্গকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে :—

(১) প্রাচীন কালের স্বাধীন বা করদ হিন্দু রাজগণ :—

(২) হিন্দু বা মুসলমান সামন্তগণ :—

(৩) পূর্বতন রাজস্ব আদায়কারী কর্মচারী, তালুকদার এবং অন্য অর্থশালী ব্যক্তিগণ :—

মুর্শিদকুলি খাঁ ১৭২২ খৃঃ সমগ্র বঙ্গদেশকে ১৩ চাক্লায় বিভক্ত করিয়া সেইগুলিকে ২৫ জমিদারি ও ১৩ জায়গীরে বন্দোবস্ত করেন। এই বন্দোবস্ত

পত্র হইতে ('জমা কামেল তুমারী') দেখা যাইবে যে বাঙলা দেশের জমিদারেরা অনেকস্থলেই উত্তরাধিকারক্রমে জমিদারী ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন। জমিদারের তালিকা—

(ক) ত্রিপুরা (৪ পরগণা) (পাঠান আমলে স্বাধীন, শাজাহানের সুবাদারি আমলে ও মুর্শিদকুলি খাঁর সময়ে বশ্যতা স্বীকার করে) (খ) পঞ্চকোট —(২) (ক্ষত্রিয় রাজপুত বংশ)—মোগল আমলের বশ্যতা (গ) বিষ্ণুপুর—(২) (রাজপুত ক্ষত্রিয় বংশ)-৮ম শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত (ঘ) বর্দ্ধমান —(কপুর ক্ষত্রিয় বংশ) সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত (ঙ) দিনাজপুর—(৮৯) (কায়স্থ বংশ)—শ্রীমন্ত চৌধুরী (শাজাহানের সময়) (চ) নবদ্বীপ —(১৩) প্রতিষ্ঠাতা ভবানন্দ মজুমদার (ছ) রাজসাহী (নাটোর) (৩১)—(১৭২৫ খৃঃ প্রতিষ্ঠিত) (জ) বীরভূমি—(২২) (মুসলমান জমিদারী) (ঝ) ইউসুফপুর (যশোহর) (২৩)—কায়স্থ ভবেশ্বর রায় (মানসিংহকে সাহায্যের প্রতিদান) (ঞ) লস্করপুর—(পুটিয়া) (১৫) বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ (ট) রুকনপুর—কানুনগো (৬২)—(ঔরংজীবের সময়ে) (ঠ) ফতেসিংহ—(১১)—জিঝোতিয়া ব্রাহ্মণ বংশীয় (মানসিংহের সময়ে) (ড) মহম্মদশাহী —(ভূষণা) (২৯)—সীতারাম (ঢ) ইদ্রাকপুর—(ঘোড়াঘাট) (৬০)—কায়স্থ বংশীয় (১৬৬৯)—রঘুনাথ (ণ) জালালপুর—(১৫৫) (ত) শেরপুর—(পুর্ণিয়া) (৩) —(মুসলমান) (থ) কলিকাতা—(২৭)—(দ) ফকিরকুণ্ডী—(রঙ্গপুর) (ধ) কাঁকজোল—(রাজমহল) (১০) (ন) তমোলুক—(মহিষাদল) (১৬)—(ষোড়শ শতাব্দীতে—জনার্দন) (প) শ্রীহট্ট—(৩৬) (ফ) ইস্‌লামাবাদ—(চট্টগ্রাম) (ব) সহেস্ত ও খোস্তাঘাট (ভ) মজকুরীতালুক (২১ তালুক) (ম) সায়রাৎ মহাল।

এখন, উল্লিখিত জমিদারী-বন্দোবস্তের প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে,

বাংলা দেশের ভূ-সম্পত্তির উপর জমিদার-জায়গীরদারগণেরই প্রত্যক্ষ আধিপত্য ছিল এবং জমিদারগণের দ্বারাই দেশের আর্থ-নৈতিক তথা রাজনৈতিক—জীবন অনেক পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত বা প্রভাবিত হইত। আর বিশেষভাবে যাহা চোখে পড়ে তাহা এই যে—জমিদারদিগের মধ্যে অনেকেই হিন্দু, ধনে জনে খুবই প্রতিপত্তিশালী এবং অনেকেই—পাঠান মোগলের শক্তি-পরীক্ষার উপপ্লবের মধ্যেও নিজ অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই সকল জমিদার-জায়গীরদাররাই নবাবের জনবলের ধনবলের উৎস তথা প্রধান সহায়। এই কারণেই নবাবের ইতিহাসে জমিদার জায়গীরদারগণের একটা অংশ—বড় অংশ—না থাকিয়াই পারে নাই। নানা শক্তির ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মধ্যে জমিদার-শক্তি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছিল। আলিবর্দীর সময়েই আমরা দেখি, আলিবর্দীর হিন্দুবিদ্বেষ না থাকিলেও এবং তাহার দেওয়ানী ও ফৌজদারী কার্যে হিন্দুরা উচ্চপদে নিযুক্ত থাকা সত্ত্বেও হিন্দু জমিদারেরা আলিবর্দীকে একটি কারণে সুনজরে দেখিতে পারেন নাই—কারণটি বোধহয়, "আবওয়াব"—আদায়। কুঠির ইঞ্জিনিয়ার কর্ণেল স্কট তাঁহার বন্ধু নোবলকে ১৭৫৪ খৃঃ লিখিয়াছিলেন—"the Jentue (Hindu) rajas and the inhavitants were disaffected to the moor (Muhammadan) government and secretly wished for a change and opportunity of throwing off their yoke." হিন্দু জমিদাররা তলে তলে আলিবর্দীকে অপসারিত করিবার জন্য গোপন বাসনা পোষণ করিতেছিলেন—সিরাজদ্দৌলার সময়ে সেই বাসনা প্রচণ্ড ষড়যন্ত্রে পরিণত হইয়াছিল।

হিন্দুপ্রভাব

তারপর—ভূমি-রাজস্বের সংগ্রাহক বলিয়া জমিদারগণ যেমন নবাবের এবং দেশের ধনবলের আধার, তেমনি ধনবলের অন্যতম উৎস ছিল বণিক-সম্প্রদায় (কারণ বাণিজ্যেই লক্ষ্মীর বাস—কাচা টাকা বণিকের ঘরেই বেশী)। শ্রেষ্ঠী-সম্প্রদায়ই যে নবাবের প্রধান কোষাগার—জগৎ শেঠের ঐতিহাসিক গুরুত্বই

দেশীয় হিন্দুবণিক ও ইউরোপীয় বণিক কোম্পানী

তাহার বড প্রমাণ। এই বাণিজ্য-ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠী-সম্প্রদায়ের প্রাধান্য ছাডাও, বৈদেশিক বণিক সম্প্রদায়ের আধিপত্য বিস্তার—বিস্তারের অধিকতর চেষ্টা এবং আধিপত্যকে সুরক্ষিত করিবার জন্য রাজনৈতিক ব্যাপারে অংশগ্রহণ, দেশের আর্থনৈতিক সংস্থাটিকে জটিলতর করিয়া তুলিয়াছিল। মোটকথা বিদেশী বণিকরাও তখন একটা শক্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল এবং সেই কারণেই উহারা আর্থনৈতিক সংস্থার বা পটভূমির অন্যতম লক্ষণীয় অংশ হিসাবে গণ্য। আলিবর্দির সময়েই ইউরোপীয় বণিকরা দাক্ষিণাত্যে গৃহ-বিবাদে মাথা গলাইয়া ক্ষমতা বৃদ্ধির যে চেষ্টা করিয়াছিল তাহাতে আলিবর্দী খুবই ভাবিত হইয়াছিলেন এবং বিদেশী বণিকগণের গতিবিধির উপর কড়া নজর রাখিতেন। কলিকাতায় বা চন্দননগরে তিনি ইংরেজ বা ফরাসী বণিককে দুর্গ নির্মাণ করিতে দেন নাই। প্রস্তাব আসিলেই বলিতেন—"তোমরা এসেছ বাণিজ্য করতে, এ দুর্গের দরকার কি? আমার অধীনে যতক্ষণ আছ ভয়ের কোন কারণ নেই।" আলিবর্দীর কড়া শাসনে টুশব্দ করিতে না পারিলেও মনে মনে ইংরেজ বণিকরা খুবই অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে আলিবর্দী ইংরেজ-বণিকদিগকে মারাঠাদের সাহায্য করিতে দেখিয়া অভিযোগ তুলিয়াছিলেন—এবং গুরুতর একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন, বিষয়টি এই—আগে কোম্পানীর জাহাজ ছিল মাত্র ৪।৫ খানা, এখন সেখানে জাহাজের সংখ্যা ৪০।৫০, আর উহাদের সবগুলি কোম্পানীর জাহাজ ছিল না। ইংরেজরা যে তলে তলে বড একটা কিছু করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল আলিবর্দীর সময়েই তাহা বুঝা গিয়াছিল। সিরাজের সময়ে এই কালসাপেরাই ফণা তুলিয়া দংশন করিতে আরম্ভ করিল।

আলিবর্দীর মৃত্যুর পরে (১৭৫৫) সিরাজদ্দৌলা উত্তরাধিকার-সূত্রে শুধু সিংহাসনখানিই লাভ করেন নাই, সিংহাসনের দশদিকে যে রাজনৈতিক, আর্থনৈতিক পরিস্থিতির বারুদস্তূপটি জমিয়া উঠিয়াছিল তাহাও গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। গৃহ-বিবাদের অনিবার্য বিস্ফোরণ দেখিতে না দেখিতেই দেখা

দিল। একদিকে বড়মাসী ও জেঠিমা ঘসেটি বেগম এবং তাহার আশ্রিত রাজবল্লভ প্রভৃতি ক্ষমতাশালী জমিদারবর্গ, অন্যদিকে জেঠতুতো-মাসতুতো-ভাই পূর্ণিয়ার নবাব সওকৎ জঙ্গ ও তাহার পৃষ্ঠপোষকগণ—সুযোগলোভী ও সিরাজবিদ্বেষীরা ঐ দুই পক্ষের কোনও এক পক্ষে ভর করিয়া গৃহ-বিবাদে বাতাস দিতে থাকিলেন। জমিদারগণ ও বণিকগণ নিজের স্বার্থরক্ষার দিকেই একমাত্র নজর রাখিয়া বাঙলার স্বাধীনতাকে বিদেশীর কাছে বিকাইয়া দিতে ইতস্ততঃ করিলেন না।

আলিবর্দীর মৃত্যুর পূর্বেই দুর্যোগের ঘনঘটা দেখা দিয়েছিল। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমে আলিবর্দী খাঁ শোথ ও উদরী রোগে শেষ শয্যাশায়ী হইলেন। তাঁহার পরামর্শ অনুসারে সিরাজ রাজকার্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। এই সময়েই—বারুদের স্তূপ বিস্ফোরণ-মুখী হইয়া উঠিতেছিল। রাজবল্লভ, কৃষ্ণচন্দ্র প্রমুখ জমিদারবর্গ রাজস্ব ফাঁকি দিয়া আসতেছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্রকে একাধিকবার বন্দী অবস্থায় মুর্শিদাবাদে কাটাইতে হইয়াছে, সুতরাং তাঁহার পক্ষে আলিবর্দী ও সিরাজ-বিদ্বেষ অন্যায় হইলেও অস্বাভাবিক ছিল না। রাজবল্লভও ঢাকার রাজস্ব লইয়া ছিনিমিনি খেলিতেছিলেন। হোসেন কুলির মৃত্যুর পর (১৭৫৪, এপ্রিল) রাজবল্লভ ঢাকার নবাবের দক্ষিণ হস্ত হইলেন। নৌবহর সংগঠনের জন্য ১৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল, অধ্যক্ষ রাজবল্লভ মহাশয় তাহা আত্মপুষ্টির জন্যই বেশী ব্যয় করিতেন। নোয়াজিস মহম্মদ পঙ্গু থাকায় হোসেন কুলি যত সুযোগ সুবিধার অধিকারী ছিলেন বৈদ্য চতুর রাজবল্লভ তাহার সব কয়টি ভোগ করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিক অর্মকে বিশ্বাস করিলে—স্বীকার করিতে হইবে "বেগমের সহিত রাজবল্লভের অনুরূপ সম্বন্ধও লোকে সন্দেহ করিত যাহা একের উচ্চ পদ ও অপরের ধর্মের অনুযায়ী নহে।" অবশ্য ঐতিহাসিক বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পাদটীকায় জানাইয়াছেন—"ঘসেটি বেগমের চরিত্র হোসেন-কুলি-প্রসঙ্গে দেখা গিয়াছে। পরে মির নবাব আলিকে সু-নজরে রাখায় বৃদ্ধ রাজবল্লভের বল্লভত্বে সন্দেহ করিবার বিশেষ কারণ আছে"। যাহা

হউক, শাহামৎ জঙ্গের (নোয়াজিস্ মৃত্যুর পরে (১৭৫৫, ডিসেম্বর), সিরাজ রাজবল্লভের ঢাকা-শাসনের হিসাব-নিকাশ করিতে বলিলেন—এই কারণেই ১৭৫৬ মার্চমাসে রাজবল্লভ কারারুদ্ধ হইলেন। আলিবর্দীর কৃপায় রাজবল্লভের মাথাটি সে যাত্রা স্কন্ধদেশেই রহিয়া গেল, কিন্তু সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ও পরিবারকে বন্দী করিতে লোক প্রেরিত হইল। অবশ্য রাজবল্লভ পূর্বাহ্নেই প্রস্তুত ছিলেন। পুত্র কৃষ্ণবল্লভকে ধনজন সহ জগন্নাথ দর্শনের অছিলা করিয়া ওয়াটসের সাহায্যে কলিকাতায় ইংরেজ দুর্গে সরাইয়া দিয়াছেন (১৩ই মার্চ ১৭৫৬)*। কৃষ্ণবল্লভের কলিকাতায় পৌঁছিবার এবং আশ্রয় পাইবার সংবাদ পাইয়া সিরাজ বুঝিয়াছিলেন—আলিবর্দীকেও বলিয়াছিলেন—ইংরাজ ঘসেটি বেগমের পক্ষই অবলম্বন করিবে। কলিকাতায় গুপ্তচর প্রেরণ করিলেন এবং গুপ্তচর বিতাড়িত হইলে (১৬ই এপ্রিল) ইংরেজের স্পর্দ্ধার মাত্রাও বুঝিয়া লইলেন। কিন্তু অবস্থা তখন ঘোরালো। (এই মাসেই আলিবর্দী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন) ওদিকে ঘসেটি বেগমও নিষ্ক্রিয় ছিলেন না। পালিতপুত্র একরাম-উদ্‌দৌলার (সিরাজের ছোট ভাই) ও স্বামীর মৃত্যুর পরে, একরামের শিশু-পুত্রকে মসনদে বসাইবার কল্পনায় মন্ত্রণা আঁটিতে লাগিলেন—সহায় ছিল তাঁহার রাজবল্লভ ও অনুগত সেনানীদল।

আলিবর্দীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে, রাজবল্লভ-মীরজাফর-ঘসেটিবেগম-সওকৎজঙ্গও ইংরেজবণিকের মধ্যে—**ঢাকা-পূর্ণিয়া-কলিকাতা জুড়িয়া একটি সিরাজ-বিরোধী ষড়যন্ত্র বলয় সৃষ্টি হইল**। ঐতিহাসিক সরকারের ভাষায় বলা চলে "Thus Sirajuddaulah came to his long assigned throne in a house divided against itself, with a hostile faction in the army and disaffected subject population'

আলিবর্দীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মীরজাফর সওকৎজঙ্গকে বাঙলা অধিকার করিবার জন্য গোপন পত্রে আমন্ত্রণ জানাইলেন এবং নিজের ও অন্যান্য সেনানীদের সাহায্যের প্রতিশ্রুতিও দিলেন। সওকৎজঙ্গও নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। দিল্লী হইতে বাদশাহী ফরমাণ আনাইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন।

রাজ্যপ্রাপ্তির পরে সিরাজদ্দৌলার ইতিহাস

সিরাজদ্দৌলা প্রথমেই ষড়যন্ত্রের বড় ঘাঁটি নষ্ট করিবার জন্য মতিঝিলের আড্ডা ভাঙ্গিয়া দিলেন—ঘসেটি বেগমের ধনরত্ন হস্তগত করিলেন এবং ঘসেটিকে মতিঝিল হইতে সরাইয়া লইয়া আসিয়া নজরবন্দী করিয়া রাখিলেন। ঘসেটির প্রিয়পাত্ররা (নজর আলি প্রভৃতি) যঃ পলায়তি'-নীতি প্রয়োগ করিয়া নীতিটির কার্যকারিতা পরীক্ষা করিলেন। তবে সব ধনরত্ন সিরাজের হস্তগত হইল না। মুতাক্ষরীণকারের মতে- "বিশ্বস্তা দাসীর সাহায্যে অনেক স্বর্ণমুদ্রা স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল। সিরাজের বিরুদ্ধে চক্রান্তের সময়, চক্রান্তকারীগণের সহিত যোগ দিয়া ইহার ব্যবহার করা হয়"। স্বার্থান্বেষী ও ষড়যন্ত্রকারী মীরজাফরকে তিনি 'বকসী' পদ হইতে সরাইয়া মীরমদনকে 'বকসী' পদ দান করিলেন এবং কাশ্মীরী মোহনলালকে দেওয়ান-খানায় পেস্কার পদ এবং মহারাজ উপাধি দিলেন। মোহনলাল কার্যতঃ প্রধানমন্ত্রীর স্থান গ্রহণ করিলেন—(এপ্রিল ১৭৫৬)—'দেওয়ানই-আল্লা' মোদর-উল-মোহন (প্রধানমন্ত্রী) হইলেন।

ঘসেটি-বেগমকে মতিঝিল হইতে অপসারণ

১৭৫৬, মে মাসে সিরাজ সৌকৎজঙ্গকে দমন করিবার জন্য পুর্ণিয়া যাত্রা করিলেন। ২২শে মে, সৌকৎজঙ্গ বশ্যতা স্বীকার করিয়া পত্র পাঠাইলে, সৈন্যসহ রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন। কারণ আর একদিকে বিপদ বেশ ঘনাইয়া উঠিতেছিল—ইংরাজ বণিকের স্পর্দ্ধা ধৈর্যের সীমা অতিক্রম করিয়াছিল।

১৬ মে হইতে ২২ শে মের ঘটনা

(৪) সিরাজের সহিত ইংরাজের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম অনিবার্য হইয়া উঠিল। ইংরাজ বণিকদিগের প্রতি সিরাজের মনোভাব একে ভাল ছিল না, তদুপরি কৃষ্ণবল্লভকে আশ্রয় দেওয়ায় এবং আদেশ অমান্য করিয়া দুর্গ মেরামত করায় তাহা ক্রোধেই পরিণত হইল। সিরাজ-প্রেরিত চরের অপমানে ক্রোধের আগুনে ঘৃতাহুতি পড়িল। ২৪শে মে কাশিমবাজার কুঠি অবরুদ্ধ হইল—কুঠিয়ালরা

অনেকেই বন্দী হইলেন। **৫ই জুন** কলিকাতা-অভিযানে যাত্রা করিলেন। ১৬০ মাইল পথ ১১ দিনে অতিক্রম করিয়া **১৬ই জুন** কলিকাতায় পৌঁছিলেন। ১৮ তারিখে রীতিমত যুদ্ধ বাধিয়া গেল। ১৯ তারিখে সাহেবদিগের সঙ্কট চরমে পৌঁছিল **হলওয়েল সাহেব** (J Z Holwell) সেনাপতি সাজিলেন এবং প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও সাহেবদের আতঙ্ক ও পলায়ন বন্ধ করিতে পারিলেন না। হলওয়েল. বেলা চার ঘটিকায় আত্মসমর্পণ করিলেন এবং নবাব সিরাজদ্দৌলা বিজয়গর্বে কলিকাতায় প্রবেশ করিলেন। "সেনাপতি মীরজাফর খাঁ ও অন্যান্য পাত্রমিত্র সঙ্গে অপরাহ্ন পাঁচটার পরে নবাব সিরাজদ্দৌলা ইংরেজ দুর্গে প্রবেশ করিলেন। প্রথমেই কৃষ্ণবল্লভ ও অমিচাঁদের সন্ধান হইল, তাহারা সম্মুখে আনীত হইলে, নবাব তাঁহার প্রতি সমাদর ও শিষ্টাচার প্রদর্শন করিলেন। কৃষ্ণবল্লভকে এক শিরোপা প্রদত্ত হইল" (বন্দ্যোপাধ্যায় Cook'es Evidence.)।

(৫) এদিকে শওকৎ জঙ্গ দিল্লী হইতে বাদশাহী উজিরকে এক কোটি টাকা ঘুষ দিয়া, বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যা অধিকার করিবার অনুমতি-পত্র সংগ্রহ করিলেন এবং সিরাজ-প্রতিনিধি রায় রাসবিহারীকে ফিরাইয়া দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন—সিরাজ যেন মুর্শিদাবাদ ত্যাগ করিয়া তাঁহার প্রতিনিধি হইয়া ঢাকায় গিয়া বাস করে। অগত্যা সিরাজকে **২৪শে সেপ্টেম্বর** শওকৎজঙ্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিতেই হইল। মণিহারী-যুদ্ধে ১৬ অক্টোবর শওকৎজঙ্গ প্রাণ দিয়া নবাবী মানটুকু বাঁচাইয়া গেলেন।

(৬) কলিকাতায় ও পূর্ণিয়ায় জয়লাভ করিয়া এবং বাদশাহী সনন্দ লাভ করিয়া সিরাজ একটু নিশ্চিন্ত হইলেন এবং আশা করিলেন ইংরেজরা এবার আত্মসমর্পণ করিয়া—বশ্যতা স্বীকার করিয়া থাকিবে কিন্তু **ডিসেম্বর মাসেই** সংবাদ পাইলেন—ইংরেজরা কলিকাতা অধিকার করিতে বদ্ধপরিকর। **ক্লাইভ** ও ওয়াটসনের নেতৃত্বে, ২৭শে ডিসেম্বর, অভিযান ফলতা হইতে অগ্রসর হইল। ২৯ তারিখে মানিকচাঁদ-চালিত সৈন্যের সহিত ছোটখাট একটি যুদ্ধ হইল—

মাণিকচাঁদ পাগড়ী উড়িতেই নিজেও উধাও হইলেন। বজবজ-যুদ্ধে নবাব-শক্তি পরাজিত হইল। ক্লাইভ ও ওয়াটসন ২রা জানুয়ারী (১৭৫৭) কলিকাতায় প্রবেশ করিলেন—৩রা জানুয়ারী নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া এক ইস্তেহার বাহির করিলেন।

বজবজ যুদ্ধের সংবাদ শুনিয়া নবাব **১৯শে জানুয়ারী** হুগলী পৌছিলেন। **৩রা ফেব্রুয়ারী** কলিকাতার বাহিরে আমির চাঁদের বাগান-বাটীতে শিবির স্থাপন করিলেন। **৫ই ফেব্রুয়ারী** ক্লাইভ অতর্কিত ভাবে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু খুব সুবিধা করিতে পারিলেন না। তবে নবাবও তেমন আঁটিয়া উঠিতে পারিলেন না। অগত্যা সন্ধি স্থাপিত হইল—খুবই উচ্চ মূল্য দিয়া সিরাজ সন্ধি ক্রয় করিলেন। ক্লাইভ অনতিবিলম্বে—পথের কণ্টক ফরাসীদের উৎপাটিত করিতে উদ্যত হইলেন। ২৩শে মার্চ চন্দননগর আত্মসমর্পণ করিল।

(৭) **ঘরে শত্রু বাহিরে শত্রু**—সিরাজ অনেকটা কিংকর্তব্য বিমূঢ়। চোখের উপর শত্রুপক্ষ ইংরেজ মিত্রপক্ষ ফরাসীদের নিঃশেষ করিতে উদ্যত অথচ বাধা দেওয়ার ইচ্ছা থাকিলেও শক্তি বা সাহস ছিল না। ইংরেজদিগের প্রতি তাহার বিরূপ মনোভাবকে তিনি চাপিয়া রাখিতে পারেন নাই, এদিকে কিন্তু ইংরেজের ফরাসীদমনে বাধাও দেন নাই। তাহার অস্থির চিত্ততা এত বাড়িয়া গিয়াছিল যে, দাক্ষিণাত্যে বুশির কাছে পত্র লিখিয়াও বসিয়াছিলেন।

পলাশী-যুদ্ধের বাকী মাত্র ৩ মাস

এদিকে গৃহশত্রুদের স্বরূপও তাহার নখদর্পণে ছিল। কিন্তু শত্রুদের গায়ে হাত দেওয়ার অবস্থা তখন ছিল না। হিন্দু জমিদারবর্গের অনেকেই তখন বাকী কর না দেওয়ার ফিকির খুঁজিতেছিলেন—সুতরাং সিরাজের বিরুদ্ধে মন্ত্রণা আঁটিবার প্রবৃত্তি তাহাদের স্বাভাবিক। রাজবল্লব, কৃষ্ণচন্দ্র, জগৎশেঠ, রায়দুর্লভ সকলেই কোন না কোন কারণে সিরাজ-দ্বেষী হইয়া উঠিয়াছিলেন,

কলে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন। মীরজাফর ছিলেন যত নষ্টের গোড়া—তাহাও অবিদিত ছিল না। সিরাজ মহা দ্বন্দ্বে পড়িয়াছিলেন—তাঁহার ঘরে শত্রু বাহিরে শত্রু।

এপ্রিলের শেষাশেষ 'কলিকাতা কাউনসিল্-এ' মীরজাফর প্রমুখ প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের পত্রাদি আসিতে লাগিল। ১লা মে মীরজাফরের সহিত কোম্পানী চুক্তি করা স্থির করিলেন। কাশিমবাজার কুঠিয়াল উইলিয়াম ওয়াটস্‌কে মুর্শিদাবাদে ষড়যন্ত্র পাকাইয়া তুলিবার ভার দেওয়া হইল। ওয়াট্‌স গোপনে গোপনে মীরজাফর প্রমুখ প্রধানগণের সহিত দেখা করিতে লাগিলেন। ১১ই জুন মীরজাফরের স্বাক্ষরিত চুক্তি—কলিকাতায় প্রেরিত হইল এবং ১২ই জুন ওয়াটস্ নিজে মুর্শিদাবাদ হইতে চম্পট দিলেন। ১৩ই জুন ক্লাইভ ৩০০০ সৈন্যসহ (৮০০ মাত্র ইউরোপীয়) মুর্শিদাবাদ অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

ওয়াটস্ সাহেবের কাশিমবাজার ত্যাগের সংবাদ পাইয়া সিরাজ বুঝিলেন—সম্মুখ যুদ্ধ আসন্ন ও অনিবার্য। "নবাব এইবার প্রমাদ গণিলেন। ঐদিনেই মীরজাফরের প্রাসাদ আক্রমণের অভিপ্রায় ছিল; কিন্তু এক্ষণে আর মীরজাফরকে প্রসন্ন না করিতে পারিলে গত্যন্তর নাই, এই চিন্তা করিয়া সে সংকল্প ত্যাগ করিলেন···পুনর্মিলনের উদ্যোগ হইতে লাগিল। মীরজাফর তাঁহাদের কথায় সম্মত হইবার ভাণ দেখাইলেন·· আত্মাভিমান পরিহার করিয়া, [সিরাজ] সামান্য একদল অনুচর সঙ্গে মীরজাফরের বাটিতে উপনীত হইলেন। পুনরায় পুনর্মিলনের কথা পড়িল, "যথারীতি কোরাণ লইয়া উভয়পক্ষে শপথও হইল।" এইভাবে নিরুপায় সিরাজ নিজের পৃষ্ঠদেশ কুচক্রী মীরজাফরের কাছে অনাবৃত করিয়া দিয়া, পলাশী প্রান্তরে ইংরেজ সৈন্যের সম্মুখীন হইলেন। শত্রুকে বিশ্বাস করার ফল হাতে হাতেই ফলিল। মীরজাফরের জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতায় সিরাজ বাহিনী পরাজিত হইল। সিরাজ পলাইয়াও পরিত্রাণ পাইলেন না—মহম্মদী বেগের খড়্গাঘাতে বাঙলার স্বাধীন নবাবের উন্নতশির

ধুলোয় লুটাইয়া পড়িল। 'ক্লাইভের গদভ' মীরজাফর মাত্র ১৩ দফা চুক্তি করিয়া বাঙলাকে ইংরেজ বণিকের হাতে তুলিয়া দিল।

ঐতিহাসিক নাটক ও ঐতিহাসিক বাস্তবতা

ঐতিহাসিক নাটক ইতিহাসমাত্র নহে—ঐতিহাসিক-ঘটনাসংশ্লিষ্ট নরনারীর জীবনের অথবা জাতীয় জীবনের স্মরণীয় ঘটনার রস-রূপ—এ কথা সত্য, কিন্তু একথাও সত্য যে ঐতিহাসিক নাটকে জীবন-রসের চাহিদা যেমন থাকে তেমনি থাকে ঐতিহাসিক ভাবশুদ্ধির চাহিদা। আদর্শ ঐতিহাসিক নাটক আমরা তাহাকেই বলিতে পারি যেখানে জীবনরস ও ঐতিহাসিক ভাবশুদ্ধি বা বাস্তবতা অবিরোধে অবস্থান করে। সুতরাং ঐতিহাসিক নাটকে ঐতিহাসিক বাস্তবতার প্রশ্ন না উঠিয়াই পারে না। তবে 'ঐতিহাসিক বাস্তবতা' এক হিসাবে যেমন ধরাবাঁধা, অন্য হিসাবে তেমনি আপেক্ষিক—এ কথাও মনে রাখা দরকার। ঘটনা জাগতিক কিন্তু ঘটনার ব্যাখ্যা—তাৎপর্যের ধারণা—মানসিক এবং মানসিক বলিয়াই অনেকটা ব্যক্তিগত ও জাতিগত সংস্কারের সাপেক্ষ। ইতিহাসের পৃষ্ঠা খুলিলেই এই মন্তব্যের সমর্থন পাওয়া যাইবে। এক জাতির কাছে যিনি দেবদূত অন্যজাতির কাছে তিনি শয়তান—এমন দৃষ্টান্ত ইতিহাসে যথেষ্টই আছে। সুতরাং 'ঐতিহাসিক বাস্তবতা' কথাটি প্রয়োগ করিবার সময়, গোঁড়ামি না প্রকাশ পায় সেদিকেও খেয়াল রাখা দরকার—মনে রাখা দরকার যে, বাস্তবতা আপেক্ষিক বলিয়া, সামাজিক সংস্কার-সাপেক্ষ বলিয়া, 'মোটামুটি' শব্দটি দ্বারা উহাকে বিশেষিত করিয়া লওয়াই বাঞ্ছনীয়। অন্যথা সম্যগ্‌দৃষ্টির স্থলে মিথ্যাদৃষ্টির প্রাধান্য ঘটিবার আশঙ্কাই বেশী।

নাটকের ঐতিহাসিকত্ব

গিরিশচন্দ্রের **সিরাজদ্দৌলা নাটকের ঐতিহাসিকত্ব** বিচার করিবার মুখে এই কথাটি বেশী করিয়াই মনে রাখা আবশ্যক। কারণ সিরাজদ্দৌলার ঐতিহাসিক তাৎপর্য ও গুরুত্ব সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদের অন্ত নাই। সিরাজদ্দৌলার "ঐতিহাসিক বাস্তবতা"র বাহিরের অর্থাৎ ঘটনা-গত রূপের

দিকটি সম্পর্কে ঐক্য থাকিলেও অন্তরের অর্থাৎ তাৎপর্যের দিকটি বিসংবাদিত।

আভ্যন্তরিক ঐতিহাসিক

এক দৃষ্টিকোণে সিরাজ অপদার্থ, লম্পট, অত্যাচারী, শয়তান, অন্য দৃষ্টিকোণে সিরাজ বাঙলার শেষ স্বাধীন নবাব, স্বাধীনতা রক্ষায় ঐকান্তিক, যুগসন্ধির হতভাগ্য বলি, ষড়যন্ত্রের বাহচক্রে নিষ্পেষিত বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যার স্বাধীনতার প্রতিনিধি। সিরাজদ্দৌলার ইতিহাসের ঐতিহাসিক গুরুত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে এ সম্বন্ধে যে সব কথা বলা হইয়াছে, এখানে তাহা পুনরুল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই; এখানে শুধু এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে ইংরেজ-অধীন ভারতবাসী সিরাজদ্দৌলাকে প্রথম অপেক্ষা দ্বিতীয় দৃষ্টিকোণ হইতেই বেশী দেখিয়াছে—নব-জাতীয়তাবাদের দৃষ্টিতে সিরাজ শুধু বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব নহে, সিরাজ ফিরিঙ্গি-শক্তির—তথা ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারতের প্রথম সম্মুখ সংগ্রামের প্রতীক। প্রগতিশীল চিন্তার কাছে সিরাজদ্দৌলার ঐতিহাসিক বাস্তবতার আত্মিক রূপটি এখানেই। হেগেলের পরিভাষায় বলা যাইতে পারে এই ধারণাটাই সিরাজদ্দৌলার "Idea"। এই "আইডিয়া"টিকে সিরাজদ্দৌলার ঐতিহাসিক বাস্তবতার আত্মা বলা চলে। গিরিশচন্দ্রের সিরাজদ্দৌলা এই 'আইডিয়া'র কেন্দ্রেই গড়িয়া উঠিয়াছে। ফিরিঙ্গি-বিদ্বেষে ও বাংলার স্বাধীনতা—দেশের স্বাধীনতা রক্ষার সঙ্কল্পে ও আকাঙ্ক্ষায় সিরাজের মেরুমজ্জা গঠিত হইয়াছে। গিরিশচন্দ্রের সিরাজদ্দৌলা বিদেশী ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে দেখা সিরাজ নহে। নাটকের ভূমিকাতে নাট্যকার তাহার দৃষ্টিকোণের বৈশিষ্ট্য ব্যক্ত করিয়াছেন—"বিদেশী ইতিহাসে সিরাজচরিত্র বিকৃতবর্ণে চিত্রিত হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়, শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি শিক্ষিত সুধীগণ অসাধারণ অধ্যবসায় সহকারে বিদেশী ইতিহাস খণ্ডন করিয়া **রাজনৈতিক ও প্রজাবৎসল সিরাজের স্বরূপ চিত্র প্রদর্শনে** যত্নশীল হন। আমি ঐ সমস্ত লেখকগণের নিকট ঋণী।" এই রাজনৈতিক ও প্রজাবৎসল

সিরাজের স্বরূপচিত্রে সিরাজের প্রধান বাস্তবতার মূল কেন্দ্রটি রহিয়াছে।

তারপর—আর্থ-রাজনৈতিক সংস্থা-গত বাস্তবতার প্রশ্ন। সিরাজদ্দৌলার ঐতিহাসিক পটভূমি পূর্বেই বর্ণনা করা হইয়াছে এবং দেখান হইয়াছে—দেশটি প্রকৃতপক্ষে জমিদার জায়গীরদারগণের অধিকারেই ছিল, দেশের আর্থ নৈতিক বিধিব্যবস্থা ও ধনসম্পদ জমিদারবর্গের বিশেষতঃ জগৎশেঠ প্রমুখ বণিকগণের হস্তেই ন্যস্ত ছিল—জগৎশেঠই নবাবের অর্থভাণ্ডার ছিলেন, এক কথায় দেশের ধনবল ও জনবলের উপর ঐ সকল জমিদার-জায়গীরদার বণিকশ্রেণীরই প্রভাব ছিল। ইহারা নিজ নিজ স্বার্থচিন্তা ছাড়া আর কোন কিছুই করিতেন না। রাজকর ফাঁকি দিয়া, সরকারী অর্থ আত্মসাৎ করিবার দিকেই ইহাদের বেশী ঝোঁক ছিল। এই কারণে নবাবের প্রতি মৌখিক আনুগত্য দেখাইলেও অর্থস্বার্থে আঘাত লাগিতেই গোপনে নবাবের শত্রুশিবিরে যোগ দিয়া ইহারা নবাবকে গতিচ্যুত করিবার ফন্দি আঁটিতেন। অর্থের হিসাব নিকাশ করিতে বলায় ইহাদের অনেকের সহিত সিরাজদ্দৌলার সংঘর্ষ হইয়াছিল। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, রাজবল্লভ অনেকটা আর্থনৈতিক কারণেই সিরাজের বিরুদ্ধ পক্ষে যোগ দিয়াছিলেন। তাঁহাদের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের মূলে অর্থ স্বার্থের চিন্তাই বেশী কাজ করিয়াছিল। নাট্যকার খুব তলাইয়া না দেখিলেও আর্থনৈতিক ঘটনার পরোক্ষ ও সামান্য উল্লেখ করিয়াছেন এবং রাজনৈতিক ঘটনারাজি প্রায় সমস্তই উপস্থাপিত করিয়াছেন। পূর্ণিয়ার সওকৎজঙ্গের ও ইংরেজবণিক-শক্তির সাহায্যে সিরাজকে দাবাইয়া রাখার এবং গদিচ্যুত করার ষড়যন্ত্রে 'ঘসেটি রাজবল্লভ জগৎশেঠ মীরজাফরের' শয়তানী কূটনৈতিক ক্রিয়াকলাপ—ইংরেজ বণিকদের ন্যায় নীতি উপেক্ষা করিয়া ছল বল কৌশল প্রয়োগ, বিশ্বাসঘাতক ও শত্রু বলিয়া জানা সত্ত্বেও সিরাজদ্দৌলার বার বার স্বার্থান্ধ শত্রুদের কাছে অগত্যা আত্মসমর্পণ—এই সকল ঘটনা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রায় পুরোপুরিই নাটকে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করা হইয়াছে। নাটকের অঙ্কান্তর্বর্তী ঘটনার হিসাব

লইলেই উক্তিটির সমর্থন পাওয়া যাইবে। প্রথম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কের প্রথম **প্রত্যক্ষ ঘটনা**—ষড়যন্ত্রের প্রধান ঘাঁটি মতিঝিল আক্রমণ এবং ঘসেটি বেগমকে মতিঝিল হইতে অপসারণ, দ্বিতীয় **প্রত্যক্ষ ঘটনা**—বিশ্বস্তা দাসীর (জহরা) সাহায্যে ধনরত্ন স্থানান্তরিত করা এবং তৃতীয় **প্রত্যক্ষ ঘটনা**—রায়দুর্লভ মীরজাফরকে পদচ্যুত করিয়া মোহনলাল-মীরমদনকে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত করা। পরোক্ষ ঘটনা—(ক) রাজবল্লভ'দের সহিত ঘসেটির ষড়যন্ত্র (খ) নবাবী অর্থ লইয়া কৃষ্ণদাসের কলিকাতায় ইংরেজের শরণাপন্ন হওয়া (গ) ঘসেটির প্রধান মন্ত্রণাদাতা মীর নজর আলীর সসৈন্যে পলায়ন (ঘ) ঘসেটির পালিতপুত্র এক্রামদ্দৌলার মৃত্যু (ঙ) এক্রামদ্দৌলার শিশুপুত্র মোরাদদ্দৌলাকে সিংহাসনে বসাইবার চক্রান্ত (চ নজর আলির সহিত ঘসেটির অবৈধ সম্পর্ক (ছ) রাজবল্লভের সহিত অন্তরঙ্গতা (জ) ঘসেটির চক্রান্তে হোসেনকুলি বধ। (ঝ) কৃষ্ণদাসকে হিসাব নিকাশের জন্য মুর্শিদাবাদে প্রেরণ করিতে ইংরেজদের প্রতি নবাবের আদেশ, ইংরেজ কর্তৃক নবাবের আদেশ উপেক্ষা। (ঞ) সওকৎজঙ্গের নিকট পূর্ণিয়ায় মীরজাফর কর্তৃক দূতরূপে মীরণ প্রেরিত। (ট) মোহনলাল মন্ত্রীপদে এবং মীরমদন সেনাপতি-পদে প্রতিষ্ঠিত। ঘটনাকে সংক্ষিপ্ত বিস্তারিত করিবার অধিকার নাট্যকারের আছে এ কথা স্বীকার করিলে দেখা যাইবে—প্রথম গর্ভাঙ্কের প্রত্যক্ষ ঘটনার প্রথমটি মুখ্য এবং ঐতিহাসিক। দ্বিতীয়টি—মুতাক্ষরীণকার বর্ণিত "বিশ্বস্তা দাসীর সাহায্যে অনেক স্বর্ণমুদ্রা স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল। সিরাজের বিরুদ্ধে চক্রান্তের সময় চক্রান্তকারীগণের সহিত যোগ দিয়া ইহার ব্যবহার করা হয়"—এই তথ্যের বিস্তার। তৃতীয় প্রত্যক্ষ ঘটনা—সত্য ঘটনারই সংশ্লেষণ। পরোক্ষ ঘটনাগুলি পুরোপুরি ঐতিহাসিক। **দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কের**—ঘটনা—অন্তঃপুরে আলিবর্দী-বেগমের সিরাজকে উপদেশ দান—মীরজাফর প্রভৃতিকে রাজকার্যে স্থাপিত করিবার নির্দেশ—সিরাজের স্বীকৃতি—অনৈতিহাসিক নহে।

বাস্তব ঐতিহাসিকত্ব

তৃতীয় গর্ভাঙ্কে—সওকৎজঙ্গের কাছে মীরজাফরের পত্র প্রেরণ—পত্রযোগে বাঙলা আক্রমণের জন্য আমন্ত্রণ—এবং "the same ignorant pride, insane ambition, uncontrollable passion, looseness of tongue and addiction to drink"—সওকৎজঙ্গের চরিত্র।

পরোক্ষ ঘটনা—(ক) ঘসেটি ও আমিনার সঙ্গে হোসেন কুলির সম্পর্ক—(খ) হোসেন কুলি-বধের কারণ ও প্ররোচনা (গ) মীরজাফরের স্ত্রী—সম্পর্কে আলিদীর বোন (ঘ) সিরাজের লাম্পট্য—"নৌকায় বেড়িয়ে দু'ধারেই ভাল ভাল মেয়ে মানুষ দেখেছে আর বেগম করেছে (মঁসিয়ে লার আত্মবিবরণী দ্রষ্টব্য) (ঙ সিরাজের সসৈন্যে রাজমহলে আগমন, ২২শে মে ১৭৫৬। (চ) পীর-ফকিরগণের সাহায্যে (দানসা) সিরাজের সৈন্য আটকাইবার চেষ্টা [গোলামহোসেন বলেন—সওকৎজঙ্গ তখনও স্বীয় সভাসদগণের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই, এজন্য সিরাজের মত পরিবর্তন হইয়া যাহাতে তিনি প্রত্যাবৃত্ত হন এই ভাবে জপতপ করিবার প্রার্থনায় পীর ফকিরগণের আশ্রয় লইলেন—বাঙলার ইতিহাস পাদটীকা-২০০ পৃষ্ঠা] (ছ] সিরাজের প্রত্যাবর্তনের কারণ-'কলিকাতায় ইংরেজেরসহিত কোনও বিবাদ হ'য়ে থাকবে' (জ) শওকতের জন্য বাদশাহী সনদ আনয়নের জন্য তোড়জোড় —জগৎশেঠের সাহায্যে 'ফরমান-আনয়নে'র আয়োজন--সব ঘটনাই ইতিহাস সমর্থিত। চতুর্থ গর্ভাঙ্কে—(১) প্রত্যক্ষ ঘটনা—কাশিম-বাজারের কুঠি আক্রমণের পরে বন্দী কুঠিয়াল ওয়াটসের ও চেম্বার্সের মুক্তির জন্য ওয়াটস-পত্নীর জানু পাতিয়া লুৎফউন্নিসার কাছে কাঁদাকাটি, লুৎফার অনুনয়ে ওয়াটসের মুক্তি (২) সিরাজের পারিবারিক জীবন— (৩) সিরাজের সংযত জীবন যাপনের চেষ্টা ও উদারতা *পরোক্ষ ঘটনা (১) ড্রেকের কাছে নবাবের আদেশ—পেরিং পয়েন্ট (a redoubt and a draw-bridge called Perring's Redoubt across the ditch at Baghbazar) ভাঙ্গিতে হইবে —রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাসকে মুর্শিদাবাদে পাঠাইতে হইবে—ড্রেকের নবাবী

আদেশ উপেক্ষা (২) 'মাতামহী নিত্য দরবার সংলগ্ন জানানা-প্রকোষ্ঠ হতে দরবার কার্য দেখেন' (৩) রাণী ভবাণীর কন্যা তারার প্রতি সিরাজের আসক্তির ইতিহাস। পরোক্ষ ঘটনাগুলি ইতিহাস-সমর্থিত তবে প্রত্যক্ষ ঘটনার—প্রথমটি অনুরূপ; আলীবর্দী-বেগমের কৃপায় হলওয়েলের মুক্তি হয়—এই তথ্যের সম্প্রসারণ বলিয়া মনে হয়।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক—প্রত্যক্ষ ও প্রধান ঘটনা—(ক) কলিকাতা আক্রমণের জন্য সিরাজের সঙ্কল্প—জগৎশেঠ-মীরজাফর প্রভৃতির পরামর্শ—সাবধানে বিরত করার চেষ্টা—*(খ) রাজনৈতিক ও প্রজাবৎসল সিরাজের চরিত্র। পরোক্ষ ঘটনা—কৃষ্ণদাসের পত্রে—কৃষ্ণদাস ও উমিচাঁদের কারারুদ্ধ হওয়ার সংবাদ।

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কোন ঘটনাই অনৈতিহাসিক নহে। তবে প্রজাবৎসল, বাঙলা-প্রাণ এবং ফিরিঙ্গি-দ্বেষী সিরাজ বেশী একটু আদর্শায়িত।

ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, নবম গর্ভাঙ্কে—কলিকাতার ব্যাপার উপস্থাপিত এবং মোটামুটি ইতিহাসই অনুসৃত। **দশম গর্ভাঙ্কে**—ফোর্ট উইলিয়ামে সিরাজের দরবার—**প্রত্যক্ষ ঘটনা**—হলওয়েলের বন্দীদশা (খ) কৃষ্ণদাস, উমিচাঁদকে সিরাজের মার্জনা (উভয়ই ঐতিহাসিক), (গ) সিরাজের জাতিপ্রাণতা (আরোপিত), (ঘ) করিমচাচা ও তাহার টিপ্পনি ও সিরাজকে ব্যাজস্তুতি—নিন্দাছলে স্তুতি [কল্পিত বটে তবে সিরাজ-চরিত্রের স্বরূপ প্রদর্শক]। **একাদশ গর্ভাঙ্কে**—সওকতজঙ্গের ও ষড়যন্ত্রকারীদের নানারূপ অতিরঞ্জিত মিথ্যা অপবাদ প্রচারের দৃশ্য—দানসা ফকিরের প্রচার। (যথার্থত অনৈতিহাসিক নহে)। **দ্বাদশ গর্ভাঙ্কে**—মুর্শিদাবাদে নবাব দরবার—মুখ্য উপস্থাপ্য হলওয়েলের মুক্তি তথা সিরাজের উদারতা, অন্ধকূপহত্যায় সিরাজের নির্দোষতা (অনৈতিহাসিক নহে) দানসা ফকিরের নাসাকর্ণ-ছেদ করার আদেশ (ঐতিহাসিক)—রাসবিহারী কর্তৃক সওকতজঙ্গের পত্র আনয়ন *(ঘ) ফরমান—আনয়ন ব্যাপার লইয়া জগৎশেঠকে চপেটাঘাত (ঙ) প্রতিবাদে মীরজাফর

প্রভৃতির অস্ত্রত্যাগ। *(চ) আলিবর্দী বেগমের সহসা প্রবেশ—তাঁহার অনুরোধে মীরজাফর প্রভৃতির অস্ত্রগ্রহণ এবং সিরাজের অনুতাপ প্রকাশ। এই গর্ভাঙ্কের "খ" সম্পর্কে সন্দেহ জাগিতে পারে বটে, কিন্তু দান্‌সা (দানাশা) বৃত্তান্ত ঐতিহাসিক বলিয়াই গণ্য he was recognised by a Muslim faqir, named Dana shah, whose ears and nose he had ordered to be cut off in the days of his power—History of Bengal—Vol. II Ed—J Sarkar আর জগৎশেঠের অপমান, মীরজাফরের প্রতিবাদে অস্ত্রগ্রহণে অস্বীকৃতি—ঐতিহাসিক (বাঙলা ইতিহাস—বন্দ্যোপাধ্যায় ২২৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

অতএব দেখা যাইতেছে—প্রথম অঙ্ক উপস্থাপিত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ঘটনার দুই একটি বাদে আর সবই ইতিহাস-সমর্থিত, জহরা ও করিমচাচা ঐতিহাসিক চরিত্র নহে—জহরা "বিশ্বস্তা দাসী"রই বিস্তার এবং করিমচাচার নামটি বোধ হয় "করম আলি"রই (মজফর নামা'র লেখক--করম আলি) অপভ্রংশ রূপ।

দ্বিতীয় অঙ্কের- প্রথম গর্ভাঙ্কে (জগৎশেঠের বাগান বাড়ীতে **প্রত্যক্ষ ঘটনা** জগৎশেঠ মীরজাফর প্রভৃতির গোপন পরামর্শ (খ) মীরমদন-আনীত ইংরেজদের—পত্র পাঠ এবং সিরাজদ্দৌলার মীরজাফর প্রভৃতির বিরুদ্ধে চাপ। অভিযোগ (গ) মানিকচাঁদ-কর্তৃক ইংরেজের কলিকাতা পুনরধিকারের সংবাদ জ্ঞাপন (ঘ) মীরজাফরকে গদীতে বসাইবার পরামর্শ। **পরোক্ষ ঘটনা**—সিরাজের চরিত্রের পরিবর্তন—"বিনয়ী নম্র, সকলকে যথাযোগ্য উচ্চ সম্মানে সম্মানিত করেছেন"। (১) মোহনলালের পূর্ণিয়ার অধিকার লাভ—গোলাম হোসেন খাঁকে বিতাড়ন (৩) ইংরেজরা মীরজাফর খাঁকে বাহাদুরের নিকট যে পত্র নবাব সরকারে পেশ করিবার জন্ত দেন, মীরজাফর প্রভৃতির (মাণিক চাঁদের) সেই পত্র গোপন করা। মাণিকচাঁদের কারসাজিতে—কলিকাতা পুনরধিকার (৫) ইংরেজের হুগলী-আক্রমণের উদ্যোগ। এই গর্ভাঙ্কে

উপস্থাপিত ঘটনা স্বরূপতঃ অনৈতিহাসিক নহে, তবে ঘটনাগুলি এক দৃশ্যে সমাহৃত করা হইয়াছে। **দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কের** ঘটনা,—ঘসেটির ও জহরার সংযোগ। ঘসেটি বেগমের অর্থে ষড়যন্ত্র পুষ্ট হইয়াছিল—এই ঐতিহাসিক তথ্যেরই বিস্তার। **তৃতীয় গর্ভাঙ্কের** মুখ্য ঘটনা—ঘসেটির ছলনা দ্বারা লুৎফার নিকট হইতে সিরাজের নামাঙ্কিত মোহর সংগ্রহ (ঘসেটির ষড়যন্ত্রেরই অংশ) **পরোক্ষ ঘটনা**—*বার-বিলাসিনী ফৈজীকে 'বায়ু প্রবেশের সকল দ্বার রুদ্ধ ক'রে হত্যা করার কাহিনী (ঐতিহাসিক)। **চতুর্থ গর্ভাঙ্ক**—"কলিকাতা--উমিচাঁদের উদ্যানস্থ কক্ষ"—(দৃশ্যটিও ঐতিহাসিক)—মুখ্য ঘটনা:—(ক) ইংরেজের সন্ধি-প্রস্তাব, সন্ধি সিরাজ পক্ষে হিতকর বলিয়া মীরজাফর প্রভৃতির সন্ধির বিরোধিতা তথা যুদ্ধে উসকানি (খ) সন্ধি প্রস্তাবে-সম্মত **ওয়ালস ও স্ক্রাপটন্** সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিতে দাওয়ানখানায় যাইতে প্রস্তুত হইলে—উমিচাঁদের মিথ্যা ভয় দেখাইয়া ভাগাইয়া তথা সন্ধি ভাঙ্গিয়া দেওয়া। (ঐতিহাসিক ঘটনা—বন্দ্যোপাধ্যায় ২৪১ পৃষ্ঠা)। **পঞ্চম গর্ভাঙ্কের** ঘটনা সাহেবদিগের (স্ক্রাপটন ও ওয়ালস্) পিছনে পিছনে জহরার ক্লাইবের ফোর্ট-উইলিয়াম মধ্যস্থ গৃহে উপস্থিত ও সহযোগের প্রস্তাব। (রোমাঞ্চকর কল্পনা।)। ষষ্ঠ গর্ভাঙ্কের দৃশ্য—কলিকাতা গড়ের মাঠ প্রধান ঘটনা—ইংরেজের অতর্কিত আক্রমণে 'সর্বনাশ' উপস্থিত, (খ) সিরাজের সন্ধি-প্রস্তাব—"যে স্বত্বে ইংরেজ সন্ধি করিতে প্রস্তুত সেই স্বত্বে সন্ধি হোক।" *গ, সিরাজের নৈরাশ্য—বাঙ্গালী-জাতির অন্তর্বিরোধের সমালোচনা। *, গ-এর শেষটুকু আরোপ)।

তৃতীয় অঙ্কের **প্রথম গর্ভাঙ্কে**—দৃশ্য নবাব দরবার (*সন্ধির পরের ঘটনা) **—প্রথম ঘটনা**—(ক) ওয়াটসের উপর সিরাজের তর্জন-গর্জন—ওয়াটসকে শূলদণ্ড দেওয়ার হুমকি (ঐতিহাসিক ২৫১ পৃষ্ঠা বাঙলার ইতিহাস) বন্দ্যোপাধ্যায় (খ) ইংরেজ-উকীলকে নবাব-দরবার পরিত্যাগ করার আদেশ (একটু পরের ঘটনা) (গ) মাণিকচাঁদের প্রতি নবাবী দ্রব্য

আত্মসাৎ করার অভিযোগ—প্রথমে কারাদণ্ড, পরে শিরশ্ছেদ-দণ্ড এবং মীরজাফর প্রভৃতির অনুনয়ে শেষপর্যন্ত ১০ লক্ষ টাকা জরিমানা—(ঐতিহাসিক ঘটনা)। *(ঘ) মীরজাফর প্রমুখ অমাত্যদের সহিত ইংরেজের পত্র লইয়া পরামর্শ—(ঙ মঁসিয়ে লা'কে (মুঁসালা, আজিমাবাদে গিয়া থাকিবার জন্য সিরাজের অনুরোধ—মুঁসালার সতর্কবাণী ও বিদায়গ্রহণ (১৭ই এপ্রিল ঐতিহাসিক) (চ) ওয়াটস ও উকসকে পুনরাহ্বান—ফরাসী বিতাড়নের সংবাদ কলিকাতায় পৌঁছাইয়া দেওয়ার নির্দেশ (ছ) ষড়যন্ত্রকারী জগৎ শেঠ—মীরজাফর প্রভৃতিকে সিরাজের দুর্দিনে একে একে দণ্ড দেওয়া সঙ্কল্প—(ইতিহাস-সমর্থিত)। **পরোক্ষ ঘটনা**:—(১) বিনানুমতিতে ইংরেজের চন্দননগর অধিকার (২) ফরাসী 'মঁসিয়ে ল' ও অন্যান্য ফরাসীদের নবাবের আশ্রয় গ্রহণ (৩) আহম্মদ শাহ আবদালির আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে সিরাজের পাটনা যাত্রার কথা—আবদালির প্রত্যাবর্তনে পাটনা যাত্রা স্থগিত (৪) সিরাজের পত্রের উত্তরে ক্লাইভের উক্তি 'যারা ইংরাজের শত্রু তারা নবাবের শত্রু হওয়া উচিত' (৫) ইংরেজ চন্দননগর আক্রমণ করিলে উমিচাঁদ ও নন্দকুমারের আচরণ। (৬) ফরাসীদের পশ্চাতে ইংরেজের রসদ যোগান।—(ইতিহাস-সমর্থিত) **দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক**—দৃশ্য 'জগৎশেঠের বৈঠকখানা' (জগৎশেঠের গৃহে মন্ত্রভবনের স্থান নির্দিষ্ট হইল : বন্দ্যোপাধ্যায়) প্রধান ঘটনা:—(ক) 'দৌহিত্র-পুত্রের অন্নপ্রাশন'—রটনা করিয়া ষড়যন্ত্রকারিগণের সম্মেলন। The Seths took the leading part in organising this plot for purifying the administration - History of Bengal Sarkar. (খ) ইংরেজের সন্ধিপত্র লইয়া আলোচনা (গ) করিমচাচা-কর্তৃক সিরাজের হোসেন-কুলি বধ ও কৈফিয়ত্যা সমর্থন ঘ) 'মীরমদন-মোহনলালের প্রবেশ ও ষড়যন্ত্রকারীদের মনোভাব-পরিবর্তনের শেষ চেষ্টা ('ঘ'—কল্পিত)। **তৃতীয় গর্ভাঙ্ক**—ঘসেটি ও জহরার নবাব-বিরোধী ষড়যন্ত্রের অংশ (অতিরঞ্জিত) চতুর্থ গর্ভাঙ্কে প্রত্যক্ষ ঘটনা—

(ক) উমিচাঁদকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য লিখিত একখানি জালসন্ধিপত্র এবং একখানি আসল সন্ধিপত্র লইয়া আমিরবেগের ওয়াটস-সমীপে আগমন (খ) জালসন্ধিপত্রে ৩০ লক্ষ টাকা ও জহরতের একচতুর্থাংশ প্রাপ্য দেখিয়া উমিচাঁদের উল্লাস (গ) জহরার বুদ্ধিনির্দেশে বেগমবেশে ওয়াটসের মীরজাফরের সঙ্গে দেখা করার ফন্দি। (জহরা-অংশ কাল্পনিক)। পঞ্চম গর্ভাঙ্কে— প্রত্যক্ষ ঘটনা—(ক) মীরজাফরের অন্তঃপুরে—রমণীবেশে ওয়াটস (খ) সন্ধিপত্রে মীরজাফরের স্বাক্ষর *(গ) সিরাজদ্দৌলা ও আলিবর্দী বেগমের মীরজাফরের গৃহে আগমন (ঘ) কোরাণ স্পর্শ করিয়া মীরজাফরের সেনাপতিত্ব গ্রহণ। (ইতিহাস-সমর্থিত ঘটনা)।

চতুর্থ অঙ্ক—প্রথম গর্ভাঙ্কের দৃশ্য 'পলাশী—ইংরাজ শিবিরের পার্শ্ব'। প্রধান ঘটনা—(ক) নবাব-সৈন্যের সংখ্যা দেখিয়া ক্লাইভের নৈরাশ্য ও আতঙ্ক - আমির-বেগকে ডাকিয়া কিঞ্চিৎ উগ্রভাবেই (বন্দ্যোপাধ্যায়) জিজ্ঞাসা * (খ) জহরার কথায় ক্লাইবের খানিকটা স্বস্তি (খ—কাল্পনিক!) দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে- দৃশ্য 'পলাশী—নবাব শিবির'—প্রত্যক্ষ উপস্থাপ্য (ক) যুদ্ধের অবস্থা বর্ণনা— (খ) মীরমদনের মৃত্যু (গ) সিরাজের যুদ্ধক্ষেত্রে গমনোদ্যোগ (আরোপ) (ঘ) মীরজাফরের পদতলে রাজমুকুট রাখিয়া নবাবের মর্যাদা, মুসলমানের মর্যাদা, বাঙলার মর্যাদা, বাঙলার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সিরাজের কাতর অনুরোধ (ঙ) মীরজাফরের সিরাজদ্দৌলার নিরুপায় অবস্থার সুযোগ গ্রহণ। (চ) জহরার কথায় সিরাজদ্দৌলার প্রাণবধ-আতঙ্কে মুর্শিদাবাদে প্রস্থান।* পরোক্ষ ঘটনা—(১) বৃষ্টিতে বারুদ ভিজিয়া যাওয়া (২) ইংরাজ সৈন্যের পশ্চাদপসরণ ও আম্রকাননে আশ্রয় গ্রহণ (৩) রায়দুর্লভ-ইয়ারলতিফের সেনা দর্শকের ন্যায় যুদ্ধস্থলে দণ্ডায়মান (৪) মীরজাফরের কপট আচরণ—উপদেশ ছলে নবাবকে দিয়া মোহনলালকে আক্রমণ হইতে নিবৃত্ত করা। প্রত্যক্ষ ঘটনার মধ্যে—'ঘ'—ঐতিহাসিক (বন্দ্যোপাধ্যায় ২২৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) তবে বাঙলার মর্যাদা…ইত্যাদি আরোপ এবং "চ' প্রথম অংশ

কল্পিত, শেষাংশ ঐতিহাসিক ঘটনা। পরোক্ষ ঘটনা সবগুলিই ঐতিহাসিক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্কে—প্রত্যক্ষ ঘটনা—(ক) মোহনলাল ও সিনফ্রের আক্রমণে ইংরেজের কাহিল অবস্থা (*খ) জহরার মিথ্যা সংবাদে মোহনলালের যুদ্ধ ত্যাগ—সৈন্যদিগের পলায়ন। (গ) ক্লাইভের আক্রমণ। প্রত্যক্ষ ঘটনার মধ্যে 'খ'-এর প্রথম অংশ অর্থাৎ জহরার মিথ্যা সংবাদ দেওয়ার অংশ—কাল্পনিক, মোহনলালের ধীরে ধীরে পশ্চাদপসরণ সত্য ঘটনা।

চতুর্থ গর্ভাঙ্কের প্রত্যক্ষ ঘটনা—মুর্শিদাবাদে প্রত্যাগত সিরাজের নৈরাশ্য, আতঙ্ক ও পলায়ন, [ঐতিহাসিক] (খ) করিম চাচার সহিত সিরাজের পরিচ্ছদ বিনিময় [আরোপিত] (গ) ঘসেটি-আলিবর্দীবেগম, ঘসেটি মোহনলাল মুখোমুখি—(আরোপিত) মীরণের সিরাজের অন্বেষণ ও পশ্চাদ্ধাবন—(ইতিহাস-সমর্থিত) (চ মীরণ কর্তৃক ঘসেটির লাঞ্ছনা (আরোপিত)। পরোক্ষ ঘটনা—(১) রাজভাণ্ডার মুক্ত করিয়া দিয়াও সৈন্য সংগ্রহের চেষ্টা ব্যর্থ (২) জয়োন্মত্ত শত্রু-সৈন্যের মুর্শিদাবাদ অভিমুখে অগ্রসরণ (৩) ঘসেটি বেগমের অথে জনসাধারণের সিরাজপক্ষ বর্জন (৪) সকলের হৃদয়ে ধারণা—ইংরেজ বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ বাতুলতা (সবগুলিই ইতিহাস সমর্থিত) **পঞ্চম গর্ভাঙ্ক**—করিমচাচার সিরাজের পলায়ন সহজ করিবার জন্য নবাবীবেশে পরিভ্রমণ (কল্পনা **ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক**—দৃশ্য - ভগবানগোলা পীরের দরগা (প্রত্যক্ষ ঘটনা)—দানশা ফকিরের দরগায় জহরার উপস্থিতি (কাল্পনিক) (খ) দানসার দরগায় সিরাজের আশ্রয় গ্রহণ (ঐতিহাসিক) (গ) দানসার জুতা দেখিয়া সিরাজকে চিনিয়া ফেলা ও মীরকাসিম প্রভৃতিকে সংবাদ দেওয়া (ঐ) (ঘ) মীরকাসিমের হস্তে সিরাজ বন্দী লুৎফ অপমানিত (ঐতিহাসিক) **পরোক্ষ ঘটনা**—(১) পাটনার রাজা রামনারায়ণের সিরাজ সন্ধানে দূত প্রেরণ (২) মুঁসালার সিরাজ সাহায্যে তৎপরতা (ঐতিহাসিক, বন্দ্যোপাধ্যায়—৩০০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) **পঞ্চম অঙ্ক—প্রথম গর্ভাঙ্ক** -সিরাজকে বধ করিবার জন্য আলিবর্দী প্রতি-

পালিত মহম্মদীবেগ নিযুক্ত—ইতিহাস-সমর্থিত। **দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে**—মীরণের লুৎফা উন্নিসার উপর অত্যাচার করিবার চেষ্টা—ওয়াটস-পত্নীর আবির্ভাব, হস্তক্ষেপ—সিরাজের প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য ওয়াটস পত্নীর চেষ্টা (কল্পনা)। **তৃতীয় গর্ভাঙ্কের প্রত্যক্ষ ঘটনা**—(ক) কারাগারে আবদ্ধ অনুতাপদগ্ধ সিরাজ (খ) মহম্মদীবেগের তরবারি আঘাতে সিরাজের মৃত্যু (গ) ওয়াটস-পত্নীর লুৎফ উন্নিসার নিকট উপস্থিতি লুৎফার প্রতি ওয়াটস পত্নীর সমবেদনা (ঘ) জহরার আবির্ভাব। [(গ) ও (ঘ)—কল্পনা]

চতুর্থ গর্ভাঙ্কে—প্রত্যক্ষ ঘটনা :—(ক) সিরাজের গোরস্থানে করিম চাচা ও মোহনলালের সাক্ষাৎকার (খ) সিরাজের মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া মোহনলালের অস্ত্র ত্যাগ ও আত্মসমর্পণ (মোহনলাল ভগবানগোলায় ধরা পড়েন - মুর্শিদাবাদে নহে সুতরাং ঘটনা সংশ্লেষ হইয়াছে) (গ) প্রতিহিংসা পূর্ণ করিবার পরে—বিশ্বাসঘাতকদিগকে ধিক্কার দিতে দিতে—প্রতিশোধপরায়ণা জহরার "পতন"। (কল্পনা) **পঞ্চম গর্ভাঙ্কে**—সুসজ্জিত রাজপথে **ক্লাইভ** ও **কুট** অর্থাৎ ইংরেজের বিজয় অধিকার দেখান—সঙ্গে **অর্থলোভী** উমিচাঁদের হীনতা দেখান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্কে—প্রত্যক্ষ ঘটনা—(ক) চুক্তি পত্রের দাবী দাওয়া মিটাইবার জন্য ক্লাইভের—নির্দেশ (ঐতিহাসিক) (খ) উমিচাঁদের প্রতিফল (ঐতিহাসিক) (গ) টাকার জন্য মীরজাফরের উপর ক্লাইভের চাপ (ঐ ঐ) (ঘ) মোহনলালের মৃত্যুদণ্ডাদেশ (ঙ) মীরজাফরের আফশোস।

সপ্তম গর্ভাঙ্কে—সিরাজের সমাধিতে লুৎফউন্নিসার দীপদান (ঐতিহাসিক) ওয়াটস পত্নীর মাল্যদান (কল্পিত।)

উল্লিখিত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ঘটনার হিসাব-নিকাশ করিলে দেখা যাইবে—সিরাজদ্দৌলা-সম্পর্কিত তথ্য সমূহকে নাট্যকার অধিক সংখ্যায় স্থান করিয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ঘটনার সংক্ষেপ বিস্তার করিবার অধিকার নাট্যকারের আছে এ কথা মনে রাখিয়া বলা যায়—নাট্যকার সিরাজদ্দৌলার ইতিহাসের দেহ এবং আত্মা উভয়কেই প্রায় যথাযথভাবে রূপ দিয়াছেন; * তবে **কবিজ**

চাচা ও জহুরা অতিরঞ্জিত তথা অনুচিত আচরণে ঐতিহাসিক ভাবশুদ্ধিকে বা ভাবগম্ভীর পরিবেশকে যে বেশ হাল্কা করিয়া তুলিয়াছে তাহাও স্বীকার করিতে হইবে। করিমচাচাকে যদিও কোন ভাবে পাংক্তেয় করা যায়, জহরা একেবারেই 'আকাশস্থ নিরালম্ব' হইয়া পড়িয়াছে। হোসেন কুলি খাঁর স্ত্রীর প্রতিহিংসা-পরায়ণতা স্বাভাবিক—কিন্তু প্রতিহিংসাপরায়ণতায় দেশ-কাল অবস্থা—ঔচিত্যকে সে যেভাবে লঙ্ঘন করিয়াছে তাহা খুবই অস্বাভাবিক—অন্ততঃ ঐতিহাসিক নাটকের বাস্তবতার পক্ষে ক্ষতিকর।—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

প্রেরণা—রচনা—অভিনয়

প্রেরণাকে আমরা মোটামুটি দুইভাগে ভাগ করিয়া লইতে পারি এবং রবীন্দ্রনাথের ভাষায় নাম দিতে পারি—১। **বাহ্য প্রেরণা** ২। **আভ্যন্তরিক প্রেরণা**। রবীন্দ্রনাথের একটি উদ্ধৃতি দিয়া বক্তব্যকে স্পষ্ট করা যাইতে পারে —১৪ই বৈশাখ ১৩৩৩ সালে প্রমথ চৌধুরী (বীরবল) মহাশয়ের কাছে একখানি চিঠি লিখিতে যাইয়া লিখিতেছেন— *"একটা নাটক আমার সমস্ত মন এবং অবকাশ অধিকার করে বসেছে। আগামী ২৫শে বৈশাখের মধ্যে লিখে শেষ করে অভিনয় করিয়ে চুকিয়ে দিতে হবে এই হুকুম ফরমাস। **তাগিদে পড়ে লিখতে সুরু করেছিলাম কিন্তু এখন লেখায় **আভ্যন্তরিক তাগিদ** তার **বাহ্য তাগিদকে** অতিক্রম করেছে। তার ফল হয়েছে এখন সময়মতো নাওয়া খাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে……*। এখানে বাহ্য তাগিদ ২৫শে বৈশাখের মধ্যে শেষ করে……" এবং আভ্যন্তরিক তাগিদ……নির্বাচিত বিষয়বস্তুকে অনির্বচনীয় রস-রূপে ব্যক্ত করা। এইরূপে রচনার বাহ্য তাগিদ—পরিবেশ, যশোলাভ, অর্থলাভ, লোকশিক্ষা (সত্য) মঙ্গল-বিধান (শিব)—প্রভৃতির দিক হইতে আসিতে পারে, কিন্তু রচনার আভ্যন্তরিক তাগিদকে সংক্ষেপে আমরা বলিতে পারি—শৈল্পিক (aesthetic)। এই তাগিদের ফলে নির্বাচিত বস্তু শিল্পীর মন অধিকার করিয়া বসে……খাওয়া নাওয়া বন্ধ হইয়া যায়। অবস্থাটি

...শেকভের "দি সি গাল" নাটকের "ট্রিগোরিন" চরিত্রের (লেখক) কথায় প্রকাশ করা যাইতে পারে · ..."I am haunted day and night by one persistent thought: I ought to be writing, I ought to be writing ....when I finish work I race off to the theatre or to fishing, if only I could rest in that and forget myself. But no, there is a new subject rolling about in my head like a heavy iron cannon ball and I am drawn to my writing table and make haste again to go on writing and writing" (দ্বিতীয় অঙ্ক) -"এই পর্যায়ে শিল্পী রস-রূপের ধ্যানেই নিমগ্ন—বিষয়বস্তু হইতে চূড়ান্ত রূপ-রস আদায় করিতে নিযুক্ত (*রস-রূপেরই অন্য নাম সৌন্দর্য)—এক কথায় সুন্দরের ধ্যানে সমাহিত। কার্লমার্কসের ভাষানুকরণে বলা যায়—according to the laws of beauty—রূপ-রস সৃষ্টি করিতেই শিল্পী তখন ঐকান্তিক। অবশ্য তাহা বলিয়া একথা মনে করিলে ভুল করা হইবে যে—সৌন্দর্যের কোন নৈর্ব্যক্তিক ও পারমার্থিক সত্তা আছে। **সংক্ষেপে বলা যায় সৌন্দর্য, সৃষ্টির রূপে ও রসেই নিহিত এবং সেই রূপ ও রস জীবন সত্য সাপেক্ষ তথা জীবনের সত্য ও শিবের সহিত অবিচ্ছেদ্য ভাবে সম্পর্কিত।**

বলা বাহুল্য, সিরাজদ্দৌলা নাটকের প্রেরণা— বাহ্য প্রেরণা—তদানীন্তন যুগ পরিবেশের ও রঙ্গমঞ্চের চাহিদা। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে বাঙলা দেশ নব-জাতীয়তাবোধের দীক্ষা গ্রহণ করে। বাঙলা শুধু হিন্দুর নহে বাঙলা শুধু মুসলমানের নহে বাঙলা হিন্দু মুসলমান উভয়েরই মাতৃভূমি—হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায় বাঙালী-জাতির উপাদানবিশেষ—এই নব জাতীয়চেতনা লইয়া জাগ্রত জাতি স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত ক্ষীরোদপ্রসাদের 'প্রতাপাদিত্য' নাটকে ধর্মনিরপেক্ষ জাতিগঠনের বা 'জাতি-চেতনার প্রথম সুস্পষ্ট ঘোষণা পাওয়া যায়—একদিকে প্রতাপের মুখে

অন্যদিকে ঈশা খাঁর মুখে। প্রতাপ ঘোষণা করেন—* "হিন্দু-মুসলমান এক মায়ের দুই সন্তান। এক অন্নে প্রতিপালিত, এক স্নেহরসসিক্ত। বাল্যে ক্রীড়ায়, যৌবনে মাতৃকার্য, প্রতিযোগিতায়, বার্দ্ধক্যে আত্মীয়তায়—এস ভাই সব —আমরা এক প্রাণে এক মনে মায়ের দুঃখ দূর করি। পরস্পরের সহায়তায় বঙ্গে মহাযশোরের প্রতিষ্ঠা করি। মাতৃসেবাকার্যে আমরা ব্রাহ্মণ নই, সেখ নই, পাঠান নই—বঙ্গসন্তান (৩য় অঙ্ক—৩য় দৃশ্য) ঈশা খাঁর মুখে শোনা যায়—"দুদিন বাদে সবাই বুঝবে **বাঙলা মুলুক হিন্দুরও নয় মুসলমানেরও নয়** বাঙালীর।"

লর্ড কার্জন তাঁহার দম্ভ, দুর্ব্যবহার ও কুচক্রান্ত দ্বারা এই জাতীয়-চেতনার উদ্দীপনায় খুবই সাহায্য করেন। ভেদনীতি ছাড়া ভারতের বুকে চাপিয়া বসিয়া থাকা অসম্ভব—লর্ড ডাফরিন তাহা অনেক আগেই উপলব্ধি করেন এবং আলিগড়ের স্যর সৈয়দ আহম্মদকে ভেদ-নীতি প্রয়োগের যন্ত্র হিসবে ব্যবহার করেন—প্রচার করিতে থাকেন **হিন্দু ও মুসলমান দুইটি স্বতন্ত্র জাতি**। কিন্তু সৈয়দ আহম্মদ প্রমুখ মুসলমানগণের বিরোধিতা সত্ত্বেও—দূরদর্শী ও দেশপ্রেমিক মুসলমানগণ, ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের কংগ্রেসের মূল সভাপতি মহম্মদ রহিমতুল্লা সায়ানি প্রভৃতির মত কংগ্রেসের আদর্শই অনুসরণ করেন—হিন্দু মুসলমানের মিলিত ভারতের স্বাধীনতাই দাবী করেন—ধর্মনিরপেক্ষ জাতি-তত্ত্বে বিশ্বাস করেন। জাতীয়তার বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতার এই উত্থান ঝানু সাম্রাজ্যবাদী লর্ড কার্জন (১৮৯৮) শুধু যে বাতাস দিয়া জ্বালাইয়া তুলিতে চেষ্টা করেন তাহা নহে, প্রকাশ্যভাবে কংগ্রেসের বিরোধিতায় প্রবৃত্ত হন (১৮৯৯) এবং একের-পর-এক দুর্ব্যবহারে ভারতীয় অভিমানকে আঘাত করিতে থাকেন। তিনি লক্ষ্য করেন শিক্ষিত বাঙালীরাই রাজনৈতিক আন্দোলনের স্রষ্টা এবং 'মস্তিষ্ক' সুতরাং বাঙলাকে জব্দ করিতে পারিলেই উৎপাতের জড় দূর হইবে। ১৯০৩ সালের ৩রা ডিসেম্বর সরকারী তরফ হইতে ঘোষিত হয়—বাঙলাদেশকে শাসন কার্যের সুবিধার জন্য দুই ভাগে ভাগ করা হইবে "রাজনীতি-সচেতন বাঙালী" ইহার

মধ্যে নবোদ্ভূত জাতীয় চেতনা খণ্ডিত করিবার প্রয়াস লক্ষ্য করে এবং বুঝিতে পারে যে, বাঙলার সমাজদেহ দ্বিখণ্ডিত করিয়া তাহাকে ভেদ বিভেদের পঙ্কিল ও সংস্কৃতির দিক হইতে জীর্ণ করিয়া ফেলিবার সগোপন চেষ্টা ইহাতে নিহিত, কাজেই রাজরোষগ্রস্ত হইলেও বাঙালী ক্ষোভে ও অপমানে গর্জিয়া উঠে, তাঁহার মন্ত্র জপ হয়—ভাই ভাই এক ঠাঁই, ভেদ নাই, ভেদ নাই।—("ভারতের মুক্তি সংগ্রাম') কাজনেরও জেদ চাপিয়া যায়—বঙ্গভঙ্গ করিতেই হইবে। তিনি সমগ্র উত্তর বঙ্গ, ফরিদপুর ও বরিশাল জিলা নবগঠিত প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করিবার ব্যবস্থা করেন। ১৯০৫ সালের ২০শে জুলাই ঘোষণা বাহির হইতেই সমগ্র বাঙলা তড়িৎ স্পৃষ্টের মত নড়িয়া উঠে। ইংরেজের বিরুদ্ধে রুদ্ধ আক্রোশে জাতি গুমরিয়া উঠে, স্বদেশী আন্দোলনের প্রাণ-বন্যায় দেশ ভাসিয়া যায়। দেশাত্মবোধ হিন্দু মুসলমান-ঐক্য, নব জাতীয়তা বোধ, ফিরিঙ্গি-বিদ্বেষ ও স্বদেশী আন্দোলন —জাতির মুখ্য প্রচার্য বিষয়ে পরিণত হয়।

"সিরাজদ্দৌলার" আত্মা এই নবজাতীয়তাবাদ। এই দেশাত্মবোধ, হিন্দু-মুসলমান ঐক্য, ফিরিঙ্গি-বিদ্বেষ ও স্বাধীনতা-স্পৃহা দিয়াই সিরাজদ্দৌলার মেরু-মজ্জা-মন গঠিত। নবজাতীয়তাবাদীর চোখে—পলাশী-যুদ্ধেই পরাধীনতার ইতিহাসের আরম্ভ—সিরাজদ্দৌলাই বাঙলার শেষ স্বাধীন নবাব—স্বাধীন বাঙলার তথা বাঙালী জাতির রাষ্ট্রপ্রতিনিধি, ইংরাজের সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রথম সংগ্রামী নায়ক। তাই ইংরাজের সহিত প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের সময়ে সিরাজদ্দৌলাকেই যে প্রথমেই মনে পড়িবে—সহজেই অনুমান করা চলে। বাস্তবিক, ইহার আগে সীতারাম, প্রতাপাদিত্য, রাণাপ্রতাপ, শিবাজী প্রভৃতির মাধ্যমে, জাতীয়তাবাদকে তথা স্বাধীনতা-আন্দোলনকে এতদিন পরোক্ষভাবেই পোষণ ও প্রচার করা হইয়াছে। ইহাদের কাহারও পক্ষে ইংরাজ বিদ্বেষী বা ইংরাজ-বিরোধী হওয়া সম্ভব হয় নাই বলিয়া ইঁহাদের মাধ্যমে আর যাহাই করা যাউক, প্রত্যক্ষভাবে ইংরেজ-বিদ্বেষ ইংরেজ-সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা প্রচার করা সম্ভব হয় নাই। বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের প্রয়োজন

প্রতাপসিংহ বা প্রতাপাদিত্য মিটাইতে পারেন না—তাহা পারেন—সিরাজদ্দৌলা, মীরকাসিম প্রভৃতি ইংরেজ বিদ্বেষী নবাবরাই। গিরিশচন্দ্র সিরাজদ্দৌলাকে মাধ্যম নির্বাচন করিয়া—একাধারে **নবজাতীয়তাবাদ, হিন্দু-মুসলমান-ঐক্য, ফিরিঙ্গি বিদ্বেষ দেশাত্মবোধক ও স্বাধীনতা-কামনাকে সঞ্চারিত করিতে চেষ্টা করেন।**

সাহিত্যে এই ধরণের ইংরেজ বিরোধিতা এত উগ্রভাবে আগে বা পরে খুব কমই ব্যক্ত হইয়াছে। অপরেশ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের উক্তি খুবই সত্য "বাঙালী যাহা দেখিতে চাহিয়াছিল দ্রষ্টা গিরিশচন্দ্র যেন তাহার আভাস বুঝিয়াই শুভক্ষণে সিরাজদ্দৌলা লিখিবার জন্য লেখনী ধারণ করলেন"—("রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর")।

রচনা ও অভিনয়

সিরাজদ্দৌলা নাটক রচিত ও অভিনীত হয় ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে। 'বলিদান'-নাটকের (৮ই এপ্রিল) প্রথম অভিনয় এবং সিরাজদ্দৌলা-নাটকের প্রথম অভিনয়ের (৯ই সেপ্টেম্বর) মধ্যে চার মাসের ব্যবধান বটে, কিন্তু মিনার্ভা-মঞ্চে বলিদানের পরেই সিরাজদ্দৌলার আবির্ভাব নহে—মাঝখানে ২৯শে জুলাই দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের রাণাপ্রতাপ কয়েক রজনীর জন্য দর্শকদিগের সম্মুখে উপস্থিত হয়। সম্ভবতঃ জুলাই আগষ্ট মাসেই সিরাজদ্দৌলা রচিত হয়—অপরেশবাবুর ভাষায়—"মিনার্ভার রঙ্গমঞ্চে রাণাপ্রতাপ নিতান্ত নিঃস্ব অবস্থায় মারা পড়িয়া তিনি মুর্শিদাবাদের ভগ্ন কবর হইতে বাংলার নবাব সিরাজকে খুঁড়িয়া বাহির করিলেন।—"এই সময়ে তাহার বসিবার ঘরটি দেখিলে মনে হইত সেটি যেন একটি ছোটখাট লাইব্রেরী..... স্তুপীকৃত ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলীর মধ্যে ধ্যান নিবিষ্টের ন্যায় গিরিশচন্দ্র বাঙলার ইতিহাসের তথ্য সংগ্রহে মগ্ন।" প্রমাণ খুঁজিতে বেশী দূর যাইতে হইবে না—বাহ্য প্রমাণ রহিয়াছে—সিরাজদ্দৌলা

নাটকের ভূমিকায় তাঁর আভ্যন্তরিক প্রমাণ নাটকের তথ্য রাজির ঐতিহাসিকত্বে।

প্রথম অভিনয়—'মিনার্ভা' রঙ্গমঞ্চে—১৩১২ সালের ২৪শে ভাদ্র (৭ই সেপ্টেম্বর ১৯০৭) * প্রথম পাণ্ডুলিপির বহু স্থান অদলবদল করিয়া পুলিশের হাত হইতে পাশ করান হয়। (নাট্যকার 'কর্মচা'চার এবং পুত্র দানীবাবু—'সিরাজদ্দৌলার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন)।

শ্রেণী-পরিচয়

*[The term 'history play' is difficult of precise theoretic limitation and in practice, the differentiation of the strict members of this new type from those plays on historical subjects which follow the more conservative rules of comedy and tragedy is a task approaching impossibilities - Tudor Drama—C F Tucker Brooke)]

বিচার যেমন বিধান-সাপেক্ষ, শ্রেণী-পরিচয়ও তেমনি শ্রেণী-বিভাগ'—সাপেক্ষ। বলা বাহুল্য শ্রেণী বিভাগ যেখানে নাই সেখানে শ্রেণী-পরিচয়েরও কোন প্রশ্ন উঠে না। পারমার্থিক দৃষ্টিতে শ্রেণী-বিভাগের অস্তিত্ব অনাবশ্যক হইতে পারে, ক্রোচের মত বলা যাইতে পারে—প্রত্যেক সৃষ্টিই বিশেষ সৃষ্টি—বিশেষ গুণ-ধর্মে, স্বতন্ত্র সৃষ্টি, সুতরাং যেখানে সামান্য ধর্ম নাই সেখানে জাতি-বিভাগ অসম্ভব—কিন্তু ব্যবহারিক দৃষ্টিতে জাতি-বিভাগ অপরিহার্য বলিয়াই সাদৃশ্য-সামান্যের ভিত্তিতে, বহুযুগ ধরিয়া জাতি-বিভাগ, প্রজাতি-বিভাগ চলিয়া আসিতেছে এবং যতদিন মানুষের সংজ্ঞা (concept) গঠনের সামর্থ্য থাকিবে ততদিন চলিবেও। বাস্তবিক যেমন লৌকিক জগৎকে তেমনি শিল্পের অলৌকিক

জগৎকেও মানুষ জাতি-প্রজাতি-শ্রেণী প্রভৃতির গণ্ডী দিয়া মনের মধ্যে সাজাইয়া গুছাইয়া লইতে চেষ্টা করিয়াছে। শিল্পকে সে ভাস্কর্য, স্থাপত্য, চিত্র, সংগীত ও সাহিত্য—এই পাঁচ জাতিতে ভাগ করিয়া লইয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, প্রত্যেক জাতিকে আবার কয়েকটি প্রজাতিতে (species) ভাগ করিয়াছে। এই বিভাগের ফলে—সাহিত্য-শিল্পে কাব্য মহাকাব্য, কথাসাহিত্য, নাট্য প্রভৃতি প্রজাতি-বিভাগ আমরা দেখিতে পাই। এখানেই বিভাজন বৃত্তি স্থগিত হয় নাই, প্রত্যেক প্রজাতির মধ্যে আবার নানা শ্রেণীর কল্পনা করা হইয়াছে—বিশেষ কোন গুণধর্মের বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে শ্রেণী বিভাগ পরিকল্পিত হইয়াছে। নাটকের শ্রেণী-পরিচয় বলিতে বুঝায়—পরিকল্পিত শ্রেণী-বিভাগ অনুসারে বিশেষ নাট্য-রচনাকে কোন কোন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যায় তাহাই বিচার করিয়া দেখা।

এখানেই বলার দরকার, শ্রেণী-বিভাগের প্রথার উপরেই শেষপর্যন্ত শ্রেণী পরিচয় নির্ভর করে এবং তাহা করে বলিয়াই প্রথার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণী-পরিচয়ের প্রচেষ্টাতেও পরিবর্তন দেখা দিয়াছে।

নাট্যের শ্রেণী-বিভাগের ইতিহাস সবিস্তারে আলোচনা করিবার অবকাশ এখানে নাই। এখানে, যত ভিত্তিতে নাট্যে শ্রেণী-বিভাগ করা হইয়াছে, সংক্ষেপে, তাহাদের একত্র করিয়া একটা তালিকা দেওয়া যাইতে পারে। (গ্রন্থ-কারের "নাট্য তত্ত্বমীমাংসা"-গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত।)

১। **সংবেদনা বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে :—**

(ক) ট্র্যাজেডি (খ) ট্র্যাজি-কমেডি (গ) কমেডি (ঘ) ফার্স (মেলোড্রামা?)

২। **বিষয়বস্তুর উৎস—ভিত্তিতে :—**

(ক) পৌরাণিক (খ) ঐতিহাসিক (গ) ঐতিহাসিককল্প চরিতমূলক (ঘ) সামাজিক (পারিবারিক) (ঙ) উপকথাশ্রয়ী (চ) কাল্পনিক।

৩। **বিষয়বস্তুর ভাব-বৈশিষ্ট্য-ভিত্তিতে :—**

(ক) ধর্মমূলক (খ) নীতিমূলক (গ) আধ্যাত্মিক (ঘ) রাজনৈতিক

(ঙ) আর্থনৈতিক (চ) প্রেম-মূলক (ছ) দেশ-প্রেমমূলক (জ) সমাজ-সমস্যা-মূলক (ঝ) ষড়যন্ত্রমূলক (ঞ) রোমাঞ্চকর দুঃসাহস-মূলক (ট) অপরাধ-আবিষ্কারমূলক প্রভৃতি।

৪। উপাদান-যোজনা-ভিত্তিতে :—

(ক) গীতি-নাট্য, (খ) যাত্রা (অপেরা) (গ) নৃত্যনাট্য (ঘ) নাটক (ড্রামা)।

৫। আয়তন বা অঙ্ক-সংখ্যা-ভিত্তিতে :—

(ক) মহানাটক মহানাটককল্প) (খ) নাটক (গ) নাটিকা (ঘ) একাঙ্কিকা।

৬। গঠন-রীতি-ভিত্তিতে :—

(ক) ক্লাসিকাল-বন্ধ (খ) রোমান্টিক-বন্ধ [* (গ) দৃশ্য-পরম্পরা]

৭। 'রচনা-বন্ধ-ভিত্তিতে :—

(ক) পদ্যনাটক (খ) গদ্যনাটক (গ) গদ্যপদ্যময় (চম্পূ ?)

৮। "উপস্থাপনা-রীতি"-ভিত্তিতে :—

(ক) বাস্তবিক (realistic) (খ) ভাবতান্ত্রিক (Idealistic) (গ) রূপক (allegorical) (ঘ) সাংকেতিক (symbolic)—(* এক্সপ্রেশানিস্টিক)……

৯। 'উদ্দেশ্য'-ভিত্তিতে :—

(ক) ঘটনা মুখ্য—drama of incidents) [মেলোড্রামা]

(খ) রস মুখ্য—(drama of passion)

(গ) চরিত্র-মুখ্য—(drama of character)

(ঘ) তত্ত্বমুখ্য—(drama of Idea)

(ঙ) মিশ্র—(Mixed)

নাটকের শ্রেণী-পরিচয়—অবশ্য পরিপাটি শ্রেণী-পরিচয়—দিতে হইলে, নাটকখানি উল্লিখিত শ্রেণীসমূহের কোন্ কোনটির অন্তর্ভুক্ত তাহা দেখাইতে হইবে। তবে 'প্রাধান্যেন ব্যপদেশ' সূত্র প্রয়োগ করিয়া প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য

দেখাইয়াই সাধারণতঃ 'শ্রেণী-পরিচয়' দেওয়া হইয়া থাকে। বিশেষতঃ যে যে প্রশ্নে বিসংবাদ দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা সেই প্রশ্নের মীমাংসাই মুখ্য লক্ষ্য হইয়া থাকে। যেমন এ ক্ষেত্রে—সিরাজদ্দৌলা ট্র্যাজেডি কি না, অর্থাৎ সিরাজদ্দৌলা ট্র্যাজেডির স্তরে পৌঁছিয়াছে কি মেলোড্রামার স্তরে পড়িয়া আছে এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে পারিলেই শ্রেণী-পরিচয়ের বড় প্রশ্নটির মীমাংসা করা হইবে। এই কারণেই প্রথম দিকে অন্যান্য প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত মীমাংসা করিয়া শেষ দিকে মুখ্য প্রশ্নটির সবিস্তার আলোচনা করা যাইতেছে।

*প্রথমতঃ—'বিষয়বস্তুর'-ভিত্তিতে—সিরাজদ্দৌলা একখানি ঐতিহাসিক নাটক। ইহাতে, বাংলার শেষ স্বাধীন নবাবের শোচনীয় ভাগ্যবিপর্যয়—ইংরেজ বণিক লক্ষ্মীর সুড়ঙ্গ পথের অন্ধকারে রাজসিংহাসন আনয়ার তথা ভারতে ইংরেজ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ইতিহাস—বাঙলার ও বাঙালীর স্বাধীনতা বিকাইয়া দেওয়ার কলঙ্কময় ইতিহাস উপস্থাপিত হইয়াছে। নামে ইহা ব্যক্তি-চরিত্রধর্মী বটে, কিন্তু কার্যতঃ এই নাটকে ব্যক্তির মধ্য দিয়া জাতির এক মহা যুগ-সন্ধির ইতিহাস সবিস্তারে নাটকায়িত হইয়াছে। **এক হিসাবে ইহা ব্যক্তি জীবনের অন্য হিসাবে ইহা বাঙলার তথা ভারতের এক যুগ সন্ধির রূপ—ব্যক্তি ও জাতি এখানে অবিচ্ছেদ্যভাবে মিশিয়া আছে।**

'বিষয়বস্তুর উৎস'-ভিত্তিতে

*দ্বিতীয়তঃ—'বিষয়বস্তুর ভাব-প্রকৃতি'—ভিত্তিতে—সিরাজদ্দৌলা রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রমূলক ও স্বদেশ-প্রেম মূলক নাটক। স্বদেশপ্রাণ সিরাজদ্দৌলার বিরুদ্ধে ঘরে বাইরে ষড়যন্ত্র এবং সেই ষড়যন্ত্রের ফলে পলাশী প্রান্তরের যুদ্ধে বাঙলার ও বাঙালীর রাজনৈতিক স্বাধীনতা-সূর্যের অস্তগমন—এই নাটকের কাহিনীর ভাববস্তু ('theme)।

*তৃতীয়তঃ—'উপাদান যোজনা'—ভিত্তিতে—সিরাজদ্দৌলা "নাটক"। তবে গীত-যোজনা সবক্ষেত্রে নাটকোচিত হয় নাই; বলা যায় গীতযোজনায় যাত্রাপ্রবণতা আসিয়া গিয়াছে।

*চতুর্থত :—আয়তনের দিক দিয়া সিরাজদ্দৌলা নাটকের মাত্রা লঙ্ঘন করিয়া অনেকটা মহানাটকের আকার গ্রহণ করিয়াছে। হিসাবে পঞ্চাঙ্ক হইলেও, গর্ভাঙ্কের সংখ্যাধিক্যে—মহানাটক-সুলভ ব্যাপ্তি দেখা গিয়াছে। প্রথম অঙ্কে ১২টি গর্ভাঙ্ক, দ্বিতীয় অঙ্কে—৬টি, তৃতীয় অঙ্কে—৫টি, চতুর্থ অঙ্কে—৬টি, এবং পঞ্চম অঙ্কে—৭টি,—মোট ৩৬টি গর্ভাঙ্কে, ২০২-পৃষ্ঠায় এক বৃহৎ কলেবর পরিগ্রহ করিয়াছে। নাট্যকার ভূমিকায় জানাইয়াও দিয়াছেন—'সিরাজচরিত্র লইয়া দুই খণ্ড নাটক লিখিলে, প্রকৃত অবস্থা বর্ণিত হইতে পারিত।... সাহিত্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ের উৎসাহে নাটকখানি একখণ্ডে সমাপ্ত করিয়াছি, **'সেই জন্য নাটকের আকার অপেক্ষাকৃত বৃহৎ হইয়াছে"**।

বাস্তবক, ৩৬ দৃশ্য অভিনয় করিতে হইলে এবং প্রতি দৃশ্যের জন্য গড়ে ১০ মিঃ ধরিলে—৬ঘণ্টার কমে অভিনয় শেষ করা সম্ভব নহে। কাটছাট না করিলে বা দৃশ্য বাদ না দিলে যে অভিনয় জমানো যায় না—এ কথাটা নাট্যকার নিজেই উপলব্ধি করিয়া গিয়াছেন—প্রমাণ নাটকের ৭৫ পৃষ্ঠার পাদটীকা—* অভিনয়ের সময় সংক্ষেপার্থে ষষ্ঠ ও অষ্টম গর্ভাঙ্কের পরিবর্তে * [ ] *অংশটি সন্নিবেশিত হইল। সুতরাং নাটকখানিকে ঠিক 'নাটক' আখ্যা দেওয়া যায় না। আর্থিক গুরুত্বের দিক বিবেচনা করিয়া 'মহানাটক' বলিতে আপত্তি করিলে—**"মহানাটককল্প"** বা 'বৃহৎ-নাটক' শ্রেণী কল্পনা করিয়া ইহার স্থান করিয়া দেওয়া উচিত।

*পঞ্চমতঃ—'গঠন রীতির দিক দিয়া নাটকখানি—'রোমান্টিক-বন্ধ' ইহাতে—বহুর সমবায়ে একটি 'একক'কে গড়িয়া তোলা হইয়াছে। "ঘটনা-ঐক্য" বলিতে এরিস্টটল ও ক্লাসিকাল পন্থারা যাহা বুঝিয়াছেন সেইরূপ সরল ঘটনা ঐক্য নাই বটে, কিন্তু এখানকার ঘটনাগুলি (ঘসেটি-ঘটিত, সওকৎ-জঙ্গঘটিত, ইংরেজ-ঘটিত, মীরজাফর ঘটিত) সিরাজ-বিরোধী ষড়যন্ত্র-চক্রের কেন্দ্রটির সহিত যুক্ত থাকায় ও কেন্দ্রটিকে ঘিরিয়া আবর্তিত হওয়ার বেশ সহজ

একটি "জটিল ঘটনা-ঐক্য" গড়িয়া উঠিয়াছে। রোমান্টিক বন্ধের নাটকের মতই এখানে দৃশ্য-বিন্যাসের মধ্যে কার্যকারণ—যোগের নিবিড় সম্পর্কটি নাই—ঘটনাগুলি পর্যায়ক্রমে এবং কালানুক্রমিক ভাবে পরপর ঘটিয়া গিয়াছে। সংক্ষেপে—গঠনটি "এপিসোডিক" বা সরল (এরিস্টটল মতে সিম্পিল্) *ষষ্ঠতঃ—রচনা বন্ধের বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়া দেখিলে—নাটকখানি প্রধানতঃ গদ্য-নাটক হইলেও—গদ্য-পদ্য মিশ্র (চম্পূ)।

*সপ্তমতঃ--উপস্থাপনা-নীতির ভিত্তিতে,—সিরাজদ্দৌলা নাটকখানি যথার্থ 'বাস্তবিক' (Realistic) নহে,—অনেক পরিমাণে রোমান্টিক বা 'ভাবতান্ত্রিক' (idealistic)। ঘটনা-চরিত্র-সংলাপ প্রভৃতির যে পরিমাণ সামগ্রিক ঔচিত্য তথা বাস্তবতা থাকিলে বাস্তবিকতার মায়া জমাট বাঁধিয়া দাঁড়ায় সেই পরিমাণ বাস্তবতা এখানে নাই। নাটকখানিতে বাস্তবিক ও ভাবতান্ত্রিক রীতির সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে বলিয়া সংক্ষেপে ইহাকে **মিশ্র-রীতিক** বলা যাইতে পারে।

অষ্টমতঃ—উদ্দেশ্যের দিক দিয়া নাটকখানিকে—প্রধানতঃ ভাব-মুখ্য বলা যায়। যদিও রস বা হৃদয়াবেগের মাত্রাও ভাবের মাত্রার খুবই কাছাকাছি। বস্তুত, প্রত্যেক বড় সৃষ্টিতেই ভাব ও রস ওতপ্রোতভাব যুক্ত থাকে, কারণ রসাত্মক হতে ভাব বা চরিত্র যাহাই উদ্দেশ্য হউক না কেন রস অপরিহার্য আর সেই রসসাহিত্যই শ্রেষ্ঠ যাহাতে ভাব ও রস প্রতিস্পর্দ্ধার সহিত বিরাজ করে। যেখানে ভাব রূপকে অতিবর্তন করে বা রূপ ভাবকে চাপিয়া ধরে—পিষিয়া মারে সেখানেই বুঝিতে হইবে শিল্পীর ভাবুক ও রসিক সত্তার ভার-সাম্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ভাবুক ও রসিকের পূর্ণ সমন্বয় সুদুর্লভ। এই নাটকে নাট্যকারের ভাবুক-সত্তা খুবই সজাগ এবং প্রকাশ-প্রবণ—রসিক-সত্তা অনেকক্ষেত্রেই ভাবুকের কাছে কোণঠাসা হইয়া পড়িয়াছে। ভাবুকের "রাজনৈতিক ও প্রজাবৎসল সিরাজের স্বরূপটি" (নাটকের ভূমিকা দ্রষ্টব্য) বুঝাইবার প্রয়াস, রসিকের দেখাইবার প্রয়াসের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে নাই। ঠিক "the

bias should flow by itself from the situation and action, without particular indication—(মিন্না কৌট্স্কির কাছে লেখা এঙ্গেলসের পত্র, ১৮৮৫)—বলা যাহা বুঝায় সেই আদর্শ অবস্থাটি নাটকে পুরোপুরি নাই। এই নাটকে পাত্র পাত্রীকে "the mere mouthpieces of the spirit of the times" (লাসাল-মার্কস ১৮৫৯) করার দিকেই ঝোঁক বেশী দেওয়া হইয়াছে এবং 'ভাবকে' (নবজাতীয়তা ও ফিউডাল-চক্রান্তের হস্ত হইতে স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখা) প্রচার করিবার উদ্দেশ্য বড় হইয়া উঠিয়াছে। মার্কসের পরিভাষায় বলা যায়—'শেকস্‌পীয়ারাইজেশন' অপেক্ষা 'শিলারাইজেশন' বেশী হইয়াছে।

নবমত:—রস-সংবেদনার দিক দিয়া শ্রেণী-পরিচয় দেওয়ার প্রশ্ন। এই প্রশ্নের মীমাংসা করিবার আগে রস-সংবেদনার ভিত্তিতে শ্রেণী-বিভাগ সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। নাট্যের শ্রেণী-বিভাগের ইতিহাস লক্ষ্য করিলে দেখা যায়—প্রতীচ্যে ট্র্যাজেডি—কমেডি বিভাগটি প্রাচীনতম এবং ঐ বিভাগটির ভিত্তি সংক্ষেপে বলা যায়—"feeling tone" সংবেদনা বৈশিষ্ট্য, বিশেষতঃ বেদনা-ভাববন্ধ এবং আমোদ ভাববন্ধ। ট্র্যাজেডির সৃষ্টি ও সংবেদনা যথাক্রমে বেদনা ভাববন্ধ হইতে এবং বেদনা-ভাব বন্ধের কাছেই। আর কমেডির সংবেদনা বিপরীত মেরুতে—আমোদ-বন্ধে এরিষ্টটলের 'পোয়েটিকস'-এ এককে বলা হইয়াছে—"imitation of serious action"......incidents arousing pity and fear"......, অন্যকে বলা হইয়াছে "dramatising the ludicrous"। প্রথম পর্যায়ে—ট্র্যাজেডি ভয়ানক-মিশ্র বেদনাজনক ঘটনার উপস্থাপনা, প্রধানতঃ **করুণরসাত্মক** নাটক, এবং কমেডি হাস্যোদ্দীপক ঘটনার উপস্থাপনা অর্থাৎ **হাস্যরসাত্মক** নাটক। পরবর্তীকালে—কমেডির মধ্যে উপবিভাগ কল্পনা করিবার প্রয়োজন দেখা দেয় এবং 'কমেডি'কে মুখ্যতঃ **লো-কমেডি হাই-কমেডি** (সিরিয়াস কমেডি)—দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। তারপর **করুণ-মিশ্র কমেডি বা ট্র্যাজেডি-হইতে-হইতে-কমেডি" জাতীয়**

নাটকের জন্যও "ট্র্যাজি-কমেডি" শ্রেণী কল্পনা করা হয়। যাহা হউক কমেডির বিস্তৃত আলোচনা এক্ষেত্রে নিষ্প্রয়োজন। সুতরাং ট্র্যাজেডির বিশেষ আলোচনায় প্রবেশ করিবার চেষ্টা করা যাক।

ট্র্যাজেডি শব্দটি যেমন 'গ্রীক', ট্র্যাজেডির লক্ষণটিও তেমনি গ্রীক সমালোচক এরিষ্টটল—নির্দ্ধারিত। লক্ষণটি সামান্যভাবে আগেই উল্লেখ করা হইয়াছে। [ট্র্যাজেডি লক্ষণের বিশেষ আলোচনা নাট্যসাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার দ্রষ্টব্য।] এখানে বিশেষ লক্ষ্য এই যে এরিষ্টটলের গ্রন্থেই আমরা ট্র্যাজেডির একটি শ্রেণীবিভাগ দেখিতে পাই—যেমন এরিষ্টটল ট্র্যাজেডিকে মোট চারটি (পাঁচও বলা যায়) শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন—যেমন (১) কমপ্লেক্স ট্র্যাজেডি [যে ট্র্যাজেডির কাহিনীতে ঘটনার বিপর্যাস ও আবিষ্কার থাকে—অর্থাৎ যাহাতে বিস্ময়ের মাত্রা বেশী থাকে]।

(২) প্যাথেটিক ট্র্যাজেডি (করুণ রস বা ভাবাবেগ (passion) সৃষ্টি যেখানে মুখ্য [illegible])। (৩) এথিক্যাল ট্র্যাজেডি—(নীতি বা আদর্শ প্রচার করা যেখানে মুখ্য উদ্দেশ্য) (৪) সিম্পল ট্র্যাজেডি (কাহিনীর গঠন যেখানে ঘটনার পরম্পরার বিন্যাস মাত্র)—

(৫) স্পেক্টাকুলার......ট্র্যাজেডি? .. (যেখানে spectacular element-এর (দৃশ্য) দ্বারা রস সৃষ্টির চেষ্টার প্রাধান্য) * [বিশেষ লক্ষণীয়—অনেক পরিবর্ত্তী কালে এলারডাইস নিকল মহাশয়, ট্র্যাজেডির উদ্দেশ্য করুণ রস (pity) সৃষ্টি নহে—উদ্দেশ্য "awe and grandeur"—বিস্ময় ভাব (অদ্ভুত রস) সৃষ্টি—বলিয়া যে নূতন মত স্থাপনার চেষ্টা করিয়াছেন তাহার বীজ এরিষ্টটলের—'কমপ্লেক্স ট্র্যাজেডি'র মধ্যেই আছে] সকলেই জানেন—এরিষ্টটল উল্লিখিত পাঁচ শ্রেণীর মধ্যে—প্রথমকে অর্থাৎ 'কমপ্লেকস ট্র্যাজেডি'কেই প্রথম শ্রেণীর মর্যাদা দিয়াছেন—এবং স্পেকটাকুলার-শ্রেণীটিকে অধম ট্র্যাজেডি বলিয়া প্রায় অপাংক্তেয় করিয়া রাখিয়াছেন। যাহারা তত্ত্বদর্শী তাঁহারা নিশ্চয়ই এ কথা স্বীকার করিবেন—ট্র্যাজেডির শ্রেণী-বিভাগের মধ্যে এরিষ্টটলের যে প্রবণতা

ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহারই সহজ পরিণতি দেখা যায় পরবর্তী কালের—'হাই ট্র্যাজেডি' ও 'মেলোড্রামা' শ্রেণীর পরিকল্পনার মধ্যে। এরিষ্টটলের প্রথম শ্রেণীর কম্‌প্লেক্স ট্র্যাজেডির মেরুতে—ট্র্যাজেডির স্থান এবং স্পেক্টাকুলার ও প্যাথেটিক মেরুতে মেলোড্রামার আবির্ভাব। এরিষ্টটল যেখানে সামান্য ধর্মের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এক হইতে পাঁচ পর্যন্ত সকলকেই ট্র্যাজেডি বলিয়াছেন, পরবর্তী কালে সেখানে ট্র্যাজেডি শব্দটিকে বিশেষ অর্থে প্রয়োগ করার প্রবণতা দেখা দিয়াছে —এই প্রবণতার ফলেই "ট্র্যাজেডি", প্যাথেটিক ড্রামা "মেলোড্রামা" প্রভৃতি ভিন্ন শ্রেণীর বিভাগ দেখা দিয়াছে। আমাদের সমস্যা —এই শ্রেণী বিভাগ ও উহাদের স্বরূপ বিচার লইয়াই।

ট্র্যাজেডির ও মেলোড্রামার স্বরূপ

এইবার ট্র্যাজেডির স্বরূপ এবং মেলোড্রামার লক্ষণ নির্ধারণ করিবার চেষ্টা করা যাউক। কারণ সিদ্ধান্তগুলোর শ্রেণী পরিচয়ের জন্য ট্র্যাজেডির স্বরূপ উপলব্ধি এবং মেলোড্রামার লক্ষণ নিরূপণ বলা চলে একরূপ অপরিহার্যই। ট্র্যাজেডির লক্ষণ নাটকখানিতে কতখানি আছে, আর মেলোড্রামার লক্ষণও বা কতটুকু আছে, শেষ বিচারে নাটকখানিকে ট্র্যাজেডি বলা হইবে কি মেলোড্রামা বলা হইবে—এই সব প্রশ্নের সমাধান করিতে হইলে যেমন জানিয়া লওয়া আবশ্যক—উভয়ের স্বরূপ, তেমনি জানিয়া লওয়া অত্যাবশ্যক মেলোড্রামার ও ট্র্যাজেডির সীমারেখাটি।

ট্র্যাজেডির স্বরূপ নির্দ্ধারণের চেষ্টায় আমরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিচারের পথে অগ্রসর হইতে পারি—

(১) ট্র্যাজেডির নায়ক (Tragic hero)
ট্র্যাজেডি বোধ (Tragic impression)
ট্র্যাজেডির রস (Tragic emotion)
ট্র্যাজেডির পরিণতি (Tragic ending)

ট্র্যাজেডির নায়ক

ট্র্যাজেডির নায়ক-সম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রকার জিজ্ঞাসা সম্ভব (ক) নায়কের বংশমর্যাদা (খ) নায়কের নৈতিক মান (গ) নায়কের ক্রিয়াতৎপরতা বা উদ্যম (ঘ) নায়কের নিজ দায়িত্ব। প্রথম জিজ্ঞাসা—নায়কের বংশ মর্যাদা সম্পর্কে প্রথমেই বলা যায়—এ বিষয়ে বিসংবাদ আছে এবং তাহার জের আজও মেটে নাই। "illustrious' -এর অর্থাৎ রাজ-রাজড়ার শোচনীয় ভাগ্যবিপর্যয় না ঘটিলে—"fall of a great man" না হইলে ট্র্যাজেডি হইবে না। এইরূপ অভিমত বহু প্রাচীন কালে সকলের মধ্যে এবং বর্তমান কালে দুই একজনের মধ্যে পাওয়া যায়। কিন্তু ট্র্যাজেডির ইতিহাস দেখিলেই দেখা যাইবে—সমাজ বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তথা সামাজিক বাসনার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ট্র্যাজেডি নায়কের বংশ-গত যোগ্যতার মাপকাঠিতেও পরিবর্তন ঘটিয়াছে। পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক ঘটনা বা ব্যক্তির জীবনকথার মধ্যে ট্র্যাজেডির বিষয়বস্তু সীমাবদ্ধ হইয়া থাকে নাই—ব্যক্তি মর্যাদার প্রসার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 'সাধারণ ব্যক্তি'ও ট্র্যাজেডি-নায়ক হইবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছে। 'ডোমেষ্টিক ট্র্যাজেডি' সামাজিক ট্র্যাজেডি নায়কের বংশ মর্যাদার নৈকষ্য ভঙ্গ করিয়া দিয়াছে বিখ্যাত নাট্য-তত্ত্ব-মীমাংসক অধ্যাপক এলারডাইস নিকল মহাশয় পৌরাণিক প্রথার মোহ কাটাইতে পারেন নাই বলিয়া গার্হস্থ্য ট্র্যাজেডি বা সামাজিক ট্র্যাজেডিকে ট্র্যাজেডি বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠা প্রকাশ করিলেও—(দি থিওরি অফ ড্রামা—ডোমেষ্টিক ট্র্যাজেডি পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য—ট্র্যাজেডি-নায়কের গণতন্ত্রায়নকে অস্বীকার করিতে পারেন নাই। "ট্র্যাজিক ইম্প্রেশন" জাগাইতে পারিলে—যে কোনব্যক্তি আজ ট্র্যাজেডি নায়ক হইতে পারে—এমনকি নাট্যকার আর্থার উইলিয়াম পিনেরো মহাশয়ের—"সেকেণ্ড মিসেস ট্যাঙ্কেরি" নাটকের নায়িকার মত পাত্রীরও কোন বাধা নাই। একথা সত্য—পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক ট্র্যাজেডির রসের আস্বাদে একটু তারতম্য থাকিবেই কিন্তু তাহা আছে বলিয়া, একেকে ট্র্যাজেডি অন্যকে অপট্র্যাজেডি বলা যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না।

এইবার নৈতিকমানের প্রশ্ন বিচার করা যাউক। নৈতিকমান সম্পর্কে এরিষ্টটলের বিখ্যাত সূত্রটি—"not too good not too bad" সুবিদিত। কিন্তু কত পাপাচরণ করিলে নাটক 'অতি মন্দ' হইবে, তাহার মাত্রা বাঁধিয়া দেওয়া সম্ভব হয় নাই—সম্ভব নহে বলিয়াই হয় নাই। আর একটু তলাইয়া দেখিলেই দেখা যাইবে নায়কের নৈতিকমানের প্রশ্নটি শেষপর্যন্ত—নায়কের প্রতি দর্শকের সহানুভূতি আকর্ষণের প্রশ্নের সঙ্গে যুক্ত হইয়া আছে। নায়কের প্রতি সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে না পারিলে ট্র্যাজেডির প্রধান রস—করুণ (pity) সৃষ্টি করা সম্ভব হয় না। নায়কের নৈতিকমান ও গুণপনা সহানুভূতির সহজ উদ্দীপক বলিয়াই ট্র্যাজেডি নায়কে নৈতিকমান আবশ্যক। মনে রাখা দরকার—লক্ষ্য "ট্র্যাজিক ইম্প্রেশন", নায়কের গুণপনা সেই লক্ষ্যে পৌঁছিবার উপায় মাত্র। রস নিষ্পত্তির ক্ষমতা থাকিলে লেখকগণ মিসেস ট্যাঙ্কেরীর মত তুচ্ছ চরিত্রা ও পতিতাকল্পা নায়িকাকে দিয়াও ট্র্যাজেডি সৃষ্টি করা চলে।

আর একটা কথা মনে রাখিতে হইবে—নৈতিক-মান নায়কের 'বাহ্য আচরণ' দিয়া বিচার করিতে বসিলে চলিবে না। এইরূপ বিচারে কত বিভ্রাট ঘটে—সুবিখ্যাত শেক্সপীয়ার-অধ্যাপক পার্সভাল্ সাহেব মহাশয়ের—'ম্যাকবেথ' সম্পাদনা হইতেই বুঝা যাইতে পারে। ম্যাকবেথকে তিনি 'ট্র্যাজিক হিরো"র মর্যাদা দিতে কুণ্ঠিত। তাঁহার মতে—ম্যাকবেথ খারাপ লোক out and out a bad man সুতরাং সহানুভূতির অযোগ্য। লক্ষণীয়—সহানুভূতিই লক্ষ্য, নৈতিকমান উপলক্ষ্য মাত্র। নায়কের প্রতি দর্শকের সহানুভূতি বজায় রাখাই নাট্যকারের সমস্যা। নায়ক যে-ভাবে এবং যত আচরণই করুক দর্শকের সহানুভূতির কক্ষ হইতে চ্যুত না হইলে, ট্র্যাজিক নায়ক হইবার পক্ষে এ দিক দিয়া কোন বাধা নাই।

তৃতীয়তঃ নায়কের ক্রিয়া-তৎপরতা (activity)। নাটকে 'ক্রিয়া' (action) বলিতে কি বুঝায় তাহা খুব সুনির্দ্দিষ্টভাবে নির্দ্ধারিত আছে—এ কথা

বলিলে সত্যের অপলাপই করা হইবে। এ ক্ষেত্রেও নানা মুনির নানা মত দেখা যায়, এবং আমাদের মত যাঁহারা পরপ্রত্যয়নেয়বুদ্ধি তাঁহারা মুনিদের মত-বিরোধের মধ্যে পড়িয়া খুবই বিভ্রান্ত। **মোটামুটিভাবে** ক্রিয়াকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করিয়া দেখিয়া থাকি—প্রথমটি **কায়িক** (physical), দ্বিতীয়টি—**মানসিক** (mental) তৃতীয়টি—**আত্মিক** (spiritual)* [spiritual ও mental লইয়া দ্বন্দ্ব করিবার স্থল ইহা নহে—ভুলিলে চলিবে না] অতএব কায়িক ক্রিয়া যেমন ক্রিয়া, তেমনি মানসিক ও আত্মিক ক্রিয়াও ক্রিয়া। আর প্রত্যেক বড় বড় নাটকে—তিন স্তরের ক্রিয়াই বর্তমান থাকে—তবে মানসিক ও আত্মিক ক্রিয়ার মাত্রাই বেশী থাকে। কারণ ক্রিয়া যত উর্দ্ধতন স্তরে উন্নীত হয়, সৃষ্টির মহত্বও তত বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। নায়কের ক্রিয়া তৎপরত বিচারের পূর্বে—এই কথাটি আমাদের মনের সম্মুখে রাখিতেই হইবে।

অবশ্য—নায়কের ক্রিয়া-তৎপরতা (activity ও passivity) বিচারের সময় আমরা সাধারণতঃ নায়কের পরিস্থিতি-সংঘটনের ঘটনা-নিয়ন্ত্রণের এবং পরিস্থিতির বাধা অতিক্রম করিয়া বিশেষ একটি লক্ষ্যে পৌছিবার **দৈহিক চেষ্টার** পরিমাণ হিসাব করিয়া থাকি। এই হিসাবেই—ম্যাকবেথ আগাগোড়া ক্রিয়াতৎপর, "কাউন্সীয়র"—হেমলো প্রভৃতি "more acted upon than acting"—এক কথায় নিষ্ক্রিয়।

যাহা হউক আমাদের আলোচ্য—ক্রিয়া-তৎপরতার তাৎপর্য নহে। আলোচ্য—ক্রিয়া-তৎপরতার প্রচলিত অর্থ এবং সেই প্রচলিত অর্থে ট্র্যাজেডির নায়কে কি পরিমাণ ক্রিয়া-তৎপরতা অপরিহার্য সেই প্রশ্নটি। দেখা গেল—ট্র্যাজেডির নায়কের পক্ষে আগাগোড়া স্থূল ক্রিয়া-তৎপরতা অপরিহার্য নহে। দেহের ক্রিয়া অর্থাৎ শারীরিক উদ্যম বন্ধ বা বাধাগ্রস্ত হইলেও—মানসিক-আত্মিক ক্রিয়ার মাহাত্ম্যে নায়ক "ট্র্যাজিক" মর্যাদালাভ করিতে পারে। এই প্রসঙ্গেই একটা কথা স্মরণীয়—ব্রুণেতিয়ে "striving towards a goal" বলিয়া ক্রিয়ার (এ্যাকশান) যে লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন তাহাকে একটু ব্যাপক

অর্থে ব্যবহার করিলেই দেখা যাইবে—লক্ষ্যে পৌঁছিবার কায়িক চেষ্টাও যেমন চেষ্টা, তেমনি কোন-কিছুকে পাওয়ার তীব্র কামনাও লক্ষ্যে পৌঁছিবার চেষ্টারই রূপবিশেষ। যেমন কায়িক চেষ্টার ব্যর্থতায় তেমনি কামনার নিষ্ফল পরিণতিতেও ট্র্যাজেডির সম্ভাবনা বর্তমান। সুতরাং ট্র্যাজিক নায়ক প্রচলিত অর্থে ক্রিয়াশীল ও নিষ্ক্রিয় দুই-ই হইতে পারে এই প্রসঙ্গেই আসে—* নায়কের দায়িত্বের প্রশ্ন। এরিস্টটলের একটি মন্তব্য হইতেই এই সমস্যার উৎপত্তি। এরিস্টটল পোয়েটিক্স গ্রন্থে বলিয়াছেন—নায়কের শোচনীয় ভাগ্য বিপর্যয় ঘটিবে—নীচতার জন্য নহে (not due to depravity), ঘটিবে—নায়কের কোনরূপ—বুদ্ধি-ভ্রংশের (error of judgment) জন্য অথবা চরিত্রের কোন অন্তর্নিহিত আসক্তি বা দুর্বলতার জন্য (frailty)। তবে দেখান যাইতে পারে যে সব ক্ষেত্রেই বিশেষতঃ অনেক—প্যাথেটিক ট্র্যাজেডিতে, নায়ক-নায়িকার দুর্দশা-দুর্ভোগ এবং ভাগ্য-বিপর্যয়ের মূলে উহাদের নিজেদের কোন দায়িত্ব নাই। জন্-এস-স্মার্ট মহাশয় তাঁহার বিখ্যাত 'ট্র্যাজেডি-নামক প্রবন্ধে ('এসেস্ এ্যাণ্ড স্টাডিজ', দি ইংলিশ এসোসিয়েশন ৮ম খণ্ড)—'Trozan Women'-নাটকখানির দৃষ্টান্ত তুলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন—নির্দোষ ব্যক্তিও (innocent person) ট্র্যাজেডির নায়ক হইতে পারে বুদ্ধিভ্রংশ বা চারিত্রিক দুর্বলতা সব ক্ষেত্রে থাকে ই এমন কোন কথা নাই।

এখানেই স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন উঠে—আসলে ট্র্যাজেডি-সংবিতের স্বরূপটি তবে কি? নায়কের বংশ, নৈতিকমান প্রভৃতি যাহার উপায় এবং যাহা সকলের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য সেই ট্র্যাজেডি সংবিৎ—ইংরাজীতে যাহাকে বলে tragic impression' তাহা কি? পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক নানা প্রকার ট্র্যাজেডির মধ্যে যাহাকে আমরা 'সামান্য' (Common) বলিয়া ধরিতে পারি—সেই 'ট্র্যাজেডি-সংবিত' (tragic impression)-কে এক কথায় প্রকাশ

*ট্র্যাজেডির বা Tragic impression

করিতে গেলে বলা যায়—ব্যর্থ-অভিযোজন-জনিত আর্থিক, দৈহিক ও আধ্যাত্মিক বিপর্যয়ের জন্য বেদনা। আর একটু বিস্তৃতভাবে বলিলে বলা যায় – unmerited misfortune' বা sight of a loosing struggle"—বা "a will striving towards a goal"-এর ব্যর্থ প্রচেষ্টা ও বিপর্যয় দেখিয়া যে বেদনা জাগে তাহাই—'ট্র্যাজেডি সংবিৎ' শ্রদ্ধেয় স্মার্ট মহাশয় বলেন – "There are tragedies, it has been said, of many types What is common to all is the element of calamity and suffering; and where these are present in literature tragedy may also be present অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে আছে—(ক) দুর্বল ও নিরীহের প্রতিক্রিয়াবিহীন দুঃখভোগ ট্র্যাজেডি নহে—ট্র্যাজেডিতে বিপত্তির বিরুদ্ধে দৈহিক বা অন্ততঃ মানসিক প্রতিরোধ প্রচেষ্টা থাকা চাই। (খ) বিস্ময়বোধ (sense of wonder) এবং রহস্যের আস্বাদন (sense of mystery which is something ultimate) থাকা চাই। এ কথা অবশ্য স্বীকার্য যে পরিস্থিতির বা পরিবেষ্টনীর বিরুদ্ধে নায়ক-নায়িকার শারীরিক বা মানসিক প্রতিক্রিয়া (reaction) ট্র্যাজেডির পক্ষে অপরিহার্য, কিন্তু—"Sense of something which is something ultimate"—অর্থাৎ পরাতত্ত্বের অবতারণা ও ব্যঞ্জনা, সর্বক্ষেত্রে থাকিবেই এ বলা যায় না। ঐতিহাসিক বা সামাজিক ট্র্যাজেডিতে পরাতত্ত্বের আবহাওয়া অপরিহার্য, তাহা বলা চলে না। ঐতিহাসিক কোন ব্যক্তির মহান কোন আদর্শের জন্য ঐকান্তিক অথচ নিরুপায় এবং নিষ্ফল সংগ্রামের তথা শোচনীয় ভাগ্য-বিপর্যয় অবশ্যই ট্র্যাজেডি-সংবেদনা সৃষ্টি করিতে সক্ষম। তেমনি সামাজিক কোন ব্যক্তির প্রতিকূল-শ্রেণী-বিন্যাসের বিরুদ্ধে ঐকান্তিক অথচ নিষ্ফল সংগ্রাম,—তথা শোচনীয় বিপর্যয় ট্র্যাজেডি-সংবিৎ সৃষ্টি করিতে পারে। গলসওয়ার্দির—"স্ট্রাইক"কে উদাহরণ হিসাবে ধরা যাইতে পারে। মোট কথা—নাটককে ট্র্যাজেডি হইতে হইলে যে নাটকের চতুর্দিকে পরাতত্ত্বীয় পরিমণ্ডল সৃষ্টি করিতেই হইবে এমন কোন কথা নাই। ইহলৌকিক অর্থাৎ

সামাজিক পরিমণ্ডলের মধ্যে থাকিয়াও নায়ক 'ট্র্যাজিক' হইতে পারে। অবশ্য ট্র্যাজিক-সংবিতের গভীরতা বা সার্বজনীনতার মাত্রা প্রথম ক্ষেত্রে বেশী, অন্য ক্ষেত্রে কম হইতে পারে। একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে শিল্পের "বিষয়বস্তু" সৃষ্টি প্রক্রিয়ার ফলে, 'বিশেষ' রূপের মধ্য দিয়া যত সাধারণীভূত বা সার্বজনীন হইয়া উঠিতে পারে, ততই তাহার শৈল্পিক মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। এই দিক দিয়া দেখিলে সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে এইভাবের একটা স্তর-বিন্যাস লক্ষ্য করা যাইতে পারে—নিছক ঘটনা-সমাবেশ, নিছক বহির্দ্বন্দ্ব, বহির্দ্বন্দ্বের সঙ্গে নৈতিক তথা মানসিক দ্বন্দ্ব, অর্থাৎ মানসিক দ্বন্দ্ব আত্মিক দ্বন্দ্ব প্রভৃতি স্তর। সৃষ্টি যত উর্দ্ধ স্তরে উঠিতে সক্ষম হয়, তত তাহাতে গভীরতা, তত তাহাতে সার্বজনীনতা ব্যক্ত হয়। ট্র্যাজিক ইম্প্রেশন' সৃষ্টি করিতে হইলে, নিছক বহির্দ্বন্দ্ব দ্বারা সম্ভব নহে—দ্বন্দ্বটিকে উন্নততর স্তরে—আদর্শের জন্য সংগ্রামের বা আদর্শচ্যুত হওয়ার জন্য অন্তর্দ্বন্দ্বের স্তরে অবশ্যই তুলিয়া লইতে হইবে—খাঁটি ট্র্যাজেডিতে ..."the situation is moral and the individual we may say, has to cope with universe (understanding Drama) এ কথাটি মোটা-মুটিভাবে মানিয়া লওয়া যাইতে পারে।

যাহা হউক, সংবিতের গভীরতা বা সার্বজনীনতার তারতম্যের প্রশ্ন বাদ দিয়া 'Tragic impression'-এর মনস্তাত্ত্বিক স্বরূপ এইভাবে প্রকাশ করা যাইতে পারে—ট্র্যাজেডি সংবিৎ বিশেষ এক প্রকার উপলব্ধি, যাহার **বোধ অংশে** (Cognitive aspect) আছে—নায়কের নিরুপায় ও নিষ্ফল সংগ্রামের বা মহিমাভ্রংশের ধারণা—দুঃখ-দুর্ভোগ ও ভাগ্যবিপর্যয়ের ঔচিত্য সম্পর্কে অন্তরের অন্তঃস্থলে একটা নিগূঢ় আপত্তি এবং **ভাব অংশে** (emotive aspect) আছে—নায়কের জন্য নিবিড় সহানুভূতি, বেদনা বোধ বা শোচনা। শোচনার সহিত যখন উল্লিখিত বোধের যোগ ঘটে তখনই "ট্র্যাজেডি সংবিৎ" সৃষ্টি হয়।—দ্বন্দ্বের গভীরতার অনুপাতে এই সংবিতের তীব্রতার মাত্রা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। অর্থাৎ সংবিৎটি—বোধে ও ভাবে আরো উত্তেজক হইয়া উঠে।

এই প্রসঙ্গেই **ট্র্যাজেডি নাটকের রসের প্রশ্ন** উঠে। এই প্রশ্নের আলোচনায়, মূলসূত্র—এরিষ্টটলের মন্তব্য—"Incidents arousing pity or fear", ..."we must not demand of Tragedy any and every kind of pleasure, but only that which is proper to it. *And since the pleasure which the poet should afford is that which comes from pity and fear through imitation···

ট্র্যাজেডির রস

"শোক অথবা ভয়" এবং "শোক ও ভয়"—এই দুইটি উক্তির কোনটি সত্য সে মীমাংসায় প্রবেশ না করিয়া আমরা বলিতে পারি—এরিষ্টটলের মতে ট্র্যাজেডি—'ভয়ানক' মিশ্র করুণ-রসাত্মক নাটক, এবং যে নাটক "thrill with horror and melt to pity" করিতে পারে সেই নাটকই বড় ট্র্যাজেডি—সুতরাং রসের হিসাব করিতে গেলে বলা যায় 'বিস্ময়-ভয়-মিশ্র' শোক (pity) ট্র্যাজেডি নাটকের ভাব এবং অদ্ভুত ও ভয়ানক-মিশ্র করুণ রস ট্র্যাজেডির রস; উহাদের মধ্যে অদ্ভুত ও ভয়ানক 'প্রাসঙ্গিক' এবং করুণ আধিকারিক (প্রধান) রস। কোন ট্র্যাজেডিতে ভয়ানকের মাত্রা বেশী থাকে (*হরর ট্র্যাজেডি) কোন ট্র্যাজেডিতে দ্বন্দ্ব—তীব্রতাজনিত বিস্ময়ের মাত্রা বেশী থাকে, কোন ট্র্যাজেডিতে ("ট্র্যাজেডি অফ্‌ সাফারিং" জাতীয় নাটকে) করুণের মাত্রা বেশী থাকে—এই যাহা পার্থক্য পূর্বেই বলা হইয়াছে,—প্যাথেটিক ট্র্যাজেডিকে এরিষ্টটল প্রথম স্থান দেন নাই,—তাঁহার মতে, পারফেক্ট ট্র্যাজেডি বা কমপ্লেক্স ট্র্যাজেডি প্রথম শ্রেণীর ট্র্যাজেডি। এই নির্দেশের এবং হেগেল প্রভৃতির আলোচনার উপর নির্ভর করিয়া অধ্যাপক এলারডাইস নিকল মহাশয়—ট্র্যাজেডির রস সম্পর্কে নূতন এক সিদ্ধান্ত প্রচার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন—তাঁহার সিদ্ধান্ত—"Tragedy.. ...has for its aim not the arousing of pity, but the conjuring up of a feeling of awe allied to lofty grandeur."—আমাদের পরিভাষায় বলিতে গেলে

বলা যায় ট্র্যাজেডির উদ্দেশ্য করুণরস সৃষ্টি নহে—ট্র্যাজেডির উদ্দেশ্য "অদ্ভুত রস" সৃষ্টি (বিস্ময়)। অধ্যাপক নিকল যে ট্র্যাজেডিকে একটু 'তৃতীয় লোকে' তুলিয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছেন রোমান্টিক ট্র্যাজেডির প্রতি বিতৃষ্ণার মধ্যেই তাহার প্রমাণ পাই। 'Lofty grandeur'-এর মোহে তিনি ট্র্যাজেডি না [illegible] করিতে চাহেন নাই। সুতরাং অধ্যাপক নিকলের সিদ্ধান্তকে একটু সতর্কভাবে গ্রহণ করিতে হইবে—কোন কোন ট্র্যাজেডির পক্ষে তাহার কথা সত্য বটে, কিন্তু সব ট্র্যাজেডিতেই 'awe and grandeur' খুঁজিতে গেলে ভুল করা হইবে। তারপর—"pity"কে বাদ দিয়া 'tragic impression' সম্বন্ধে [illegible] কাহারও বিচার করিলে। [illegible] আছে (পার্সিভাল সাহেব সম্পাদিত [illegible] নাটকের ভূমিকায়) pity জাগ্রত করিতে না পারা পর্যন্ত কোন নায়ক "ট্র্যাজিক" হইতে পারে না। ট্র্যাজিক সংজ্ঞার সহিত—শোক বা শোচনার অপরিহার্য যোগ রহিয়াছে।

ট্র্যাজেডির পরিণাম

ট্র্যাজেডির পরিণাম সম্বন্ধে আমাদের প্রচলিত ধারণা এই যে, ট্র্যাজেডি "unhappy-ending"-এর নাটক।—"বিয়োগান্ত নাটক" কথাটির মধ্যেই ধারণাটি প্রতিফলিত হইয়াছে। কিন্তু ধারণাটির মধ্যে সত্যের মাত্রা বেশী থাকিলেও, উহা সম্পূর্ণ সত্যকে ব্যক্ত করে না। যদিও এরিস্টটল ইউরিপিদিসের-সমালোচকদিগের বিরূপ মন্তব্যের সমালোচনা করিবার প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—"It (*unhappy ending) is the right ending তথাপি সত্য এই যে প্রাচীন-গ্রীসে happy-ending"-ট্র্যাজেডির পরিণাম প্রচলিত ছিল এবং ফরাসীয় ক্লাসিকাল ট্র্যাজেডির অনেকগুলিই—happy ending—অর্থাৎ মিলনান্ত পরিণাম। যাহা হউক এ সম্বন্ধে এই কথাটাই বিশেষভাবে মনে রাখিতে হইবে যে, ট্র্যাজেডি পূর্ণমাত্রায় বিয়োগান্ত যেমন হইতে পারে, আবার—আপাতমিলনান্তও হইতে পারে অর্থাৎ পরিণাম আপাতদৃষ্টিতে মিলন-সূচক মনে হইলেও ট্র্যাজিক-

সংবেদনার মাত্রা বেশী কম পড়ে না, বিষাদের রেশ যথেষ্ট পরিমাণেই থাকে। * [ট্র্যাজেডি সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা—গ্রন্থকারের "নাট্যতত্ত্ব মীমাংসা" গ্রন্থের ট্র্যাজেডি অধ্যায় দ্রষ্টব্য]

এইবার "ট্র্যাজেডি" ও "মেলোড্রামা"র পার্থক্য সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে। "মেলোড্রামা" শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ: মেলোস = গান ড্রেম্ = নাট্য অর্থাৎ গানযুক্ত নাট্য। ইতালীতে গ্রীক নাটকের অনুরূপ গান-যুক্ত নাটক সৃষ্টির চেষ্টা হইতে ইহার প্রচলন—(Dafne 1599)। এক শতাব্দী পর্যন্ত অপেরা ও মেলোড্রামা সমার্থক থাকে। ক্রমে গান ও আকস্মিক ও চাঞ্চল্যকর ঘটনা প্রধান 'সিরিয়াস ড্রামা' অর্থে প্রযুক্ত হইতে আরম্ভ করে। পরে অর্থের হ্রাস ঘটিতে ঘটিতে—ট্র্যাজেডির "a cruder and more popular kin" চেম্বার্স অক্সফোর্ড ডিক্সনারির অর্থ দাঁড়াইয়াছে।

অধ্যাপক নিকলের ভাষায়—মেলোড্রামা ট্র্যাজেডির—"Plebeian relative'। অধ্যাপক এলারডাইস নিকল মেলোড্রামা সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছেন তাহাকে আমরা এইভাবে সাজাইয়া লিখিতে পারি: —

(১) মেলোড্রামায়—'song show and incident prevailing characteristics.

২। „—"undue insistence upon incident"

৩। „ –have nothing or practically nothing that makes an inward appeal .....অর্থাৎ "stressing of the spiritual".

* (৪) তবে—(বিশেষ সূত্র)......নাটকে মেলোড্রামা-সুলভ আকস্মিক বা রোম-হর্ষক ব্যাপার থাকিলেই যে নাটক 'মেলোড্রামা' হইবে তাহা নহে—চরিত্র-চিত্রনের ও ভাবব্যঞ্জনার গভীরতা (inwardness) তথা সার্বজনীনতা (universalness) ব্যক্ত হইলে, মেলোড্রামাসুলভ ঘটনাদি থাকা সত্ত্বেও নাটককে ট্র্যাজেডি বলিতে হইবে—(দৃষ্টান্ত দিয়াছেন—'হ্যামলেট"কে)

অধ্যাপক নিকলের সিদ্ধান্ত—It is then some inner quality—

the stressing of the spiritual as opposed to merely physical that makes Tragedy out of melodrama and Comedy out of farce। অধ্যাপক নিকলের এই সিদ্ধান্তটি খুব মনোযোগ দিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, কারণ "spiritual" ও "merely physical" কথা দুইটির তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলে ট্র্যাজেডিকে মেলোড্রামা এবং মেলোড্রামাকে ট্র্যাজেডি বলার বিপত্তি সর্বদাই থাকিবে। লক্ষণীয়, নিকলের মতে যে নাটকে ঘটনা-কৌতূহল merely physical) ছাড়া অন্য কোন গভীর ভাব বা রস ব্যক্ত হয় না তাহাই আসলে "মেলোড্রামা"। আর যখনই নাটকে গুরুতর কোন সংবেদনা সৃষ্টির ক্ষমতা প্রকাশ পায়, তখনই নাটক ট্র্যাজেডির স্তরে উন্নত হইয়া যায়।

এই প্রসঙ্গেই, "Understanding Drama"-গ্রন্থের পরিশিষ্টে ট্র্যাজেডি ও মেলোড্রামার পার্থক্য-নিরূপণ করিতে যাইয়া **ব্রুক্স** ও **হিল্‌ম্যান** যে নূতন ধরনের একটু মন্তব্য করিয়াছেন এবং খুব সম্ভব **অধ্যাপক নিকলের** মতেরই যে সমালোচনা করিয়াছেন, তাহা উল্লেখ করা যাইতে পারে। আমাদের অনেকেরই মধ্যে এমন ধারণা আছে (বোধ হয় অধ্যাপক নিকলের—'শ্রেণী বিভাগ, পরিচ্ছেদ' পাঠ করিয়াই তাহা জন্মিয়াছে) যে, মেলোড্রামা ট্র্যাজেডিরই অংশ বিশেষ অর্থাৎ ট্র্যাজেডি রসোত্তীর্ণ সৃষ্টিতে পরিণত না হইলেই মেলোড্রামা হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু ব্রুকস ও হিলম্যান বলেন—না, এই ধারণা সত্য নহে—ট্র্যাজেডি অথবা "প্রবলেম-প্লে" লেখার চেষ্টা বিফল হইলেও যেমন মেলোড্রামার সৃষ্টি হইতে পারে তেমন 'মেলোড্রামা' লেখার মুখ্য উদ্দেশ্য হইতেও মেলোড্রামার জন্ম হইতে পারে। আর ট্র্যাজেডি রসোত্তীর্ণ না হইলেই যে মেলোড্রামা হইবে তাহাও বলা ঠিক নহে। ইঁহারা বলেন - We should, however, guard against seeing melodrama merely as tragedy which does not come off ; tragedy may fail to come off and yet not be melo-drama. Viz. Dr. Jonnson's Irene ; or an

author may aim only at melodrama and what he does may be good or bad melo-drama. অবশ্য ইহাদের মতেও—মেলোড্রামার পরিস্থিতিতে বাহ্যঘটনা-কেন্দ্রিক অর্থাৎ পরিস্থিতি "Physical" এবং মেলোড্রামাতে—"good athletic contest"-এর মত "excitement, tension suspense for their own sake." [illegible] শেষ পর্যন্ত "it means nothing"। অন্যদিকে "অর্থগৌরব 'meaning' এর নাটকের অন্তরে [illegible] নাটকের [illegible] ঘটনা বিন্যাস মেলোড্রামাটিক হইলেও, নাট্যশালার [illegible]!

ট্র্যাজেডি ও মেলোড্রামার স্বরূপ লক্ষণ মনে রাখিয়া এইবার সিরাজদ্দৌলা নাটকের [illegible] বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা যাক।

প্রথমতঃ—সিরাজদ্দৌলার নায়ক হইবার যোগ্যতা আছে কি না এই প্রশ্নের মীমাংসা করা যাউক। *বংশ মর্যাদার দিক দিয়া বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব সিরাজের যোগ্যতা কেহই অস্বীকার করিবেন না। তবে প্রশ্ন উঠিতে পারে — সিরাজের *নৈতিক যোগ্যতা-সম্পর্কে। এখানেও স্মরণীয় সিরাজদ্দৌলার চরিত্রে ইতিহাস যত কালিমাই লেপন করিতে চেষ্টা করুক,—ইংরাজদের মুখের ভাষণের—লিখনের উপরে বিধাতার হস্তলিখিত লিখন জয়ী হইয়াছে। সিরাজকে বাঙালী বা ভারতবাসীরা শেষ স্বাধীন নবাবের মর্যাদা দিয়া — সিরাজের অপরিণত বয়সের উচ্ছৃঙ্খলতা প্রভৃতি দোষগুলি ভুলিয়া গিয়া স্বাধীনতা-প্রীতি ফিরিঙ্গি বিদ্বেষ প্রভৃতি গুণের মহিমা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছে। *বিশেষতঃ নাটকে যে সিরাজদ্দৌলা রূপায়িত হইয়াছে, তাহা এই **স্বাধীনতাকামী নবজাতীয়তাবাদী ও ফিরিঙ্গি বিদ্বেষী** সিরাজদ্দৌলাই। বলা বাহুল্য, তাঁহার শত দোষের তুলনায় এই, কয়েকটি গুণের ভার অনেক বেশি, এই আদর্শ পরায়ণতার মধ্যেই সিরাজের নৈতিক যোগ্যতা নিহিত আছে। এই গুণের জন্যই সিরাজ সকলের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন তথা ট্র্যাজেডি নায়কের যোগ্যতা অর্জন করিয়াছেন।* তৃতীয়তঃ

—সিরাজের ভাগ্য বিপর্যয়ের জন্য সিরাজের কোন দায়িত্ব আছে কি না এই প্রশ্নের আলোচনা করা যাউক। দায়িত্ব সম্পর্কে পূর্বে যে আলোচনা করা হইয়াছে তাহাতে দেখা গিয়াছে—innocent person'ও নায়ক হইতে পারে। এখানে অবশ্য সে কথা উঠে না। সিরাজ চরিত্রে যেমন দেখান হইয়াছে—অন্তর্নিহিত দুর্বলতা (frailty) তেমনি পাওয়া যায়—'error of judgment' বা বিচার ভ্রান্তি।

আলিবর্দী বেগমের মুখে যেমন শোনা যায়—

"ভালমন্দ না করি বিচার,
যেই কায যেইক্ষণে উঠে তব মনে
সেই কার্য সেই দণ্ডে কর সমাধান।"

তেমনি সিরাজের নিজের মুখেও শুন...... "দাদামহ, কেন ক্রোধ দমন করতে শিক্ষা দান নাই। এই ক্রোধেই আমার মনোভাব ব্যক্ত করে।" এই স্বভাবের বশেই, সিরাজ জগৎশেঠের গণ্ডদেশে চপেটাঘাত করেন, মীরজাফর প্রভৃতিকে কটুকথা বলেন তথা শত্রুর ষড়যন্ত্রকে ত্বরিত করিয়া তুলেন—এই স্বভাবের ফলেই সিরাজ ক্রোধের বশীভূত হয়ে ওয়াটসকে অপমান করেন এবং শেষ পর্যন্ত যাহাদের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হন সেই ইংরেজের প্রতি বিরূপ আচরণ করিতে ইতস্ততঃ করেন না। স্বভাবের এই ত্রুটির জন্যই সিরাজের ঘরে বাইরে যে সকল শত্রু ছিল, দলবদ্ধভাবে সিরাজের বিরুদ্ধতা করিতে অগ্রসর হয়। তারপর 'error of judgment"-ও সিরাজ কম করেন নাই। 'কুটিলতা কুটীল না বরিবে বজন' —জানিয়াও যাঁহাদের "হাসি পাশে লুক্কায়িত অসি' সেই সব কৃষ্ণসর্প অমাত্যদের গৃহে স্থান দিয়াছেন, অবশ্য অবস্থাচক্রে দিতে বাধ্য হইয়াছেন। করিমচাচা ভ্রান্তিটা ঠিকই ধরিয়াছে "নবাব মদ ছেড়ে খালি ভাবছেন এ করি কি ও করি [হ্যামলেটের মত—To be or not to be ?]। এই দু'নৌকায় পা দিয়েই প্যাঁচে পড়েছে।........ "রোক করে হুকুম ঝাড়লে ধরপ্যাঁচ ওয়ার্

যা হবার একটা হ'য়ে যেত…… …""রাগে দু'কথা বলে, আবার বাড়ী বাড়ী গিয়ে পায়ে ধ'রে সাধে এই দু'নৌকায় পা দিয়েই ছোঁড়া মজতে ব'সেছে। যদি তোরয়া হয়েই চ'লতো, যাহোক চোটপাট একদিক দিয়ে এক রকম হয়ে যেতো।" বাস্তবিক সিরাজদ্দৌলা মীরজাফর প্রভৃতির সহিত ব্যবহারে বেশী একটু কড়া হইলেই, ষড়যন্ত্রের বীজ অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইত। অন্ততঃ পলাশীতে যে মীরজাফর প্রভৃতি দেশদ্রোহীরা যুদ্ধের অভিনয় করিবার অবকাশ পাইত না—এ কথাটি বলা যায়। সিরাজদ্দৌলার শোচনীয় ভাগ্য-বিপর্যয়ের মূলে—error of judgment-এর ক্রিয়া গণনা নহে—এই কথাই বলা সমীচীন যে, অন্তর্নিহিত দুর্বলতা অপেক্ষা বিচার-ভ্রান্তিই অধিকতর দায়ী। "অন্তরের ছুরী কাহারও লুকান থাকে না" জানা সত্ত্বেও, কপট ও লোভী মীরজাফরের সম্মুখে বক্ষদেশ উন্মুক্ত করিয়া দিয়া সিরাজ নিজের দুর্বিপাককে নিজেই যেন ডাকিয়া আনিয়াছেন। অবশ্যই বলা যাইতে পারে—মহম্মদীবেগ যে কৃপাণ দ্বারা সিরাজকে হত্যা করে, মীরজাফরের কোষাগারের মধ্যেই তাহা লুক্কায়িত ছিল।

তারপর আলোচনা করা যাক ক্রিয়াতত্ত্বের তৃতীয় (action) রূপটিকে। ক্রিয়াতত্ত্বের সার রূপ আসল পরিস্থিতির সহিত নায়কের বুঝা-পড়ার চেষ্টার দিক। যেখানে নায়ক পরিবেষ্টনীর প্রতিকূলতা ও সঙ্কট (crisis) এড়াইবার জন্য দৈহিক মানসিক উদ্যম করেন সেখানে নায়ককে বলা হয় ক্রিয়াশীল আর যেখানে নায়ক পরিবেশের নাগপাশ বন্ধনে নিরুপায়ভাবে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় দুঃখদুর্ভোগের অতল আবর্তে ডুবিতে থাকেন এবং হাহাকার বা আর্তনাদ করিতে থাকেন অথবা পরিবেশ হইতে মর্মান্তিক আঘাত খাইয়া কর্মোদ্যমের অবকাশ থাকিলেও, অন্তরাত্মার অভিমান হারাইবার বেদনায় হাল ছাড়িয়া দিয়া, আত্মপীড়ন করিতে করিতে নিজেকে সর্বতোভাবে নিঃশেষ করিতে থাকেন, সেখানে নায়ককে বলা হয়—নিষ্ক্রিয়। বিখ্যাত সমালোচক ব্রুণেতিয়ের ক্রিয়াশীলতা বলিতে যদিও striving towards

a goal"-এর প্রতিই ঝোঁক দিয়াছেন এবং ইহাই বলিতে চাহিয়াছেন যে নাটকে আসলে ব্যক্তি-এষণাকেই (will) বিশেষ পরিস্থিতির সহিত সংগ্রাম করিতে দেখি এবং এই সংগ্রাম "conflict" সেখানেই তীব্রতর যেখানে যেমন পরিস্থিতির প্রতিকূলতা তেমন নায়কের উদ্যম, উভয়ই জোরালো। যে নাটকে এষণা (will) সংগ্রাম করিতে করিতে শেষপর্যন্ত ভেঙ্গে না অভেদ্য পরিবেশের কাছে বিনত হইয়া যায় সেই নাটকই ট্র্যাজেডি। অবশ্যই মনে রাখিতে হইবে—'ব্রুনেতিয়েরের ক্রিয়াশীলতার লক্ষণটি কোন কোন ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইতেও, সর্বক্ষেত্রে যে সুপ্রযুক্ত নহে উইলিয়াম আর্চার তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং ব্রুনেতিয়ের-মতে নিষ্ক্রিয় ব্যক্তিও ট্র্যাজেডির নায়ক হইয়াছে তাহা দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন। যাহা হউক—এ ক্ষেত্রে আমাদের আর অধিক দূর অগ্রসর হইবার প্রয়োজন নাই।

সিরাজদ্দৌলা নাটকে সিরাজদ্দৌলা যে 'up against something'-এ বিষয়ে সন্দেহ নাই এবং যে যে পরিস্থিতির বিরুদ্ধে তিনি সংগ্রাম করিয়াছেন, তাহা যে ট্র্যাজেডি-যোগ্য পরিস্থিতির মতই, চক্রিল ও দুর্ভেদ্য ব্যূহবিশেষ তাহাও স্বীকার করিতে হইবে। ট্র্যাজেডির পরিস্থিতি সম্বন্ধে যে 'inescapability-র কথা বলা হয়, তাহা এই পরিস্থিতিতে আছে। একদিকে রাজবল্লভ, জগৎশেঠ মীরজাফর, ঘসেটি-বেগম এবং অন্যদিকে সওকৎজঙ্গ এবং ফিরিঙ্গি বণিকদল মিলিয়া যে ষড়যন্ত্রের বলয় রচনা করে তাহার বিরুদ্ধে না দাঁড়াইলে যেমন মৃত্যু আবার দাঁড়াইলেও—"পলাশী এবং মহম্মদী-বেগের তরবারীর নিষ্ঠুর আঘাত।" সিরাজদ্দৌলা-নাটকের পরিস্থিতি-বিন্যাসে এই অপরিহার্য বেষ্টনী সৃষ্টি করা হইয়াছে—এ কথা বলা যাইতে পারে। ঐতিহাসিক তথ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেও দেখা যায় ঘসেটির ষড়যন্ত্রের ঘাঁটি ভাঙিবার পরেই সওকৎজঙ্গ-সমস্যা দেখা দেয়, সেই সমস্যা আপাতত মিটিতে না মিটিতেই ইংরেজবণিক-সমস্যা ঘোরালো হইয়া উঠে। এই সব সমস্যার সমাধান না করিলেই নহে অথচ করিতে যাওয়ার পরিণতি—ঘরে-বাইরে শত্রু-শিবির সৃষ্টি করা— বিশ্বাসঘাতক-

দিগের চক্রান্তের কাছে অগত্যা আত্মসমর্পণ করা তথা নিজের শোচনীয় শেষ-পরিণতির দিকেই ধাপে ধাপে অগ্রসর হওয়া।

মতিঝিলের ষড়যন্ত্র-ঘাঁটি আক্রমণের পর হইতে মহম্মদীবেগের তরবারীর তলে শির বাড়াইয়া দেওয়া পর্যন্ত ইতিহাসের এবং নাটকের উভয় সিরাজই অনিবার্য ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হইতে শোচনীয় ভাগ্য-বিপর্যয়ে ও মর্মন্তুদ পরিণতিতে গিয়া পৌঁছিয়াছেন।

পরিস্থিতির মধ্যে এইরূপ **অনিবার্যতা** থাকায়—নায়কের সংগ্রামের রূপে একটা 'sight of a lossing struggle'র দৃশ্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। ট্র্যাজেডি-সংবিতের 'বোধ' 'অংশে-নিরুপায় ও নিষ্ফল সংগ্রামের' ধারণা—এবং নায়কের দুঃখদুর্দশা-দুর্ভোগ যে সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত নহে এইরূপ একটা বিশ্বাস আবশ্যক। সিরাজদ্দৌলার কর্ম-প্রচেষ্টায় sight of a lossing struggle'র রূপটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। পরিস্থিতিজনিত সঙ্কট হইতে মুক্তি পাইবার জন্ত সিরাজ যে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাতে তাহার সঙ্কট কমে তো নাই-ই বরং আরো জটিল ও ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছে। মীরজাফর, জগৎশেঠ প্রভৃতির স্বরূপ জানিয়াও অবস্থাগতিকে বার বার তাহাদের কাছে আত্মসমর্পণ করিতে হইয়াছে। এই নিরুপায় আত্মসমর্পণই তাহাকে শত্রুর ষড়যন্ত্রের কাছে বেশী করিয়া উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে। সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়া সিরাজ নিষ্কৃতিলাভের যে উপায় অগত্যা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা এক হিসাবে যেমন খুবই সঙ্গত বা স্বাভাবিক হইয়াছে তেমনি তাহাই সিরাজকে সঙ্কট-আবর্তের গভীরতর তলে টানিয়া লইয়া গিয়াছে।

এইরূপ অবস্থার মধ্যে যে নিরুপায়তা রহিয়াছে, ট্র্যাজেডি-সংবিতের তাহা অন্যতম ও প্রধান উপাদান। সিরাজদ্দৌলা নাটকে এই উপাদানটি বিশেষভাবেই বর্তমান। সুতরাং বলা যায় ট্র্যাজিক ইম্প্রেশনের মনস্তাত্ত্বিক সর্তটি এখানে পূরণ করা হইয়াছে। * তারপর—নাটকের পরিণতিও 'unhappy-ending-র ট্র্যাজেডির মত বিষাদময়।

সুতরাং বাহ্য-লক্ষণের দিক দিয়া, সিরাজদ্দৌলার ট্র্যাজেডিত্ব অস্বীকার করিবার কোন উপায় নাই। এখন প্রশ্ন—ট্র্যাজেডির প্রাণপ্রাচুর্য ও মনস্বতা নাটকে আছে কি না? অন্যভাবে বলিলে—নাটকখানি মেলোড্রামার স্তর অতিক্রম করিতে সক্ষম হইয়াছে কি না। এই প্রশ্নের আলোচনার প্রথমেই 'নাট্যসাহিত্যের আলোচনা ও নাটকবিচার—গ্রন্থের (দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম সংস্করণের) ভূমিকায় ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন তাহা স্মরণ করিতে চাহি—ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন "সুতরাং কারণের দিকে খুব বেশী ঝোঁক না দিয়া নায়কের আচরণের উপর তাহাদের প্রতিক্রিয়াটি বিবেচনা করিলে প্রশ্নের মীমাংসা সহজ হইতে পারে। * আমাদের দেখিতে হইবে যে যে দিক দিয়াই নায়কের জীবনে দুর্দৈবের অভিঘাত প্রবেশ করুক না কেন তাহার আচরণে উপযুক্ত মর্যাদা বোধ, ভাব-গভীরতা ও চরিত্রের মহনীয়তার নিদর্শন স্ফুরিত হইয়াছে কি না।" উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য—কারণ বাহ্য লক্ষণ যাহাই থাকুক শেষ পর্যন্ত ট্র্যাজেডি-সংবিদ (Tragic impression) হয় কি না সেইটাই তো বড় কথা। অবশ্য "ট্র্যাজিক ইম্প্রেশন" নিরালম্ব কোন কিছু নহে। নায়কের ঐকান্তিকতা সংগ্রাম ও লক্ষ্যের মহত্ত্বের সহিত উহার নিবিড় সম্পর্ক রহিয়াছে। আদর্শ বা লক্ষ্য যেখানে মহৎ, সংগ্রাম সেখানে ঐকান্তিক এবং ভাগ্য বিপর্যয় বা পরিণতি যেখানে শোচনীয়, সেখানে বাহ্য লক্ষণের খুঁটিনাটি অপূর্ণতা থাকিলেও,—ঘটনার ছোটখাট মেলোড্রামা সুলভ অবাস্তব আকস্মিকতা ও রোমাঞ্চকরতা থাকিলেও,—নাটককে ট্র্যাজেডির মর্যাদাই দেওয়া বাঞ্ছনীয়। শাস্ত্রকারগণও সেই কথাই বলিয়াছেন—যেখানে merely physical"-এর সীমা পার হইয়া—"inner quality"-এর স্তরে উন্নীত হয় সেখানে আর নাটককে মেলোড্রামা বলা চলে না। এই "inner quality"—মানে—"opposed to merely physical".

সিরাজদ্দৌলা-নাটকের "ideational value"র প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই দেখা যাইবে—নায়ক সিরাজদ্দৌলাকে নাট্যকার আলিবর্দী-দৌহিত্রের সংকীর্ণ

সত্তার গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ রাখেন নাই—ব্যক্তিগত স্বার্থরক্ষায় তথা সিংহাসন রক্ষার পরিধির মধ্যেই তাঁহার সংগ্রামের আদর্শকে সীমাবদ্ধ করিয়া দেন নাই, সিরাজদ্দৌলাকে তিনি বাংলার শেষ সংগ্রামী স্বাধীননবাবের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন তথা সমগ্র বাঙালী জাতির রাষ্ট্র-প্রতিনিধি হিসাবেই দাঁড করাইয়াছেন। ব্যক্তি-স্বার্থ সিদ্ধ করাই সিরাজ-জীবনের উদ্দেশ্য নহে, সিরাজের উদ্দেশ্য 'ফরিঙ্গি'দিগের গ্রাস হইতে বাঙলার তথা দেশের স্বাধীনতাকে রক্ষা করা, এই জন্য সিরাজ "বিশেষ" হইয়াও নির্বিশেষ। অধ্যাপক নিকল Abraham Lincon সম্বন্ধে যে কথাটি বলিয়াছেন তাহারই পুনরাবৃত্তি করিয়া বলা চলে—সিরাজ—"is a force symbolized in a man"। এখানেও—"a desire n the part of the dramatist to soften the sense of independent individuality"—বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। বাস্তবক ব্যক্তি এখানে সাধারণীকৃত। ব্যক্তি-সিরাজ যেন অভিধামাত্র আর নবজাতীয়তাবাদী সিরাজ, ফিরঙ্গি বিদ্বেষী সিরাজ, দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সর্বস্ব এমন কি সিংহাসন ত্যাগ করিতে প্রস্তুত—সিরাজ যেন ব্যঞ্জনা। এই কারণেই সিরাজের আবেগ, সঙ্কট ও সংগ্রাম ও ভাগ্যবিপর্যয়, ব্যক্তি-সিরাজের মধ্যে আর সীমাবদ্ধ থাকে নাই—হিন্দু মুসলমানের দেশ সমগ্র বাঙলার তথা ভারতের আবেগ-সঙ্কট-সংগ্রাম-ভাগ্যবিপর্যয় হইবার মহিমা লাভ করিয়াছে।

সিরাজ যে—"a force symbolized in a man"—নিম্নলিখিত উক্তিগুলি তাহার প্রমাণ—(ক "হে অমাত্যগণ! আমায় শত্রু বিবেচনা করবেন না। যদি সত্যই শত্রু হই, আমি আপনাদের শত্রু, বাঙলার শত্রু নই… হিন্দু মুসলমান একস্বার্থে বাঙলায় আবদ্ধ…যদি আমার প্রতি বিদ্বেষ পরিত্যাগ না করেন পূর্ণিয়ার সওকৎজঙ্গের সঙ্গে যোগদান করুন কিংবা বিদ্রোহীর ধ্বজা উড্ডীন করে যোগ্যজনকে সিংহাসন প্রদান করুন। কিন্তু স্থির জানবেন, ফিরিঙ্গি বাঙলায় দুশমন (প্রথম অঙ্ক-৫ম গর্ভাঙ্ক)।

(খ) সিংহাসনে হয় যদি সকত স্থাপিত
বাঙলায় বঙ্গবাসী হইবে নবাব।
কিন্তু সাবধান
নাহি দিও ফিরিঙ্গিরে সূচ-অগ্র স্থান
বঙ্গের সন্তান—হিন্দু মুসলমান
বাঙ্গলার সাধহ কল্যাণ,
তোমা সবাকার যাহে বংশধরগণ
নাহি হয় ফিরিঙ্গি-নফর

| বাংলার স্বাধীনতা ও ফিরিঙ্গি বিদ্বেষ |

(নবজাতীয়তা-মূলক)

—(১মঅঃ—৫ম গর্ভাঙ্ক)

(গ) "যে হিন্দু বা মুসলমান স্বার্থচালিত হ'য়ে স্বদেশের প্রতি ঈর্ষায় বিদেশীর আশ্রয় গ্রহণ করে সে কুলাঙ্গার। মাতৃভূমির কলঙ্ক। তার জীবন ঘৃণিত।... ("স্বদেশপ্রাণতা" ...১অ—১১শ গর্ভাঙ্ক।

(ঘ) "যদি কখনও সুদিন হয়, যদি কখনও জন্মভূমির অনুরাগে হিন্দু-মুসলমান ধর্মবিদ্বেষ পরিত্যাগ করে পরস্পর পরস্পরের মঙ্গলসাধনে প্রবৃত্ত হয়, উচ্চ স্বার্থে চালিত হ'য়ে সাধারণের মঙ্গল যদি আপন মঙ্গলের সহিত বিজড়িত জ্ঞান করে...যদি সাধারণ শত্রুর প্রতি খড়্গহস্ত হয়—এই দুর্দম ফিরিঙ্গি দমন তখন সম্ভব, নচেৎ অভাগিণী বঙ্গমাতার পরাধীনতা অনিবার্য।"

উল্লিখিত উক্তিগুলির মধ্যে সিরাজের যে ব্যক্তিত্ব—আদর্শবাদিতা ও সংকল্প প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে সিরাজকে যথার্থই—'a force symbolized in a man' বলিয়া গ্রহণ করা যায়। এই ভাবরাজি সিরাজের সূক্ষ্ম শরীর বা আত্মা এবং এই কারণেই সিরাজদ্দৌলা-নাটক শুধু ঐতিহাসিক ঘটনার উপস্থাপনা মাত্রে পর্যবসিত হয় নাই—জাতির বাসনা, কামনা, নবজাতীয়তা আদর্শকে রূপায়িত করিয়া, জাতীয়-জীবনের গভীর উপলব্ধির কাব্য হইয়া উঠিয়াছে। নাট্যকার শুধু যে সিরাজ-চরিত্রের মাধ্যমেই এই জাতীয় চৈতন্য বা ভাব সত্যকে ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা নহে, মীরমদন-মোহনলাল করিমচাচা

প্রভৃতি চরিত্রকেও মাধ্যম করিয়া সমগ্র নাটকের মধ্যে সিরাজের আদর্শকেই নানা মুখে ব্যাখ্যা ও ঘোষণা করিয়াছেন। সংক্ষেপে বলা চলে—সিরাজদ্দৌলা নাটকে ঘটনা-বিন্যাস কৌতূহল-রসেই শেষ হয় নাই—ঘটনা-বিন্যাসের মধ্য দিয়া গভীরতর ভাবাদর্শ অভিব্যঞ্জিত হইয়াছে। এই ব্যঞ্জনার মধ্যেই নাটকখানির ভাবিক সার্বজনীনতা নিহিত আছে। অবশ্য সার্বজনীনতাও যে আপেক্ষিক এবং উহার মধ্যেও যে স্তর-বিভাগ সম্ভব তাহাও মনে রাখা দরকার। যে ট্র্যাজেডিতে মানুষকে পরাতত্ত্বের (metaphysical) পটভূমিতে দাঁড করাইয়া মানব জীবনের আধ্যাত্মিক দ্বন্দ্বকে রূপ দেওয়া হয়, সেই ট্র্যাজেডির সার্বজনীনতা এবং একখানি সামাজিক, ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক ট্র্যাজেডির সার্বজনীনতা সর্বতোভাবে একরূপ হইবে ইহা প্রত্যাশা করা অন্যায়। ভাবের সার্বজনীনতার পরিধির অনুপাতে শিল্পের সার্বজনীনতার রস ফুটিয়া উঠে এবং ভাবকে যত তীব্র ও গভীরভাবে রূপ দেওয়া যায় তত সৃষ্টির সংবেদন-শক্তির তথা রসোত্তীর্ণতার মাত্রা বৃদ্ধি পায়।

এইবার আমরা সিরাজদ্দৌলা-নাটক সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে চেষ্টা করি। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে—ট্র্যাজেডি-নায়কের বংশ, কীর্তি, ক্রিয়াতৎপরতা, দায়িত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে আপত্তি করবার মত কিছুই নাই। দ্বিতীয়তঃ ইহাও প্রমাণ করা হইয়াছে যে নাটকখানি অর্থ-গৌরবের দিক দিয়াও নিঃস্ব বা দীন নহে এবং অর্থ গৌরবের জন্য সিরাজ— "a force symbolized in a man"। প্রশ্ন এবং শেষ প্রশ্ন—রসোত্তীর্ণতার মাত্রা সম্বন্ধে। যে পরিমাণ রসনিষ্পত্তি ঘটিলে রচনা রসসাহিত্যের মর্যাদা পায় তাহা সিরাজদ্দৌলা নাটকে অবশ্যই ঘটিয়াছে, তবে ইহাও অবশ্য স্বীকার্য—শিল্পকর্মের দৈন্য নাটকে আছে এবং **প্রথম শ্রেণীর ট্র্যাজেডির রসগাঢ়তা বলিতে যেরূপ চমৎকারিত্ব বুঝায় তাহা এখানে নাই।** নাট্যকার ভূমিকাতেই সবিনয়ে তাহা স্বীকার করিয়াছেন এবং নিজের বাধা ও অসুবিধার কথা নিবেদন করিয়াছেন (ভূমিকা দ্রষ্টব্য)। সুতরাং "সিরাজদ্দৌলা" উচ্চাঙ্গের শিল্পকর্ম না হইলেও ট্র্যাজেডির তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার যোগ্যতা উহার আছে। এই প্রসঙ্গেই মনে রাখা দরকার বড় ট্র্যাজেডি না হইলেই যে ড্রামা মেলোড্রামা হইবে এমন কোন কথা নাই। **সিরাজদ্দৌলা উচ্চাঙ্গের ট্র্যাজেডি নহে এ কথা যত সত্য, তত সত্য এই সিদ্ধান্তটি যে সিরাজদ্দৌলা 'মেলোড্রামা' নহে।**

বিচার

(ক) গঠন

* বৃত্ত বন্ধ বা কাহিনী যোজনা

বৃত্তবন্ধ বা কাহিনী সংগঠন-বিষয়ক আলোচনাকে আমরা মোটামুটি নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করিয়া লইতে পারি :—

(ক) কাহিনীর গঠন **সরল** (simple) কিংবা **জটিল** (complex)। *[অবশ্য সরল-জটিল বলিতে এখানে এরিষ্টটল-কথিত লক্ষণই ধরা হইতেছে—*জটিল কাহিনী তাহাই যেখানে ঘটনা-বিপর্যাস (reversal of situation) এবং অভিজ্ঞান-মূলক আবিষ্কারের (Discovery) ব্যাপার থাকে, আর সরল কাহিনী ইহার বিপরীত—উহাতে ঘটনা ক্রমান্বয়ে ঘটিয়া যায়—ঘটনার পরাবৃত্তি থাকে না।]

(খ) কাহিনী **একক** অথবা **যৌগিক** (সাবপ্লটযুক্ত) [ক্লাসিকাল বা রোমান্টিক—এই বিচারেই অংশ] সিরাজদ্দৌলা নাটকের ক্ষেত্রে দেখা যায়—বৃত্তটি (নির্দ্ধারিত অর্থে) 'জটিল' নহে—সরল অর্থাৎ নাটকের ঘটনা-বিন্যাসে পরাবৃত্তির (regression) কোন ব্যাপার নাই ; ঘটনা ক্রম-পরম্পরিত (progressive)। একটি বিশেষ কালে ঘটনার আরম্ভ এবং পর পর যে ভাবে ঘটনা ঘটিয়াছে, সেইরূপ ক্রমান্বয়ে সংবিন্যস্ত হইয়াছে। তারপর—'খ'—সূত্রের দিক দিয়া দেখিলে কাহিনীটি যৌগিক। সিরাজদ্দৌলার জীবনে 'পনের মাসের' নবাবীতে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহাদের একটি ব্যক্তি-এককতার সূত্রে গ্রথিত করা হইয়াছে। এখন, 'প্রধান কাহিনী' ও উপকাহিনীর হিসাব-নিকাশ করিতে গেলে দেখা যায়—সিরাজদ্দৌলার কাহিনীর সহিত ঘসেটি-বেগম সওকৎজঙ্গ, রাজবল্লভ-কৃষ্ণবল্লভ, জগৎশেঠ-উমিচাঁদ—ইংরেজ বণিক ও ফরাসী বণিক-সম্প্রদায়ের ক্রিয়াকলাপ প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত।

ইহাদের ক্রিয়াকলাপ সিরাজ-কাহিনীর অপরিহার্য উপাদান। সুতরাং প্রধান কাহিনীরই অঙ্গ। আমরা দেখি—প্রধান কাহিনীর ঘটনাধারা—ঘসেটি-বেগমের ষড়যন্ত্রঘাঁটি মতিঝিল আক্রমণ—মীরজাফর, রায়দুর্লভ প্রভৃতির পদচ্যুতি ও পুনর্বহাল—সওকৎজঙ্গের বিরুদ্ধে অভিযান—রাজমহল হইতে প্রত্যাবর্তন কলিকাতা আক্রমণ ও কলিকাতা জয়—কৃষ্ণবল্লভকে ক্ষমা—সওকৎজঙ্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও যুদ্ধে জয়লাভ, কলিকাতা পুনরুদ্ধারের ব্যর্থ চেষ্টা ও ইংরেজের সহিত সন্ধি…ইংরেজের সন্ধি ভঙ্গ-করা—সিরাজের ক্রোধ ইংরেজের বিরুদ্ধে অভিযান…পলাশীতে পরাজয়—পলায়ন—বন্দীদশা—মহম্মদীবেগের তরবারি আঘাতে শোচনীয় মৃত্যু। এই সকল ঘটনা বাদ দিয়া সিরাজের কাহিনী গঠন করা সম্ভব নহে এবং সেই দিক দিয়া বলা যায় যে **সিরাজ-কাহিনী স্বরূপতই যৌগিক**…বহুপক্ষীয় ঘটনার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সমবায়ে উহা গঠিত। কিন্তু প্রশ্ন এই যে **"পক্ষের"** অবতারণা বা বিস্তারকে আমরা উপকাহিনী-যোজনা বলিতে পারি কি না? একাধিক বৃত্তান্ত লইয়া 'সিরাজের' বৃত্তান্ত সম্পূর্ণ। সেদিক দিয়া ঘসেটি-বৃত্তান্ত, সওকৎজঙ্গ-বৃত্তান্ত, রাজবল্লভ-কৃষ্ণবল্লভ-বৃত্তান্ত, মীরজাফর-বৃত্তান্ত, জগৎশেঠ-মাণিকচাঁদ-বৃত্তান্ত, ইংরেজবণিক-বৃত্তান্ত প্রভৃতি নানা বৃত্তান্তের সংযোগে সিরাজ-বৃত্তান্ত যৌগিক। কিন্তু উপকাহিনী (sub-plot) কথাটি একটু বিশেষ অর্থেই প্রয়োগ করা হইয়া থাকে।

যেখানে পারিপার্শ্বিক পাত্র-পাত্রীকে প্রধান বা কেন্দ্রীয় চরিত্রের সহায়কমাত্র করিয়াই ছাড়িয়া দেওয়া হয় না, তাহাদের চরিত্র-বিকাশের জন্য স্বতন্ত্র একটা কক্ষ-পথে বিবর্তিত করা হয়—তাহাদের কেন্দ্র করিয়া ছোটখাটো কাহিনীর উপবৃত্ত রচনা করা হয়, সেখানেই "উপকাহিনী"র সৃষ্টি হয়। সেই হিসাবে—সিরাজদ্দৌলায় [বিদেশী বণিক পক্ষের এবং স্বদেশী ষড়যন্ত্রকারীদের কথা বাদে] 'জহরা-কাহিনী' এবং 'করিমচাচা' কাহিনীকে—আমরা 'উপকাহিনী'র মর্যাদা দিতে পারি। ঘসেটি-বৃত্তান্তের সহিত জহরা-উপকাহিনীর যোগ থাকিলেও

উহা স্বতন্ত্র এবং করিমচাচা অনেকটা পার্শ্বচরিত্র হইলেও উপকাহিনীর মতই একটা ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্য লইয়া বিরাজ করিয়াছে। জহুরা-কাহিনীর উৎস (হোসেনকুলির স্ত্রী) যাহাই হউক, কাহিনীটির অবতারণার প্রয়োজন যাহাই থাকুক, কাহিনীটি নাটকখানির নাটকীয়তা বৃদ্ধিতে সাহায্য করিলেও ঐতিহাসিক বাস্তবিকতার মাত্রা হ্রাস করিয়াছে। করিমচাচার– কাহিনী নাটকের সুন্দর ভাষ্য তথা নাটকের ভাব-গৌরবের সহায়ক হইয়াছে—এক কথায়, প্রশংসনীয় সংযোজনা।

সন্ধি-বিন্যাস

সিরাজদ্দৌলা নাটকের সন্ধি-বিন্যাস পর্যালোচনা করিবার আগে প্রথমেই নাটকের সূক্ষ্ম-শরীরটিকে—কাহিনীর পর্বগুলিকে—চোখের উপর রাখা দরকার; দেখা দরকার, নাট্যকার কেন্দ্রীয় চরিত্রটির এষণাকে (will) কোন্ পরিস্থিতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার জন্য প্রধানতঃ স্থাপিত করিয়াছেন। এখানে দেখা যায়—একটা ষড়যন্ত্রের ব্যূহের মধ্যে নায়ক দণ্ডায়মান। এই ব্যূহের কোন বৃত্তাংশ নায়কের কাছাকাছি, কোনটি একটু দূরে—ছদ্মরূপে অস্পষ্ট। এই ব্যূহ হইতে নিষ্ক্রমণের চেষ্টাই সিরাজের মুখ্য-সংগ্রাম! ইহার এক মুখ ভেদ করিতে যাইয়াই, ঘসেটির ষড়যন্ত্র ঘাঁটি ভঙ্গ করিতে গিয়াই—ঠাণ্ডা লড়াইয়ের পর্ব শেষ হয়—এবং গরম লড়াই শুরু হইয়া যায়। তবে সিরাজদ্দৌলা নাটকে যদিও আদ্যন্ত নায়কের সংগ্রামের রূপটি দেখান হইয়াছে, তবু নাটকে **নায়কের প্রধান সংগ্রাম ইংরেজ বণিকের বিরুদ্ধেই**। গোড়ার দিকে ঘসেটি ও সওকৎজঙ্গ প্রতিদ্বন্দ্বী বটে, কিন্তু মূল সঙ্কট বা সমস্যা সওকৎকে লইয়া নহে—ঘরশত্রুদের এবং ইংরেজ-বণিকের স্পর্দ্ধিত আচরণ লইয়াই। নাটকে ফিরিঙ্গি-শক্তিই সিরাজের প্রধান বাহ্য-পরিবেষ্টনী। ঘর-শত্রুরা শত্রু বটে কিন্তু বাঙলার স্বাধীনতার প্রধান শত্রু "ফিরিঙ্গি"; পূর্বেই বলা হইয়াছে—সিরাজদ্দৌলা নাটকের—ধ্রুবপদ "ফিরিঙ্গি বাঙলার দুশমন"; তাহারা সব—"বিদেশী দস্যু"। এই কারণেই নাটকে সন্ধি-বিভাগ প্রধানতঃ—ইংরেজ শক্তির সহিত বুঝাপড়াকে কেন্দ্র

করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে। এই দিক দিয়া দেখিলে—**প্রথম অঙ্কে**— ইংরেজকে শায়েস্তা করিবার জন্য সিরাজের কলিকাতা আক্রমণ, **দ্বিতীয় অঙ্কে**— ইংরেজের কলিকাতা পুনরধিকার সন্ধি প্রস্তাব… ষড়যন্ত্রকারী চক্রান্তে সন্ধি-পত্র-স্বাক্ষরে বিভ্রাট,—যুদ্ধ, নবাবের পরাজয় ও সন্ধি প্রস্তাব। **তৃতীয় অঙ্কে**— ইংরেজের ঔদ্ধত্যপূর্ণ পত্র—ফরাসী বিতাড়নের দাবী সিরাজের প্রতিক্রিয়া …কিন্তু শেষ পর্যন্ত পত্রের প্রস্তাব স্বীকার… মীরজাফরের সহিত ইংরেজের চুক্তি…ক্লাইভের যুদ্ধ-প্রস্তুতি **চতুর্থ… অঙ্কে** পলাশী যুদ্ধ ষড়যন্ত্রকারীদের বিশ্বাসঘাতকতায় সিরাজের পরাজয় - অগত্যা প্রাণরক্ষার জন্য পলায়ন… দানসাহ দরগাস…ধরাপড়া **পঞ্চম অঙ্কে** · সিরাজকে হত্যা করা. মুর্শিদাবাদে ক্লাইভের অভ্যর্থনা· ক্লাইভের আচরণে মীরজাফরের ক্ষোভ (ইংরেজের আধিপত্য সূচনা)। অবশ্য সিরাজদ্দৌলা কাহিনীর যৌগিকতার কথা ভুলিয়া গেলে চলিবে না—সিরাজদ্দৌলাকে একই সময়ে দুই সীমান্তে যুদ্ধ করিতে হইয়াছে—একদিকে গৃহশত্রুর বিরুদ্ধে, অন্যদিকে—বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে গৃহশত্রুর দলে—রাজবল্লভ রায়দুর্লভ উমিচাঁদ জগৎশেঠ প্রভৃতি হিন্দু প্রধানগণ ও মীরজাফর, বহিঃশত্রুর দলে—প্রথম প্রতিপক্ষ ঘসেটি, দ্বিতীয় প্রতিপক্ষ সওকৎ-জঙ্গ, তৃতীয় প্রতিপক্ষ - মীরজাফর-সহায় ইংরেজ। প্রথম অঙ্কেই সিরাজ— তিন পক্ষেরই সম্মুখীন; ঘসেটি ও সওকৎজঙ্গের পরে ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছে।

ঘসেটি দমন, সওকৎ-প্রশমন ও ইংরেজ দমনের পরে সওকতের বিরুদ্ধে যুদ্ধায়োজন… এতগুলি ঘটনা লইয়া নাটকের **মুখ সন্ধি**। ***প্রতিমুখ-সন্ধিতে** সওকৎজঙ্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ও জয়লাভের পরে- গৃহশত্রুর চক্রান্ত, ইংরেজের কলিকাতা-অধিকার সন্ধিপ্রস্তাব…সন্ধিপ্রস্তাবে চক্রান্তকারীদের বাধাদান—শেষ পর্যন্ত সিরাজের সন্ধি-প্রস্তাব স্বীকার · তথা ইংরেজের কাছে বেশ খানিকটা আত্মসমর্পণ ***গর্ভ-সন্ধিতে**.. সিরাজের কাছে ইংরাজের দম্ভপূর্ণ পত্র এবং পত্রে ফরাসীদিগকে বিতাড়িত করিবার জন্য প্রস্তাব…

সিরাজের ইংরাজ-বিরোধী তীব্র প্রতিক্রিয়া সত্ত্বেও শেষপর্যন্ত ষড়যন্ত্রকারীদের কুমন্ত্রণায়, ফরাসী-বিতাড়নে সম্মতি ..তথা নিরুপায় ভাবে ইংরেজের খপ্পরে যাইয়া পড়া ..ধৈর্য হারাইয়া সিরাজের জগৎশেঠ মীরজাফর প্রভৃতিকে তীব্র ভর্ৎসনা ··ষড়যন্ত্রের পরিণতি—মীরজাফরের ইংরেজকৃত চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করা ···সিরাজের শেষ error of judgment—বিষকুম্ভ মীরজাফরের কাছে আত্মসমর্পণ, কপট মীরজাফরের কোরাণ স্পর্শের ভণ্ডামিতে বিশ্বাস। **বিমর্ষ সন্ধিতে** পলাশী-প্রান্তরে সিরাজের পরাজয়—ইংরাজের জয় এবং **উপসংহারে**—সিরাজের শোচনীয় ভাগ্য বিপর্যয় ও পরিণতি— ক্লাইভের-গদভ মীরজাফরের ক্লাইভের হাতেই অপমান—ইংরেজের মানদণ্ডের পরিণতি—বাঙলার তথা ভারতের স্বাধীনতা-সূর্যের অস্তগমন।

এই সন্ধি-বিভাগ অঙ্ক-বিভাগের সহিত এক হইয়া আছে। পাঁচ অঙ্কে—পাঁচটি সন্ধি প্রদর্শিত হইয়াছে তার বহুঘটনাকে একত্র করিতে যাইয়া প্রত্যেক অঙ্কে বহুসংখ্যক দৃশ্য যোজনা করিতে হইয়াছে। এক্ষেত্রের আলোচনায় নাট্যকারের নিবেদনটুকু অবশ্যই স্মরণীয়। "আলিবর্দীর সময় হইতে সিরাজদ্দৌলার শোচনীয় পরিণাম পর্যন্ত যে সকল স্বার্থচালিত ঝঞ্চাপূর্ণ ঘটনা প্রভাবে বঙ্গ-সিংহাসন আলোড়িত হইয়াছিল, তাহার সম্পূর্ণ চিত্র প্রদর্শন ব্যতীত সিরাজদ্দৌলা নাটক প্রস্ফুটিত হয় না।. সিরাজ চরিত্র লইয়া দুইখণ্ড নাটক লিখিলে প্রকৃত অবস্থা বর্ণিত হইতে পারিত।"

অঙ্ক ও দৃশ্য বিভাগ

প্রথম অঙ্কে অর্থাৎ মুখ-সন্ধিতে সিরাজদ্দৌলার নাগপাশ-সদৃশ জটিল পরিস্থিতিটিকে স্থাপিত করা হইয়াছে। **প্রথম গর্ভাঙ্কে** ঘসেটি-বেগম . রায়-দুর্লভ-মীরজাফর প্রভৃতির মনোভাব ও পদচ্যুতি। **দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে** আলিবর্দী বেগমের অনুরোধে শত্রুদের কাছে সিরাজের ক্ষমা-প্রার্থনা ও তাহাদিগকে পদাধিকারে পুনঃপ্রতিষ্ঠার কথা। **তৃতীয় গর্ভাঙ্কে**—সওকৎজঙ্গের ব্যাপারে সওকৎজঙ্গের সহিত মীরজাফরের ষড়যন্ত্র···**চতুর্থ গর্ভাঙ্কে**—

সিরাজের পারিবারিক জীবনের দৃশ্য এবং কাশীমবাজার কুঠি আক্রমণ, ওয়াটসের ও চেম্বার্সের বন্দীদশা ও মুক্তির পরোক্ষ উপস্থাপনা। **পঞ্চম গর্ভাঙ্কে** ...কলিকাতা আক্রমণের মন্ত্রণা ও উদ্যোগ...জগৎশেঠ মীরজাফর প্রভৃতির সহিত ইংরেজের গোপন সম্পর্ক (প্রজাপ্রাণ ও স্বজাতিবৎসল ও স্বাধীনতা-প্রাণ সিরাজের রূপ) **ষষ্ঠ গর্ভাঙ্কে**...ইংরেজের হস্তে কৃষ্ণদাস ও উমিচাঁদের লাঞ্ছনা। **সপ্তমে**...কলিকাতা আক্রমণের পরোক্ষ উপস্থাপনা। **অষ্টমে**.. ইংরেজের আতঙ্ক—কলিকাতা-যুদ্ধের রূপ। **নবমে**. 'হলওয়েল'-বন্দী। **দশমে** ইংরেজ জয়ী সিরাজের দরবার—সিরাজের হলওয়েল কৃষ্ণদাস প্রভৃতির সহিত উদার ব্যবহার। * (করিমচাচা চরিত্রটির অবতারণা) **একাদশে :**—সিরাজের বিরুদ্ধে জনসাধারণের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টির চেষ্টায় দানশার প্রয়োগ, দানশার বন্দীদশা, **দ্বাদশে** —* ("ব্লাকহোল" কাহিনীর খণ্ডন), দানশার নাসা-কর্ণচ্ছেদন, সওকৎজঙ্গের পত্র...দিল্লীর সনন্দ আনয়নে জগৎশেঠের কারসাজি. জগৎশেঠকে চপেটাঘাত করায় রায়দুর্লভ মীরজাফরের প্রতিবাদ. আলিবর্দী বেগমের অনুরোধে সকলের কাছে সিরাজের ক্ষমা প্রার্থনা ...আপাততঃ রোষ শান্তি এবং সওকৎজঙ্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার উদ্যোগ। এই অঙ্কে নাট্যকার শুধু পরিস্থিতি গড়িয়াই তুলিয়াছেন তাহা নহে—ভাবী ঘটনার সমস্ত বীজই স্থাপনা করিয়াছেন।

যে সকল রাজনৈতিক ঘটনা সিরাজের পরিস্থিতি বা পরিবেষ্টনী রচনা করিয়াছে এবং যাহারা সিরাজকে ক্রমে জটিলতর পরিবেষ্টনীর সম্মুখীন করিয়া তুলিয়াছে তাহাদের প্রত্যেকেই এখানে আছে। অধিকন্তু, ঘসেটিবেগমের "বিশ্বস্তা" দাসীর সাহায্যে ধন রত্ন অপসারণ এবং পরে ষড়যন্ত্রকে অর্থ-সাহায্যে পুষ্ট করার ইতিহাসটুকুকে রূপ দেওয়ার চেষ্টাও করিয়াছেন—"জহরা" চরিত্রে নাট্যকার "বিশ্বস্তা দাসী" এবং হোসেনকুলির স্ত্রীকে এক করিয়াছেন এবং গোড়াতেই জহরাকে উপস্থিত করিয়াছেন। তারপর দ্বিতীয় কাল্পনিক চরিত্র —করিমচাচাকে শেক্সপীয়রের "ফুল" ও "কমেন্টেটরের" মতই নাটকের

অপরাঙ্গ না হইলেও, ভাবের ভাষ্যকার হিসাবে অবিচ্ছেদ্য, সেও তাহার মূল সুর লইয়া এখানে উপস্থিত। তৃতীয়তঃ যে দানসা ফকির সিরাজকে নাক কাণ কাটার আক্রোশে ধরাইয়া দিয়াছে তাহাকেও রাষ্ট্রনৈতিক ঘটনার সহিত সংযুক্ত করিয়া দেখান হইয়াছে। মোট কথা পরবর্তী ঘটনার সম্ভাবনা প্রথম অঙ্কে স্বাভাবিকভাবেই সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। এই সন্নিবেশে শুধু যে ঘটনার দিকেই লক্ষ্য রাখা হইয়াছে তাহা নহে—নাটকের রস ও ভাব পরিমণ্ডলটির দিকেও দৃষ্টি নিবদ্ধ আছে। তবে এ কথা বলা যায়—নাট্যকারও স্বীকার করিয়াছেন দৃশ্যসংখ্যা কমানো সম্ভব। যেমন সপ্তম গর্ভাঙ্কটি (ষষ্ঠ ও অষ্টমকে নাট্যকার অভিনয় সংক্ষেপার্থে নিজেই বাদ দিয়াছেন) রসে ও রূপে খুবই হেয় এবং নিরর্থক।

দ্বিতীয় অঙ্কে—৮টি দৃশ্য। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দৃশ্যে যাহা উপস্থাপিত হইয়াছে তাহার জন্য দুইটি দৃশ্য যোজনার কোন প্রয়োজন নাই। ঘসেটি-জহরার ক্রিয়া-কলাপকে অনুচিত প্রাধান্য দিতে গিয়াই এই অপব্যয়ে নাট্যকার নিজেকে জড়াইয়া ফেলিয়াছেন। **তৃতীয় অঙ্কে**—৫টি দৃশ্য। দ্বিতীয়-গর্ভাঙ্কটি যথাক্রমে করিমচাচার স্পষ্টোচ্চারণে এবং মীরমদন-মোহনলালের ভাবোচ্ছ্বাসে এবং তৃতীয়টি জহরার ভাবোচ্ছ্বাসে বেশ খানিকটা আকাশস্থ হইয়া বাস্তবিকতার দিক দিয়া হাল্কা হইয়া পড়িয়াছে। **চতুর্থ অঙ্কে**—৬টি দৃশ্য। প্রথম দ্বিতীয়, তৃতীয় ও ষষ্ঠ দৃশ্যের গুরুত্ব জহরার অতিনাটকীয় কায়িক ও বাচনিক আচরণের সংযোগে বেশ খানিকটা কমিয়া গিয়াছে। **পঞ্চম অঙ্কে** ৭টি গর্ভাঙ্ক—প্রথম গর্ভাঙ্কটি অবান্তর না হইলেও অত্যাবশ্যক নহে। দ্বিতীয়টি—ওয়াটসের মুক্তির প্রস্তাবে ওয়াটস-পত্নীর সক্রিয় কৃতজ্ঞতা-কল্পনা। এই হিসাবে দৃশ্যটি কাহিনী কল্পনার দিক দিয়া একেবারে অনাবশ্যক নহে। তৃতীয় দৃশ্যে ওয়াটস-পত্নীর উদারতাকে অস্বাভাবিক না বলিলে অতিশয় বলিতেই হইবে। চতুর্থ গর্ভাঙ্ক—জহরার উপসংহার, বলা বাহুল্য অতিনাটকীয় পরিবর্তনে চমকপ্রদ উপসংহার। পঞ্চম গর্ভাঙ্কে—ক্লাইভের বিজয়-গর্বে মুর্শিদাবাদ দরবারে প্রবেশের উদ্যোগ এবং

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্কে—মুর্শিদাবাদে দরবার—নাটকের ভাব ব্যঞ্জনার পরিণতির দিক দিয়া অত্যাবশ্যক। সপ্তম গর্ভাঙ্কে—দৃশ্য দ্বারা করুণ সংবেদনা সঞ্চারের চেষ্টা—করুণ মূর্ছনায় নাটকের উপসংহার করা হইয়াছে।

এইবার গীতি-যোজনা-সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া গঠন-বিচার শেষ করা যাইতে পারে। নাটকে গান আছে প্রথম অঙ্কের চতুর্থ গর্ভাঙ্কে ১টি (উম্মৎ জহরার মুখে) সপ্তম গর্ভাঙ্কে—নাগরিকগণের মুখে ১টি, একাদশ গর্ভাঙ্কে—নাগরিকাগণের মুখে ১টি (মোট—৩টি), দ্বিতীয় অঙ্কে—প্রথম গর্ভাঙ্কে বন্দী-গণের মুখে ১টি, তৃতীয় গর্ভাঙ্কে—লুৎফউন্নিসার মুখে ১টি (মোট—২), তৃতীয় অঙ্কে দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে—নর্তকীগণের মুখে (মোট—১), চতুর্থ অঙ্কে—চতুর্থ গর্ভাঙ্কে লুৎফউন্নিসার মুখে ১ (মোট—১), পঞ্চম গর্ভাঙ্কে নাগরিকের মুখে এবং সপ্তম গর্ভাঙ্কে—লুৎফউন্নিসার মুখে। গীতি-যোজনা অধিকাংশ স্থলেই ঔচিত্য-বিরোধী হইয়াছে। প্রথম অঙ্কে উম্মৎজহরার ও নাগরিকগণের গীতি তিনটিই অনুচিত, দ্বিতীয় অঙ্কে গান দুইটি অস্বাভাবিক নহে; তৃতীয় অঙ্কের গানটিও অসঙ্গত মনে হয় না। চতুর্থ অঙ্কের লুৎফউন্নিসার গানটি যাত্রা-সুলভ। পঞ্চম গর্ভাঙ্কের গানটি অবস্থা-অনৌচিত্য দোষ দুষ্ট এবং লুৎফউন্নিসার শেষ গানটি—অস্বাভাবিক। লুৎফার শেষ গানটি সম্পর্কে নবীন সেন গিরিশচন্দ্রকে পত্রে লিখিয়াছিলেন—"আমি নবযুবক সিরাজের পত্নীর মুখে শোক সঙ্গীত প্রথম সংস্করণ 'পলাশীর যুদ্ধে' দিয়াছিলাম। শোকের সময় সঙ্গীত আসে কিনা বলিয়া সন্দেহের কথা বলিয়া বঙ্কিমবাবু বলিয়াছিলেন। সেই জন্য আমি সঙ্গীত পরে উঠাইয়া দিয়াছিলাম। তুমি চিরদিন গোঁয়ার। দেখিলাম, তুমি সেই সন্দিগ্ধ পথ অবলম্বন করিয়াছ।" গান সম্বন্ধে বঙ্কিম যে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন আমরাও তাহা করিতে পারি।

সুতরাং গঠন-বিচারের উপসংহারে আমরা এই কথা বলিতে পারি—অতিনাটকীয় ঘটনার সংস্পর্শে এবং অনুচিত গানের উচ্ছ্বাসে নাটকের গঠনটি অনৌচিত্য দোষ মুক্ত হইতে পারে নাই।

(খ) ক্রিয়া (Action)

কোন নাটকের ক্রিয়া-সামর্থ্য পরিমাপ করিবার আগে প্রথমেই দেখিয়া লইতে হইবে—নাটকের ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য বা প্রকৃতিটি কি। কারণ ক্রিয়া-সামর্থ্য আছে কি নাই তাহা হিসাব করিতে হইলে শেষ পর্যন্ত নাটকখানির ক্রিয়া-প্রকৃতিরই শরণ লইতে হইবে। যেরূপ ক্রিয়া-প্রকৃতি সেইরূপ ক্রিয়ার লক্ষণ। ক্রিয়া যেখানে আত্মিক বা মনস্তাত্ত্বিক, সেখানে নাটকের ক্রিয়া-সামর্থ্য বিচার করিতে আত্মিক বা মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়ার রূপটি হিসাব করিতে হইবে, আবার যেখানে ক্রিয়া পরিবেষ্টনীর বাধার এবং সেই বাধা অতিক্রম করিবার চেষ্টার মধ্যে নিহিত, সেখানে ক্রিয়া-সামর্থ্য বিচার করিবার সময় পরিবেষ্টনীর বাধার ভার ও জটিলতা এবং সেই বাধা অতিক্রমণের **চেষ্টার ঐকান্তিকতা** অবশ্যই হিসাব করিতে হইবে। নাটকে যে ক্রিয়ার প্রাধান্য ক্রিয়াপ্রাণতা পরীক্ষার সময় সেই ক্রিয়ার তীব্রতাই হিসাব করিয়া দেখা দরকার। অবশ্য এ কথাও মনে রাখা দরকার যে দ্বন্দ্ব যত গভীর হয়—বহির্দ্বন্দ্ব যেখানে অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে তথা অন্তর্দ্বন্দ্বকে মুখ্য স্থান ছাড়িয়া দিয়া নিজ গুণীভূত হইয়া থাকে সেখানে নাটকের ক্রিয়াপ্রাণতাও তীব্র ও গভীর হয়। তবে ইহাও স্মরণীয়—**যেখানে মহান কোন আদর্শের জন্য প্রতিকূল পরিবেষ্টনীর সহিত সংগ্রাম তীব্র আকারে প্রকাশ পায় অন্তর্দ্বন্দ্বের গভীরতা না থাকিলেও বহির্দ্বন্দ্বেই একটা মহত্ত্ব ফুটিয়া উঠিয়া থাকে।**

সঙ্গে সঙ্গে আর একটি কথাও মনে রাখা আবশ্যক—কথাটি এই যে 'ক্রিয়া' শব্দটিকে একটু ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়, এবং ব্যাপক অর্থে "ক্রিয়া" — **"চিত্তাকর্ষকত্ব"** অর্থাৎ দর্শকের চিত্তকে আকর্ষণ করিবার শক্তি।

এই আকর্ষণ শক্তি কোন স্থলে ঘটনায় বা পরিস্থিতিতে (situation) কোনস্থলে ভাবাবেগে (emotional intensity), কোনস্থলে...সংলাপে কোনস্থলে কল্পনায় ও ভাবনা গৌরবের মধ্যে নিহিত থাকে। **রসাস্বাদন এই সমস্ত বিশেষ বিশেষ সংবেদনার সামগ্রিক ফল। যতদিক হইতে**

মানুষের চিত্তকে 'চেতাইয়া' রাখা যায় ততটিই রস-সৃষ্টির উপায়… ততটিই আকর্ষণ-কেন্দ্র ইংরাজীতে যাহাকে বলা যায় 'interest'। ঘটনা-কৌতূহল, চরিত্র-রহস্য, আবেগের গভীর ও তীব্র সংবেদনা, সংলাপ-রস, অর্থ-গৌরব বা ভাব মহিমা, দৃশ্য চমৎকারিত্ব…সব কিছুই গোটা ক্রিয়া-সামর্থ্যে কিছু কিছু দান করিয়া থাকে। সব নাটকে একরকম ক্রিয়া বৈশিষ্ট্য খুঁজিতে যাওয়া যেমন ঠিক হইবে না, তেমনি একই নাটকে সব দৃশ্যেই একরূপ ক্রিয়ার প্রত্যাশা করিলেও হতাশ হইতে হইবে।

সিরাজদ্দৌলা নাটকের ক্রিয়া স্বরূপটিকে পর্যবেক্ষণ করিতে গেলে, দেখা যায়—নাটকের **ক্রিয়ার সাধারণ প্রকৃতিটি** বহির্দ্বন্দ্বাত্মক অর্থাৎ জটিল ষড়যন্ত্র বৃত্ত হইতে নিষ্ক্রমণের নিষ্ফল সংগ্রামের মধ্যে ক্রিয়া স্বরূপটি নিহিত। এই ষড়যন্ত্র সাধারণ ষড়যন্ত্র নহে—শুধু ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যক্তির ষড়যন্ত্র নহে, এই ষড়যন্ত্র বাংলার স্বাধীন নবাবের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহী কুচক্রীদের ষড়যন্ত্র… দেশের স্বাধীনতাকে বৈদেশিক শক্তির কাছে বিক্রয় করিবার ষড়যন্ত্র। * এই কারণেই এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে নায়কের সংগ্রাম বহির্দ্বন্দ্বাত্মক হওয়া সত্ত্বেও গুরুত্বপূর্ণ ও মহিমময়। নায়ককে ঘিরিয়া যে পরিমাণে আমাদের জাতি-অভিমান বর্তমান সেই পরিমাণে তাঁহার দ্বন্দ্বের প্রতি আমাদের কৌতূহল ও সম্ভ্রম এবং সেই পরিমাণেই তাঁহার নিষ্ফল সংগ্রামে সমবেদনা এবং পরিণতির জন্য শোচনা। তারপর—ক্রিয়ার বিশেষ বিবরণ দেওয়ার পূর্বে একটা কথা অবশ্যই স্মরণীয় এবং তাহা এই যে নাটকের ক্রিয়াপ্রাণতার পরিমাপ, অনেক স্থলেই সহৃদয়ের হৃদয়বত্তার উপর নির্ভর করিয়া থাকে।

নাটক রচনা-হিসাবে স্বরলিপি-বিশেষ। সুর-সংযোগ যেমন স্বরলিপি প্রাণবন্ত হইয়া উঠে…নাটকেরও তেমনি অভিনয়ের গুণে ক্রিয়াপ্রাণবত্তা প্রকাশ পায়। এক অভিনেতার কাছে যাহা ক্রিয়াহীন, অন্যের কাছে তাহাই ক্রিয়া-পূর্ণ—এইরূপ ঘটনা সর্বত্র এবং সর্বযুগেই দেখা যায়। ইবসেন, শেকভ, বার্ণাড

শ' প্রমুখ বিশ্ববিখ্যাত নাট্যকারগণের নাটকের প্রথম অভিনয়ের ইতিহাসে ইহার চমৎকার সাক্ষ্য পাওয়া যায়। "The plays of Anton Chekhov-এর (মডার্ণ লাইব্রেরী 'নিউ ইয়র্ক' প্রকাশিত) ভূমিকায় বিখ্যাত নট Eve Le Gallienne সুন্দর একটি কথা বলিয়াছেন... ."To express a truth you must have truth within yourself"। কথাটি বহুমূল্য। বড সত্যকে প্রকাশ করিতে হইলে অবশ্যই নিজের মধ্যে সত্যোপলব্ধি চাই। বাস্তবিক, নাটকের ক্রিয়াপ্রাণতা সহৃদয়ের সাক্ষাৎকার শক্তির উপর যে নির্ভর করে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সিরাজদ্দৌলা নাটকের 'action' বিচার করিবার সময়েও এ কথাটি মনে রাখা চাই।

সিরাজদ্দৌলা-নাটকের ভূমিকায় নাট্যকার বিনীতভাবে যাহা বলিয়াছেন তাহা স্মরণ করিয়া ক্রিয়াপ্রাণতার মাত্রা নিরূপণে অগ্রসর হওয়া যাইতেপারে। তিনি লিখিয়াছেন —"ঐতিহাসিক নাটকে ঐতিহাসিক ঘটনাবলী, শেক্‌সপিয়ারের লেখনী প্রসূত হইয়াও, অনেকের মতে স্থানে স্থানে নীরস হইয়া পড়িয়াছে। সে দোষ আমার থাকিবে না, ইহা আশা করা আমার পক্ষে বাতুলতা মাত্র।" নাট্যকারের এই স্বীকৃতিটুকু এবং শেক্‌সপীয়রের ঐতিহাসিক নাটক সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা অবশ্যই স্মরণীয়। এ কথা মিথ্যা নহে যে ইতিহাসের নীরস ঘটনা পরিবেশন করিতে যাইয়া নাটকের ক্রিয়াপ্রাণতা রক্ষা করিবার জন্য শেক্‌সপীয়রকেও অদ্ভুত অদ্ভুত চরিত্র এবং অবাস্তব কবি-কল্পনার আমদানী করিতে হইয়াছে—*"চতুর্থ হেনরী" নাটকখানি তাহার বড দৃষ্টান্ত হিসাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে। (* ফলষ্টাফ্-চরিত্রটি দ্রষ্টব্য)

সিরাজদ্দৌলা-নাটকে নাট্যকার ঐতিহাসিক ঘটনা উপস্থাপনায় যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। তিনি ঐতিহাসিক বিবরণকে মুখ্য উপস্থাপ্য না করিয়া রসের আনুষঙ্গিক করিবার জন্যই যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন অর্থাৎ ঐতিহাসিক ঘটনা বা তথ্যকে তিনি পাত্র-পাত্রীর ভাবাবেগ ও চরিত্র বৈশিষ্ট্যে" সহিত অবিচ্ছেদ্যযোগে যুক্ত করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ফলে নাট্যকারের

দিক হইতে ঐতিহাসিক বিবরণ শুনাইবার প্রত্যক্ষ চেষ্টা না থাকায় শ্রোতাদের পক্ষে নীরস বিবরণ শুনিবার ক্লান্তিও এখানে তেমন নাই। রসাস্বাদনের সহযোগেই তথ্য চেতনায় অনুপ্রবেশ করে মোট কথা ইতিহাসকে নাটক করিতে হইলে তথ্যের যে পরিমাণ রসায়ন অত্যাবশ্যক তাহা নাট্যকার প্রস্তুত করিতে পারিয়াছেন। **পরিস্থিতি, ঘটনা, চরিত্র, ভাবরস** নানা দিকেও কম বেশী কৌতূহল সৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন। ভাব-গত আকর্ষণের কথা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। পরিস্থিতি বা ঘটনা-গত আকর্ষণও কম নাই। দেখা যায়— দুই-একস্থলে ঘটনায় অতিনাটকীয় আকস্মিকতার চমকও দেখা দিয়াছে। চরিত্র রসের দিক দিয়া—বড় বড় গুরুগম্ভীর চরিত্র বাদ দিলে অহমার প্রতি হিংসাপরায়ণতা, করিমচাচার কমলাকান্তের মত নেশার ও রসিকতার অন্তরালে দার্শনিকতা ও স্বদেশপ্রাণতা, সওকৎজঙ্গের মাতলামি বাচালামি-ভরা অপদার্থতা, দানসার বাগ-বৈশিষ্ট্য—খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। বিশেষতঃ করিমচাচার আকর্ষণ অনস্বীকার্য। (* গিরিশচন্দ্রের 'করিমচাচা' অভিনয় নাকি অবিস্মরণীয় ব্যাপার)। ইহা ছাড়াও, নাটকের মূল বা অঙ্গীরসের আবেদনও কম জোরালো নহে। শেষের দিকের করুণরসের আকর্ষণের মাত্রাও উপেক্ষণীয় বলা যায় না।

এই প্রসঙ্গেই নাটকের রস, চরিত্র, কল্পনা, ভাবনা প্রভৃতির মূল্যের কথা উঠে। সুতরাং এখানেই আমরা উহাদের বিশেষ বিবরণ দিতে চেষ্টা করিতে পারি।

রস—মাত্রা

এই নাটকের অঙ্গীরস যে করুণ তাহা পুর্বেই বলা হইয়াছে। নাটকের নায়ক সিরাজদ্দৌলা এই রসের আলম্বন বিভাব। প্রথম দিকে ষড়যন্ত্রের নাগপাশ পরিবেশের সহিত নায়কের নিরুপায় নিষ্ফল সংগ্রাম, শেষের দিকে পরাজয়, ভাগ্য বিপর্যয় ও শোচনীয় পরিণতি। প্রথম দিকের সমবেদনা ও

অঙ্গী রস

শোচনা ক্রমে শোকের আকার ধারণ করিয়া থাকে। **চতুর্থ অঙ্ক—দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে** (পলাশী, নবাব শিবিরাভ্যন্তর) নৈরাশ্য ও আতঙ্কের

সঞ্চারিভাবের সাহায্যে, স্থায়িভাবটি বেশ বর্দ্ধিত হয়। তারপর, মীরমদনের মৃত্যু সমর্থ উদ্দীপনা-বিভাবের কাজ করে। নৈরাশ্য ও আতঙ্কের চরম অভিব্যক্তি দেখা যায়—রণক্ষেত্র হইতে মুর্শিদাবাদে পলায়নে। **চতুর্থ গর্ভাঙ্কে** ভাগ্য বিপর্যয় জনিত আক্ষেপ-অনুশোচনায় স্থায়িভাব আরো প্রবর্দ্ধিত হয়। **ষষ্ঠ গর্ভাঙ্কের** প্রথম দিকে উন্মৎজহরা তথা বাৎসল্যকে উদ্দীপক হিসাবে প্রয়োগ করিয়া, পরে ভাগ্য-বিপর্যয়ের আক্ষেপের দ্বারা এবং শেষে আবার উন্মৎ জহরাকে 'উদ্দীপক' হিসাবে ব্যবহার করিয়া রসনিষ্পত্তির চেষ্টা করা হয়। **এখানেই উন্মতের মৃত্যুর পর সিরাজের মধ্যে যে অনুভাবাদি সৃষ্টি করা হয় তাহা খুবই রসোদ্দীপক।** ব্যভিচারী ভাবের শক্তিমান প্রয়োগ পাওয়া যায়—যখন সিরাজ বলেন—"বালিকার মৃত্যু দেখেছি, তোমার মৃত্যু দেখলে শান্তিলাভ করতেম। **সিরাজের শুষ্ক ও গভীর শোক সুন্দর অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে।** ইহার পর শেষ উদ্দীপনা-বিভাব—পঞ্চম অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্কের—মুর্শিদাবাদ কারাগার। সিরাজের অনুতাপদহনে 'poetic justice'-এর রূপটি ফুটিয়া উঠিলেও—করুণরসের ধারা ব্যাহত হয় না, বরং অনুতাপটুকু করুণ বিলাপের মতই বেদনা সঞ্চার করে। মহম্মদীবেগের পুনঃ পুনঃ তরবারি-আঘাতের সম্মুখে ভগবৎ কৃপাপ্রার্থী কাতর সিরাজ এবং আঘাতের ফলে ভূপতিত সিরাজের·· দৃশ্য, **ভয়ানক ও অদ্ভুত মিশ্র করুণের** উদ্রেক করে।

সপ্তম গর্ভাঙ্কের দৃশ্যটি—"দীপমালা শোভিত সিরাজের সমাধিমন্দির" মৌন-ভাবে এবং লুৎফার শান্তবিলাপাত্মক প্রার্থনায় মুখরভাবে করুণকেই উদ্দীপিত করে।

তবে এ কথা কিন্তু স্বীকার করিতেই হইবে যে রস-সৃষ্টির জন্য যে উদ্দীপনা-বিভাব প্রয়োগ করিয়াছেন সবক্ষেত্রে সেগুলি সমুচিত হয় নাই। উন্মৎ জহরার কথা ও আচরণ এবং লুৎফার অনুভাবাদি আরো বাস্তবিক করিতে পারিলে রসের তীব্রতা ও গভীরতা আরো বৃদ্ধি পাইত। বাস্তবিকতা

অপেক্ষা নাটকীয়তার মাত্রা বেশী ব্যক্ত হওয়ায় রসের উদ্দীপক হিসাবে উহাদের অনবদ্য বলা যায় না। উদ্দীপক-সমূহ আরো বাস্তবিক হইলে এবং অনুভাবাদি আরো অভিব্যক্ত হইলে নাটকখানি উচ্চতর পর্যায়ে উঠিতে সক্ষম হইত। এই অঙ্গীরসের পরে উল্লেখযোগ্য—ঘসেটি বেগম-হলওয়েল—আশ্রিত রৌদ্ররস মীরমদন-মোহনলাল-আলম্বিত বীররস, জহরা-আশ্রিত অদ্ভুত রস এবং সওকৎজঙ্গ—দানসা—কৃষ্ণদাস উমিচাঁদ এবং করিমচাচা আলম্বিত বিবিধ হাস্যরস। (জহরা চরিত্রের মূল ভাব প্রতিহিংসাপরায়ণতা বটে, কিন্তু উহার গতিবিধি ও আচরণে দর্শকের মধ্যে বিস্ময়ই প্রাধান্য লাভ করে)।

নানাবিধ অঙ্গরস

অঙ্গীরসের পরেই প্রাধান্য পাইয়াছে…হাস্যরস এবং এই রসটি বিচিত্র রূপেই প্রকাশ পাইয়াছে। এই রসের আলম্বন…মাতাল ও বে-চাল সওকৎজঙ্গ। অর্থ স্থূল বাগ-বিকৃতির সাহায্যে এখানে হাস্যরস সৃষ্টির চেষ্টা হইয়াছে। মূর্খ দাম্ভিকতা, মাতালের জড়তা ও বাচালতা, অপদার্থের চেষ্টা-বিকৃতি ও চুপসে-যাওয়া আস্ফালন মিশিয়া চরিত্রটি খুবই হাস্যোদ্দীপক হইয়াছে। দানসার ক্ষেত্রে পূর্ববঙ্গীয় ভাষাই হাস্যের প্রধান উদ্দীপক, অবশ্য সৈন্য-সামন্তকে ফুঁ দিয়া উড়াইয়া দেওয়া'র কেরামতি দেখান বা সরাব খাওয়ার ব্যাপারে নবাবজাদার দোহাই দিয়া নতুন শাস্ত্র তৈয়ার করিয়া সরাব খাওয়া তথা ভণ্ডামি করা বাক-বিকৃতির স্তরে সীমাবদ্ধ হয় নাই…সূক্ষ্ম চেষ্টা-বিকৃতির স্তরের ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। তারপর ১ম অঙ্কের একাদশ গর্ভাঙ্কেও…গোড়ার দিকে স্থূল বাক-বিকৃতি আর শেষদিকে অতি আস্ফালনের আকস্মিক সঙ্কোচনে…(হাদে, তুমি এমন লোকটা—তামাসা বোঝে না—তামাসা বোঝে না?—তুমি জান না কেতাবে লিখচে নিন্দি করতি হয়, নবাবের পেগমাই বারে)…সূক্ষ্ম চেষ্টা-গত বিকৃতির লক্ষণই পরিস্ফুট হইয়াছে।

হাস্যরস

এই রসের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য আলম্বন করিমচাচা। ইংরাজীতে যাহাকে হিউমার বলে—ডাঃ শ্রীকুমার

হিউমরিষ্ট, করিমচাচা

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ভাষায়—"মুখের হাসি চোখের জল মিশিয়া একপ্রকার অপূর্ব ইন্দ্রধনুর বর্ণ-বৈচিত্র্য স্থষ্টি", করিমচাচার উক্তি-আচরণে সেই হিউমারই ব্যক্ত হইয়াছে। করিমচাচার উক্তি-আচরণে নিছক ভাঁড়ামি নহে, তাহাদের—"পশ্চাতে একটা বিশিষ্ট মনোমূর্তি, জীবন-সমালোচনায় একটা মৌলিক গতানুগতিকতা বজনকারী ভঙ্গীর পরিচয় মিলে" (বঙ্কিমচন্দ্রে হাস্যরস-প্রবন্ধে ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়) করিমচাচার "হাসির খোঁচা এক ঝলক অতর্কিত আলোকের মত (সেই) সমস্ত ভ্রান্তি ও অসঙ্গতিকে এক মুহূর্তে সুস্পষ্ট উজ্জ্বল করিয়া তোলে, (ঐ)। করিমচাচা যে "দার্শনিকের নিকট আত্মীয় ও সহকর্মী" (ঐ)—এ বিষয়েও সন্দেহের অবকাশ নাই। (চরিত্র বিশ্লেষণ দ্রষ্টব্য)। তাহার বক্রোক্তি ব্যাজস্তুতি প্রভৃতি বাগ-ভঙ্গিমা ও আনুষঙ্গিক অনুভাব যে হাসি সৃষ্টি করে তাহা নিরর্থক আবেগমাত্রে পর্যবসিত হয় না, তাহাতে জীবনের গভীর সত্য উদ্ভাসিত হইয়া উঠে।

চরিত্র

সিরাজদ্দৌলা নাটকে ছোট-বড়, হিন্দু মুসলমান, ইংরেজ ফরাসী এবং নারী-পুরুষ মিলাইয়া পাত্রপাত্রীর সংখ্যা পঁয়ত্রিশ ছাড়াইয়াও বেশী। পুরুষ পাত্রদের মধ্যে মুসলমান ৭টি, হিন্দু ৮টি—ইংরেজ-ফরাসী ১২টি। আর নারী চরিত্রদের মধ্যে ওয়াট্‌স-পত্নী ছাড়া বাকী সকলেই মুসলমান-জাতীয়।

প্রথমেই বিচার করা যাউক নায়ক চরিত্র—"সিরাজদ্দৌলা" * সিরাজ "বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার নবাব"—ভূতপূর্ব নবাব আলিবর্দীর কনিষ্ঠা কন্যার পুত্র—ইহা একান্তই সাধারণ এবং বাহিরের পরিচয়; ভিতরকার পরিচয় সিরাজের

চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই নিহিত। **প্রাক-নবাব** সিরাজ-চরিত্রের পরিচয় সিরাজ নিজ মুখেই ব্যক্ত করিয়াছেন।

"হিতাহিত ছিল না বিচার
মদ্যপানে করিয়াছি শত শত দুর্নীত ব্যাভার।"

মঁসিয়ে ল'র আত্মবিবরণীতে সিরাজ চরিত্র সম্বন্ধে যে মন্তব্য করিয়াছেন, মাতাল সওকৎজঙ্গের উক্তি… "নৌকোয় বেড়িয়ে দু'ধারে ভাল ভাল মেয়েমানুষ দেখেছে—আর বেগম করেছে"— তাহা সমর্থনই করে। দান্সার উক্তি— "বিশখানা লায়েব মদি আদমি ভর্তি করি, দরিয়ার বিচে ডোবাইচে, হাপইয়ে জল খাইয়ে কেমন মরে দেখতিছে! ঘরের মদ্দি আদমি পুরে তালা লাগাইয়ে আগুন ধরাইচে, আদমিগুলো জ্বালার চোটে চ্যাল্লাচ্ছে, শুনতিচে আর হাসতিচে।"—উপরোক্ত মন্তব্যেরই অংশ। 'দুর্নীত ব্যাভার'—নিঃসন্দেহ। তবে হোসেনকুলি হত্যা নিষ্ঠুর ব্যাপার হওয়া সত্ত্বেও করিমচাচা সিরাজের পক্ষ সমর্থন করিয়া যাহা বলিয়াছেন (৩য় অঙ্ক—২য় গর্ভাঙ্ক) তাহা উপেক্ষণীয় নহে। তারপর ফৈজিকে 'দেওয়ালে-গেঁথে-মেরে ফেলা' অবশ্যই নিষ্ঠুর কার্য। মীরজাফর খাঁর সহিত আমরাও বলিতে পারি—'আহা অবলা স্ত্রীলোক তারে দেওয়ালে গেঁথে মেরে ফেল্‌লে! এমন নিষ্ঠুরও অন্যায়!' কিন্তু করিমচাচা চোখ খুলিয়া দেখিবার জন্য যে টিপ্পনি করিয়াছেন (৩য় অঙ্ক—২য় গর্ভাঙ্ক) তাহাতে ফৈজি-হত্যার মত নিষ্ঠুর ব্যাপারের গূঢ় কারণও ব্যক্ত হইয়াছে এবং সিরাজের অপরাধের ভারটাও হালকা হইয়া গিয়াছে। যাহাই যিনি বলুন – নবাব হইবার আগে যে সিরাজ উচ্ছৃঙ্খল স্বভাব ছিলেন তাহা একরূপ অবিসংবাদিত সত্য। *কিন্তু নবাব হইবার পরে সিরাজ ভিন্ন ব্যক্তি।—সিরাজ সম্বন্ধে মোহনলাল যাহা বলিয়াছেন তাহাই প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে—"নবাব এখন প্রকৃত প্রজাপালক। বৃদ্ধ নবাবের মৃত্যুর পর যৌবন-সুলভ চপলতা আর নাই; মদ্যপান পরিত্যাগ করেছেন, অসৎ সঙ্গীদের বিদায় দিয়েছেন। প্রজার মঙ্গল

তাঁর একমাত্র কামনা।" সিরাজের নিম্নলিখিত স্বীকারোক্তিও অস্বীকার করিবার কোন কারণ নাই—

"বসি বৃদ্ধ নবাবের মরণ-শয্যায়
শেষ বাক্যে তাঁর—
জন্মিয়াছে ধারণা আমার,
রাজকার্য নহে স্বেচ্ছাচার ;
নবাব রাজার ভৃত্য, প্রভু প্রজাগণে ;
প্রজার মঙ্গল কার্য সতত সাধন
নবাবের উদ্দেশ্য জীবনে।
* যথাসাধ্য আত্মসংশোধন
চেষ্টা করি দিবানিশি ॥"

তারপর শত্রুপক্ষের স্বরূপচাঁদকে—বিশ্বাস করা যায়, তিনিও বলিয়াছেন—"সওকৎজঙ্গের যুদ্ধের পর নবাবের যেন সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়েছে ; বিনয়ী নম্র সকলকে যথাযোগ্য উচ্চ সম্মানে সম্মানিত করেছেন।" জগৎশেঠকে পর্যন্ত বলিতে শোনা যায়—"যেন বৃদ্ধ আলিবর্দী যৌবন লাভ করে প্রত্যাবর্তন করেছে।" করিমচাচা যথার্থবাদী—তিনিও বলিয়াছেন—"আলিবর্দী সিংহাসনটি দিয়ে গেলেন আর দাড়ি দিয়ে মদ ছাড়িয়ে, নবাবী রোকৃটি কেড়ে নিলেন।" নবাব সিরাজ আত্ম-সংশোধনে-চেষ্টিত-সিরাজ—উচ্ছৃঙ্খলস্বভাব সিরাজ হইতে ভিন্ন ব্যক্তি।

একথা মিথ্যা নহে যে সিরাজ বাল্যাবধি চিত্তদমন শিক্ষা করেন নাই, তাঁহার ক্রোধ...কাম প্রভৃতি প্রবৃত্তি চিরদিনই প্রশ্রয় পাইয়া আসিয়াছে। সিরাজ খুব সঙ্গত ভাবেই একথা বলিতে পারেন—"বাল্যাবধি আপনাদেরই আদরে আমাদের চিত্তদমন করা শিক্ষা হয়নি। তার দায়িত্ব আপনাদেরই। যদি কখনও কখনও উগ্রতা প্রকাশ করি, সে আপনাদের মার্জ্জনীয় নিশ্চয়।" (২য়—১ম) এখনও সিরাজ ক্রোধনস্বভাব বটে, কিন্তু তাঁহার ক্রোধ সাময়িক

উত্তেজনা উৎক্ষেপ মাত্র। মার্জনা-প্রার্থনার স্পর্শ লাগিতে না লাগিতেই তাহা জল হইয়া যায়। শত্রুমুখের প্রশংসার দাম বেশী হইলে রাজবল্লভপুত্র কৃষ্ণদাসের মন্তব্যটি উল্লেখ করা যাইতে পারে—"নবাব ক্রোধন স্বভাব বটে, ক্রোধ হ'লে দিগ্বিদিক জ্ঞান থাকে না, কিন্তু দেখে'ছি অতিশয় দোষ করে গিয়ে মার্জনা চাইলে মার্জনা পায়। যতই দোষ থাকুক মেজাজ অতি উচ্চ।' (৩য়—৮ম) করিমচাচার কথায় কৃষ্ণদাসের উক্তির সমর্থন আছে—"রাগে দু'কথা বলে, আবার বাড়ী বাড়ী গিয়ে পায়ে ধরে সাধে...।" সিরাজ যখন কৃষ্ণদাসকে বলেন—"যৌবন সুলভ অনেক দোষে দোষী স্বীকার করি কিন্তু কেউ শরণাগত হয়ে আশ্রয় পায়নি বা গুরুতর অপরাধ করে মার্জ্জনা প্রার্থনায় দোষ মাপ হয়নি, বোধ হয় আমাদের শত্রুর মুখেও শুনবে না" তখন মিথ্যা গর্ব প্রকাশ করেন না। ইংরেজ পক্ষের উকীলের মুখেও সিরাজের উচ্চ মেজাজের প্রশংসা শোনা যায়...."নবাবের উচ্চ মেজাজ আমরা সম্পূর্ণ অবগত নবাব দয়াবান, মার্জ্জনা করিবেন—এই ভরসায় রাজগৃহ পরিত্যাগ করি নাই (৩য়—২য়)।" করিমচাচার ব্যাজস্তুতিতেও তাহা প্রকাশ—টাকা ভাঙলে মাপ, শত্রুতা করলে মাপ—এ ব্যাটা কি নবাব, ছ্যাঃ।" সিরাজের ক্রোধ যেমন দপ করিয়া জলিয়া উঠে, তেমনি খপ্ করিয়া নিভিয়াও যায়—এ কথা ঘরে-পরে সকলেই জানিত। এই ক্রোধন-স্বভাবের জন্য—এই অন্তর্নিহিত দুর্বলতার জন্য সিরাজ নিজেও আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছেন "মাতামহ, কেন ক্রোধ দমন করতে শিক্ষা দাও নাই! এই ক্রোধই আমার মনোভাব প্রকাশ করে।" মেজাজের এক দিক এই হঠাৎ-ক্রোধে ব্যক্ত, অন্যদিক ব্যক্ত হইয়াছে—স্বয়ং আলিবর্দী-বেগমের ভৎর্সনায়—

"ভাল মন্দ না করি বিচার
যেই কার্য যেইক্ষণে উঠে তব মনে
সেই কার্য সেই দণ্ডে কর সমাধান।

* * * *

শুনি মতি-স্থৈর্য নাহিক তোমার।

কিন্তু মেজাজী-সিরাজ ক্রোধনস্বভাব-সিরাজ— আত্মসংশোধন-পরায়ণ-সিরাজ, সিরাজ চরিত্রের একটি দিকমাত্র, যে যে গুণের জন্য সিরাজ—'a force symbolized in a man' হইয়াছেন সেই সকল গুণের মধ্যেই সিরাজ চরিত্রের আসল দিকটি রহিয়াছে। সিরাজ অল্পবয়স্ক হইলেও অল্পবুদ্ধি নহে—পরিস্থিতি-চেতনা তাঁহার মধ্যে কম নহে। আলিবর্দী-বেগমের গঞ্জনার উত্তরে সিরাজ ঠিকই বলিয়াছেন—

"রাজ্যের অবস্থা তুমি জাননা জননী!
স্বার্থপর অমাত্যসকল
করে সবে স্বার্থ উপাসনা
কারো নাহি মঙ্গল কামনা
চলে জনে জনে নিজ স্বার্থ অনুসারে

* * * *

সতত মন্ত্রণা যত অমাত্য মিলিয়ে
কি উপায়ে সাধিবে আমার পদচ্যুতি।
কভু বা গোপনে—
ষড়যন্ত্র সওকৎজঙ্গ সনে,
কভু দানে ইংরাজে উৎসাহ
উপেক্ষিতে নবাবী প্রভাব।"

ইংরাজ যে ছলেবলে রাজ্য বিস্তার করিতে চাহে তাহাও তাঁহার অজ্ঞাত নহে। ফিরিঙ্গিদের সম্পর্কে তাঁহার সাবধান বাণী—

জানিহ নিশ্চিত—
রাজ্যলিপ্সা প্রবল সবার।

দাক্ষিণাত্যে বুঝহ ব্যাভার,
ছলে বলে বিস্তার করিছে অধিকার।

অমাত্যদের মনোভাবও তাঁহার বুদ্ধিকে ফাঁকি দিয়া এড়াইতে পারে নাই—"কুটীলতা কুটিল না করিবে বর্জ্জন" তাহা তিনি মর্মে মর্মে বুঝিয়াছেন এবং খুব স্পষ্টভাবেই বুঝিয়াছেন—"রাজ্যে গোলযোগ স্থায়ী হ'লেই তাদের মঙ্গল।"

সিরাজের দৃষ্টিতে সমসাময়িক রাজনৈতিক অবস্থার পরিমণ্ডলটিও অস্পষ্ট নহে—ভারতবাসী ভারতবাসীর যুদ্ধে ক্লান্ত! ভারত বিচ্ছিন্ন। ভারত সন্তান পরস্পরের শত্রু! ইহাও সিরাজের সম্বন্ধে 'এহ বাহ্য'। সিরাজ যেখানে প্রজার মঙ্গলের মুখ চাহিয়া বার বার ফিরিঙ্গিদিগকে মার্জনা করিয়াছেন (১ম—৭ম) সেখানে আমরা…সিরাজেরই ঘোষণায়—"প্রজার মঙ্গল কায সতত সাধন, উদ্দেশ্য জীবনে।" যে প্রজাবৎসল সিরাজের রূপ ফুটিয়াছে তাঁহাকেই দেখি, বটে, কিন্তু যে সিরাজ বাঙলার স্বাধীনতা রক্ষায় ঐকান্তিক, যে সিরাজের চোখে বাঙলা মাতৃভূমি, বাঙলার হিন্দু-মুসলমানের আসল পরিচয় বাঙ্গালী, হিন্দু-মুসলমান "এক স্বার্থে বাঙলায় আবদ্ধ," বাঙলার গৌরব বাঙলার স্বাধীনতা…স্বদেশের গৌরব রক্ষা যে সিরাজের কাছে নিজের স্বার্থ ও প্রাণ অপেক্ষাও কাম্য, বিদেশী দস্যুর হস্ত হ'তে প্রজা রক্ষা করার জন্য যে সিরাজ সঙ্কল্পিত এবং সঙ্কল্পিত বলিয়াই ফিরিঙ্গি-বিদ্বেষে অনির্বাণ আগ্নেয় উদ্গার—সেই স্বদেশপ্রাণ নবজাত-চেতনায়-উদ্বুদ্ধ, ইংরাজ বিদ্বেষী সিরাজ সিরাজের আসল ভাব-বিগ্রহ। এই সিরাজ যেন স্বাধীনতাকামনার বাঙলার স্বাধীনতা-রক্ষা-সংগ্রামের বাঙলার মর্মেরই বাণীমূর্তি। সিরাজ ইংরেজ-বিদ্বেষের একটি অগ্নিশিখা। "ফিরিঙ্গি বাঙলার দুষমন" (১ম—৫ম) "কিন্তু সাবধান নাহি দিও ফিরিঙ্গিরে সূচ-অগ্রস্থান" (ঐ) শত্রুজ্ঞানে ফিরিঙ্গিরে কর পরিহার। বিদেশী ফিরিঙ্গি কভু নহে আপনার… চাহে মাত্র রাজ্য অধিকার" (ঐ) প্রভৃতি উক্তির মধ্যে মনোভাবের তাপ যেন বাক্-শিখায় জ্বলিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এই জ্বলনের মূলে রহিয়াছে…স্বদেশ প্রাণতা….ঐকান্তিক স্বাধীনতা-কামনা—ব্যক্তি-স্বার্থ-নিরপেক্ষ স্বদেশ-প্রীতি।

বাঙলার কল্যাণ সাধন করিতে তিনি বাঙলার সন্তান—হিন্দু মুসলমানকে আহ্বান করিয়াছেন...কারণ হিন্দু-মুসলমানের বংশধরগণ যেন "নাহি হয় ফিরিঙ্গি নফর"। এই মনোভাবেরই একটি তিক্ত প্রকাশ—"যে হিন্দু-মুসলমান স্বার্থ চালিত হ'য়ে স্বদেশের প্রতি ঈর্ষায় বিদেশীর আশ্রয় গ্রহণ করবে সে কুলাঙ্গার। মাতৃভূমির কলঙ্ক। তার জীবন ঘৃণিত!!"

সিরাজের আক্ষেপ—"যদি কখনো জন্মভূমির অনুরাগে হিন্দু-মুসলমান ধর্মবিদ্বেষ পরিত্যাগ ক'রে পরস্পর পরস্পরের মঙ্গল সাধনে প্রবৃত্ত হয়...যদি সাধারণ শত্রুর প্রতি একতায় খড়্গহস্ত হয়—এই দুর্দম ফিরিঙ্গি দমন তখন সম্ভব, নচেৎ অভাগিনী বঙ্গমাতার পরাধীনতা অনিবার্য।"...একাধারে ফিরিঙ্গি বিদ্বেষ ও স্বদেশপ্রীতিই ব্যক্ত করে। সিরাজের এই স্বদেশপ্রীতি নিছক ব্যক্তিগত স্বার্থ-প্রণোদিত নহে। সকলের উপরে সিরাজের কাছে দেশের স্বার্থ। প্রথম হইতেই সিরাজের মুখে আমরা শুনি—"যদি আমার প্রতি বিদ্বেষ পরিত্যাগ না করেন, পুনিয়ায় সওকৎজঙ্গের সঙ্গে যোগদান করুন কিংবা বিদ্রোহীর ধ্বজা উড্ডীন করে যোগ্যজনকে সিংহাসন প্রদান করুন। (১ম-৪র্থ) এই অঙ্কেরই শেষ দৃশ্যে সিরাজকে একই ধরনের কথা বলিতে শোনা যায়—'মহাশয়, আপনাদের সকলের যদি অভিপ্রেত হয়, যে আমি অযোগ্য, যোগ্য-ব্যক্তিকে নির্বাচনে ক'রে বাঙলার গদীতে স্থাপন করুন। চতুর্থ অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে এই মনোভাবটি আরো তীব্র আবেগে ব্যক্ত হইয়াছে—বাঙলার মর্যাদা, বাঙলার স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য রাজ্য ত্যাগেও সিরাজ কুণ্ঠিত নহেন—সমস্ত সৈন্যের সম্মুখে মীরজাফরকে বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব বলিয়া অভিবাদন করিতেও সিরাজ প্রস্তুত। সিরাজ মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করে—"আমি বার বার আপনাদের বলেছি, আমায় যদি অযোগ্য বিবেচনা করেন, আমায় রাজ্য-চ্যুত ক'রে যোগ্য ব্যক্তিকে রাজ্যপ্রদান করুন।"

এই আদর্শপরায়ণতাই সিরাজকে "a force symbolized in a man"

-এর মর্যাদা দিয়েছে। অতীত নৈতিক ত্রুটিবিচ্যুত থাকা সত্ত্বেও সিরাজের শীর্ষে একটা মহত্ত্বের জ্যোতির্মণ্ডল বিচ্ছুরিত হইয়াছে।

সিরাজদ্দৌলার চরিত্র সম্পর্কে প্রথমেই এই কথাটি উল্লেখযোগ্য যে নাট্যকার সিরাজের কোন দোষকেই যেমন ঢাকিয়া রাখেন নাই তেমনি কোন গুণকেও চাপিয়া যান নাই, বরং দু'একটি গুণ আরোপ করিয়া চরিত্রটির ঐতিহাসিক তাৎপর্যটি ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এ কথা সত্য বটে, যে সিরাজ সামন্ততান্ত্রিক যুগের একজন প্রভু বাঙলা-বিহার উড়িষ্যার নবাব, সুতরাং এতখানি নবজাতীয়তাবাদের চেতনা তখন বাস্তবিক ছিল কিনা সন্দেহের বিষয়, কিন্তু এ কথাও মনে রাখা দরকার যে, বাঙলাই সিরাজের রাজধানী থাকিয়া বাঙলাতেই ইংরেজ শক্তির সহিত নবাব-শক্তির দ্বন্দ্ব ঘটিয়াছে বলিয়া এবং বাঙলা ও বাঙালী হিন্দু মুসলমানের স্বাধীনতা-পরাধীনতার তথা জীবন মরণের সমস্যাই অগ্রাধিকার পাওয়ায়, খুব স্বাভাবিকভাবেই সিরাজ প্রধানত বাঙলার ও বাঙালার প্রতিনিধি হইয়া পড়িয়াছেন। বাঙলাকে 'মাতৃভূমি' জন্মভূমি প্রভৃতি বলায় সিরাজের জাতীয়তা চেতনা বাঙলার ভৌগোলিক সীমায় পরিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। তবে নাট্যকার সিরাজকে বাঙলা-প্রাণ করিয়া সৃষ্টি করিলেও এবং 'হিন্দু-মুসলমানগণ এক স্বার্থে বাঙলায় আবদ্ধ'—এইরূপ নবজাতীয়তাবাদী উক্তি সিরাজের মুখে দিলেও, সিরাজের মুসলমান চেতনা অক্ষুণ্ণই রাখিয়াছেন অর্থাৎ সিরাজকে ঐতিহাসিক বাস্তবিকতার গণ্ডীর মধ্যে রাখিয়াই যথাসাধ্য আদর্শায়িত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বাঙলায় হিন্দু মুসলমান এক স্বার্থে আবদ্ধ—এ কথা সিরাজ স্বীকার করিয়াছেন, "যোগ্যজনকে সিংহাসন প্রদান করুন" -এ কথাতেও অস্পষ্টভাবে সিরাজের অসাম্প্রদায়িক চেতনাই প্রতিধ্বনিত হইয়াছে, কিন্তু…

নাট্যকার চতুর্থ অঙ্কে দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে সিরাজের মুখে 'মুসলমানের প্রভাব অপ্রতিহত থাকুক'…আমার রাজ্যত্যাগে যদি মুসলমানের রাজ্য রক্ষিত হয়" প্রভৃতি উক্তি বসাইয়া সিরাজের মুসলমান-ব্যক্তিত্বকে তথা ঐতিহাসিক সত্য

কেই রক্ষা করিয়াছেন। সিরাজদ্দৌলার সময়ে নবজাতীয়তার চেতনা তেমন লক্ষণীয়ভাবে দানা বাঁধিয়া উঠে নাই, ইহা ঐতিহাসিক সত্য। সুতরাং নবাব সিরাজদ্দৌলার মধ্যে বিশুদ্ধ নবজাতীয়তাবাদ না দেখাইয়া নাট্যকার সিরাজকে যুগোপযোগী তথা বাস্তবিক করিয়াই তুলিয়াছেন। বাস্তবিক সামন্ততান্ত্রিক যুগের সিরাজকে সাম্প্রদায়িক চেতনাশূন্য করিয়া তুলিলে আদর্শায়নের অভিযোগই যে ঘটিত এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সিরাজের ব্যক্তিত্ব (personality) যে আদর্শপরায়ণতার (principle) মধ্যে একেবারে ডুবিয়া যায় নাই···ইহা প্রশংসার কথা।

কিন্তু, এঙ্গেলস মিন্না কৌটস্কির কাছে লিখিত পত্রে যে কথাটি বলিয়াছেন, সেই—"It is always bad for an author to be infatuated with his hero .."কথাটি এখানেও বলা যাইতে পারে। সিরাজদ্দৌলার স্রষ্টা অনেক-ক্ষেত্রেই ভুলিয়া গিয়াছেন "The more the author's views are concealed the better for the work of art" [এঙ্গেলস :—মীনা কৌটস্কির কাছে লিখিত পত্র ১৮৮৫] প্রথম অঙ্কের দশম গর্ভাঙ্কে সিরাজের চরিত্রে অশোভন মাত্রায় প্রচার-প্রবণতা দেখা দিয়াছে। এই প্রকট প্রচার-ধর্মিতাকে দোষ বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। কারণ—এঙ্গেলসের সহিত সকল সাহিত্য-সমালোচকই এ কথা স্বীকার করিবেন— "the bias should flow by itself from the situation and action, without particular indications and that the writer is not obliged to obtrude on the reader the future historical solutions of the social conflicts pictured." সিরাজ এমন সব কথা নিজ মুখে ব্যক্ত করিয়াছেন যাহা একেবারে না বলিলেই—ভাল হইত।

এই প্রচার-প্রবণতার বশেই সিরাজ দুই একস্থলে অনুচিতমাত্রায় ভবিষ্যদ্দ্রষ্টা ভবিষ্যদ্বক্তা হইয়া দাঁড়াইয়াছে (২য় অঙ্ক ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক দ্রষ্টব্য)। ভবিষ্যদ্ দৃষ্টি বা ভবিষ্যদ্-বাণী মাত্রই নিন্দনীয় এ কথা না বলিয়াও বলা চলে, চরিত্রটিতে মাঝে মাঝে প্রচার-প্রবণতা চোখে-লাগার মাত্রায় পৌঁছিয়াছে। চরিত্রটি সম্বন্ধে

সর্বশেষ কথা এই যে চরিত্রে দ্বন্দ্বের তীব্রতা এবং অনুভূতির গভীরতা প্রকাশ করিবার যে সমস্ত অবকাশ পাওয়া গিয়াছে, নাট্যকার তাহাদের সবগুলির সদ্ব্যবহার করিতে পারেন নাই। সিরাজের নিজ বিশ্বাস ও বিচারের তথা খেয়ালের সহিত আলীবর্দী বেগমের উপদেশ-নির্দেশের দ্বন্দ্বটি পরিস্ফুট আকার লাভ করে নাই। অধিকন্তু চরিত্রটিকে যে উভয় সঙ্কটের সম্মুখীন করিয়া শোচনীয় ভাগ্য বিপর্যয়ের মধ্যে ঠেলিয়া দেওয়া হইয়াছে, সেই সঙ্কটের বিরুদ্ধে সিরাজের দ্বন্দ্বটিকে আরো সচেতন ও স্ফুটতর করার সুযোগ রহিয়াছে। নাট্যকার সেই সুযোগকে সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিতে পারেন নাই। সিরাজ-চরিত্রটি ধারণা (concept) হিসাবে যত প্রশংসনীয় হইয়াছে, রূপায়ণের (execution) দিক দিয়া তত অনবদ্য হইতে পারে নাই।

সিরাজদ্দৌলার পরেই উল্লেখযোগ্য চরিত্র—করিম চাচা। করিম চাচার সংক্ষিপ্ত পরিচয়—রায়দুর্লভের ভৎর্সনায় প্রকাশ পাইয়াছে —"করিম চাচা, তুমি আমার অন্নে পালিত; তোমার সহিত আমার দূর সম্পর্ক মাত্র। আমার অনুরোধে আমির-ওমরাও সকলে তোমাকে ভালবাসে। তোমার কামিনীকান্ত নামের পরিবর্তে আদর করে "করিমচাচা" বলে ডাকে, দেখছি তুমি নবাবের নিকট ভাঁড়ামি করে তার প্রিয় হয়েছ, সেই নিমিত্ত গর্বে যথারীতি সকলকে সম্মান করো না। তোমার সকল কথায় কথা কওয়া ভাল নয়।" অর্থাৎ—করিমচাচা, আদরের ডাক নাম। আসল নাম কামিনীকান্ত (কমলাকান্তের নিকট আত্মীয় নয় তো ?) রায়দুর্লভের দূর সম্পর্ক এবং অন্নে পালিত। গুণের মধ্যে ভাঁড়ামি এবং সেই গুণেই এইরূপ দশজনের প্রশ্রয় পাওয়ার ফলে (এই ধরনের রসিক চরিত্র সব দেশে এবং প্রায় সব যুগেই প্রশ্রয়—ইংরাজীতে বলা 'যায় লাইসেন্স' পাইয়া আসিয়াছে)... করিমের বড় দোষ দাঁড়াইয়া গিয়াছে—করিম সকলকে যথাযোগ্য সম্মান করে না এবং সকল কথায় কথা বলিতে চেষ্টা করে। ছোটখাট দোষও অবশ্য আছে—করিম নেশাখোর—চণ্ডু-আফিঙ-মদ সবই চলে এবং জীবনের বড়

করিমচাচা

আকাঙ্খা মাত্র "দুটান চণ্ডু আর দু'পেয়ালা মদ"-এর চাহিদায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তবে এইটুকু করিমের একান্তই বাহিরের পরিচয়।

আসলে, করিম চাচাকে আমরা 'inverted serious' বলিয়া গণ্য করিতে পারি। করিমের ভাঁড়ামির অন্তরালে একজন সূক্ষ্মদর্শী স্বদেশবৎসল ও মহানুভব ব্যক্তি বিরাজ করিতেছে। তাহাকে লইয়া সকলে রসিকতাই করুক আর যাহাই করুক, করিমের দৃষ্টিতে রঞ্জন-রশ্মির সমীক্ষণ শক্তি প্রকাশ পাইয়াছে। চণ্ডু আফিঙ মদ তাহার চর্মচক্ষুর উপর যে প্রভাবই বিস্তার করুক, মর্মচক্ষুকে যেন আরও প্রসারিত ও সূক্ষ্মদর্শী করিয়া তুলিয়াছে। বোধহয় কমলাকান্তের মত যতই সে নেশা করে ততই তাহার চোখ খুলিয়া যায় তাহার দৃষ্টি ব্যক্তি-চরিত্র, জাতি-চরিত্র, রাজনীতি, অর্থনীতি দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সব কিছুরই স্বরূপ যেন সমগ্র রূপেই প্রত্যক্ষ করে। বাস্তবিক করিমচাচা অতি সূক্ষ্মগ্রাহী মস্তিষ্কের অধিকারী।

কিন্তু করিম চাচা শুধু দ্রষ্টাই নহে—মস্তবড় একজন বক্রোক্তি-নিপুণ ভাষ্যকার। তাহার এক একটি টিপ্পনি কাহারও কাহারও পক্ষে তীক্ষ্ণমর্ম অন্তর টিপুনি এবং সকলের পক্ষেই অঞ্জন-শলাকা। ব্যক্তির অন্তরের অন্তঃস্থলের উদ্দেশ্যটি, জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতি...সব কিছুই তাহার ব্যাজস্তুতির ও বক্রোক্তির এক একটি চমকে উদ্ভাসিত হইয়া পড়িয়াছে। করিম চাচার এই বক্রোক্তিপরায়ণতা, আপাতদৃষ্টিতে নিছক বাক-চাপল্য বলিয়া মনে হইতে পারে বটে, কিন্তু আসলে এই বক্রোক্তি-পরায়ণতার মূল রহিয়াছে গভীর এক আন্তরিকতার ক্ষেত্রে—করিম চাচা যে পরিমাণে বাঙলাকে ও বাঙলার স্বাধীনতাকে ভালবাসে, সেই পরিমাণেই সে ভালবাসে বাঙলার নবাবকে এবং সেই পরিমাণেই স ফিরিঙ্গিদের প্রতি বিরূপ করিম চাচার নবাব-প্রীতি ও ফিরিঙ্গি-বিদ্বেষ আসলে আন্তরিক বাঙালী প্রীতি ও স্বাধীনতা প্রীতিরই পরিণতি বিশেষ। নেশাখোর করিম চাচা যে অতি লঘু কথা বলিতে বলিতে গুরুতর কাজ করিতে পারে,—সিরাজের পোষাক পরিয়া সিরাজের পলায়নকে

সহজসাধ্য করিবার জন্য সে যে চেষ্টা করিয়াছে তাহাতেই তাহার অন্তরের অন্তঃস্থলের পরিচয় উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে। তাহার শেষ ও ব্যথিত প্রশ্ন—বাঙলাটা কেন জ্বালালে ?"

করিম চাচার চরিত্র সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলবার আগে শেক্সপীয়রের "চতুর্থ হেনরী" (১ম ভাগ) নাটকের "ফলস্টাফ" চরিত্র সম্বন্ধে সমালোচকরা যাহা বলিয়াছেন তাহা স্মরণ করিয়া লওয়া যাইতে পারে। ফলস্টাফের witty "prose-poetry" সম্পর্কে বলা হইয়াছে—"it may suggest a kind of commentary on the world of the play and thus indicate the positive function which the character of Falstaff has in the play; it may help us see more clearly what is the attitude of Shakespeare toward the characters and events of the play and the attitude toward them which he expects us as readers to adopt— Understanding Drama) অর্থাৎ ফলস্টাফের উক্তিগুলি নাটকের নানাবিষয়ের ভাষ্য এবং ঐ ভাষ্য রচনাতেই চরিত্রটির প্রধান উপযোগিতা। ঐ ভাষ্য হইতেই বুঝা যায় নাটকের চরিত্রগুলি এবং ঘটনাসমূহের কোনটার প্রতি শেকসপীয়রের কি মনোভাব এবং নাট্যকার পাঠকদের কাছেও মনোভাব প্রত্যাশা করেন। করিম চাচার উপযোগিতা বিচার করিবার সময় ফলস্টাফ সম্পর্কিত উল্লিখিত মন্তব্যটি মনে রাখা খুবই বাঞ্ছনীয়। ফলস্টাফ ও করিম চাচা এক হিসাবে অবাস্তব বটে, কিন্তু অন্যহিসাবে অপরিহার্য।

করিম চাচা নাটকখানির সার্বভৌম ভাষ্যকার। নাটকের চরিত্র ও ঘটনার আলো করিম চাচার মনোভঙ্গীর আতস কাচে প্রতিফলিত হইয়া স্বরূপত বিচ্ছুরিত হইয়াছে। করিম চাচার বক্রোক্তি বা ব্যাজস্তুতি, সর্বদাই সিরাজ চরিত্রের মহত্ত্বের বা প্রশংসনীয় দিকটিকে আলোকিত করিতে চেষ্টা করিয়াছে এবং সিরাজের বিরুদ্ধপক্ষীয়দের সিরাজ-বিরোধী কার্যকলাপের দোষের দিকটিকে

বড করিয়া দেখাইয়াছে আর সিরাজের পাপাচার অস্বীকার না করিয়াও, আচরণের সূক্ষ্ম প্রেরণাকে বিশ্লেষণ করিয়া আচরণের অনিবার্যতা প্রমাণ করিয়া সিরাজের দোষের ভারকে লঘু করিতে চেষ্টা করিয়াছে। করিম চাচার দৃষ্টির গবাক্ষ লণ্ঠনের আলোতেই আমরা চরিত্র ও ঘটনার স্বরূপটি দেখিতে পাই।

প্রথম অঙ্কের দশম গর্ভাঙ্কেঃ—করিম প্রথম প্রবেশ করে এবং কৃষ্ণ দাসকে ক্ষমা করায় সিরাজ চরিত্রের যে উদারতা প্রকাশ পায় সেই উদারতার প্রতি বক্রভাবে (কৃষ্ণদাসের ও বড অপমান হল) সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ভাবী ঘটনা বা ষড়যন্ত্রকারীদের মনোভাবটিও প্রকাশ করিয়া দেয়—(এখন গিয়ে সওকৎজঙ্গের ঘাডে চাপো—আর তো উপায় দেখছিনে) তাহার মুখে ব্যাজস্তুতিও শোনা যায়—"বেকুব নবাব, নবাবীই জানে না, কারুর গর্দানা নেবার হুকুম দেয় না—ওকে আগে তক্তা থেকে নাবাও। এমন একজন নবাবের বেটা নবাবকে বসাও, যে হুট বলতে জুতো শুদ্ধ লাথি ঝাড়ে, যে কয়েদ করে টাকা আদায় করে। টাকা ভাঙলে মাপ, শক্রতা করলে মাপ—এ ব্যাটা কি নবাব, ছ্যাঃ।"

দ্বিতীয় অঙ্ক—চতুর্থ গর্ভাঙ্কে—করিম প্রথমে উমিচাঁদের গোপন ক্রিয়া-কলাপকে একেবারে বে-আব্রু করিয়া দেয় (পলতায় যখন ইংরেজ নোনাপানি খাচ্ছেন, তখন সস্তাব ক'রে তাদের সামগ্রী বেচে লাভ করছে…) তারপর—স্বগত উক্তিটি—"এলোমেলো করে দে মা, লুটেপুটে খাই।"…এক চমকে অমাত্যবর্গের অভিসন্ধিকে ব্যক্ত করিয়া দেয়।

অমাত্যবর্গ, এক দিক দিয়া দেশের বিশৃঙ্খলাই কামনা করে…রাজ্যে সুশৃঙ্খলা থাকলে প্রজাপীড়নের সুবিধা একটু কম হয় বলিয়া ওলট-পালটই তাহাদের কাম্য কারণ প্রজা যত বেওয়ারিশ হয় তত প্রজাপীড়ন করিয়া ধন লুণ্ঠন করার সুবিধা হয়।—অমাত্যদের প্রজা-শোষণের এই গোপন অভিসন্ধি করিম বেঁফাস করিয়া দেয়…বলে…"একটা ওলট-পালট না হ'লে, আমার সুবিধা কিসে হয় বলুন? বেওয়ারিশ প্রজা দাবিয়ে মজা করি কিসে বলুন?

অমাত্যবর্গের রাজনীতি যে অর্থনীতির মূল হইতেই জন্মিয়াছে করিম তাহা ভালভাবেই বুঝে···সকলকেও বুঝায় তথা আর্থ-রাজনৈতিক (econo-political) অবস্থাটিকে বাস্তবিকভাবেই রূপ দিতে চেষ্টা করে। এখানেই সঙ্গে সঙ্গে বাঙালী-জাতির সাধারণ চরিত্র-বৈশিষ্ট্যও করিম প্রকাশ করে—আমার কি বাঙলা-দেশে জন্ম নয়, আমি কি মতলববাজ নই, আমি কি আপনি গাঁট কেটে জানি নি? ·····বাঙলায় জন্মেছি আমার আপনার ভালোই ভালো।" করিম বড় খেদেই বলে—'এ বাঙলায় যিনি শান্তি স্থাপন করবেন তিনি দেবতা পুরুষ। বাঙলা ফিরে গড়তে হবে, পুরানো বাঙলায় চলবে না।" (নাট্যকারের দৃষ্টি যথার্থই দিব্য!) অবশ্য করিম কেবল বাঙলার দোষের দিকটাই দেখাইয়াছেন তাহা নহে, অনৈক্যের দুঃখে করিম অতি-আক্ষেপেই বলে- "এই বাঙলায় যদি তিন জনের দুমত দেখাতে পারেন, তাহলে নাকে খৎ দিয়ে, আফিঙ ছেড়ে দেবো; তবে ··ইহাও বলে —'বাঙলার বুদ্ধিও যেমন প্রখর, প্যাঁচও তেমনি ঝুড়ি ঝুড়ি। দ্বিতীয় অঙ্ক ষষ্ঠ গর্ভাঙ্কে—করিম সাধারণ ভাবে মনুষ্য-চরিত্রের দুজ্ঞেয়ত্বের প্রতি এবং বিশেষভাবে নবাবী ফৌজের পাহারাওয়ালাদিগের চরিত্রের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়াছে। "সমুদ্রের গর্ভে নজর যাবে, কিন্তু মানুষের পেটের মধ্যে সেঁধোনো তোমাদের কর্ম নয়। 'বড় জবর মাটির ছাল, বুঝেছ বাবা'।"—চিরকালের সত্য কথা। করিম সিরাজের অবস্থাটি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করে—যে ব্যাটার তিন কুলে কেউ নেই, সেই তো বাঙলার নবাব।—এই একটি মাত্র কথায় করিম বুঝাইয়া দেয়—নবাবটা কোথায় তা একবার কোনো খোঁজ নিলে না!

তৃতীয় অঙ্ক—প্রথম গর্ভাঙ্কে: ফরাসী ও ইংরেজ এই দুই জাতির চরিত্র-বৈশিষ্ট্য করিম তাহার স্বভাব-সিদ্ধ বক্রোক্তি দ্বারা ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করে। ফরাসীরা ইংরেজকে 'পড়সি', 'এক ধর্মের লোক' বলিয়া সহযোগিতা দেখায় বটে কিন্তু ইংরেজদের স্বভাব উল্টো। মুঁসালাকে করিম যাহা বলে ইংরেজের চরিত্রকে এক কথায় বলিতে গেলে ঠিক তাহাই বলিতে হয়—"এক

হাত গলায় আর এক হাত পায়ে দেওয়া" ইংরেজরা ছাড়া কোন জাতি পারে না। মুঁসালার কথাই ষোল আনা সত্য— "ইংরাজ চরিত্র সম্পূর্ণ বুঝিয়াছেন"— এক করিম চাচা, নবাবী কার্যে তাহার মত দুই চারি 'আদমী' থাকিলে— "আলিনগরের সন্ধি হইত না, ইংরাজ কলিকাতায় থাকিত না।" মুঁসালাকে বলার সঙ্গেই ইংরেজের প্যাঁচোয়া চাকটিকে চোখে আঙুল দিয়া করিম দেখায়—"তা হ'লে ব'লতে—'এই আমাদের ফৌজ এলো বলে, এই আমরা কোলকাতা উড়িয়ে দেব। নবাবী আমলাদের টাকা দিয়ে—থুড়ি, কতক দিয়ে কতক কব্‌লে হাত করতে, নবাবকেও একটু আধটু শাসাতে'। করিম শুধু ফরাসী ও ইংরেজদিগের—আচরণের উপর টিপ্পনি করিয়াই ক্ষান্ত হয় না—সিরাজের উপরও আলোক প্রক্ষেপ করে—"নবাব মদ ছেড়ে খালি ভাবছেন এ করি কি ও করি। এই দু'নৌকায় পা দিয়েই প্যাঁচে পড়েছে।" এত বিবেচনা না করিয়া হুকুম ঝাড়লেই·· "সব দাঁত ভাঙ্গা কউটে গর্তে সেঁধাতো"।—"শত্রু যত বাড়ছে, নবাবও তত জবুথবু হয়ে বিবেচনা কচ্ছেন।" করিম সিরাজের ভাবী পরিস্থিতিও ইঙ্গিতে স্পষ্ট জানাইয়া দেয়। 'আর মাতামহীর অনুরোধ রক্ষা করব না" বলিয়া সিরাজ সংকল্প করিবার পরেই করিম জানায়—"ঐ যে বেগম মহিষী আসছেন। বুঝি নবাবকে মীরজাফরের হাতে হাতে সপ্‌বেন। আহা আমলারা যে চলে গেল তা' না হলে একে একে সকলের হাতে হাতে সপতেন"। তৃতীয় অঙ্ক দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে—করিম চাচা সিরাজের নিরুপায় অবস্থাটির কথাও জানায়— এ ছোঁড়া পায়ে ধরলেও পাজী, আর কড়া হ'লে তো পাজীর পাজী। এখানেই করিমচাচা হোসেনকুলি-বধের, ফৈজি-হত্যার পক্ষে ছাপাই গায়। হোসেনকুলি-বধ নিষ্ঠুর কার্য সন্দেহ নাই কিন্তু হোসেনের আচরণ যে অসহ্য তাহাও মনে করা দরকার—'অন্দরে ঢুকে মা-মাসীর সঙ্গে গিয়ে বসবেন' ইহা বরদাস্ত করিতে না পারিলে দোষ দেওয়া যায় না। ফৈজির নিষ্ঠুর হত্যা আমাদের প্রাণে আঘাত দিতে পারে কিন্তু করিম চাচার ব্যঙ্গের খোঁচাটি—

"দেখছি তুমি চাচীর পার্শ্বে আর একজন চাচাকে বসিয়ে সেলাম দিতে পারো।"—কৈফি হত্যার অভিযোগের গুরুত্ব বেশ খানিকটা লঘু করিয়া দেয় তথা সিরাজের দিকটি ভাবিয়া দেখিতে বাধ্য করে। অধিকন্তু করিমচাচা স্বার্থ সন্ধানীদের সতর্ক করে "যে যার স্বার্থ তো টেঁকে আছো। আখেরে কতটা টেকবে তা একবার ভাবছ কি? ইংরেজের আসল উদ্দেশ্য কি তাহা চোখে আঙ্গুল দিয়া ধরাইয়া দেয়।......"সাদা চেহারা চেন না, শেষ পসতাবে, ওরা খুব দাঁওবাজ, ওদের কাছে কারো দাঁও চলবে না।" করিম ভবিষ্যদ্ দ্রষ্টার মত বলে—'ইংরেজের কোটের ল্যাজ্ ধরলে একুল ওকূল দু'কূল যাবে। দুধ কলা দিয়ে কালসাপের ঝাঁক পুষো না। সিরাজের পক্ষে করিম জোরালো ওকালতি করে—প্রমাণ করে "হিন্দুর সুবিধা মত নবাব তো এ নবাব ব্যাটার মত কেউ হয় নি" "সব বড় বড় কাজ হিন্দুর" এবং সিরাজ সম্পর্কে অমাত্যবর্গের যে আতঙ্ক তাহার জন্য দায়ী "নবাবের দোষ" নহে—অমাত্যদের 'মনের দোষ' করিম ইংরেজ অধীন বাঙালীর ভবিষ্যৎ যেন প্রত্যক্ষ করে—'জুতো টুতো খাওয়া? চাই বই কি। অন্নাভাবে মরা?—দুইটি প্রশ্নে বাঙলার ভাবী রাজনৈতিক মর্যাদা ও অর্থনৈতিক দুরবস্থা প্রতিফলিত। চতুর্থ অঙ্কে—চতুর্থ দৃশ্যে :—করিম বক্রতা ও আপাত-লঘুতা রক্ষা করিয়াই, গুরুত্বপূর্ণ কার্য করিতে অগ্রসর হয়—বাঙলার নবাবকে—সিরাজকে বাঁচাইবার জন্য প্রাণ দিতে অগ্রসর হয়। সিরাজের সহিত বেশ বিনিময় করে। হাসি যে কান্নারই একটা রূপ হইয়া ফুটিতে পারে এখানকার করিমচাচাকে না দেখিলে বুঝা যায় না—"এই দুঃসময়ে বকসিস নিতে এসেছি, আর কখন তো পিত্যেস রইল না"—কান্নারই শুষ্ক একটি রূপ। এখানেই জাতির প্রতি ধিক্কার ও অভিমান শ্লেষ হইয়া বাহির হয়। "জুতো জোড়াটার মর্যাদা বুঝলুম না"—রীতিমত একটি জুতোর আঘাত। সূক্ষ্ম আঘাত যাহার গায়ে না লাগিবে তাহার জন্য স্থূল আঘাতের বন্দোবস্তও আছে—"ইংরেজের বুট পায়ে জুতো দেখেও জুতোর মর্যাদা শিখ্‌লে না। অনেক বাঙালী

তায়াকেই বুটের মর্যাদাটা ঠেকে শিখতে হবে"...করিম রায়দুর্লভ তথা বাঙালী জাতিকে নেমকহারামির জন্য শেষ ধিক্কার দেয়—"নেমকহালাল চাচা, কি করবো মাটির দোষ। আমিও তো বাবা বাঙালী। দেখ্ছি বাবা সাত পুরুষের নেমক উগরে তুলে ফেলছে। আমি না হয় স্বকৃতভঙ্গ!"—অতি সত্য কথা; করিম চাচা—Commentary on the world of the drama"—নাটকখানির চরিত্রের ও ঘটনার মহাভাষ্যকার।

এই প্রসঙ্গেই আর একটি কাল্পনিক চরিত্রের কথা মনে আসে। চরিত্রটি সিরাজের প্রতিপক্ষীয়—নারী-চরিত্র জহুরা। জহরা নিজের নামটির তাৎপর্য নিজেই শুনাইয়াছে "প্রতিহিংসা জগতে জর্জরীভূত হ'য়ে জহরা নাম গ্রহণ করেছিলাম" জহরা পতিপরায়ণা রমণী'রই 'প্রতিহিংসায়-অন্ধ', "প্রেতিনী পিশাচিনী", নরক-সহচরী -মূর্তি। জহরা করিমের কাছে নিজের দুই সত্তার পরিচয় (অশোভনভাবে) ব্যাখ্যা করিয়াছে—"সে জহর নবাব শোণিতে ধুয়ে গিয়েছে, এখন আমি পতিপরায়ণা রমণী"। জহরা হোসেন কুলিখাঁর স্ত্রী—অদ্ভুত এক পতিপরায়ণা রমণী। আমির বেগের মত সকলের মনেই এ প্রশ্ন জাগে—"কি ভীষণ দেওয়ানা! হোসেন তো ঘসেটি আর আমিনা বেগমকে নিয়েই ছিলো, এর প্রতি তো ফিরেও চাইতো না"। জহরার অবস্থাটি জহরা নিজেই অবশ্য ব্যক্ত করিয়াছে—"হোসেন কুলি আমার স্বামী। তার অতৃপ্ত প্রেতাত্মা আমার সঙ্গে দিবারাত্র ভ্রমণ ক'চ্চে—তা'র উত্তেজনায় আমি এক মুহূর্ত স্থির নই... ...শোণিত-তৃষায় হা হা রবে সে আমার আহার নিদ্রা হরণ করেছে"। ঘসেটি ঠিকই দেখিয়াছে—প্রতিহিংসার আগুন ওর চক্ষে...সিরাজের শোণিত-তৃষায় ওর জিহ্বা শুষ্ক। "নারী প্রতিহিংসাপরায়ণা হইলে' কত ভীষণ হইতে পারে জহরা তাহারই দৃষ্টান্ত। ঘসেটি বোধ হয় এই প্রতিহিংসার উগ্ররূপ দেখিয়াই বলিয়াছে "নারী, নারীরই তো প্রতিহিংসা, প্রতিহিংসা আর কার?"

প্রতিহিংসা-পরায়ণতা জহরাতে অতি উৎকট মাত্রায় ব্যক্ত হইয়াছে।

শুধু যে নাটকীয় শয়তানী শক্তিতেই তাহার হৃদয় পরিপূর্ণ তাহা নহে, সে সর্বত্রগামিনী, বহুবেশধারিণী—দেশ-কাল-পাত্র'—কোনকিছুরই দ্বারা তাহার গতি-বিধি বাধিত হয় না। সিরাজের প্রশ্নের উত্তরে জহরা বেশ স্পষ্টভাবেই বলিয়াছে—"আমি সর্বত্র থাকি, আমি এক মুহূর্ত স্থির নই। বায়ু যেমন উত্তপ্ত হয়ে ঘূর্ণায়মান হয় আমিও তেমনি অন্তর-তাপে দিবা-রাত্র ঘূর্ণায়মানা।" এই সর্বত্রগামিতা মুর্শিদাবাদ এবং দেশীয় শিবিরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হইয়া থাকে নাই, পলাশী, ভগবানগোলা, কলিকাতা ফোর্ট উইলিয়াম-মধ্যস্থ গৃহ, গড়ের মাঠ সবই তাহার পায়ের তলায়।

দাসীর ছদ্মবেশে সে ঘসেটি-বেগমের অর্থ সরাইয়া লয়—সেই অর্থ ব্যয় করিয়া সৈন্য সঞ্চয় করে—ইংরাজ-সৈন্যকে অর্থ দেয়—প্রজাপুঞ্জকে অর্থ দ্বারা বশীভূত করে এবং সিরাজ-বিদ্বেষী করিয়া তোলে। ঘসেটি-বেগমের দ্বারা সিরাজের মোহর চুরি করিয়া সে সিরাজের নামে মিথ্যা পত্র লিখিয়া সিরাজের বিরুদ্ধে সমগ্র প্রজা শক্তিকে উত্তেজিত করিতে—প্রতি হৃদয়ে শয়তান জাগরিত করিতে—চেষ্টা করে। নিশা-যুদ্ধে সে ইংরাজ-বাহিনীকে পথ দেখাইয়া লইয়া যায়—গোলাগুলি তাহাকে আঘাত করে না (ক্লাইভের সম্মুখে সে দম্ভ করিয়াই বলে -"গোলাগুলি। এমন গোলাগুলি তোমাদের সৈন্যের নিকট নাই, নবাব সৈন্যের নিকট নাই, যে আমাকে আঘাত করবে।") যুদ্ধক্ষেত্রে সে নবাব-সৈন্য বিশৃঙ্খল করে। জহরা মিথ্যা বলেনা—আমি নারকীয় -শক্তিসম্পন্না, সয়তানকে আত্মবিক্রয় করেছি"। সত্যই হোসেন কুলির স্মৃতি তাহাকে 'সহস্রদানবায়বল" দিয়াছে।

জহরা শুধু সর্বত্রগামিনী, সর্বকার্যসাধিনীই নহে…জহরা প্রায় সবজান্তা। লোক চরিত্র তথা মনস্তত্ত্ব সে খুব ভালই বোঝে। বাঙলার রাজনৈতিক অবস্থাটি সে এত সুন্দরভাবে ক্লাইভকে বুঝাইয়া দেয় (চতুর্থ অঙ্ক ১ম গর্ভাঙ্ক দ্রষ্টব্য) যে স্বীকার না করিয়া উপায় নাই—তাহার 'দিব্যচক্ষু প্রস্ফুটিত… "বিধিলিপি…সম্পূর্ণ গোচর"। আশ্চর্যের কথা—এমন কি ক্লাইভের ধর্মপুস্তকের

উদ্ধৃতি দিয়া সে ক্লাইভকে মীরজাফরের মনস্তত্বটুকু বুঝাইয়া দেয়। ("তবে তোমাদের ধর্মপুস্তকে কি বলে? যদি রাজ্যলোভ দিয়ে, সয়তান মানুষকে নরকস্থ না করতে পারে তবে সে সয়তান সয়তান নয়।") [দেওয়ানাই বটে!] দেওয়ানাপনার উৎকৃষ্ট প্রকাশ দেখা যায়—পঞ্চম অঙ্কের চতুর্থ-গর্ভাঙ্কে—যেখানে জহরা বিশ্বাসঘাতক প্রভুহন্তা রায়দুর্লভ প্রভৃতিকে জন্মভূমি হিন্দুনাম, মুসলমান-নাম কলঙ্কিত করিবার জন্য—আলীবর্দীর বংশধরের সর্বনাশ করিবার জন্য, বংশধরকে হত্যা করিবার জন্য এবং পরিবারবর্গকে পথের ভিখারিণী করিবার জন্য তারস্বরে ধিক্কার দিয়াছে। হোসেনের কাছে মার্জনা চাহিয়া "পতন"-এ, জহরার অতিনাটকীয় জীবনের পরিসমাপ্তি।

*[জহরা-চরিত্রটি আত্যন্ত অতি-নাটকীয়। তাহার গতি-বিধি ও কার্য-বিধি সমান চমকপ্রদ। রোমাঞ্চ-রস দ্বারা ঐতিহাসিক ঘটনাকে রসিত করিতে যাইয়া নাট্যকার "irrational"-এর (অনৌচিত্যের) একশেষ করিয়া ছাড়িয়াছেন। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে রোমাঞ্চপ্রিয় জনসাধারণ জহরাকে যত তৃপ্তির সহিতই আস্বাদন করুক আধুনিক বাস্তবতা-প্রিয় জনসাধারণ জহরাকে লইয়া তেমন তৃপ্তি পাইবে না। জহরাকে লইয়া এত বাড়াবাড়ি করিবার কোন প্রয়োজনও ছিল না। করিমের সহিত এক হইয়া প্রত্যেক সমালোচকই বলিবেন—"ভ্যালা মোচ চাচা, খুব কারখানা দেখালে! তোমার অতটা না করলেও চল্‌তো। এই রাজা-রাজড়া, আমির-ওমরাও আর ঘসেটি বেগম হতেই কাজ রফা হতো!" দেখা যাইতেছে—নাট্যকার খুবই সচেতন—নিজেই নিজের সমালোচনা করিয়াছেন এবং যাহারা মনে করিবে যে একটা কাল্পনিক চরিত্র দিয়া নায়কের ট্র্যাজেডি সংঘটিত করা হইয়াছে তাহাদেরও সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। জহরা 'দেশ-কাল পাত্র' ঔচিত্যের গণ্ডী না ছাড়াইলে নাটকখানি ঐতিহাসিক বাস্তবতার মায়াঘোর আরও জমাট হইত। অসাধারণ (abonormal) চরিত্র সৃষ্টির অধিকার নাট্যকারের অবশ্যই আছে, কিন্তু চরিত্রের অস্বাভাবিকতা সকল নাটকেরই পক্ষে বড় দুর্বলতা।]

জহরার পরে লক্ষণীয় চরিত্র—**মীরমদন ও মোহনলাল**। দুইটি চরিত্রই একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ; সুতরাং একই বন্ধনীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করিয়া আলোচনা করা যাইতে পারে। উভয়েরই এক কথা "প্রতিপালক উচ্চপদদাতা মর্যাদাদাতা নবাবের মঙ্গল কামনা একমাত্র আমাদের অভিপ্রায়।" স্বদেশ প্রীতির-একবৃন্তে দুইটি সুরভিত পুষ্প। বাঙলার মঙ্গলের জন্য নবাবের মঙ্গলের জন্য তাহারা ধন প্রাণ দেশ সব-কিছু ত্যাগ করিতে প্রস্তুত। ইংরেজ-আধিপত্যের অমঙ্গল উভয়ের চোখেই সুস্পষ্ট…জন্মভূমি হতে অর্থোপার্জন ক'রে স্বদেশে প্রেরণ কচ্ছে, রাজার ন্যায় বঙ্গভূমি অধিকার কচ্ছে, বাটা প্রদান না করে টাকা মুদ্রণ কচ্ছে, শুল্ক প্রদান করে না, ইংরেজের যা লাভ সমস্তই বঙ্গবাসীর ক্ষতি।"

"নবাব-কার্যে দেশের কার্যে যদি প্রাণ ত্যাগ করবার সুযোগ হয়, সে সুযোগ আমরা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি"—উভয়েরই ঐকান্তিক ও আন্তরিক কামনা। স্বদেশের কার্যে নবাবকার্যে উভয়েই প্রাণ দেন—মীরমদন পলাশী-প্রান্তরে গোলার আঘাতে আর মোহনলাল মীরজাফরের আদেশে ঘাতকের তরবারি-আঘাতে। মোহনলাল-মীরমদন স্বদেশ-প্রেমের প্রদীপ্ত শিখা। মোহনলাল নিজ মুখে না বলিলেও সকলেই স্বীকার করিয়াছেন তিনি "রাজভক্ত স্বদেশভক্ত…'বঙ্গবাসী-হৃদয়ে চির আসন'…'ঘাতকের অস্ত্রে হত হ'য়ে (আমার) দম্ভ নষ্ট হইবে না'। ক্লাইভ পর্যন্ত মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন—"you are a brave soldier. সত্যিই বলিয়াছেন—মৃত্যুতে আপনার গৌরব খর্ব হইবে না—you are a patriot"। *[তবে মীরমদন মোহনলালের রাজভক্তি বা স্বদেশভক্তি যত প্রশংসনীয়ই হউক, শিল্পিত চরিত্র হিসাবে উহাদের ত্রুটি আছে এবং সেই ত্রুটি এই যে—তাহারা নিজেদের গুণের কথা নিজেরাই খুব বেশী করিয়া বলিয়াছেন। একটু কম মুখর হইলেই তাহারা চরিত্র হিসাবে প্রশংসনীয় হইতে পারিতেন।]

মীরমদন-মোহনলালের উলটো দিক—**মীরজাফর, জগৎশেঠ, রাজবল্লভ,**

রায়দুর্লভ প্রভৃতি স্বার্থসর্বস্ব, "বেইমান বিশ্বাসঘাতক কুলাঙ্গার", লজ্জাহীন নীচাত্মার দল। স্বার্থ সিদ্ধি ছাড়া আর কোন মহৎপ্রবৃত্তি ইহাদের নাই। সকলেই গোপনে গোপনে নিজ স্বার্থ সম্প্রসারণে ব্যস্ত। জহরার মুখে ইহাদের বিবরণ পাওয়া যায়—"বিশ্বাসঘাতী ষড়যন্ত্রকারীরা এক স্বার্থে চালিত নয় সেনানায়ক বিশ্বাসঘাতক ইয়ারলতিফও পত্র লিখেছে—"নবাবী আমায় দাও" মীরজাফরও পত্র লিখেছে—"নবাবী আমায় দাও"; রাজবল্লভ স্বয়ং রাজা হ'তে চায়... রায়দুর্লভ জগৎশেঠ মহাতাবচাঁদ ও স্বরূপ চাঁদ, মাণিকচাঁদ সকলেরই মনোগত কিসে রাজ্য করগত হবে! **রাজ্য করগত করা রাজ্যের মঙ্গলার্থে নয়, দুর্দান্ত নবাবকে দমন করবার জন্য নয়, প্রজার শান্তির জন্য নয়—স্বার্থের জন্য**।... সে স্বার্থ বাঙলার, হিন্দু-মুসলমানের নয়, অতি হীন স্বার্থ, সেই হীন স্বার্থের আচরণে সকলে অন্ধ হ'য়েছে।"

মোহনলাল মীরজাফর সম্বন্ধে যে মন্তব্যটুকু করিয়াছে—সেই মন্তব্যটি—"যে রাজ্যলাভে মান, মর্যাদা জাতীয়তা, স্বদেশ গৌরব, মুসলমানের গৌরব সামান্য বণিকের পদে অর্পণ করেছে সে যে পিশাচের ক্রীতদাস তা কি অবগত হওনি?"—উহাদের সকলের সম্পর্কেই কম-বেশী প্রযোজ্য। মীরজাফর তো সকলের সেরা—কোরাণ স্পর্শ করিয়া মিথ্যা শপথ করিতেও সে পশ্চাৎপদ নহে। তবে 'ক্লাইভের গর্দভ' হাতে হাতেই দেশদ্রোহিতার ফল ভোগ করিয়াছে—এই যাহা সান্ত্বনা।

এই প্রসঙ্গেই উমিচাঁদকে স্মরণ করা যাউক। **উমিচাঁদ** অর্থলোভী বণিক-শ্রেণীর চিরন্তন আদর্শ। ইহাদের কাছে অর্থই পরমার্থ—আর সব-কিছুই অবান্তর। ইহাদের চিরন্তন সঙ্কল্প—"আমি আর এক কাণাকড়িও ছাড়বো না।" অর্থের জন্য এই শ্রেণীর লোক না করিতে পারে এমন কোন কাজ নাই। ...মুনাফার লোভে ইহারা দেশ ধর্ম বিবেক সব-কিছুই বিসর্জন দিতে পারে। [**শেঠ সমস্যা শুধু আজকের সমস্যাই নয়**।] 'মাগ-ছেলে' মরিলেও ইহারা সহিতে পারে কিন্তু টাকা খোয়া গেলে প্রত্যেক উমিচাঁদ বুক চাপড়াইয়া

কাঁদে—"ওরে বুক ফেটে গেল—বুক ফেটে গেল।" টাকা টাকা করিয়াই ইহাদের প্রাণ যায়। উমিচাঁদেও ব্যতিক্রম ঘটে নাই।

সওকৎজঙ্গ। তারপর এই সকল চরিত্রহীন চরিত্রের দলের মধ্যে **সওকৎজঙ্গের** নামটা কম উল্লেখযোগ্য নহে। সওকৎজঙ্গ সম্বন্ধে ঐতিহাসিকরা যাহা বলিয়াছেন তাহাই অনুবাদ করিয়া বলা চলে,—মূর্খের দাম্ভিকতা উন্মাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষ, অবাধ কামুকতা, বে-সামাল বাচালতা ও মাতলামি দিয়া সওকৎজঙ্গ চরিত্র গঠন। (ignorant pride, insane ambition uncontrollable passions. looseness of tongue and addiction to drink. History of Bengal—Sarkar.) সওকৎজঙ্গের চরিত্র সম্বন্ধে এইটুকুই যথেষ্ট।

এইবার আমরা চরিত্র-বিচারের রায় দিতে অগ্রসর হইতে পারি। প্রথমেই এ কথাটি বলা যাইতে পারে যে নাট্যকার **আদর্শায়ণের মাত্রা সবক্ষেত্রে স্বাভাবিকতার পরিধির মধ্যে রাখিতে পারেন নাই**; ফলে প্রচার-প্রবণতা শিল্প-সৌন্দর্যকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে। [সিরাজ, মীরমদন মোহন, লাল, জহরা] দ্বিতীয়তঃ কোন কোন চরিত্রে (জহরা, লুৎফা, উমিৎ) অতি নাটকীয়তার ছাপ খুবই গাঢ়ভাবে পড়িয়াছে। বাস্তবতা অপেক্ষা ভাব-প্রকাশের দিকে অধিকতর লক্ষ্য থাকায় চরিত্রগুলি ভাবের দিক দিয়া যতটা সংলক্ষ্য হইয়াছে- ঔচিত্যের দিক দিয়া ততটা প্রশংসনীয় হয় নাই। কোন কোন চরিত্র [আলিবর্দী-বেগম আমিনা, রাজবল্লভ, রায়দুর্লভ, মাণিকচাঁদ] বেশ বর্ণহীন, কয়েকটি [জহর, দানসা, করিম] বেশী কম অতিরঞ্জিত, অবশ্য জহরা ছাড়া বাকী তিনটি চরিত্র অতিরঞ্জিত হইলেও আপত্তিকর নহে। বর্ণ-লেপ ব্যাপারে অ-যোগ ও অতিযোগ পরিহার করিতে পারা প্রথম শ্রেণীর শিল্পীর পক্ষেই সম্ভব। নাট্যকারে সেই প্রথম শ্রেণীর শিল্পীর মাত্রাজ্ঞান এখানে পাওয়া যায় না।

চরিত্রের উৎকর্ষের পক্ষে বাস্তবিকতা সকল যুগেই অন্যতম অপরিহার্য গুণ।

—বিশেষতঃ ঐতিহাসিক ও সামাজিক নাটকের চরিত্রের পক্ষে তো বটেই। পাত্র-পাত্রীগুলি আরও স্থান-কাল-পাত্রোচিত আচরণ করিলে অর্থাৎ ভাবে ভাষায় আরো বাস্তবিক হইলে নাটকখানির গুরুত্ব ও আবেদন আরো যে বৃদ্ধি পাইত এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তৃতীয়তঃ প্রধান বক্তব্য এই যে প্রধান চরিত্রে গভীর অন্তর্দ্বন্দ্ব বা ভাব গভীর জটিলতা ব্যক্ত হয় নাই। এবং হয় নাই বলিয়া, নাটকখানি 'উচ্চাঙ্গের ট্র্যাজেডি'তে পরিণত হইতে পারে নাই।

কল্পনা ও ভাবনা

কল্পনা-বৈভব বলিতে আমরা, সাধারণতঃ অর্থাৎ সংকীর্ণ অর্থে, আবেগের বা উপলব্ধির রূপকল্পনাময় কাব্যিক তান-বিস্তারটুকু বুঝিয়া থাকি। ইহাকেই অন্যভাবে—প্রচলিত ভাষায় বলা হয় 'কাব্যিকতা'—(poetic expression)। কিন্তু কল্পনাকে ঠিক এইভাবে সমগ্র রূপটি হইতে পৃথক করিয়া দেখা সম্ভব নহে। কারণ কল্পনাশক্তি অন্তরাত্মার মত দেহের সমগ্র-সৃষ্টির মধ্যে আপনাকে ব্যাপ্ত করিয়া দিয়া বিরাজ করে। **চরিত্র, ভাব, ভাষা, সব কিছুই কল্পনারই এক একটা খণ্ড অংশ, ঐ সকলের সমবায়েই কল্পনার অখণ্ড রূপ।** ব্যাপক অর্থে কল্পনা, ক্রোচের—"expression" বা intuition বলা যায়। কাব্যিকতা না থাকিলেও উচ্চাঙ্গের কল্পনা-শক্তি যে প্রকাশ পাইতে পারে—অতি আধুনিক সামাজিক নাটকাদি দেখিলেই তাহা বুঝা যায়। দৃশ্যকাব্যে (নাটকে) কাব্যিকতার অভাব সত্ত্বেও, তীব্র ও গভীর জীবনের রূপ-পরিকল্পনা অবশ্যই থাকিতে পারে। সিরাজদ্দৌলা নাটকের কথাই ধরা যাউক। সিরাজদ্দৌলা নাটকে—সিরাজদ্দৌলা, করিম চাচা, জহরা, প্রভৃতি চরিত্র পরিকল্পনার মধ্যে কম কল্পনা-শক্তি প্রকাশ পায় নাই। আর এই সকল চরিত্রের অভিব্যক্তিতে অর্থাৎ ভাবে-ভাষায় ও ভাবনায়, কল্পনা-শক্তির কম কাজ দেখা যায় না। তবে অবশ্যই এ কথা স্বীকার করিতে হইবে,—

'রবীন্দ্রনাথ বা দ্বিজেন্দ্রলালের পাত্র-পাত্রীর মত, কোন চরিত্র কবিত্বময় ভাষায় ভাবাবেগ ব্যক্ত করে নাই। সেই হিসাবে, বলা বাহুল্য, গিরিশচন্দ্রের নাটকে কবিত্বের মাত্রা কম। সিরাজদ্দৌলা নাটকে সেইরূপ কবিত্বের মাত্রা আরো কম—নাই বলিলেও অত্যুক্তি বলা হয় না। পূর্বেই বলা হইয়াছে—কবিত্বের অভাবে "literary success" কম হইতে পারে বটে কিন্তু stage success-এ অর্থাৎ ভাল নাটক হওয়ার পক্ষে, কবিত্বের অভাব তেমন কোন বাধা নহে। যে বিশেষ জীবনের রূপ উপস্থাপিত করা নাটকের উদ্দেশ্য, সেই জীবনটি যদি নাটকে স্বরূপতঃ দৃশ্য হইয়া উঠে তাহা হইলেই নাটককে সমর্থ সৃষ্টি বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।

ভুলিলে চলিবে না—নাটক সাধারণভাবে জীবনের সমালোচনা বটে, কিন্তু বিশেষভাবে জীবনের প্রত্যক্ষ অর্থাৎ দৃশ্য রূপ।

ভাব পরিধি

সিরাজদ্দৌলা নাটকের "ভাব বস্তু" আলোচনা করিবার পূর্বে এই কথাটি মনে রাখা দরকার যে, ধানের খেতে বেগুন খুঁজিতে গেলে পণ্ডশ্রম হওয়ার দুর্ভাগ্য অনিবার্য। সব নাটকেই এক রূপ রস বা ভাব থাকিবে—এ কথা কোন রসিকই মুখ ফুটিয়া বলিবেন না। সাহিত্য জীবন-সমীক্ষা এ কথা সত্য, এই সমীক্ষা যত গভীর হয়, তত সাহিত্যের মহত্ত্ব বৃদ্ধি পায় সে কথাও সত্য কিন্তু এ কথাও তত সত্য—সব ক্ষেত্রেই সব-কিছু সৃষ্টির অবকাশ থাকে না, আর থাকিলেও খুব বেশী থাকে না। সব নাটকই—বিশেষতঃ ঐতিহাসিক বা সামাজিক সমস্যা-মূলক নাটক, বিশেষ একটি উদ্দেশ্যের অভিমুখী হইয়া গড়িয়া উঠে। এই সকল নাটকে জীবনদর্শন, পরাদর্শন সব কিছুই প্রবেশ করিতে পারে বটে, কিন্তু ইহাদের বিশেষ উদ্দেশ্যের "ফোকাস" থাকে, ঐতিহাসিক ঘটনা বা সামাজিক সমস্যার উপরে। ঐতিহাসিক বা সামাজিক সমস্যা মূলক নাটকের উদ্দেশ্যকে এই হিসাবে ঠিক একক বলা যায় না; উহা —দ্বৈত, এক লক্ষ্যে—ইতিহাস বা সমস্যা, অন্য লক্ষ্যে—

—জীবন সমীক্ষা ও রস নিষ্পত্তি, যদিও "হিষ্ট্রি-প্লে" (History play) এবং ঐতিহাসিক ট্র্যাজেডি এবং কমেডির মধ্যে অনেকে সীমা-রেখা নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিয়াছেন তবু শেষ পর্যন্ত বলিতে বাধ্য হইয়াছেন—"The term 'history play' is difficult of precise theoretic limitation and in practice, the differentiation of the strict members of this new type from those plays on historical subjects which follow the more conservative rules of Comedy and Tragedy, is a task approaching impossibilities"—Tudor Drama C. F. Tucker Brooke। অর্থাৎ ইতিহাস-নাট্য (History) এবং ঐতিহাসিক ট্র্যাজেডি বা ঐতিহাসিক কমেডির মধ্যে সীমারেখা টানা অসম্ভব—কারণ "ইতিহাস-নাট্য" যে পরিমাণেই ইতিহাসের নাট্য-রূপ হউক -ট্র্যাজেডি-রসের বা কমেডি-রসের দুই মেরুর এক দিকে উহাকে অগ্রসর হইতেই হইবে।

এখন এই কথাটি গোড়াতেই স্বীকার করিয়া লওয়া দরকার যে ঐতিহাসিক নাটকের ভাব-সত্যের জগৎকে মোটামুটি দুইটি পরিমণ্ডলে ভাগ করিয়া দেখা সম্ভব। একটি ঐতিহাসিক সত্যের—(econo-political truths) অন্যটি জীবন সত্যের (দার্শনিক ও মনস্তাত্ত্বিক সত্য)। যে নাটকে দুইটি পরিমণ্ডলই সম্পূর্ণ আকারে প্রকাশিত হয়, সেখানে সোনায় সোহাগা, কিন্তু উর্দ্ধতন পরিমণ্ডল না থাকিলেও অর্থাৎ দার্শনিক চিন্তা ভাবনা তেমন না থাকিলেও ঐতিহাসিক সত্যের সম্ভাবেই, ঐতিহাসিক নাটক যথেষ্ট ভাব-গম্ভীর ও মর্যাদাসম্পন্ন হইতে পারে। সিরাজদ্দৌলা-নাটকে গভীর দার্শনিক চেতনা, ও মনস্তাত্ত্বিক সত্যের অবতারণা একরূপ নাই বলিলেই চলে। [করিম চাচার মুখে—এক স্থলে অদৃষ্ট শক্তির ও আর এক স্থলে—মনুষ্য-চরিত্রের রহস্যের সামান্য উল্লেখ দেখা যায়। সিরাজের মধ্যে মাত্র একস্থলে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস এবং পাপের পরিণাম

সম্পর্কে চেতনা দেখা যায়।] ইহার ভাব-সম্পদ, সমকালীন আর্থ-রাজনৈতিক পরিবেশটির সুষ্ঠু উপস্থাপনার মধ্যে, জাতীয় চরিত্র বিশ্লেষণের মধ্যে এবং জাতীয়তা (বিশেষ একটা sentiment উদ্বোধনের প্রচেষ্টার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। এ কথা অবশ্য স্বীকার্য যে উল্লিখিত ভাব সত্যগুলি প্রাদেশিক অর্থাৎ ইহাদের সার্বজনীন আবেদন নাই।) ইহারা একান্তই বাঙলা দেশের বা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক বাসনা তৃপ্ত করিয়া থাকে। আর একথাও বলা চলে যে—গভীর কোন সাধারণ সমাজ-দর্শন—সমাজ-নীতিগত আদর্শ নাটকের মধ্যে আলোচিত হয় নাই। এই হিসাবে সাধারণ ভাব সম্পদের দিক দিয়া নাটকখানি খুব সমৃদ্ধ হইয়া উঠে নাই।

তবে বিশেষ বা প্রাদেশিক ভাব-সম্পদের দিক দিয়া নাটকখানি একেবারে নিঃস্ব নহে। প্রথমতঃ সিরাজদ্দৌলার সমসাময়িক সামন্ততান্ত্রিক, আর্থ রাজনৈতিক পরিস্থিতিটা নাটকে খুব প্রশংসনীয় মাত্রায় উপস্থাপিত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ বাঙালীর জাতীয় চরিত্রে দোষ-গুণ নির্মমভাবে বিশ্লেষিত করা হইয়াছে। তৃতীয়তঃ-জাতীয়তা স্বদেশপ্রীতির মহিমা উচ্চে তুলিয়া ধরা হইয়াছে। চতুর্থতঃ পরাধীনতাকে ধিক্কার দেওয়া হইয়াছে এবং ইংরেজ অধীন ভারতবাসীর রাজনৈতিক-আর্থনৈতিক জীবনের রূপটিরও ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে---(জুতো-টুতো খাওয়া ?...অন্নাভাবে মরা ?—ক্রমে।।

পঞ্চমতঃ-হিন্দু মুসলমানকে একজাতি চেতনায় উদ্বুদ্ধ করিবার তথা জাতি চেতনার পরিধিকে, ধর্মগোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ না করিয়া দেশ গত কৃষ্টি গত ঐক্যের সীমা পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত করিয়া দেওয়ার চেষ্টা দেখা যায়। ধর্ম নিরপেক্ষ জাতি গঠনের আদর্শটি নাটকে যথাসম্ভব জোরের সহিত প্রচারিত হইয়াছে। বাঙলার হিন্দু মুসলমান এক স্বার্থে আবদ্ধ—দেশের পরাধীনতায় উভয়েরই সমান অমঙ্গল এবং হিন্দু মুসলমান ধর্মবিদ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া উচ্চ স্বার্থে চালিত না হইলে—সাধারণ শত্রুর প্রতি একতায় খড়্গহস্ত না হইলে...জাতির অমঙ্গল অনিবার্য—এই ধরনের ভাব-সত্য নাটকে

প্রচুর পরিমাণেই পরিবেশিত করা হইয়াছে। ষষ্ঠতঃ হিন্দু মুসলমানের মধ্যে একজাতিবোধ উদ্বুদ্ধ করিয়া বৈদেশিক শক্তির (ইংরেজের) কবল হইতে দেশের স্বাধীনতা উদ্ধার করিবার প্রেরণা পরোক্ষভাবে সঞ্চার করা হইয়াছে। ফিরিঙ্গি বাঙলার দুষমণ—এই সকল ঘোষণা ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনের আগুনে ঘৃতাহুতির কাজ করিয়াছে। ইংরেজের বিরুদ্ধে এত উগ্র বিষ গিরিশচন্দ্রের আগে এবং পরেও বটে, আর কোন নাট্যকার এত তীব্রভাবে উদ্‌গীরণ করিয়াছেন কি না সন্দেহ। ইংরেজের জাতীয় চরিত্রের উপর—ভেদনীতির কূট কৌশলের উপর নাট্যকার গিরিশচন্দ্র উচ্চশক্তির আলোক প্রক্ষেপ করিয়া ইংরেজ জাতির স্বরূপটি অতি স্পষ্টভাবে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিয়াছেন তথা ভারতীয় স্বাধীনতা-আন্দোলনে গতিবেগ সঞ্চার করিয়াছেন।

বাস্তবিক—এই সকল ভাব-সত্যের মধ্য দিয়া নাট্যকারের অধিমানসিক অভিযোজনের একটি বিশেষ দিক প্রকাশ পাইয়াছে। দেশের স্বাধীনতা-আন্দোলনে নাট্যকার তাহার নিজ ক্ষেত্রে থাকিয়াই অর্থাৎ শিল্পের মধ্য দিয়া, অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। জাতির রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষাকে—হিন্দু মুসলমানকে এক জাতিবাদে দীক্ষিত করা, হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের দ্বারা ফিরিঙ্গি-শক্তিকে (ইংরেজ) পর্যুদস্ত করিয়া স্বাধীনতা উদ্ধার ও রক্ষা করা এমনি সব আকাঙ্ক্ষাকে—নাট্যকার যথাসম্ভব তীব্র আবেগেই ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সিরাজদ্দৌলাকে বিষয়-বস্তু হিসাবে নির্বাচন করিয়া এবং বিষয়-বস্তুকে যথাযথভাবে উপস্থাপিত করিয়া নাট্যকার খুবই যে সাহসের ও সমাজ-সচেতনার পরিচয় দিয়াছেন এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। ইংরেজের শাসনাধীনে থাকিয়া ইংরেজের তীব্র সমালোচনা করা খুবই দুঃসাহসের কাজ। অনেক কথা কাটছাট দিয়াও যাহা আছে তাহাতে ইংরেজ বিদ্বেষের ঝাঁঝ ও তীব্রতা কমে নাই—ইংরেজের

পক্ষে যে খুবই অসহ্য—'proscribed' করিবার ইতিহাসই তাহার প্রমাণ।* কেহ হয়ত বলিতে পারেন—যেহেতু জহরা ক্লাইভের নিকট যে উক্তি করিয়াছে ("ভারতবর্ষে দীন প্রজা দিবারাত্র হাহাকার করছে, ভারতবর্ষ শক্তিহীন······ সেই শান্তি স্থাপনের ভার ঈশ্বর তোমাদের উপর প্রদান কচ্ছেন) তাহাতে ইংরেজ তোষণের মনোভাব ব্যক্ত হইয়াছে; পঞ্চম অঙ্কের পঞ্চম গর্ভাঙ্কে নাগরিকগণের উল্লাস-গীতিতে, ইংরেজ-মহিমাই ধ্বনিত হইয়াছে—"এরা রাজার রাজা পালনে প্রজা, ছোট বড এক সমান"—ইংরেজ-প্রশস্তির পরাকাষ্ঠা। সেই হেতু গিরিশচন্দ্রকে প্রগতিপন্থী না বলিয়া প্রতিক্রিয়াশীল বলাই উচিত কিন্তু তাহাকে মনে রাখিতে বলি—সমগ্র নাটকের যে সুর সেই সুরের তুলনায় এই দুই একটা ধ্বনি অতিশয় নগণ্য। ইংরেজ আমলে ইংরেজ-রাজপুরুষদিগের চোখে ধুলো দেওয়ার যে প্রয়োজন আছে তাহা ভুলিয়া গেলে চলিবে না। নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ইংরেজ সমালোচনায় যেখানে নির্মম সেখানেই আসল প্রগতিশীল গিরিশচন্দ্রকে পাওয়া যাইবে।

* বিষয়বস্তুর প্রতি নাট্যকারের এই মনোভঙ্গী,—বিষয়বস্তুর সহিত জাতির গভীর আবেগের সম্পর্ক; জাতির ঐকান্তিক আবেগের পরিতর্পণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া 'বস্তুর' উপস্থাপনা এবং সক্ষম উপস্থাপনা ভাবের ও রসের গাম্ভীর্য, সমস্ত মিলিয়া নাটকখানিকে এমন একটি অর্থ-গৌরবে মণ্ডিত করিয়াছে যাহা অতি-নাটকীয়তার কলঙ্কলেখাকে আপনার মধ্যে পোষণ করিয়া লইয়া ট্র্যাজেডির ভাবদ্যুতিকেই বিচ্ছুরিত করিয়াছে।

বিল্বমঙ্গল ঠাকুর

আমাদের এই দেশ—ভারতবর্ষের প্রাচীন যুগকে এক হিসাবে 'হারিয়ে গেছে সে সব অব্দের' যুগ বলা যাইতে পারে। কারণ প্রায় বিষয়েরই অব্দ সম্বন্ধে ইতিবৃত্ত স্তব্ধ হইয়া আছে। অতি পুরাতন অতীতের কথা সম্বন্ধে তো কথাই নাই, সামান্য অতীতের ঘটনা সম্বন্ধেও 'পণ্ডিতেরা বিবাদ করে ল'য়ে তারিখ সাল'। এইরূপ অবস্থায় কবিরা অবশ্য 'গেছে যদি আপদ গেছে মিথ্যা কোলাহল'—বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন, কিন্তু সমস্যা তাঁহাদেরই যাঁহারা ঐতিহাসিক অথবা সমালোচক যাঁহারা স্রষ্টাকে ও সৃষ্টিকে সম্যকভাবে জানিতে চাহেন এবং চাহেন "বলিতেই উহার 'কবে-কি-কেন' না জানিয়া স্বস্তি পান না। ইঁহারা—গেছে যদি আপদ গেছে" তখনই মুখে আনিতে পারেন যখন ইঁহাদের মুখে কালি মাখিবার পুঠা ও মুখ দেখাইবার ইচ্ছা একেবারেই চলিয়া যায়। এই কারণেই কবিরা যেখানে নিশ্চিন্ত সমালোচকেরা সেখানে দুশ্চিন্তিত হন এবং 'খুব সম্ভবতঃ' বা 'মনে হয়'—এইরূপ কোনকিছুর শরণ লইয়া মুখ রক্ষা করিয়া থাকেন। বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের—'কবে-কি-কেন' সম্বন্ধেও এই সমস্যা। ঐতিহাসিকরা তাহার সম্বন্ধে একটি কথা খুব জোর করিয়া বলিতে পারেন এবং তাহা এই যে তাঁহার সম্বন্ধে জোর করিয়া বিশেষ কিছুই বলিতে পারা যায় না। তবে 'যতটুকু জানা যায়'—যোগে এইটুকুই বলা যায় যে 'লীলাশুক' নামে একজন (একাধিকও থাকিতে পারেন) কবি ছিলেন এবং খুব সম্ভবতঃ নবম হইতে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যে কোন এক অব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া কোন এক অব্দে পরলোক গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার-লেখা গ্রন্থের আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য হইতে এইটুকু অনুমান করা যাইতে পারে যে—গ্রন্থোল্লিখিত 'দামোদর' ও 'নীবী' যথাক্রমে পিতা ও মাতা, ঈশানদেব গুরু এবং প্রথম শ্লোকে-বন্দিত 'সোমগিরি'—দীক্ষাগুরু। কবি নিজে 'লীলাশুক' বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছেন

কিন্তু 'বিল্বমঙ্গল' নাম কখনও করেন নাই। লীলাশুক ও বিল্বমঙ্গল পৃথক ব্যক্তি কি না এইরূপ সন্দেহ স্বাভাবিক,—কিন্তু স্থানীয় কিংবদন্তীতে উভয়েই এক হইয়া আছেন, ইহার অধিক যাহা জানা যায় তাহা কিংবদন্তী মাত্র। * [(Beyond this nothing authentic is known of the date and personal history of our author ; although many regions and monas.ic orders of Southern India claim him and have their local legends to confirm the claim ; and reliance on this and that legend wouldenable one to assignhim to different periods of time ranging from the 9th to the 1 th Century— History of Sanskrit Literature, vol. I, edited by, S. N. Dasgupta ; Contributors—Dr. S. N. Das Gupta & Dr. S K. Dey, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত এবং আচার্য শ্রীযুক্ত সুশীল কুমার দে মহাশয় সম্পাদিত 'কৃষ্ণ কর্ণামৃত' গ্রন্থেও (গোপালভট্টের "কৃষ্ণবল্লভা", চৈতন্যদাসের সুবোধনী এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'সারঙ্গরঙ্গদা টীকা সমেত) দেখা যায় — (Not much authentic information is available with regard to the auther himself. Pious legends connect him with different monastic orders and envelop his personality in a shroud of myth, but his exact date as well as the sect to which he belonged has not yet been determined. Some legends connect him with Calicut and with the temple of Padmanabha at Trivandram, while another tradition makes him a pupil of Padmapada at the Sankarite monastery at Trichur.—(XXVII —VIII))]

কিন্তু আসল কথাই এই যে বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের জীবন-চরিত বলিতে যাহা পাওয়া যায়, কিংবদন্তীই উহার প্রায় সবখানি।

যে ঘটনা কিংবদন্তীরূপে রটিত হইয়া বিল্বমঙ্গলকে রাগমার্গীয় বৈষ্ণব সাধকদিগের অন্যতম উত্তরসাধকের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে সেই ঘটনাটিই

স্বদেশ দাক্ষিণাত্যে এবং সুদূর উত্তরাপথে বিল্বমঙ্গলের ব্যক্তিজীবনের সর্বোত্তম স্মরণীয় ঘটনা হইয়া আছে। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত লীলাশুকের অবিস্মরণীয় কীর্তি—সাধক কবির ভাবতন্ময়তার অপূর্ব ও অক্ষয় প্রকাশ বটে, কৃষ্ণদাস কবিরাজের ভাষায় বলা যাউক…'কর্ণামৃত সম বস্তু নাহি ত্রিভুবনে' এবং 'বৈষ্ণব সকল পড়ে কৃষ্ণকর্ণামৃত'……—এ সবই সত্য, কিন্তু ইহা যেন 'এহ বাহ্য', বিল্বমঙ্গল সম্বন্ধে 'আগে' কিছু কহিতে গেলেই এই কিংবদন্তীর কথাই বলিতে হইবে। কারণ সেখানেই আছেন আমাদের সেই বিল্বমঙ্গল ঠাকুর যিনি চিন্তামণি-কামকে চিন্তামণি-প্রেমে পরিণত করিয়া কৃষ্ণলীলারসে আপন সত্তাকে সম্পূর্ণরূপে রসিত করিয়া তুলিয়াছিলেন—যিনি অখিলরসামৃতমূর্তি গোপীবল্লভ রাধাকান্তের নিত্যলীলা দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করিয়া 'একটি প্রেমের মাঝারে·· সকল প্রেমের গীতি' মিশাইয়া দিয়া, সকল প্রেমের শান্তি লাভ করিয়াছিলেন—যাঁহাকে লাভ করিলে অন্য কোন লাভকে আর লাভ বলিয়া মনে হয় না, তাঁহাকেই লাভ করিয়াছিলেন।

কিংবদন্তীর উৎস: এই কিংবদন্তীর উৎস-সন্ধানে অগ্রসর হইলে আমাদের ক্রমে ক্রমে দাক্ষিণাত্যেই পৌঁছিতে হইবে। বিল্বমঙ্গল ঠাকুর দাক্ষিণাত্যের অধিবাসী। তাঁহার গ্রন্থ শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের উপর যে-সকল দাক্ষিণাত্য টীকাকার টীকা রচনা করিয়াছেন তাঁহারাই এ ক্ষেত্রে আমাদের শরণ্য। আমরা জানি—দাক্ষিণাত্যে, শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের উপর যিনি প্রথম টীকা (সংস্কৃত) লেখেন তাঁহার নাম পাপল্লয় সূরি [আনুমানিক হিসাবে—পঞ্চদশ শতাব্দীর লোক]—Papayllay Suri appears to have lived considerably later than the middle of the 14th century—S K. Dey]। টীকার নাম—সুবর্ণচষক। তারপর—(মালয়লম ভাষায়?) 'সুবর্ণপাত্রী' নামে টীকা লেখেন ব্রহ্মভট্ট (আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রী কে, রাম পিষারতি কর্তৃক প্রদত্ত সংবাদ)

দাক্ষিণাত্যের ও উত্তর ভারতের টীকা

—'কৃষ্ণানন্দ প্রকাশনী'-নামক টীকা লেখেন অজ্ঞাতনামা কোন ব্যক্তি এবং 'প্রপা'-নামক টীকা লেখেন জনৈক শঙ্কর। এই কয়জন দাক্ষিণাত্যের টীকাকার।

উত্তরভারতেও একাধিক টীকা রচিত হইয়াছিল। এই সকল টীকা সম্বন্ধে কোন কথা বলার আগে শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত পুঁথির আবিষ্কার ও উত্তরায়ণ (উত্তরভারতে আনয়ন) সম্বন্ধে কিছু বলা একান্তই আবশ্যক। এক প্রেমপাগল প্রেমভক্তি-নিধি শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, আর এক প্রেমপাগল সেই প্রেম-নিধিকে দাক্ষিণাত্যের কৃষ্ণবেণ্বা নদীর তীরবর্তী করিয়াছিলেন। এই প্রেমপাগল দেবমন্দিরে যাইয়া খুঁজিয়া বাহির করিয়া আপনার ও ভক্তের হৃদয়ে নিহিত আর কেহ নহে—আমাদেরই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু (১৪৮৬—১৫৩৩ খ্রীঃ)। চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় লিখিয়াছেন—

"তবে মহাপ্রভু আইলা কৃষ্ণবেণ্বা তীরে
নানা তীর্থ দেখি তাঁহা দেবতা মন্দিরে।
ব্রাহ্মণ সমাজ সব বৈষ্ণব চরিত
বৈষ্ণব সকল পড়ে কৃষ্ণকর্ণামৃত।

ব্রহ্মসংহিতা কর্ণামৃত দুই পুঁথি পাইয়া
মহারত্ন প্রায় তাহা আইলা সঙ্গে লইয়া।

তারপর—শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের রথযাত্রা উপলক্ষে মথুরা, বৃন্দাবন, বঙ্গদেশ, আসাম প্রভৃতি স্থান হইতে যে সকল ভক্ত সমাগত হইয়াছিলেন তাঁহারা এই দুই গ্রন্থের অনুলিপি লিখিয়া লইয়া গিয়া নিজ নিজ দেশে প্রচার করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু যে গ্রন্থকে 'রাত্রিদিনে স্বরূপ—রামানন্দ সনে' পরম আনন্দে গান ও শ্রবণ করিতেন সেই গ্রন্থ যে বৈষ্ণবদিগের পরম আদরের ও শ্রদ্ধার সামগ্রী হইবে তাহা বলাই বাহুল্য—আর ইহাও বলা

বাহুল্যমাত্র যে এইরূপ গ্রন্থের টীকা অবশ্যই রচিত হইবে এবং এই টীকাকার হইবেন—অসামান্য আচার্যরাই।

উত্তর ভারতের টীকা

শ্রীচৈতন্য দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ শেষ করিয়া পুরীতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন—ইহা ১৪৩২ শকাব্দের বৈশাখ মাস হইতে ১৪৩৩ শকাব্দের (১৫১১ খৃঃ) মাঘ মাসের মধ্যবর্তী কালের ঘটনা। শ্রীচৈতন্য আনীত শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত পুঁথির উপর সংস্কৃত ভাষায় 'কৃষ্ণবল্লভা' নামক প্রথম ও সবিস্তার টীকা লেখেন শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী—(ইনি দক্ষিণ ভারতীয় ব্রাহ্মণ, কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ছয় গোস্বামীর মধ্যে একজন।) এই টীকার কাল রূপগোস্বামী কৃত ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (১৫৪১ খৃঃ) এবং উজ্জ্বল নীলমণি গ্রন্থের পরে। এই টীকা পরে, চৈতন্য দাস (পূজারী গোস্বামী ?) 'সুবোধনী নামক (সংস্কৃত) টীকা লিখেন। চৈতন্য দাস রূপগোস্বামীর সমসাময়িক। [If its author Chaitanvadasa directed Krisnadasa's literary activity then he must have been a contemporary of Rupa Goswamin ··Introduction—Krisnakarnamrita by Dr. S.K Dey.] এই টীকার কাল—(১৫৫০-১৫৭০) মধ্যবর্তী কোন সময়ে। ইহার অল্পকাল পরে, সুবিখ্যাত বৈষ্ণবশিরোমণি শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ 'সারঙ্গরঙ্গদা' নামক টীকা (১৫৮০-১৬০০) রচনা করেন। এই টীকা অবলম্বন করিয়া যদুনন্দন দাস বাংলা পদ্যে একটি বিস্তৃত ভাব ব্যাখ্যা রচনা করেন। জনৈক পূর্বদেশীয় গোপাল ভট্টের 'শ্রবণাহ্লাদিনী' নামক টীকার নামও শোনা যায়।

টীকায়—'চিন্তামণি-বিল্বমঙ্গল কথা।

ক। পাপল্লয় সূরির 'সুবর্ণচষক' টীকায় কিংবদন্তীর আভাষ মাত্রই পাওয়া যায়। গ্রন্থের প্রথম শ্লোকান্তর্গত 'চিন্তামণির্জয়তি'...অংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গেই আভাষটুকু পাওয়া যায়। 'চিন্তামণি' শব্দটির তাৎপর্য নির্দ্ধারণ করিতে টীকাকার প্রথমত—'চিন্তামণি'র অর্থ করিয়াছেন—"মন্ত্রবিশেষ," দ্বিতীয় অর্থ স্থির

করিয়াছেন—"কশ্চিদ্‌যোগী যৎসংনিধানে কবিনা যোগাভ্যাসঃ কৃতঃ", তৃতীয় অর্থ (আমাদের প্রয়োজনীয় অংশ)—"যদ্বা চিন্তামণিরিতি শ্রীকাকুলেশ্বরানুগ্রহবশান্নির্মলান্তরঙ্গা (কাচিদ্‌বারবনিতা")। এই টীকায় কাহিনীর অতি সূক্ষ্ম বীজটুকু মাত্রই পাওয়া যায়। চিন্তামণি বারবনিতা ও কাকুলেশ্বরের অনুগ্রহের ফলে নির্মলান্তিরঙ্গা—এবং বিল্বমঙ্গল তাহাকে বিশেষ কারণে নমস্কার করিয়া গ্রন্থারম্ভ করিতেছেন—এইটুকু সংবাদই শুধু পাওয়া যায়। তবে এই সংবাদ হইতে অনুমান করা যাইতে পারে 'বিল্বমঙ্গল-চিন্তামণি' কথার কিংবদন্তী দক্ষিণ ভারতেও ছোট আকারে প্রচলিত ছিল।

খ। উত্তর ভারতীয় টীকাকারগণের মধ্যে গোপাল ভট্টের নামই প্রথম। আমরা দেখি গোপালভট্ট গোস্বামী কিংবদন্তীটিকে 'কল্পিত কথা' বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার মতে—'চিন্তামণি'র অর্থ ভগবান আর 'সোমগিরি'র অর্থ মহেশ-বন্দিত (সোম = মহেশ, গিরি = পূজ্য) যাঁহারা চিন্তামণিকে—'বারবনিতা বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে চাহেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে গোপালভট্ট লিখিয়াছেন—'চিন্তামণির্বেশ্যা...কল্পিতয়া কথয়া ব্যাখ্যানং কুর্বতে। তত্তেভ্য এব জ্ঞাতব্যম্।" লক্ষণীয়...চিন্তামণি বেশ্যা এই ব্যাখ্যার সম্বন্ধে, বেশী কিছু লিখিতে তিনি অনিচ্ছুক।—ঐরূপ ব্যাখ্যা 'তেভ্য এব জ্ঞাতব্যম্' তাঁহাদের নিকট হইতেই জানিতে বলিয়াছেন।

যাহা হউক এই উপেক্ষার মধ্যেও কিংবদন্তীর অস্তিত্বের প্রমাণ রহিয়াছে। অন্ততঃ এ কথা সুস্পষ্ট যে তাঁহার সময়ে চিন্তামণিকে বারবনিতা বলিয়া ব্যাখ্যা করা রীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি—পাপয়ল্লয় সূরির টীকাতে এই কিংবদন্তীর সূক্ষ্ম বীজ রহিয়াছে। দাক্ষিণাত্যে এইরূপ ব্যাখ্যানরীতি থাকা সত্ত্বেও গোপালভট্ট কেন যে অস্বীকার করিতেছেন, বিচার্য বিষয় বটে কিন্তু এখানে অপ্রাসঙ্গিক। আবার আমরা দেখি সারঙ্গরঙ্গদা-টীকার লেখক কৃষ্ণদাস কবিরাজ স্পষ্টভাবেই লিখিয়াছেন—ইতি হি গুরুপরম্পরাগতা

সার্বলৌকিকী প্রসিদ্ধিরিতি, অর্থাৎ কবিরাজকে বিশ্বাস করিলে বলিতেই হইবে এই প্রসিদ্ধি (কিংবদন্তী) গুরুপরম্পরাগতা।

গ। তবে **দ্বিতীয় টীকাকার চৈতন্যদাস** কিন্তু গোপালভট্ট-পন্থী। চিন্তামণি শব্দের ব্যাখ্যায় কোথাও তিনি বারবনিতার উল্লেখ করেন নাই।

ঘ। সারঙ্গরঙ্গদা টীকায় বিল্বমঙ্গল-চিন্তামণি কাহিনী :—

[অথ দাক্ষিণাত্যঃ কৃষ্ণবেণ্বাপশ্চিমতীরনিবাসী পণ্ডিতঃ কবীন্দ্রঃ শ্রীবিল্বমঙ্গলনামা কশ্চিদ্ ব্রাহ্মণঃ কিলাসীৎ। স চ দুর্ব্বাসনাপ্রেরিতস্তৎপূর্বতীরবাসিন্যাং সঙ্গীতবিদ্যাধিকৃতকিন্নরীনিকরায়াং কস্যাঞ্চিচ্চিন্তামণিনাম্ন্যাং বেশ্যায়ামতীবাসক্তো বভূব। স চ কদাচিৎ প্রাবৃটতমিস্রায়াং জীমূতমন্দ্রগর্জ্জিতম্পাতদ্ধচ্ছযোঽন্ধ ইবাগণিতগমনপ্রত্যূহচয়ঃ স্বগৃহান্নির্গত্য তাং নদীং হস্তাভ্যাং শবালম্বনেনোত্তীর্য্য কীলিতকবাটং তদাবাসদ্বারমাসসাদ। তত্রাপি তত্রৈবাশ্রুতফুৎকারশত ইতস্ততঃ ভ্রমন্ ভিত্তিগর্ত্তেঽর্দ্ধপ্রবিষ্টকৃষ্ণভুজঙ্গপুচ্ছমালম্ব্য ভিত্তিমুল্লঙ্ঘ্য প্রণালিকামধ্যে নিপতন্ মূর্চ্ছিতো বভূব।

তত সা সখীভিঃ সহ বিদ্যুদ্দ্যোতিষা তং দৃষ্ট্বা হা কষ্টমিতি বদন্তী তমানীয়োপচারৈঃ স্বস্থং চক্রে। ততস্তেন কথিতং তদাগমনবৃত্তান্তং শ্রুত্বা জাতবেপথুঃ সা সনির্ব্বেদং তমাহ—অহো! সকলশাস্ত্রবিশারদমপি ভবন্তং মূঢ়ং বিনা কোঽন্যঃ পরিণতিবিরসরসলেশার্থমাত্মানং ঘাতয়েৎ। হা ধিক্ ধিগস্তু মাং, যাহং পাপীয়সী কপটভাবৈঃ পুরুষান প্রতার্য্য তেষাং মনোধনানি চাহরম্। অহো! এতাদৃশ্যাসক্তির্যদি ভগবতি শ্রীকৃষ্ণে জায়তে তদা কিং ন স্যাৎ। শ্বঃ সর্ব্বং পরিত্যজ্য শ্রীকৃষ্ণভজনমেব ময়া কার্য্যম্। ইতি নিশ্চিত্য তাং রাত্রিং শুশ্রূষমাণা সখীভিঃ সহ শ্রীকৃষ্ণস্য শ্রীরাধয়া সহ রাসকুঞ্জাদিলীলাময়গীতান্যগাসীৎ। স চাপি তদ্বাক্যমাকর্ণ্য জাতনির্ব্বেদঃ স্বং ভর্ৎসয়ন্, ময়াপি শ্বঃ সর্ব্বং ত্যক্ত্বা ভগবদ্ভজনমেব কার্য্যমিতি চিন্তয়ন্নুন্নিদ্র এব তদ্গীতশ্রবণমাত্রেণ প্রবুদ্ধপূর্ব্বসিদ্ধপ্রেমাঙ্কুরস্তং শ্রীরাধাকান্তমেব প্রাণকোটিদয়িতং দয়িতং মন্যমানঃ প্রাতস্তাং নমস্কৃত্য তেনৈব

পথা তন্নদীতীরস্থং সোমগিরিনামানং, বৈষ্ণবোত্তমমাসাদ্য নিবেদিতস্ববৃত্তান্তস্তস্মাৎ শ্রীগোপালমন্ত্ররাজমগ্রাহীৎ।

গৃহীতমন্ত্র এব প্রবুদ্ধানুরাগঃ কম্পাশ্রুপুলকাদিব্যাকুলঃ শ্রীবৃন্দাবনগমনোৎকণ্ঠিতোঽপি গুরুসেবার্থং কতিচিদ্দিনানি তত্রৈবাবাৎসীৎ তত্রাপি শ্রীকৃষ্ণলীলাদিবর্ণনাময়গ্রন্থাংশ্চকার। তদ্দৃষ্ট্বা সোমগিরিগুরুণা লীলাশুক ইতি খ্যাপিতোঽভূৎ। অত্র শ্রীবৈষ্ণবোত্তম এব সন্ন্যাসং চক্রে। ততঃ পরোৎকণ্ঠয়া শ্রীগুরুং বিজ্ঞাপ্য শ্রীবৃন্দাবনায় প্রতস্থে। গচ্ছংশ্চ পথি পথি প্রথমং তৎস্ফূর্ত্তিসমুচ্ছলিত প্রেমপ্রবাহস্রোৎকণ্ঠাকল্লোলপতিতঃ শূন্যমিবাত্মানং মত্বা তল্লীলাবিশিষ্টস্য তস্য স্ফূর্ত্তিং প্রার্থয়ন্ ততো মথুরামণ্ডলগতো লীলাবিশেষস্ফূর্ত্ত্যুচ্ছলিতানুরাগসিন্ধুকল্লো চ "লালসাবর্ত্তগ্রাসিতস্তদ্দর্শনং প্রার্থয়ন্" ততো মথুরাগতস্তৎস্ফূর্ত্তৌ সাক্ষাৎকারং মন্বানস্ততো বৃন্দাবনাগতঃ সাক্ষাদ্দৃষ্ট্বা বাঙ্মনসাগোচরত্বেন তং বর্ণয়ংশ্চ যদ্‌যৎ প্রললাপ তত্তৎ সর্ব্বং তৎসঙ্গিভির্বৈষ্ণবৈস্তয়া তথৈব লিখিত্বা স্থাপিতমাসীৎ। ততো বৃন্দাবনে কতিচিদ্দিনান্যবাৎসীৎ। পশ্চাৎ শ্রীকৃষ্ণেন স্বলীলাং প্রবেশিতঃ—ইতি হি গুরুপরম্পরাগতা সর্ব্বলৌকিকী প্রসিদ্ধিরিতি। (সারঙ্গরঙ্গদা টীকার অংশ)।

টীকার অনুবাদ। দাক্ষিণাত্যে, কৃষ্ণবেণ্বা নদীর পশ্চিম তীরে, পণ্ডিত কবীন্দ্র বিল্বমঙ্গল নামক এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি পূর্বে দুর্বাসনাবশে নদীর পূর্বতীরবাসিনী, চিন্তামণি-নাম্নী সঙ্গীতবিদ্যাসুনিপুণা কোন এক বেশ্যার প্রতি অতীব আসক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। একদা মেঘাচ্ছন্ন বর্ষারজনীতে বৃষ্টি ও বজ্রপাতাদি উপেক্ষা করিয়া অন্ধ আবেগে বাধাবিপত্তি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, নিজ গৃহ হইতে তিনি বাহির হইলেন, অগত্যা সাঁতরাইয়া এবং শব আশ্রয় করিয়া নদীপার হইলেন এবং বেশ্যার রুদ্ধকবাট বাসগৃহে উপস্থিত হইলেন। রুদ্ধদ্বার গৃহের চারিদিকে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া ফিরিয়া শেষে ভিত্তি গর্ত্তে-অর্দ্ধপ্রবিষ্ট কৃষ্ণসর্পের লেজ ধরিয়া প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিতে যাইয়া প্রণালিকার মধ্যে পড়িয়া গেলেন ও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সসখী চিন্তামণি বিদ্যুদালোকে তাঁহাকে দেখিতে

পাইলেন এবং হা কষ্ট! হা কষ্ট!—এইরূপ আক্ষেপ প্রকাশ করিতে করিতে তাঁহাকে তুলিয়া আনিয়া নানা উপচারে সুস্থ করিয়া তুলিলেন। তারপর, তাঁহারই মুখে আগমন বৃত্তান্ত শুনিয়া কম্পিতদেহে ও সনির্বেদে কহিলেন—"হায়! সকল শাস্ত্রবিশারদ হওয়া সত্ত্বেও তোমার মত মূঢ় ছাড়া আর কোন্ ব্যক্তি পরিণামে—দুঃখজনক আনন্দের জন্য এইভাবে প্রাণ দিতে পারে? তোমাকে ধিক্। আর আমাকেও ধিক, যে-আমি পাপীয়সী কপটভাব আশ্রয় করিয়া পুরুষদিগকে প্রতারণা করিয়া তাহাদের মন-ধন হরণ করিয়া থাকি। হায়! এইরূপ আসক্তি যদি ভগবান শ্রীকৃষ্ণে লগ্ন হয়, তবে কি না হইতে পারে? কাল সব-কিছু পরিত্যাগ করিয়া আমি কৃষ্ণভজনাই করিব—এইরূপ স্থির করিয়া, সেই রাত্রে বিল্বমঙ্গলকে শুশ্রূষা করিয়া, সখীদের সহিত রাধাকৃষ্ণের রাসলীলাদিবিষয়ক গান করিতে লাগিলেন। বিল্বমঙ্গলও তাহা শুনিয়া অনুতপ্ত হইলেন এবং নিজেকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন এবং সব ত্যাগ করিয়া ভগবদ্‌ভজনায় আত্মনিয়োগ করিবেন—এইরূপ স্থির করিলেন। নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া, গীত শ্রবণ মাত্রেই তাঁহার পূর্বসিদ্ধপ্রেম অঙ্কুরিত হইল। বিশ্বপ্রাণকান্ত রাধাকান্তকে প্রাণকান্ত মনে করিয়া চিন্তামণিকে নমস্কার জানাইয়া সেই পথেই বৈষ্ণবোত্তম সোমগিরির নিকটে উপনীত হইলেন এবং তাঁহাকে সব বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া তাঁহার নিকট হইতে মন্ত্ররাজ গোপালমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। মন্ত্র গ্রহণ করিবার পরে তাঁহার অনুরাগ আরো প্রবুদ্ধ হইল—কম্পঅশ্রুপুলকাদি (সাত্ত্বিক) ভাব জাগিতে লাগিল এবং গুরুসেবার জন্য কিছুকাল সেই স্থানেই বাস করিলেন। সেই স্থানে থাকার সময়েই শ্রীকৃষ্ণলীলাবর্ণনাময় গ্রন্থাদি রচনা করিয়াছিলেন। এই সকল রচনা দেখিয়া, গুরু সোমগিরি তাঁহাকে 'লীলাশুক' উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু এই আশ্রমে, আত্মীয় স্বজনরা আসিয়া উপদ্রব করিতে লাগিল; এই কারণে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন এবং গুরুকে আপন অভিপ্রায় জানাইয়া বৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে যাইতে যাইতে, প্রথমে তাহার মধ্যে কৃষ্ণ-

প্রেমজনিত উৎকণ্ঠা,নির্বেদ, প্রার্থনা প্রভৃতি ভাবের তরঙ্গ উত্থিত হইল, মথুরা মণ্ডলে প্রবেশ করিয়া অনুরাগ-সিন্ধু উচ্ছলিত হইয়া উঠিল এবং দর্শনলালসাও প্রবল হইল; মথুরাতে প্রবেশ করিয়া কৃষ্ণদর্শন-ভ্রান্তি জন্মিতে লাগিল এবং বৃন্দাবনে যাইয়া, সাক্ষাদ্দর্শন ঘটিল। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণের বাঙমানসাগোচর রূপের বর্ণনা করিতে করিতে তিনি যে প্রলাপোক্তি করিয়াছিলেন, তাঁহার সঙ্গিগণ তাহা লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। তারপর তিনি বৃন্দাবনে কিছুকাল বাস করিলেন এবং পরে, শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক স্বলীলায় প্রবেশিত হইয়াছিলেন।—এই কাহিনী গুরুপরম্পরাগতা এবং সার্বলৌকিকী প্রসিদ্ধি। ****

(৬) (প্রাচ্য) গোপাল ভট্টের 'শ্রবণাহ্লাদিনী' টীকার ভাষামুগ বিবরণ: –

(নতুন যোজনাগুলি তারকাচিহ্নিত)

*[এস. আর. ভাণ্ডারকর ধৃত—ডেকান কলেজে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি তালিকার —১৭৮নং পাণ্ডুলিপি। ডাঃ দে মহাশয়ের মতে seems to be of eastern origin.]"

ভগবজ্জনমুখনিঃসৃত এইরূপ কিংবদন্তী শোনা যায়—*কাশীনিকট সুরতরঙ্গিনীতটগ্রামবাসী বিল্বমঙ্গল নামা জনৈক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি পূর্বাদৃষ্টবশতঃ, * চরণাদ্রিনিবাসিনী জনৈকা প্রসিদ্ধা বেশ্যার অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। প্রেমাকৃষ্ট হৃদয় বিল্বমঙ্গল প্রত্যহ *কৃষ্ণা নদী পার হইয়া তাহার গৃহে গমন করিতেন। বেশ্যানুরক্ত তাঁহার * পিতৃশ্রাদ্ধদিন উপস্থিত হইল। লোকলজ্জাভয়বোধে যেটুকু না-করিলে-নয় সেটুকু কোন রকমে করিয়া, ব্রাহ্মণাদি ভোজন করাইয়া নিজেও ভোজন করিলেন। ইতিমধ্যে দিনমণি অস্তগমন করিলেন। বেশ্যার কাছে যাইবার জন্য তাহার কামনা উদগ্র হইলেও লোক পরিহাস এড়াইবার জন্য, তিনচার ঘণ্টা কোনোরকমে অতিবাহিত করিলেন এবং অন্ধকার গাঢ়তর হইলে, সকলের অজ্ঞাতসারে গঙ্গাতীরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে কোনও নৌকা ছিল না; ঐকান্তিক মিলন

কামনাবশে, স্বকীয় পরিচ্ছদাদি মাথায় বাঁধিয়া সাঁতরাইয়াই অনেকদূর অতিক্রম করিলেন। তারপর, মধ্যস্থলে যাইয়া অতিশ্রান্ত হইয়া পড়িলেন এবং একটি 'মৃতক' (শব) দেখিয়া তাহারই উপর বসিয়া গঙ্গাপারে গেলেন। প্রভাতে ঐরূপেই পারে যাওয়া যাইবে মনে করিয়া, শবটিকে তীরে টানিয়া রাখিলেন এবং সিক্ত বসনে কাঁপিতে কাঁপিতে, চরণাদ্রি অবিত্যকাস্থিত পরমরমণীয় বেশ্যা-সদনে উপনীত হইলেন

এরূপ অবস্থা দেখিয়া বেশ্যাটি, তাড়াতাড়ি উঠিয়া অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিলেন এবং শুষ্কবসনাদি দিয়া তাঁহার শীতজনিতকম্পাদি দূর করিলেন। সুন্দরীর বিল্বমঙ্গলকে সস্মিত বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন—ওহে কামিন্! এতক্ষণ কোথায় কি করিতেছিলে? বিনা নৌকায় পার হইলে কেমন করিয়া? তিনি উত্তর করিলেন—প্রিয়ে। আজ আমার পিতার শ্রাদ্ধ দিন। এই কারণে ব্রাহ্মণ ভোজনাদি ব্যাপার সম্পন্ন করিতে করিতে রাত্রি হইয়া গেল। এদিকে তোমার পার্শ্বে আসিবার জন্য আমার ভীষণ উৎকণ্ঠা। গঙ্গাতীরে আসিয়া কোন নৌকা দেখিতে না পাইয়া আমি, সাঁতরাইয়াই পার হইব—এরূপ স্থির করিয়া গঙ্গা-প্রবাহে ঝাঁপ দিলাম এবং অতিশ্রান্ত হইয়া পড়িলে, কোন একখানা ভাসমান কাষ্ঠ অবলম্বন করিয়া পার হইলাম। সকালে আবার ঐ ভাবে গঙ্গাপার হইব—তাই কাষ্ঠখানা তীরে তুলিয়া রাখিয়া আসিয়াছি। চিন্তামণি তাঁহার কথা শুনিয়া অন্তর্যামীর প্রেরণায়, দীপ লইয়া গঙ্গাতীরে যাইতে প্রস্তুত হইয়া কহিল—'কাষ্ঠখানা আমাকে দেখাও দেখি। তিনিও, চল দেখাইব—বলিয়া যেখানে শবটি ছিল সেখানে লইয়া গেলেন। দীপালোকে শবটি দেখিয়া সে বলিল—এ যে শব। পরমবৈরাগ্য দেখা দিল এবং সরোষে সকরুণ ভাষায় বলিল—'হায়, পাপিষ্ঠ কামান্ধ! পরম কারুণিক মহাপতিতপাবন ভক্তজনবৎসল ব্রজরাজকুমার হরি কৃষ্ণকে ছাড়িয়া বিণমূত্রমাংসমঞ্জুষিকা আমার মত একটা সামান্যা রমণীতে তুমি এতআসক্ত হইয়াছ যে শবের উপর চড়িয়া আমার কাছে ছুটিয়া আসিয়াছ। তারপর গুরুর কাছে থাকিয়া উপদেশাদি শ্রবণ এবং

ভগবানের ধ্যান করিয়া কিছুকাল অতিবাহিত করিলেন। পরে, শ্রীরাধারমণ—নন্দকিশোর—গোবিন্দ পদারবিন্দে অনুরাগ বৃদ্ধি পাইলে গুরুর নির্দেশ গ্রহণ করিয়া,—পরম রমণীয় শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিলেন। শ্রীবৃন্দাবনে লীলাস্থানগুলি দর্শন করিয়া পরমাহ্লাদ হইল এবং অন্তঃকরণ রাধারমণ শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক—ভাবময় হইয়া উঠিল।......

বিঃ দ্রষ্টব্য:—প্রাচ্য গোপাল ভট্টের এই বিবরণে কয়েকটি নতুন কথা আছে। *প্রথমতঃ—বিল্বমঙ্গল 'কাশীনিকটস্বরতরঙ্গিনীতটগ্রামনিবাসী' অর্থাৎ গঙ্গাতীরবাসী। (কিন্তু আশ্চর্যেরই কথা—কৃষ্ণা পার হইয়া চিন্তামণি-সদনে যাইতেন) *দ্বিতীয়তঃ—পিতৃশ্রাদ্ধের কথা সারঙ্গরঙ্গদা টীকায় পাওয়া যায় না। সংস্কৃত টীকাগুলির মধ্যে, এই টীকাতেই উহার প্রথম উল্লেখ। অন্যান্য বর্ণনা রঙ-ফলানো। আরো লক্ষণীয়—কৃষ্ণসর্পের পুচ্ছ ধরিয়া প্রাচীর উল্লঙ্ঘনের কথাও এখানে নাই॥

ভক্তমালগ্রন্থে বিল্বমঙ্গল কাহিনী—

দক্ষিণ দেশে কৃষ্ণাবেণ্বা নদীর তীরে বিল্বমঙ্গল-নামক এক লম্পটস্বভাব বিপ্র বাস করিতেন। এই বিপ্র বিল্বমঙ্গল—'নদী পারে এক বেশ্যা নাম চিন্তামণি—তাহাতে আসক্ত সদা দিবসরজনী।" একদিন পিতৃশ্রাদ্ধ তিথি উপস্থিত হইলে বেশ্যা কহিল—'নদী পার না আসিহ ইথি'। বিল্বমঙ্গল সারাদিন অস্থিরচিত্তে ঘরে থাকিলেন, কিন্তু 'দ্বিতীয় প্রহর রাত্রে হইল অবশ।' আর তখন—

বৃষ্টিবরিষণ ঘোর বহে ঝঞ্ঝাবাত
উঠিয়া চলিলা নাহি মানে বজ্রাঘাত।
নদী পার যাইতে নাহি নৌকা ভেলা;
কাম তরণিতে চড়ি জলে ঝাঁপ দিলা।

কিন্তু --অবস্থা দাঁড়াইল এই—

কামবেগে লইয়া ডুবায় জলবেগে
ডুবিতে ভাসিতে এক শব পাইল আগে॥

বিল্বমঙ্গল সম্পূর্ণ বাহ্যজ্ঞান রহিত, কাষ্ঠখণ্ড মনে করিয়া সেই শবকে আশ্রয় করিলেন এবং শবের ক্লেদ সর্বাঙ্গে মাখিয়া বেশ্যার বাটীতে উপস্থিত হইলেন। সেখানে তখন দ্বার বন্ধ। সুতরাং—"বেশ্যার বাটির চৌদিকে ফিরয়ে ধাইয়া" এবং—

প্রাচীরের গর্ত্তে এক সর্প মুখ দিয়া
রহয়ে বাহিরে পুচ্ছ লম্বিত হইয়া
দ্বার না পাইয়া দীর্ঘ রজ্জু বুদ্ধি করি
সেই সর্প ধরি উঠে প্রাচীর উপরি।
ভিতরে উপর হইতে লম্ফ দিয়া পড়ে
শব্দ শুনি বেশ্যাগণ ডরে হুড়হুড়ে॥

প্রদীপ লইয়া বাহিরে আসিয়া তাহারা দেখিল—"বিল্বমঙ্গল হয় আঙ্গিনায় পড়িয়া" এবং 'পড়িয়া চূর্ণিত দেহ উঠিতে না পারে।' তখন—'ধরাধরি করিয়া আনিল সভে ঘরে'। তারপর 'অঙ্গেতে দুর্গন্ধ ক্লেদ দেখিয়া পুছয়ে', এবং বিল্বমঙ্গলও 'যেরূপে আইলা গিয়া প্রত্যক্ষ দেখায়ে।' তারপর স্নানাদি করাইয়া ঘরে বসাইয়া চিন্তামণি ভর্ৎসনা করিয়া কহিল—

ছি ছি ধিক ধিক্ তব হেন দুষ্ট বুদ্ধি
হেন কর্মে যার মতি তার এই সিদ্ধি।
হেনতম মদ যাতে শব কালসর্প
না চিনিল' অধম হইয়া কামদর্প।
আমি বেশ্যা নীচ অতি অস্পৃশ্য নিন্দিত
তাহে তুমি বিপ্র মোতে ক্রিয়া অনুচিত।
এহেন অগ্রাহ্য কর্মে হেন অনুরাগ
ইহার যে শতাংশের অংশ এক ভাগ
শ্রীকৃষ্ণ চরণে যদি হইত তোমার
তব কি না হইত চতুর্বর্গ সেবা সার॥

চিন্তামণির এই চিন্তামণি-বাণী শুনিয়া বিল্বমঙ্গলের বিবেক জাগ্রত হইল এবং সারারাত্রি কৃষ্ণলীলাগানে কাটাইয়া—'বৈরাগ্য করিয়া প্রাতে অমনি চলিলা'।

তারপর, সোমগিরি-নামক জনৈক সাধুর নিকট কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন এবং 'বৎসরেক' গুরুসেবা করিয়া, শুদ্ধ প্রেমধন লাভ করিলেন তখন—প্রেম ভক্তিমদ পান করিয়া হৃদয় তাঁহার প্রমত্ত—কৃষ্ণদর্শনের জন্য প্রাণমন মহাব্যাকুল হইল এবং—'হা হা কোথা কৃষ্ণ বলি ধাইয়া চলিল'। বিল্বমঙ্গল বৃন্দাবনে যাওয়ার সঙ্কল্প করিলেন।

তারপর, কোন এক গ্রামের সরোবরতীরস্থ বৃক্ষতলে প্রেমাবেশে দুইচারিদিন অন্তর্মনা হইয়া বসিয়া রহিলেন। ঐ সরোবরে বহু নরনারী স্নান করিতে আসিত। সুন্দরী এক বণিক পত্নী দেখিয়া তাঁহার মন টলিয়া উঠিল : তখন—

আপন অন্তররীত বুঝিয়া আপনে
উপায় সৃজিল কিছু শাস্তির কারণে।

স্নান করিয়া নারী যেইদিকে চলিলেন,বিল্বমঙ্গলও সেইদিকে তাঁহার পিছনে পিছনে চলিলেন, এবং যে-বাড়ির অন্তঃপুরে বধূটি প্রবেশ করিলেন সেই বাড়ীর দ্বারদেশে তিনি বসিয়া থাকিলেন। রমণীর স্বামী গৃহদ্বারে সাধুকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া খুব চিন্তিত হইলেন এবং সাধুর আজ্ঞা প্রার্থনা করিলেন। সাধু বিল্বমঙ্গল অদ্ভুত প্রস্তাব করিলেন—'তোমার রমণী আনি আমারে দেখাহ'। বণিকেরও অলৌকিক চরিত্র, বৈষ্ণব প্রীতির বশেই তিনি স্বীকার করিলেন—অলংকৃত ও সুবেশা করিয়া—নিজের স্ত্রীকে—"নির্জনে সাধুর আগে হর্ষে আনি দিলা।" সাধু রমণীর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া চক্ষুকে সম্বোধন এবং তত্ত্ব-বিচার করিয়া নিজমনকে বুঝাইতে লাগিলেন।

"আরে মূঢ় চক্ষু কি দেখিয়ে ভুলিয়াছ
অগ্রাহ্য অবিদ্যাপথে কি ধন পাইয়াছ।
রক্তমাংস ক্লেদবিষ্ঠা-মূত্রময় দেহ
ত্বক আচ্ছাদনমাত্র দরশ সুবহ।

নির্ঘৃণ্য তোমার মতি এ হেন কদর্য
লালসা করহ যাহে নিন্দিত অভুজ্য
ধিক ধিক আরে দুষ্ট অসত ইন্দ্রিয়
ক্ষম বিড়ম্বন মোরে না কর অস্থির।"—

এইভাবে তত্ত্ব-বিচারাদি করিয়া যুবতীকে আজ্ঞা করিলেন—'তীক্ষ্ণ দুটি সূচ শীঘ্র আনি দেহ মোরে।' সূচ আনিলে আবার আজ্ঞা হইল—'সাধু নিজ চক্ষে তাব বিদ্ধিতে কহিলা।' বার বার আজ্ঞা করায়—রমণী অগত্যা তাঁহার চক্ষু বিদ্ধ করিলেন এবং তাঁহারই আজ্ঞাক্রমে বণিক তাঁহাকে সরোবরের তীরে হাত ধরিয়া রাখিয়া আসিলেন।

কৃষ্ণ-অনুরাগে বিল্বমঙ্গল বৃন্দাবন-অভিমুখে চলিলেন। দৃষ্টিশক্তিহীন হইলে কি হইবে ?—'অনুরাগ চক্ষু যার কি করে নয়ানে'। হৃদয়ে তখন তাঁহার ভাব-তরঙ্গের দোলা—

"রাধাকৃষ্ণ লীলারূপ গুণ মধু মাতি
ক্ষণে হাসে কান্দে গায় ক্ষণে পড়ে ক্ষিতি।
মাতোয়ার প্রায় থর থর করি চলে
বর্ণয়ে মধুর গীত ভাসে অশ্রুজলে।"
(এই গীতই কৃষ্ণকর্ণামৃত নামে জগতে বিখ্যাত)

এইভাবে ভাব-বিভোর অবস্থায় বিল্বমঙ্গল বৃন্দাবনে উপস্থিত হইলেন এবং ব্রহ্মকুণ্ডের নিকট কৃষ্ণপ্রাপ্তির আশায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। 'ভকতবৎসল' শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কহিলেন—

'রৌদ্রে কেন বসি ভাব, ভুকে কেন রহ
ছায়াতে আসিয়া বৈস, আহার করহ।'

অন্ধ সাধক কহিলেন—"আমি অন্ধ, তোমার পরিচয় দাও, তাহা হইলে আমি যাইতে পারি। কৃষ্ণ "গ্রামী গোপশিশু" বলিয়া নিজের পরিচয় দিলেন এবং বলিলেন—"মাতা অন্ন দিয়া পাঠাইলা তব ঠাঞি। বিল্বমঙ্গল 'শ্রীঅঙ্গ-

সদ্গন্ধে' অনুভাবে তত্ত্ব জানিয়া ফেলিলেন। সাপটিয়া ধরিবেন—এইরূপ স্থির করিয়া কহিলেন "আমাকে হাত ধরিয়া বৃক্ষছায়ায় লইয়া যাও, আর যে অন্ন আনিয়াছ, আমাকে দাও, আমি খাইব।

গোপশিশু-বেশী শ্রীকৃষ্ণ, মুচকি হাসিয়া তর্জনী ধরিতে কহিলেন কিন্তু— "সাপটিয়া ধরে সাধু অতি দ্রুত করি।" কৃষ্ণ হাত ছাড়িতে কহিলে বিল্বমঙ্গল কহিলেন—

……হেন হস্ত ছাড়িতে কি পারি।
বান্ধিয়া রাখিব আজু হৃদয় মাঝার।
বহু দুঃখে অনেক সাধনে হেন ধন
পাইয়াছি যদি বা ছাড়িব কি কারণ।
পর কি পরের দুঃখ বুঝয়ে কখনো
তুমি সে কেমন প্রভু না দেখি এমনো।
নিজ হানি নাহি পর দুঃখ বিমোচন
দরশন দিয়া মাত্র তাহো না করণ।"—

তথাপি কৃষ্ণ হাত ছাড়াইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং ব্যথা পাইবার ভাণও করিলেন। বেদনা লাগে।—শুনিয়াই সাধু চমকাইয়া উঠিলেন এবং মুষ্টি একটু শিথিল করিতেই কৃষ্ণ হাত ছাড়াইয়া লইলেন। বিল্বমঙ্গল তখন কৃষ্ণকে বলিলেন—বলে হাত ছাড়াইয়া গেলে—ইহাতে আশ্চর্য হইবার কি আছে? কিন্তু -

"হৃদয় হইতে যদি পারহ যাইতে
তবে তো গণিয়ে মুঞি পৌরুষ তোমাতে

* [হস্তমুৎক্ষিপ্য যাতোঽসি বলাৎ কৃষ্ণ কিমদ্ভুতম্
হৃদয়াদ যদি নির্যাসি পৌরুষং গণয়ামি তে।]

কৃষ্ণ ভক্তকে ছাড়িয়া কোথায় যাইবেন? তাঁহাকে কহিলেন—'ছায়াতে আইস এই মোর সাথে সাথে'।

তারপর—কৃষ্ণ দূরে দূরে যায় সাধু পাছে পাছে ধায়
চক্ষু অন্ধ না পায় দেখিতে
চুম্বক মণির সাথে লৌহ স্বাভাবিক রীতে
যেন ধায় যায় তেন মতে॥

কৃষ্ণ ভক্তকে বৃক্ষতলে বসাইয়া দুগ্ধ ও অন্ন আনিয়া দিলেন। কিন্তু ভক্ত না-ছোড়-বান্দা, বলিয়া বসিলেন—রূপ দেখাও, নতুবা কিছুই খাইব না। কৃষ্ণ বলিলেন—'গোপশিশুর কী দেখিবে'? বিল্বমঙ্গল হাসিয়া নিকটে যাইতেই কৃষ্ণ পিছে ছুটিলেন এবং এইভাবে আনন্দে ভক্তের সহিত কৌতুক করিতে লাগিলেন। তখন বিল্বমঙ্গলের হৃদয়ে কৃষ্ণদর্শনবাসনা দুর্বার। কৃষ্ণের কৌতুক দেখিয়া ভক্তের প্রাণে আঘাত লাগিল—অভিমানবশে নির্দয় নিষ্ঠুরশ্রেষ্ঠ প্রভৃতি নিন্দা-বাক্য বলিতে লাগিলেন। কিন্তু সেইসব বাক্যে ভক্তের নিজের প্রাণেই বেশী আঘাত লাগিল—তাঁহার মনে হইল—কৃষ্ণ বুঝি ব্যথিত হইয়াছেন, তাই আবার স্তব আরম্ভ করিলেন। কৃষ্ণ তখনও কৌতুকী—কহিলেন—

"কালোরূপে কি দেখিবে তাহে বা কি সুখ পাবে
বর মাগ সুখৈশ্বর্য যাহে।"

ভক্তও পাকা লোক—উত্তর দিলেন দেওয়ার মতই—

আমাকে আর কী দিয়া ভুলাইবে? তোমার আর কি ধন আছে?

ভূক্তি ও মুক্তি—ভক্তির দুই পদসেবিকা চেরী। সেই ভক্তিই প্রেম-মণি—অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া আমার হৃদয়সিংহাসনে বসিয়া আছে।—তবে যদি কৃপা করিতে ইচ্ছা হইয়া থাকে, আমাকে দৃষ্টিশক্তি ফিরাইয়া দাও আর ত্রিভঙ্গিম হইয়া মুখে মুরালী দিয়া সম্মুখে দাঁড়াও। কৃষ্ণ ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে, সুধাময় করকমল তাঁহার চক্ষে বুলাইলেন—বিল্বমঙ্গল দিব্যদর্শন লাভ করিয়া, কৃষ্ণের রূপরাশি দর্শন করিয়া অচেতন হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেলেন। তারপর, এইভাবে কৃষ্ণদর্শন-আনন্দে দিন যাইতে লাগিল। কৃষ্ণ নিজ ভুক্তাবশেষ দুগ্ধ-অন্নাদি দিয়া ভক্তের ক্ষুধা মিটাইতে লাগিলেন। এই সময়ে একদিন চিন্তামণি

কৃষ্ণপ্রেমাবেশভরে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলে বিল্বমঙ্গল তাঁহাকে গুরুভাবে প্রণাম করিলেন এবং মিষ্টান্নাদি খাইতে দিলেন। চিন্তামণিও তখন কৃষ্ণপ্রেমে পাগলিনী—কহিলেন "খাইতে তোমার ঠাকুর নাহি আইনু অন্ন হেথা হেরি।" তুমি কৃষ্ণকৃপার শ্রেষ্ঠ অধিকারী—সুতরাং 'কৃষ্ণ মোরে দেখাও বিরলে।' বিল্বমঙ্গল চিন্তামণির কৃষ্ণপ্রেম দেখিয়া পুলকিত হইলেন এবং

—আপনার যত গুণ হেরি   কৃষ্ণকৃপা তোমা'পরি
অবশ্য দিবেন দরশন
এত কহি কৃষ্ণস্থানে   সটেপটে শ্রীচরণে
ধরিয়া করিলা দৃঢ়পণ।

একে চিন্তামণি অধিকারী, তাহার উপর ভক্তের অনুরোধ, অগত্যা শ্রীকৃষ্ণ—'দুই জনে দিল দরশন'।

টীকা-বর্ণিত কাহিনীর সহিত ভক্তমাল-কাহিনীর ঐক্য ও পার্থক্য

টীকা-বর্ণিত কাহিনীর সহিত (সারঙ্গরঙ্গদা ও শ্রবণাহ্লাদিনী) ভক্তমাল-বর্ণিত কাহিনীর তুলনা করিয়া ইহাই দেখা যায় যে উভয়ের মধ্যে ঐক্যের মাত্রাই বেশী এবং পার্থক্যের মাত্রা অল্প—তবে খুবই লক্ষণীয়। সারঙ্গরঙ্গদা-টীকার পিতৃশ্রাদ্ধের উল্লেখ না থাকিলেও শ্রবণাহ্লাদিনীতে আছে; কিন্তু বণিক-পত্নী-' বিষয়ক আখ্যান কোন টীকাতেই নাই—ভক্তমাল-গ্রন্থেই বোধ হয় উক্ত আখ্যানের প্রথম আবির্ভাব। কাহিনীটুকু খুবই চিত্তাকর্ষক। ইহার উদ্ভাবক কে তাহা সঠিক জানিবার উপায় নাই। সাধক-কবি সুরদাসের প্রচলিত কাহিনীর সহিত ইহার ঐক্য আছে বটে, কিন্তু ভক্তমালে যে সুরদাস-কাহিনী আছে তাহাতে এই সব ধরনের কোন কথা পাওয়া যায় না। সুতরাং এই সুরদাসের কাহিনী হইতে এই আখ্যান বিল্বমঙ্গলের কাহিনীতে যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে—অনুমান করিবার অবকাশ নাই। এই কাহিনী, মনে হয়, ভক্তমাল-লেখকেরই কল্পিত—এবং প্রত্যেক কল্পনার মূলে যেমন বস্তু-বীজ থাকে এই কল্পনার মূলেও তেমনটি দেখা যায়। প্রথমেই এইরূপ অনুমান করা যাইতে

পারে—বিল্বমঙ্গলের নিজের লেখা একটি শ্লোকই এই কল্পনার মূল প্রেরণা।—শ্লোকটি প্রসিদ্ধ—'হস্ত-মুৎক্ষিপ্য যাতোঽসি•• পৌরুষং গণয়ামি তে (৩য় আশ্বাস—৯৪ শ্লোক) এই শ্লোক হইতে এইরূপ অনুমান খুবই স্বাভাবিক—বিল্বমঙ্গল কৃষ্ণকে ধরিয়াছিলেন কিন্তু কৃষ্ণ হাত ছাড়াইয়া গিয়াছিলেন—বোধ হয় বিল্বমঙ্গল সেই সময়ে অন্ধ ছিলেন।

সুতরাং প্রশ্ন আসে—অন্ধ হইলেন কেন? এই 'কেন'র উত্তর মনে হয়, সারঙ্গরঙ্গদা টীকার একটি বাক্যের বিকৃত অর্থবোধ হইতে গড়িয়া উঠিয়াছে। টীকান্তর্গত—উদ্‌গতলালসাবর্তগ্রসিতস্তদ্দর্শনং প্রার্থয়ন্'—এই অংশের বিকৃতি হইতেই বণিকপত্নীর কাহিনী দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে। 'উদ্‌গতলালসাবর্তগ্রসিতঃ—বিল্বমঙ্গলের বিশেষণ,—অর্থ=উদ্‌গত লালসাবর্ত দ্বারা গ্রসিত অর্থাৎ লালসাবর্ত আবার উদ্‌গত হইয়া বিল্বমঙ্গলকে গ্রাস করিয়াছিল এবং তারপর—'তদ্দর্শনং প্রার্থয়ন্'—যাহাকে দেখিয়া লালসা উপজাত হইয়াছিল তাহারই দর্শন প্রার্থনা করিয়াছিলেন—এইরূপ বিকৃত ব্যাখ্যার ধারা ধরিয়াই বণিকপত্নীর কাহিনী উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া এই ঘটনার পরে শলাকাবিদ্ধচক্ষু অন্ধ বিল্বমঙ্গল খুবই স্বাভাবিক। আর পরবর্তী লুকোচুরি খেলার বীজও—'হস্তমুৎক্ষিপ্য' শ্লোকের মধ্যে রহিয়াছে। 'অন্ধ' করিবার মূলে অন্য প্রেরণাও কাজ করিতে না পারে এমন নয়। ভক্তমাল গ্রন্থে নাভাজীর যে বিবরণ আছে তাহাতে দেখা যায়—নাভাজী বাল্যকালে অন্ধ ছিলেন, পরে বৈষ্ণব সাধু 'কীল্হ' ও 'অগর'—নামক দুই ভ্রাতার কৃপায় চক্ষুলাভ করেন। নিজের জীবনের ঘটনা আরোপ করিয়া কাহিনী রচনা করিতে যাইয়া, বিল্বমঙ্গলকে অন্ধ করিবার আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়াছেন—এমনও হইতে পারে। যাহাই হউক বণিক—বণিকপত্নীর কাহিনী ভক্তমাল-গ্রন্থেই প্রথম দেখা যায়। তারপর চিন্তামণির বৃন্দাবনাগমনাদি-ব্যাপারও টীকাবর্ণিত নহে।

নাটকে বিল্বমঙ্গল-কাহিনী এবং প্রচলিত কাহিনীর গ্রহণ-বর্জন-বিস্তার

নাটকে যে বিল্বমঙ্গল কাহিনী দেখা যায়, তাহা মোটামুটি 'ভক্তমাল' গ্রন্থ

হইতেই গৃহীত। ভক্তমাল বর্ণিত কাহিনীতে বিল্বমঙ্গলের জীবনের চারিটি পর্ব পাওয়া যায়—প্রথম পর্বে মোহ—বেশ্যা চিন্তামণিতে মোহ, দ্বিতীয় পর্বে—মোহমুক্তি বা বৈরাগ্য এবং তৃতীয় পর্বে—মোহের পুনরাবির্ভাব ও পুনর্মুক্তি এবং চতুর্থ পর্বে—কৃষ্ণপরায়ণতা ও ক্রমে কৃষ্ণপ্রাপ্তি ও কৃষ্ণদর্শন। যে যে ঘটনা দ্বারা ভক্তমালে এই চতুঃপর্বিক জীবন নিদর্শায়িত হইয়াছে, নাটকে প্রায় অবিকৃত ভাবেই— অবশ্য ভাবাতিশয্যের সহযোগে—সেই সমস্ত ঘটনাই গৃহীত হইয়াছে। আমরা দেখি প্রথম পর্বে প্রধান ঘটনা—(ক) বিল্বমঙ্গল চিন্তামণিতে 'আসক্ত সদা দিবস রজনী', (খ) পিতৃশ্রাদ্ধের দিনেও ঝড়বৃষ্টি উপেক্ষা করিয়া, সাঁতরাইয়া ও শব আশ্রয় করিয়া নদী পার হওয়া (গ) সাপের লেজ ধরিয়া প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া চিন্তামণির বাটীতে প্রবেশ করা। দ্বিতীয় পর্বের প্রধান ঘটনা:—(ক) চিন্তামণির অনাস্থায় ও ভর্ৎসনায় বৈরাগ্যোদয় (খ) সোমগিরি গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ (গ) বৃন্দাবন গমনাকাঙ্ক্ষা। তৃতীয় পর্বের ঘটনা:—(ক) সরোবর তীরে বণিকপত্নী দর্শনে লালসা—(খ) লালসার আত্যন্তিক নিবৃত্তির জন্য বণিকের গৃহে উপস্থিতি, পত্নী দর্শন প্রার্থনা এবং শেষে সূচ দ্বারা চক্ষুবিদ্ধকরণ। চতুর্থ পর্বের প্রধান ঘটনা:—(ক) কৃষ্ণপ্রাপ্তির জন্য ঐকান্তিক ব্যাকুলতা (খ) গোপবালক বেশে শ্রীকৃষ্ণের আগমন এবং ভক্ত সেবন (গ) গোপবালকবেশীকে শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে চিনিতে পারা—ভক্তের সহিত ভগবানের লুকোচুরি খেলা—ভক্তের মান-অভিমান-আত্মসমর্পণ, দিব্যদৃষ্টিলাভ ও শ্রীকৃষ্ণদর্শন। (ঘ) চিন্তামণির বৃন্দাবনে আগমন—বিল্বমঙ্গলের কাছে কৃপা ভিক্ষা এবং উভয়েরই কৃষ্ণলীলাদর্শনের সৌভাগ্য। নাটকের মূল কাহিনী এই সকল ঘটনার সমবায়েই গঠিত।

তবে, এই কাহিনীকেই দৃশ্যরূপ দিতে যাইয়া নাট্যকারকে উপকাহিনী যোজনা করিয়া, পটভূমি তৈয়ার করিতে হইয়াছে। অবশ্য এই পটভূমিকা গঠনে, শৈল্পিক প্রয়োজনই একমাত্র প্রেরণা হয় নাই, অর্থাৎ বিল্বমঙ্গলের চতুঃপর্বিক জীবনকথাকে দৃশ্য করিয়া তুলিতে কেবলমাত্র যেটুকু সংযোজনা আবশ্যক শুধু সেই আবশ্যকতার দ্বারাই নাট্যকারের উদ্দেশ্য সীমায়িত হয় নাই, এই সীমা অতিক্রম

করিয়া, উদ্দেশ্য আরো অনেক দূরে অভিসরণ করিয়াছে—শৈল্পিক প্রয়োজনের সহিত, বৈষ্ণব ভাবসাধনার নানাবিধ দিকের সম্যক উপস্থাপনার উদ্দেশ্যও যুক্ত হইয়াছে। আরো সহজ করিয়া বলিলে—নাট্যকার বিল্বমঙ্গল কাহিনীকে দৃশ্যরূপ দিতে যাইয়া বা দেওয়ার সুযোগে বৈষ্ণব ভাবসাধনার, ভারতীয় প্রেমভক্তি সাধনার স্বরূপকে—প্রকৃতিকে ও বিকৃতিকেও নিদর্শায়িত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই বিশেষ উদ্দেশ্যের প্রেরণাতেই মূল কাহিনীর সহিত আনুসঙ্গিক উপকাহিনী যোজিত হইয়াছে এবং উহা এক'দকে যেমন কাহিনীর গতি-বিধি নিয়ন্ত্রণে অংশগ্রহণ করিয়াছে তেমনি ভাব-বৈচিত্র্যের বর্ণময় পটভূমিও সৃষ্টি করিয়াছে। এই উপকাহিনী 'নাটকের কাহিনী'র নূতন যোজনা।

এই উপকাহিনীকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করিয়া লওয়া যাইতে পারে—এক—ভিক্ষুক-কথা, দুই—সাধক-থাক কথা, তিন—পাগলিনী-কথা। ইহাদের মধ্যে প্রথম দুইটি ওতপ্রোতভাবে যুক্ত—সুতরাং দুইটিকে এক করিয়া বলা যাইতে পারে—'ভিক্ষুক-সাধক-থাক-কথা'। এই সকল চরিত্রের প্রত্যেকেই বিশেষ বিশেষ ভাবের প্রতিনিধি ['প্রতিনিধি' স্থলে 'রূপক' বসানো সঙ্গত নহে, কারণ 'রূপক' অধিকমাত্রায় বাস্তব স্থান-কাল-পরিবেশ বিমুক্ত, 'প্রতিনিধি' তাহা নহে] সাধক ভণ্ড—বৈষ্ণব সহজ সাধনার বিকৃতি, থাক প্রেমহীনা ও বিষয় তৃষ্ণার্ত কামিনী, পাগলিনী রাগময়ী প্রেমের পূর্ণ প্রতিমা—মহাসমন্বয়ের পূর্ণ বিগ্রহ। ভিক্ষুক—চোর কিন্তু রসিক—'যে যে ভক্ত মোরে ভজে যেই ভাবে'—এই তত্ত্বের দৃষ্টান্ত। সুতরাং ইহারা ভাবের প্রতিনিধি এবং সেই হিসাবেই নাটকের ভাবপটভূমির নানাবর্ণসমাবেশের এক একটি বর্ণ—কোনটি অনুকূল—কোনটি প্রতিকূল। এই পটভূমির মধ্যেই বিল্বমঙ্গল-চিন্তামণির অপূর্ব প্রেমলীলার প্রোজ্জ্বল ছবি অঙ্কিত হইয়াছে।

প্রথমেই আমরা বলিয়াছি—বিল্বমঙ্গলের জীবনে মোটামুটি চারটি পর্ব—এক—মোহ, দুই—মোহমুক্তি, তিন—পুনর্মোহ ও মোহভঙ্গ, চার—কৃষ্ণার্তি ও কৃষ্ণপ্রাপ্তি। নাটকে এই চার পর্বকেই—পাঁচটি অঙ্কে বিভক্ত করা হইয়াছে।

প্রথম অঙ্কে—মোহের উপস্থাপনা, দ্বিতীয় অঙ্কে—মোহ-মুক্তি, তৃতীয় অঙ্কে—প্রথম মোহমুক্তির পরে— দীক্ষা এবং বণিকপত্নী দর্শনে পুনর্মোহ ও মোহমুক্তি, চতুর্থ অঙ্কে—বৃন্দাবন-গমন, রাখালবেশী শ্রীকৃষ্ণের লীলাদি ব্যাপার, পঞ্চম অঙ্কে—রাখালের মধ্য দিয়া রাখালরাজকে পাওয়া—দিব্যদৃষ্টি লাভের পরে শ্রীকৃষ্ণদর্শন এবং চিন্তামণির আত্মসমর্পণের পরে, একসঙ্গে কৃষ্ণলীলা-সম্ভোগ।

প্রথম অঙ্কের—**প্রথম গর্ভাঙ্কে :-** প্রথমে মোহ ও অভিমানের প্রবল দ্বন্দ্ব—এবং সেই মোহেরই জয়। এই দৃশ্যেই ভিক্ষুকের আবির্ভাব—মোহের আনুষঙ্গিক সহায় হিসাবেই। বিল্বমঙ্গল চিন্তামণিকে আত্মসাৎ করিয়া পাইবার মতই পাইতে চাহেন, তাই তিলেক অদর্শনও তাঁহার অসহ্য—অতি ভয় পাছে চিন্তামণি অন্য কোন পুরুষে আসক্তা হইয়া পড়ে। প্রবল অভিমানের তাড়নায় না বলিয়া চলিয়া আসিয়াছেন বটে, কিন্তু প্রাণ অস্থির— বিনা আহ্বানে ফিরিয়া যাওয়া যত অসম্ভব, তদপেক্ষা বেশী অসম্ভব চিন্তামণিকে ছাড়িয়া যাওয়া। ভিক্ষুকের দৌত্য অর্থমূল্যে ক্রয় করা হয় এবং চিন্তামণির কাছে তাহাকে পাঠানো হয়। অবিলম্বেই মোহের আকর্ষণেই বিল্বমঙ্গলকে ধরা দিতে হয়—মোহই শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়। এখানকার কবিকল্পনা বা যাহা কিছু যোজনা—সবই মোহগ্রস্তের দৃষ্টান্ত হইয়াই আসিয়াছে।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে

পথে ভিক্ষুক-সাধকে মণিকাঞ্চনযোগ; একজন চোর, একজন জুয়াচোর ভণ্ড ও কামপরায়ণ। দুইজনেরই ফাঁড়িদারদের ফাঁকি দেওয়ার মতলব এবং ভণ্ড সন্ন্যাসই শেষপর্যন্ত শরণ্য। এই স্থান হইতেই দুইজনেই 'একটু কাজ' করিবার উদ্দেশ্যে নদীপারে একটি স্ত্রীলোকের বাড়ীতে যাওয়ার কথাবার্তা বলে—ভিক্ষুকের কাজ বিল্বমঙ্গলের দূতগিরি করা, আর সাধকের কাজ থাককে কৃষ্ণ-কথা শুনানো। এই 'পথে'ই 'পাগলিনী' গান গাহিয়া যায়—[এই দৃশ্যটিতে মুখ্যতঃ ভিক্ষুক ও সাধকের বিশেষ পরিচয় দেওয়ার চেষ্টাই হইয়াছে

এবং পাগলিনী চরিত্রকে প্রবেশ করানো হইয়াছে। এই দৃশ্যটির উপস্থাপ্য বিষয় নাট্যকারের কল্পনা প্রসূত।

তৃতীয় গর্ভাঙ্কে—শ্রাদ্ধের দিনের ব্যাপার। বিল্বমঙ্গল চিন্তামণির জন্য অস্থির। ব্রাহ্মণ-ভোজনের আগেই চিন্তামণির জন্য পাঁচ চেঙারি খাবার তাহার চাই। বিল্বমঙ্গল চিন্তামণিময়। হিতাহিতজ্ঞান তাঁহার একেবারেই লুপ্ত। ব্রাহ্মণ ভোজনের আগেই তিনি সরিয়া পড়েন * [এই দৃশ্যটি ভক্তমালবর্ণিত কাহিনীর 'পিতৃশ্রাদ্ধ দিনে' কথাটিরই বিস্তার]

চতুর্থ গর্ভাঙ্কে—নদীতীর—শ্মশান। চিন্তামণি-পাগল বিল্বমঙ্গল পারে যাইবার জন্য অস্থির-ব্যাকুল। প্রাণ তাঁহার যায় যায়। চিন্তামণিকে একটু দেখার জন্যই শুধু প্রাণের মায়া। নৌকা-ভেলাদির অভাবে, অগত্যা শ্মশানের কাঠ আনিয়া গেলেও তাঁহাকে পারে যাইতে হইবে —এমন উন্মত্ততা। শ্মশানে পাগলিনীর সাথে দেখা হয়—দুইজনেই পাগল—বিল্বমঙ্গল বেশ্যা চিন্তামণির জন্য আর পাগলিনী পাগল আসল চিন্তামণির জন্য। তাঁহার চিন্তামণি—কভু এলোকেশী কালী, কভু বাঁশরীবয়ান ব্রজকিশোর, কভু জটাধর দিগম্বর শিব, কভু রাস-রসময়ী রাধিকা—মোট কথা সে একা সাজে পুরুষপ্রকৃতি। এই পাগলিনীই যেন বিল্বমঙ্গলের উত্তর সাধকের কাজ করে। প্রাণের মায়া তুচ্ছ করিয়া বিল্বমঙ্গল জলে ঝাঁপ দেন। [* এই দৃশ্যে নাট্যকার পাশাপাশি দুই প্রেমকে উপস্থাপিত করিয়াছেন, তন্ময়তা ও ব্যাকুলতা উভয় প্রেমেরই লক্ষণ, কিন্তু একের লক্ষ্য -কামিনীকায়া, অন্যের লক্ষ্য—অচিন্ত্যরূপ চিন্তামণি।

ইহার একাংশের মূলবীজ—ভক্তমালে আছে, কিন্তু পাগলিনীর উপস্থাপনা ও ভাবোন্মত্ত প্রলাপ নতুন সংযোজনা [এখানেই প্রথম অঙ্কের ছেদ।]

দ্বিতীয় অঙ্কের—প্রথম গর্ভাঙ্কের—দৃশ্য—চিন্তামণির বাটি। এই দৃশ্যের মুখ্য উপস্থাপ্য—"প্রাচীর হইতে বিল্বমঙ্গলের পতন":—দৃশ্যের প্রথমাংশে—'সাধক—ভিক্ষুক'—আলাপ ও 'সাধক-থাক,—সংলাপ।—শেষাংশে

—'প্রাচীর হইতে বিল্বমঙ্গলের পতন। [প্রথমাংশ—সংযোজনা, দ্বিতীয়াংশ ভক্তমাল-কথিত]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে—প্রাচীরে লম্বমান মৃতসর্পের দৃশ্য। এই দৃশ্যেই—মোহমুক্তির সূচনা—ভাবান্তরের প্রথম আন্দোলন—উন্মত্ত মোহের সহিত মুগ্ধের মুখোমুখি পরিচয়—হারানো আত্মার জন্য নির্জ্জন ভাবনা বেদনা। রূপ-সৌন্দর্যের মোহ, ক্রমেই নির্বিশেষ ব্যক্তিনিরপেক্ষ হইয়া উঠিতেছে। চিন্তামণির অবিশ্বাস উহার গতিবেগ আরো বাড়াইয়া দিয়াছে। আর টহলদারদিগের গীত—বৈরাগ্যেরই পরিপোষক উদ্দীপন-বিভাব। *[এই দৃশ্যটির বিষয় ভক্তমাল কথিত বটে কিন্তু ভাব-কল্পনা ও টহলদারগণ নতুন ও সার্থক যোজনা।]

তৃতীয় গর্ভাঙ্কে—নদীকূলে পতিত গলিত শবের দৃশ্য। বিল্বমঙ্গলের মন মায়া-সচেতন—বৈরাগ্য-মুখী। শবের পরিণাম দেখিয়া বিল্বমঙ্গলের মধ্যে হাহাকার—তবে হায়! প্রাণ দিছি কারে? মনে হয়—'মিথ্যা মিথ্যা মিথ্যা এ সকলি!'

যে প্রেমের পাথারে সকল প্রেম-প্রবাহ মিশিয়া লয় হইয়া যাইবে সেই পরম আত্মজনের জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। পাগলিনীর গানে তাঁহার সন্দেহ শঙ্কা দূর হইয়া যায়। যিনি ভিতরে থাকিয়া বলিয়া দিতেছেন—সংসারে কেউ নাই, যিনি ভিতরে থাকিয়াই এখন বলিতেছেন—আমি আছি, সেই "পরম সুন্দর"কে দেখিবার জন্য তিনি উন্মত্ত ব্যাকুলতায় চলিয়া যান। *[বিষয়টুকু ভক্তমাল-কথিত—তবে ভাব-বিস্তার ও পাগলিনীর উদ্দীপনাময়ী গীতি—কবি-কৃতি]

তৃতীয় অঙ্ক—প্রথম গর্ভাঙ্কে 'দৃশ্য'—'পথ'। সোমগিরি-বিল্বমঙ্গলে সাক্ষাৎকার। সোমগিরির নিকট বিল্বমঙ্গলের কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ।

[* ভক্তমালে দেখা যায়—বিল্বমঙ্গল সোমগিরির আশ্রমে গিয়া দীক্ষা গ্রহণ

করেন। এখানে—দেখা যাইতেছে, সোমগিরিই বিল্বমঙ্গলকে আশ্রমে লইয়া যাইতে—'পথে' আসিয়াছেন।]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে—দৃশ্য—'চিন্তামণির বাটীর সম্মুখ'। উপস্থাপ্য বিষয় চিন্তামণির প্রতিক্রিয়া—পাপ—চেতনা ও বেদনা এবং প্রেমময় কৃষ্ণের কৃপার জন্য আকুতি। পাগলিনী আসিয়া ভরসা দেয়—'তোকে হরি কৃপা করবেন'। পাগলিনীর কথায় ও গানে—চিন্তামণির আপাদ-মস্তক কাঁপিতে থাকে—তাঁহারও ভাবান্তর ঘটে। চিন্তামণির বিষয় বিরাগ দেখা দেয়— তাইসে পাগলীকে গহনাগুলি দিয়া দেয়। এখানেই বিপরীত বাসনা দেখানো হয়—সাধক ও থাকর বিষয় তৃষ্ণার মধ্যে। ভিক্ষুকও আসিয়া জুটে—সাধক চলিয়া গেলে—পাগলিনীও প্রবেশ করে। পাগলিনীর গহনা দেখিয়া ভিক্ষুকের লোভ হয়। পাগলিনী ভিক্ষুককে গহনা দিতে চাহে কিন্তু ভিক্ষুকের মনে পাপ—প্রথমে মনে করে গোয়েন্দা, শেষে দেখে সত্যই পাগল। আপন-ইচ্ছায় দেওয়া—গহনা, সে চোরের মত ত্রস্তভাবে লইয়া প্রস্থান করে। [* এই দৃশ্যের ভাব-গত উদ্দেশ্য—বিষয় বিরাগ ও বিষয়-তৃষ্ণাকে পাশাপাশি রাখিয়া দেখান। ইহা ভক্তমালের—

"দৈবযোগে সেই রামা, চিন্তামণি বেশ্যানামা
কৃষ্ণ কৃপা তাহার উপরি।
সকল করিয়া দূরে কৃষ্ণ প্রেমাবেশ ভরে
আসি মিলে বৃন্দাবন পুরী ॥"

—এই বিবরণ- কথিত ঘটনারই প্রস্তুতি। তবে চিন্তামণির বিষয় বিতৃষ্ণাকে, সাধকাদির বিষয় তৃষ্ণার যে পটভূমিতে স্থাপন করা হইয়াছে, তাহা নতুন সংযোজনা]

তৃতীয় গর্ভাঙ্কে—দৃশ্য—'বাপীতট'। আসল উপস্থাপ্য—বণিকপত্নী দর্শন ও তজ্জনিত লালসা। কিন্তু ইহা উপস্থাপিত হইয়াছে শেষাংশে। প্রথম অংশে—সোমগিরির ও তদীয় শিষ্যের কথোপকথনের মধ্য দিয়া প্রকৃত বৈরাগ্যের ও বিকৃত বৈরাগ্যের রূপ বিচার করা হইয়াছে এবং বিল্বমঙ্গলের অহেতুকী ভক্তির

মাহাত্ম্য প্রদর্শিত হইয়াছে। সোমগিরি নকল সাধুর শ্রেণী বিভাগ করিয়া দেখাইয়াছেন—(১) কেহ 'কাঞ্চনের তরে জটা ধরে শিরে'—(২) কেহ 'নারী সহ করিতে বিহার' সন্ন্যাসীর ভাণ করে, (৩) কেহ মানের জন্য—'দীর্ঘ জটা বয়' (৪) কেহ অষ্টসিদ্ধি আশ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করে। এবং সঙ্গে সঙ্গেই দেখাইয়াছে বিল্বমঙ্গলের প্রেমের মাহাত্ম্য—'কৃষ্ণ চায়, কিবা হেতু নাহি জানে'। ব্রজের এ প্রেম, তুলনা নাহিক আর তার! 'গুরু—শিষ্য ভাব সম্বন্ধে শিষ্যের যে সংশয় হয় তাহাও দূর করেন—বলেন—ঈশ্বর ইন্দ্রিয় গোচর নহেন বলিয়াই তর্ক যুক্তির পথে অনুমান করা হয় কিন্তু সন্দেহ কাটে না। ঈশলুব্ধ প্রাণ-তত্ত্ব জানিতে ব্যাকুল হইয়া উঠে, এই ব্যাকুলতার মুখেই— 'অকস্মাৎ কোথা হতে কেবা আসে, তাঁর ভাবে হৃদে হয় আশার সঞ্চার, বিশ্বাস বিকাশে প্রাণে,' এবং সেই কথাকেই—'মানে মনে জ্ঞানে, ঈশ্বরের বাক্য বলি'। এই হিসাবে গুরুমাত্রই নিমিত্তগুরু। কিন্তু সত্যকার গুরু তিনিই যিনি 'প্রেমিক মহাজন'।

গুরু-শিষ্যের প্রস্থানের পর প্রবেশ করেন বিল্বমঙ্গল—নাম জপ করিতে করিতে এবং 'চক্ষু মুদ্রিত করিয়া উপবেশন করেন'। এই সময়েই 'অহল্যা' প্রবেশ করেন—তাহাকে দেখিয়াই বিল্বমঙ্গলের চক্ষু আকৃষ্ট হয়। 'সংস্কার'কে ধিক্কার দিতে দিতে বিল্বমঙ্গল বণিকপত্নীর অনুসরণ করেন। * [এই দৃশ্যের প্রথমাংশ নাট্যকারের স্বকীয় পরিকল্পনা—এইস্থানে তিনি প্রেমতত্ত্ব, গুরুশিষ্যভাব প্রভৃতি তত্ত্ব উপস্থাপনার সুযোগ গ্রহণ করিয়াছেন। গুরু-শিষ্যভাব-তত্ত্বের আলোচনা করিতে যাইয়া নাট্যকার বেশখানিকটা আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছেন। দাক্ষিণাত্যের বিল্বমঙ্গল সম্বন্ধে—"বাঙলায় সাধু সদাশয় কৃষ্ণ মিলাবেন আনি"—বলা, অনুচিত কল্পনা হইয়াছে। রামকৃষ্ণের আকর্ষণেই এই বিভ্রাট ঘটিয়াছে। সুতরাং—এই দৃশ্যের প্রথমাংশ নতুন গ্রহণ, এবং বিল্বমঙ্গলকে বাঙলার সাধু কল্পনা করা—প্রথিত তথ্যকে 'বর্জন'। শেষাংশ—ভক্তমাল-নির্দেশিত।

চতুর্থ গর্ভাঙ্কে—দৃশ্য, 'চিন্তামণির বাটীর সম্মুখ। বিষয়তৃষ্ণার উৎকট অবস্থা—থাক ও সাধকের। বিষ খাওয়াইয়া চিন্তামণিকে মারিয়া ফেলিয়া ধনরত্ন হস্তগত

করিবার ষড়যন্ত্রে উভয়ে লিপ্ত। কিন্তু ভিক্ষুক ঝোপের অন্তরাল হইতে সবই শুনিয়া ফেলে। ভিক্ষুকের যৎসামান্য ভাবান্তর দেখা যায়। সব কথা বলিয়া দিতে তাহার ইচ্ছা হয়। কিন্তু তখনই—চিন্তামণিও প্রবেশ করে, পরকালের উপায় খুঁজিতে সে ব্যাকুল; কিন্তু পোড়া পেটের ভাবনাই বাধা। পাগলিনীও আসিয়া পড়ে—উত্তরসাধিকার মত চিন্তামণিকে পেটের ভাবনা ছাড়িতে বলে—এবং পরোক্ষভাবে বিষ সম্বন্ধে সতর্কও করে। ভিক্ষুকের ভাবান্তরের বীজ বেশ অঙ্কুরিত হয়। পাগলিনীর মধ্যে সে রহস্যময়ী শক্তিরই আবির্ভাব উপলব্ধি করে। ভিক্ষুক চিন্তামণিকে থাক-সাধকের ষড়যন্ত্রের কথা সব বলিয়া দেয়। চিন্তামণির বিষয়-বিরাগ সম্পূর্ণ হয়। অঞ্চল হইতে চাবি খুলিয়া ফেলিয়া দেয়। পাগলিনী চাবি চাহিয়া লইয়া ভিক্ষুককে দেয়। ভিক্ষুকেরও বৈরাগ্য আসে। সেও আত্মসমর্পণ করে। [* এই দৃশ্যটিতে—বিষয়তৃষ্ণা ও বিষয়বিরাগের চরম নিদর্শন দেখান হইয়াছে। চিন্তামণির বিষয়বিতৃষ্ণা ও বৈরাগ্যের দিক দিয়া ইহা এক হিসাবে ভাব 'বিস্তার,' কিন্তু সামগ্রিক ভাবে দেখিলে দৃশ্যটি নতুন যোজনা।]

পঞ্চম গর্ভাঙ্কে—বণিকের বাটীর সম্মুখ—দ্বারে বিল্বমঙ্গল উপবিষ্ট। এই দৃশ্যে—বণিকের কাছে স্ত্রীদর্শনের প্রস্তাব। 'বণিক চরিত্র কিছু অলৌকিক হয়'—ভক্তমালের এই উক্তিরই বিস্তার বণিক-চরিত্রে দেখা যায়।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্কে—বণিকের বাটীর অন্তঃপুর। এই দৃশ্যের প্রথমাংশে বণিক ও বণিক-পত্নীর ধর্মরক্ষার জন্য আত্মপ্রস্তুতি—দ্বিতীয়াংশে বিল্বমঙ্গলের মোহমুক্তির চরম পর্যায়—চক্ষু বিদ্ধকরণ। [* ভক্তমাল-কাহিনী কথিত ঘটনারই বিস্তার]

চতুর্থ অঙ্কে—প্রথম গর্ভাঙ্কে—চিন্তামণির বাটীর কক্ষে, বিষয়-লোভী থাক-সাধক দারোগার হস্তে বন্দী হয় এবং বিষয়-বিষেই প্রাণত্যাগ করে। [* নতুন যোজনা। বিষয়তৃষ্ণার পরিণাম দেখানই উদ্দেশ্য]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে—পথ। উত্তর সাধিকা পাগলিনী চিন্তামণিকে আরো এক ধাপ 'সাধন-মার্গে' আগাইয়া দেয়—নিঃসম্বল ও নিঃসহায় চিন্তামণি পতিত-

পাবন দয়াময়ের শরণ লয়। ভিক্ষুকের সঙ্গে চিন্তামণির দেখা হয়। উভয়েই বৃন্দাবন-অভিমুখে যাত্রা করে। [* সাধনতত্ত্বের বিস্তার হিসাবে দৃশ্যটি নতুন সংযোজনা।]

তৃতীয় গর্ভাঙ্কে—দৃশ্য—বণিকের বাটী। বণিক ও বণিক-পত্নীর মনেও বৈরাগ্য জন্মে। উভয়েই বৃন্দাবন-গমনে সঙ্কল্পিত। এখানেই রাখাল বালক-বেশী শ্রীকৃষ্ণের প্রথম আবির্ভাব—বৃন্দাবনের আহ্বান ঘরে ঘরে পৌঁছাইয়া দেওয়াই তাহার কাজ। ভক্তকে রক্ষা করাও তাহার অন্যতম দায়—বিল্বমঙ্গলকে বৃন্দাবনে পৌঁছাইয়া দেওয়ার দায়েই সে বণিক-দম্পতীর সাহায্য-প্রার্থী। অহল্যাকে সে মা বলিয়া ডাকে, বণিকেরও মনে হয়—ছেলেটি যেন ব্রজের গোপাল।

চতুর্থ গর্ভাঙ্কে—দৃশ্য—'কানন'। বিল্বমঙ্গল তৃষ্ণার্ত। হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ! বলিতে বলিতে মূর্চ্ছিত হইয়া যান; রাখাল তাঁহার কর্ণমূলে কৃষ্ণনাম প্রেরণ করে। 'চৈতন্ম পাইয়া' বিল্বমঙ্গল আরো কৃষ্ণপ্রেম-পাগল হইয়া পড়েন। রাখাল প্রেম কৃষ্ণপ্রেমের অবাধ স্ফুরণে বাধা জন্মায়—বিল্বমঙ্গল রাখালকে দূরে ঠেলিতে চাহেন। প্রেমক্ষুধায় তিনি উন্মত্ত মাধবকে তাঁহার চাই-ই চাই। রাখাল গান করিতে করিতে—বিল্বমঙ্গলের হাত ধরিয়া প্রস্থান করে। [* ভক্তমালের "কৃষ্ণ দরশন রাগে চলে বৃন্দাবনে। অনুরাগ চক্ষু যার কি করে নয়নে॥ রাধাকৃষ্ণ-লীলা-রূপ গুণ মধু মাতি। ক্ষণে হাসে কাঁদে গায় ক্ষণে পড়ে ক্ষিতি॥ মাতোয়ার প্রায় থর থর করি চলে। বর্ণয়ে মধুর গীত ভাসে অশ্রুজলে॥—এই অংশ অনুসরণে লিখিত; এই স্থানে রাখালের উপস্থিতি—নব পরিকল্পনা।]

পঞ্চম অঙ্কে—প্রথম গর্ভাঙ্কে, দৃশ্য—বৃন্দাবনের গোবর্দ্ধন-পর্বত। চিন্তামণি বৈরাগ্যের শেষ মাত্রায় উপনীত—"অঙ্গে বিভূতি লেপন" করিয়াছে এবং "চুল কাটিতে উদ্যত"। রাখাল যথাসময়েই যথাস্থানে উপস্থিত। চুল কাটিতে মানা করে এবং চিন্তামণির মন পরীক্ষাও করে। ভিক্ষুকের সঙ্গেও রাখাল ভাব করে এবং ভিক্ষুকের—শেষ সংস্কার 'পুটলী-সামলানো বাতিক' দূর করে।

পাগলিনীও উপস্থিত হয়- সশিষ্য সোমগিরির সঙ্গেই পাগলিনীর নির্দেশেই চিন্তামণি সোমগিরির শরণ লয়। সোমগিরি আবার শরণ লইতে বলে—বিল্বমঙ্গলের কাছে। ভিক্ষুক সোমগিরির শরণাপন্ন হয়। স্বভাব-অনুযায়ী সাধনার পথেই সিদ্ধি তাড়াতাড়ি সম্ভব বলিয়া ভিক্ষুককে তিনি—মাখন-চোরকে চুরি করিবার নির্দেশ দেন।

[* এই দৃশ্যে—চিন্তামণির বৈরাগ্যকে কেন্দ্র করিয়া - সাংসারিক ভাবকে বা লৌকিক সংস্কারকে কৃষ্ণপ্রেমে পরিণত কৃষ্ণপ্রেমলাভের উপায়ে পরিণত করিবার কথা উপস্থাপিত হইয়াছে। দৃশ্যটি—তথ্যের ও তত্ত্বের হিসাবে নতুন যোজনা।]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে –দৃশ্য –বন। রাখাল-প্রেম ও কৃষ্ণপ্রেমের তীব্র দ্বন্দ্ব বিল্বমঙ্গলের হৃদয়ে। কৃষ্ণের ধ্যান করিতে গেলেই রাখালমূর্তি মনে ভাসিয়া উঠে। রাখালের কাছ থেকে, সাত দিন ধরিয়া তিনি দূরে যাইবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু প্রতিমুহূর্তেই মনে হয়—এই রাখাল উপস্থিত। মন তাঁহার রাখালময়। তাই রাখালকে দেখিবার সাধ আজ দুর্বার। অনাথনাথ রাখালও সেই সময়েই উপস্থিত হয়—হাতে তাহার দুধের বাটি। বিল্বমঙ্গল এইবার বুঝিয়া ফেলেন—'এই যে অনাথনাথ শ্রীকৃষ্ণ।' হাত ধরিয়া ছায়ায় লইতে গেলেই বিল্বমঙ্গল খপ্ করিয়া হাত ধরিয়া ফেলেন এবং বলেন—"আর ত ছাড়ব না—আমার অনেক যত্নের নিধি।" কৌশলে হাত ছাড়াইয়া লইয়া কৃষ্ণ ভক্তের সহিত লুকোচুরি খেলেন এবং পরে—চক্ষু দান করিয়া, ভক্তের স্বরূপ দেখান।

সেই সময়েই—বণিক ও বণিকপত্নী উপস্থিত হয়। রাখালের মা সম্বোধনে অহল্যার প্রাণ জুড়াইয়া যায়। রাখালের কথায় তাহার অটল বিশ্বাস। কৃষ্ণকে দেখিবার জন্য সেখানেই তাহারা বসিয়া থাকে।

এমন সময় প্রবেশ করে—চিন্তামণি, পাগলিনী ও ভিক্ষুক। সোমগিরিও সশিষ্যে উপস্থিত। শিষ্যদিগকে—তিনি বিল্বমঙ্গলের মধ্যে 'বৈরাগ্যের চেতন

মূর্তি প্রত্যক্ষ' করিতে বলেন। এবং কৃষ্ণদর্শনের ফল—'কৃষ্ণদর্শন,' তাহাও বুঝাইয়া দেন।

শেষে চিন্তামণি বিল্বমঙ্গলের পদে আত্মসমর্পণ করে। চিন্তামণির কৃষ্ণপ্রেম দেখিয়া বিল্বমঙ্গলের আনন্দ ধরে না, প্রেমশিক্ষাদাতা বলিয়া তাহাকে প্রণামও করেন। *[এই দৃশ্য রাখাল-রাজের লীলা এবং বিল্বমঙ্গলের কৃষ্ণদর্শন মুখ্য উপস্থাপ্য। তবে এখানে অনেক পরিমাণে ভাব-সঙ্কোচ করা হইয়াছে। ভক্তমালে যে-ভাবের ভাব-বিস্তার পাওয়া যায় এখানে তাহা নাই। সুতরাং বলা যাইতে পারে—রাখালপ্রেম ও কৃষ্ণপ্রেমের দ্বন্দ্ব নতুন পরিকল্পন, হইলেও বিল্বমঙ্গলের সহিত কৃষ্ণের লুকোচুরি খেলা প্রসঙ্গে যে ভক্তমালে যে ভাবাবস্থার দেখা যায়—এখানে তাহা দেখা যায় না। বণিক-বণিকপত্নী প্রভৃতির বৃন্দাবনে-গমন ও শ্রীকৃষ্ণদর্শন কবি-কৃত কল্পনা। ভিক্ষুকের কৃষ্ণদর্শনও—কবির কল্পনা এবং ভাব-পরিকল্পনারই পরিণতি।]

শেষ দৃশ্য—'পটপরিবর্তন'-এর পরেই দোলমঞ্চোপরি শ্রীকৃষ্ণ-রাধিকার যুগল-মূর্তি। সকলেই—বণিক, অহল্যা, চিন্তামণি, ভিক্ষুক, পাগলিনী, সোমগিরি, শিষ্যগণ গোপীবল্লভকে দর্শন করিয়া কৃতার্থ। সমবেত গীতের পরে—যবনিকা।

বিঃ দ্রঃ * নাটকে যে কাহিনী পরিকল্পিত হইয়াছে, তাহা শুধু ভক্তমাল-কথিত কাহিনীরই উক্তি-প্রত্যুক্তিবন্ধে-গ্রথিত রূপটি নহে। নাটকে কেবলমাত্র বিল্বমঙ্গলের জীবন-কথাই দৃশ্য করা হয় নাই—বিল্বমঙ্গলের জীবনকথাকে কেন্দ্র-রূপে গ্রহণ করিয়া, বৈষ্ণব-সাধনতত্ত্বের নানাদিক নিদর্শায়িত করা হইয়াছে। সুতরাং নাটকের মূল অবলম্বন—ভক্তমাল-কথিত কাহিনী হইলেও, নাটকের কাহিনী নতুন নতুন সংযোজনায় আরো সমৃদ্ধ ও জটিল। ভিক্ষুক-থাক-সাধক, বণিক-বণিকপত্নী প্রভৃতি পাত্র-পাত্রীর সমবায়েই এই কাহিনী গঠিত।

'রচনার প্রেরণা' সম্বন্ধে দুই-একটা গোড়ার কথা

রচনার প্রেরণা বিষয়ে আলোচনা করিবার মুখে, কবি-সমালোচক ড্রাইডেনের একটি উক্তি স্মরণ করা যাইতে পারে,—উক্তিটি এই—

They who have best succeeded on the stage

Have still comformed their genius to their age

[Epilogue to the second part of the conquest of Granada]

অর্থাৎ প্রতিভা যতই বড় হউক, যুগাপেক্ষী না হইয়া পারে না। এই প্রসঙ্গে আর একটি উক্তিও স্মরণীয়—

"The drama's laws the drama's patrons give.

And he who writes to please must please to live".

এই উক্তি দুইটি শুধু নাট্যসাহিত্য সম্বন্ধেই যে প্রযোজ্য তাহা নহে, সকল রকমের শিল্প ও সাহিত্য-শিল্প সম্বন্ধেও কম-বেশী প্রযোজ্য। বাস্তবিক, আপাত-দৃষ্টিতে, "writes to please"-ই (আনন্দ দেওয়ার উদ্দেশ্যে লেখা) বড় আকারে আমাদের কাছে প্রতিভাত হয়, কিন্তু প্রত্যেক আনন্দদানের তাগিদের মূলে বাঁচার তাগিদের অন্তঃপ্রবাহও যে বেশী কম থাকে তাহা আমাদের চোখে ধরা পড়ে না এবং সেই কারণেই 'অহেতুক আনন্দ সৃষ্টি'-বাদ, 'স্বতঃস্ফূর্ত সৃষ্টি'-বাদ (free-inspiration) 'শিল্পের প্রেরণা' আলোচনার ক্ষেত্রে, খুব বড গলায় কথা বলে এবং চমকও সৃষ্টি করে। কিন্তু তলাইয়া দেখিলেই দেখা যাইবে "অহেতুক" বলিয়া কোন কিছু সম্ভব নহে—অন্ততঃ 'কারণাভাবাৎ কার্যাভাবঃ' —সূত্রটি যতদিন অন্যতম মৌলিক সত্য বলিয়া স্বীকৃত থাকিবে। আশ্চর্যের বিষয় হইলেও তবু ইহা সত্য, যে আমরা উল্লিখিত সূত্রটিকে মুখে যত বলি, কার্যে তত প্রয়োগ করি না এবং করি না বলিয়াই, শিল্পের বা সাহিত্যের প্রেরণা আলোচনা করিবার সময় সূত্রটি ভুলিয়া থাকি এবং শিল্পকে "বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি বিকশি" গোছের বস্তু বলিয়া মনে করিয়া থাকি, অর্থাৎ সৃষ্টি-ব্যাপারটিকে অলৌকিক প্রেরণার সামগ্রী ও অহেতুক প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করি। বিশেষতঃ যেখানে সৃষ্টি-প্রেরণা অতি-সংলক্ষ্য বা সুবিদিত নহে, সেখানেই এই প্রবৃত্তিটি বেশী প্রবল হইয়া ওঠে। সাহিত্য-সৃষ্টি ব্যাপারটি বিশেষ এক ধরনের মানসিক ক্রিয়া এবং সাহিত্যে যে ভাব ও

জীবনের রূপ রূপায়িত হয় তাহারা বিশেষ কালের ও বিশেষ সমাজের সামগ্রী—ইহা আমরা প্রায় সকলেই স্বীকার করিয়া থাকি এবং ইহাও আমরা দেখি—ব্যবহারিক সমালোচনায় সমালোচকরা কবি-মানসের গঠন এবং সৃষ্টির অনুপ্রেরণা বিশ্লেষণ করিবার সময় রীতিমত কার্য-কারণ-তত্ত্ব-বাদীর মনোভাবই দেখাইয়া থাকেন—অর্থাৎ কবির পারিবারিক ও সামাজিক শিক্ষা-দীক্ষার হিসাব করেন—নানা ব্যক্তির ও মতবাদের প্রভাব খুঁজিয়া খুঁজিয়া বাহির করেন, যুগের চাহিদা কবির কোন সৃষ্টিকে কিভাবে প্রভাবিত করিয়াছে তাহা নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করেন এবং কবি কেন কোন্ ভাব বা বিষয়বস্তুকে গ্রহণ করিয়াছেন তাহাও সমীক্ষণ করিয়া থাকেন, কিন্তু সাধারণ সূত্র আওড়াইবার সময় "দৈব-প্রেরণা"কেই মূল অনুপ্রেরণা বলিয়া ঘোষণা করিবার দুর্বলতা খুব কম সমালোচকই কাটাইয়া উঠিতে পারেন। এই—পরিবৃত্তি-প্রবণতাকে আমরা সংক্ষেপে Intellectual "Atavism" বলিতে পারি (জীবের অতীত প্রজাতীয় বৈশিষ্ট্য অনেক সময় পরিবৃত্তির প্রভাবে বর্তমান প্রজাতিতে দেখা দেয়া থাকে—রাশিয়ার কুকুর-রূপী মানুষটি ইহার বড় দৃষ্টান্ত। এখানে এই শব্দটির অর্থ সামর্থ এই যে দৈহিক গঠনে পূর্বপ্রজাতবৃত্তিতা যেমন ঘটিতে পারে, তেমনি বুদ্ধিতেও অনেকের মধ্যে পূর্বের অথচ নিষ্প্রয়োজন বিশ্বাসের মমতা বা প্রবণতা দেখা যায়) অকপটে স্বীকার করা ভাল—সমালোচকদিগের মধ্যে এমন লোক খুব কমই আছেন যাঁহারা সর্বাঙ্গীন সঙ্গতি রক্ষা করিতে সক্ষম।

তবে একথা স্বীকার করিয়াই এখানে অগ্রসর হওয়া বাঞ্ছনীয় যে, শিল্পের প্রেরণা সরল বা একক নহে—উহা যৌগিক এবং শিল্পের ঠিক সৃষ্টির সময়টিতে 'বিষয়বস্তু'কে সুন্দর রূপ দেওয়ার তাগিদ তথা আনন্দ-মূল্যে-মূল্যবান করিবার তাগিদ অধিক পরিমাণে কাজ করে; কারণ শিল্পের মূলে অন্তর্বিধ যত তাগিদই থাক, শিল্প সৃষ্টি শেষ পর্যন্ত স্বরূপের তথা রসের সৃষ্টি। এইদিক দিয়া শিল্প-সৃষ্টিকে রস-সৃষ্টি বলা অসঙ্গত নহে এবং শিল্প-সৃষ্টির প্রেরণাকে সংক্ষেপে রূপ-

রস-সৃষ্টির প্রেরণা বলিলেও ভুল বলা হয় না। কিন্তু প্রেরণা শব্দটির তাৎপর্যকে এত ছোট করিয়া দেখিলে চলে না; কারণ প্রেরণাটি জৈবিক প্রবৃত্তি ও সামাজিক জীবনের সহিত যুক্ত হইয়া আছে—অভিযোজনের চেষ্টার অংশ রূপেই প্রেরণাকে গ্রহণ করিতে হইবে।

মানুষ সামাজিক জীব। এই হিসাবে তাঁহার আচার-বিচার, ধর্ম-কর্ম, ভাব-ভাবনা—সব-কিছুই সামাজিক অর্থাৎ বিশেষ সামাজিক জীবনেরই প্রতিফলন। ব্যক্তির আচরণ—যে-কোন রূপ আচরণই হউক—সামাজিক জীবনের একটি বিশেষ পরিবেশের সহিত অভিযোজনের চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নহে। আমরা তলাইয়া দেখিতে যাই না যে ব্যক্তির প্রতিটি হাঁ বা না, প্রতিক্ষণের দৈহিক ও মানসিক ক্রিয়া পরিবেশের (রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-নৈতিক-সামাজিক-আধ্যাত্মিক সংস্থা) সহিত অবিরাম অভিযোজনেরই পরিণতি। এই দৃষ্টি লইয়া দেখিলে দেখা যায়—কবি একজন সামাজিক ব্যক্তি, তাঁহার দৃষ্টির উপাদান—সামাজিক জীবনের রূপ ও ভাব এবং তাঁহার উদ্দেশ্য সামাজিক মানুষের মধ্যে নিজের অভিজ্ঞতা ভাব ও ভাবনাকে রসরূপে সঞ্চার করিয়া দেওয়া। কবি সামাজিক ব্যক্তি বলিয়াই তাহার কর্ম সমাজের চাহিদার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত—সে কর্ম আধ্যাত্মিক, রাজ-আর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক যাহাই হউক না কেন।

মনু বলিয়াছেন—"অকামস্য ক্রিয়া কাচিৎ দৃশ্যতে নহি কর্হিচিৎ"—অকামের কোন ক্রিয়া নাই। প্রত্যেক ক্রিয়ার মূলে কামনা অবশ্যই আছে—একথা স্বীকার করিবার সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে সামাজিক-জীব মানুষের বিশেষ কামনা, সমগ্র সমাজেরই বাসনা-কামনার অন্যতম অংশ বা একটা দিকমাত্র এবং শিল্প-সৃষ্টি মানুষের কামনার সহিত—সমাজের চাহিদার সহিত যুক্ত হইয়া আছে। অভিযোজনের বাহিরে কোন কর্ম নাই। শিল্প সৃষ্টিও একপ্রকার অভিযোজন—আধিমানসিক অভিযোজন। অর্থাৎ শিল্প-দ্বারা শিল্পী তাঁহার পরিবেশের সহিত অভিযোজন করিতে চেষ্টা করেন। কখনও

পরিবেশের চাহিদা মিটাইয়া, কখনও বা নূতনের চাহিদা সৃষ্টি করিয়া শিল্পী শিল্প রচনা করেন তথা আত্মরক্ষা বা আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন। এখানেই—"'must please to live" -এর মৌলিক সত্যটি আছে। মনে রাখা দরকার শিল্পী শ্রেণী-বিভক্ত সমাজের বিশেষ একটি শ্রেণী। শিল্পই তাহার আত্মরক্ষার বা আত্মপ্রতিষ্ঠার অবলম্বন। শিল্পের মূল্যেই তাঁহার নিজের মূল্য—সামাজিক মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে শিল্পীকে সমাজের প্রধান প্রবৃত্তি তথা আনন্দ-বোধের সহিত খাপ খাওয়াইয়া চলিতে হয়। সমাজের চিত্তকে 'চেতাইয়া' রাখাই (রবীন্দ্রনাথ) শিল্পীর নিগূঢ় উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য যিনি যত অধিক মাত্রায় সিদ্ধ করিতে পারেন তিনি তত কৃতী হন—তত যশস্বী হন। শিল্প শিল্পীর জীবন-সাধনারই উপায় বিশেষ।

যেখানে স্পষ্টভাবে এই জীবন-সাধনার রূপটি ধরা পড়ে না, সেই আত্ম-কেন্দ্রিক ব্যক্তিগত ভাবোচ্ছ্বাসময় রচনাতেও শিল্পী কিন্তু সমাজ-নিরপেক্ষ—দেশ-কাল-নিরপেক্ষ নহে। এইরূপ সৃষ্টিতে, কোনস্থলে শিল্পীর বিশেষ 'ভাব-প্রসক্তি' বা অবদমিত বাসনা-কামনা উৎসারিত হইয়া থাকে এবং কোন স্থলে কবি পরোক্ষভাবে কোন সামাজিক ভাবাদর্শকেই গীতোচ্ছ্বাসে ব্যক্ত করিয়া, আপনার বিশ্বাসানুগতাই প্রকাশ করিয়া থাকেন।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে কবি বুঝি সমাজের কেহ নহেন এবং—সমাজের কোন-কিছুর সহিত বুঝি তাহার কোন যোগ নাই বা কোন-কিছু সম্বন্ধে কোন মাথা ব্যথাও নাই, কিন্তু তলাইয়া দেখিলেই কবির সামাজিক রূপটি ধরা পড়ে—দেখা যায়, কবি সমাজসত্যের সহিত আবেগ-ভরে বুঝাপড়া করিতেছেন—বিষয়বস্তু নির্বাচনের ও রসরূপ দানের মধ্য দিয়া কবি সমাজ-সত্যেরই কোন-না-কোন পক্ষে যোগদান করিয়াছেন। * [রবীন্দ্রনাথের নাটক ও কাব্য আলোচনায় এই কথাটি বিশেষভাবে স্মরণীয়] এই শ্রেণীর আত্মপরায়ণ শিল্পীদের কথা একটু স্বতন্ত্র।

কিন্তু যাঁহারা নাট্যকার—যাঁহারা অভিনেয় কাব্যরচনা করিয়া থাকেন

তাঁহাদের পক্ষে ঐরূপ আত্মমগ্নতা বা আত্মলগ্নতা সম্ভব নহে। স্রষ্টা এখানে অধিকমাত্রায় সমাজ-সচেতন। কারণ সমাজের সর্বশ্রেণীর চাহিদার মুখ চাহিয়া তাঁহাকে সৃষ্টি করিতে হয়। Lynton Hudson মহাশয় তাঁহার 'The Twentieth Century Drama-গ্রন্থে এই সম্পর্কে সরল ও সুন্দর ভাষায় কয়েকটি কথা লিখিয়াছেন— তিনি লিখিয়াছেন :—"In every age, the dramatist must submit to certain limitations. The **first** are the obvious economical **limitations**—not only must the playwright 'please to live' but his play must be Commercial proposition, the outlay it will require to put it on the stage, must be recoverable from the box-office within a reasonable period. The Second are **factual limitations** imposed by his dependence on the actors, the producer and the possibilities of stage production ·····The Third psychological. In very age and, indeed, with every audience this is what has been termed a "psychological climate" to which the playwright must conform " বিখ্যাত নাট্যকার বার্ণার্ডশ' মহাশয়ের স্মরণীয় পত্রখানি—on the principles that govern the Darmatist in his selection of Themes, and Methods of treatment (1902)—এ বিষয়ে একেবারে অগাম প্রমাণ। তিনি তাঁহার স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে লিখিয়াছেন—' I have to think of my pocket, of the manager's pocket, of the actors' pockets, of the spectators' pockets, of how long people can be kept sitting in a theatre without relief or refreshments, of the range of the performer's voice and of the hearing and vision of the boy at the back of the gallery·········I have to consider theatrical

rents, the rate of interest needed to tempt capitalists to face the risk of financing theatres······

It is these factors that dictate the playwright's methods having him so little room for selection that there is not a pennyworth of difference between the methods of Sophocles or Shakespeare and those of the maker of the most ephemeral face. And withal, when the play is made, the writer must feed himself and his family by it····· "

বার্ণার্ডশ' মহাশয়ের মন্তব্যে অতিশয়োক্তির গন্ধ পাওয়া গেলেও, বলা বাহুল্য মন্তব্যটিতে সত্যের ভাগই বেশী। যুগ-ধর্ম দর্শক-রুচি স্বত্বাধিকারীর মনাফা, অভিনয়ের সামর্থ্য প্রভৃতি নানা বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া নাট্যকারকে নাটক রচনায় অগ্রসর হইতে হয়। বিশেষতঃ নাট্য-নিকেতনগুলি যেখানে শিল্পকেন্দ্রের ছদ্মবেশে বাণিজ্য-কেন্দ্রমাত্র এবং নাট্যকার যেখানে মঞ্চাধিকারীর বেতনভুক কর্মচারী বিশেষ, সেখানে মঞ্চাধিকারীর মুনাফাশিকারী বুদ্ধির দ্বারা নাট্য-রচনা যে নিয়ন্ত্রিত হইবে, সে কথা বেশী করিয়া বুঝাইয়া বলা বাহুল্য মাত্র। যে নাট্যকার এই ভাবে মঞ্চের সহিত চুক্তিবদ্ধ থাকেন অথবা একাধারে নাট্যকার ব্যবস্থাপক ও অভিনেতা হন তাঁহার অবস্থা সহজেই অনুমেয়। বিষয় নির্বাচনে—এমন কি রূপায়নেও (চরিত্র-যোজনা ও গান যোজনায়) ব্যক্তিগত শিল্প-চেতনা অপেক্ষা স্বত্বাধিকারীর এবং সাধারণ দর্শকের রুচির ধার ধারিতে হয়। কোন রচনা 'মার' খাইলে শুধু যে নাট্যকারের প্রতিষ্ঠাই হ্রাস পায় তাহা নহে, অর্থ প্রাপ্তির আশা এবং ভাবী চুক্তির ভরসার পথেও কাঁটা পড়ে। এই কারণেই চুক্তিবদ্ধ নাট্যকারদিগের পক্ষে জনরুচির অতি বিপরীত কোন কিছু সৃষ্টি করা সম্ভব হয় না; তাঁহারা যুগ চাহিদার অনুকূল স্রোতে রঙ্‌বেরঙের চিত্তাকর্ষক ভাবের ও ঘটনার পাল তুলিয়া নিশ্চিন্তে হাল ধরিয়া বসিয়া থাকিতে চাহেন। তবে ইঁহারা কি নতুন নতুন বিষয়ে হাত দেন না? নিশ্চয়ই দেন

এবং যেন প্রতিযোগিতার তাড়নাতেই। স্বত্বাধিকারীদের প্রতিযোগিতা শেষ পর্যন্ত নাট্যকার এবং অভিনেতাদের প্রতিযোগিতা হইয়া দাঁড়ায়। এইভাবে পারস্পরিক প্রতিযোগিতার প্রেরণায় নূতন নূতন বিষয় লইয়া নূতন নূতন রীতি প্রয়োগ করিয়া নূতন নাটক লেখা হইতে থাকে। অবশ্য যুগ-চিত্তের তর্পণের দিকে সর্বদাই লক্ষ্য থাকে। কেহ ব্যক্তিত্বকে বিসর্জন দিয়া জনরুচির কাছে আত্মসমর্পণ করিয়া থাকেন, কেহ বা ব্যক্তিত্ব প্রয়োগ করিয়া জনরুচিকে নিজের স্তরে তুলিয়া লইতে চেষ্টা করেন। এই শেষোক্ত শ্রেণীর প্রতিভা, পরাধীন থাকিলেও স্বকীয়তাকে একেবারে বিসর্জন দেয় না।

নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের নাট্যরচনার প্রেরণা আলোচনা করিবার গোড়াতেই যে কথাটি মনে রাখা দরকার তাহা এই, যে গিরিশচন্দ্র একাধারে নাট্যকার ব্যবস্থাপক ও অভিনেতা। অভিনেতা গিরিশচন্দ্র নিরঙ্কুশ স্বাধীন ছিলেন, কিন্তু ব্যবস্থাপক ও নাট্যকার গিরিশচন্দ্র তত স্বাধীন ছিলেন না। নাট্যকার গিরিশচন্দ্র জনরুচির এবং ব্যবস্থাপক গিরিশচন্দ্র স্বত্বাধিকারীর মুখাপেক্ষী না হইয়া পারেন নাই। এ কথা ভুলিয়া গেলে চলিবে না—প্রতাপচাঁদ জহুরী ও গুর্মুখ রায় প্রভৃতির মত স্বসংস্কৃতিমান ব্যক্তির ব্যবসায় বুদ্ধির অনুগমন করিয়া তাঁহাকে চলিতে হইয়াছে এবং বাঙালী-সমাজের রুচি ও রসবোধের হিসাব করিয়া তাঁহাকে নাটক রচনা করিতে হইয়াছে।

তবে এ কথাও মনে রাখিতে হইবে যে গিরিশচন্দ্র অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন অভিনেতা ও শক্তিমান নাট্যকার ছিলেন বলিয়া—এক কথায় আত্মপ্রত্যয়ের অভাব, চাকরী পাওয়ার দুশ্চিন্তা প্রভৃতি ছিল না বলিয়া—স্বত্বাধিকারীদের অনুগত হইয়া থাকেন নাই। সর্ববিষয়েই প্রায় স্বাধীন ভাবেই বিচরণ করিয়াছেন। কিন্তু তবুও অনেক বিষয়েই যে তাঁহাকে উপরওয়ালার সহিত রফা করিয়া চলিতে হইয়াছে তাহা একেবারে বাদ দিয়া রাখিলে ভুল করা হইবে। আসল কথা—গিরিশচন্দ্র-লিখিত নাটকে গিরিশচন্দ্রের ব্যক্তি-মানসের স্বাভাবিক প্রকাশ কতখানি হইয়াছে আর কতখানিই বা মঞ্চ-চাহিদার যোগান

রহিয়াছে তাহা নিখুঁতভাবে পরিমাপ করা খুবই কঠিন—অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি করা হয় না। অধিকাংশ নাট্যকার সম্বন্ধেই এ কথা বলা চলে। শুধু সেই সকল নাট্যকারেরই কথা স্বতন্ত্র যাঁহারা নাট্যকে তাঁহাদের কেবল মানসিক অভিযোজনের উপায় স্বরূপ গ্রহণ করেন।

"বিল্বমঙ্গলঠাকুর" নাটকের রচনা ও অভিনয় বাংলার ইতিহাসের এমন একটি বিশেষ পর্যায়ে হয় যখন বাংলার বুকে আত্মপ্রতিষ্ঠা-কামনার জোয়ার আসিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই সময় রঙ্গমঞ্চে যতগুলি নাটক অভিনীত হইয়াছে, তাহাদের হিসাব লইয়া দেখা যায়—অধিকাংশই পৌরাণিক এবং ধর্ম মূলক। ঐতিহাসিক ও সামাজিক নাটকের সংখ্যার পাশে, পৌরাণিক ও ধর্ম ভাবাত্মক নাটকের সংখ্যা পাশাপাশি রাখিয়া দেখিলে, যুগটিকে 'পৌরাণিক নাটকের যুগ' বলার ঝোঁক স্বাভাবিক ভাবেই আসে। ইহার 'কেন'-টুকু তদানীন্তন সামাজিক অবস্থার এবং জনচিত্তের প্রবণতার মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে বাঙালীর ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করিলেই এই 'কেন' ব্যাখ্যা করা যায়।

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর প্রান্তরে নবাব-শক্তির পরাজয়ে বাংলার ইতিহাস—(ভারতের ইতিহাস) বাঙালীর ইতিহাস নূতন এক যুগে প্রবেশ করিবার দিকে আগাইয়া যায়। বাঙালী—হিন্দু বাঙালী মুসলমান বাঙালী—সমানভাবে ইংরাজ শক্তির পদানত হয়, রাজনৈতিক সত্তা হারাইয়া, দেশ ও দেশের ধন-সম্পদ ইংরেজের হস্তে সমর্পণ করিতে বাধ্য হয়।

সমগ্র ভারতের উপর ইংরেজ শক্তির সম্প্রসারণের ফলে—জাতি সর্ববিষয়ে আত্মসমর্পণ করিয়া বসে—বাঙালী দেহে-মনে ইংরেজের বশ্যতা স্বীকার করে এবং "অহং-সংবিৎ" সঙ্কুচিত হইতে হইতে ক্রমে শূন্য অঙ্কে যাইয়া উপস্থিত হয়। সর্বক্ষেত্রে একটানা 'ছি-ছি' কিছু-না কিছু-না' কিছু-নাই কিছু নাই' রব। বিজয়ী ইংরাজ সামরিক ক্ষেত্রে জয়লাভ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিবার জন্য সাম-দান-ভেদ-দণ্ড চালাইতে আরম্ভ করে।

এই সীমান্তের সেনাপতি ও সৈন্য—পাদ্রীবাহিনী। রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় এই সব পাদ্রীবাহিনী জাতীয় সংস্কৃতির উপর আঘাত হানিতে থাকে। তবে পলাশীর প্রান্তরে যে অস্ত্র যুদ্ধের মীমাংসা করিয়াছে সে অস্ত্রে ইংরেজরা ছিল পটু, কিন্তু সংস্কৃতি-সীমান্তের যুদ্ধে ইংরেজরা ভারতীয় নৈয়ায়িক বুদ্ধির কাছে হার না মানিয়া পারে নাই। এই যুদ্ধে নবাব বা মুসলিম শক্তি নহে, অগ্রণী—ভারতীয় আর্য-সাংস্কৃতিসম্পন্ন হিন্দু বাঙালী। এতকাল পরে হিন্দু-চেতনা আবার মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার অবকাশ পায়, হিন্দুবাঙালীর সহিত সম্মুখ সমরে পাদ্রীবাহিনী পশ্চাদপসরণে বাধ্য হয়। শোপেনহাওয়ারের ভাষায়—"but in India, the Brahmans treat the discourses of the missonaries with Contemptuous smiles of approbation or simply shrug their shoulders. And one may say generally that the proselytizing efforts of the missionaries in India inspite of the most advantageous facilities are as a rule, a failure (Religion : A Dialogue)"। শেষ পর্যন্ত সম্মুখ রণে ভঙ্গ দিয়া পাদ্রীরা স্কুল কলেজের মধ্য দিয়া "smuggle in Christianity"র চেষ্টা করে, কিন্তু "against which Hindoos are most jealously on their guard হওয়ায় তাহাও তেমন সফল হয় না। এইভাবে খ্রীষ্টান পাদ্রীদের আক্রমণের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে গিয়া, বাঙালীহিন্দুর মধ্যে আত্ম-সংবিদ্ ফিরিতে আরম্ভ করে এবং বাঙালীহিন্দুর আত্মপ্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়া বাঙালীজাতির প্রাণে আত্মপ্রতিষ্ঠার কামনা সঞ্চারিত হয়। * এই কারণেই বাঙালীর নব-জাগরণ হিন্দু-সংস্কৃতির পুনর্জাগরণের রূপ প্রথম দেখা দেয়—ধর্মচেতনাকে কেন্দ্র করিয়া জাতীয়-চেতনা দানা বাঁধিতে থাকে।

বাস্তবিক—মোহনলাল-মীরমদন যাহা করিতে পারে নাই—রামমোহন প্রভৃতি তাহাই করেন—সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের যুদ্ধে পাদ্রী-বাহিনীকে পরাজিত করেন—জাতির অহং-প্রতিষ্ঠার ভিত্তি রচনা করেন,—জাতিকে 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত'...মন্ত্রে দীক্ষিত করেন।

এই নবজাগরণ—উদ্‌বোধন—আর্য-সংস্কৃতির লুপ্তপ্রায় রত্ন উদ্ধারের চেষ্টা রূপে আত্মপ্রকাশ করে। ভারত জ্ঞানে বিজ্ঞানে-শিল্পে জগৎসভায় কত কি দান করিয়াছে তাহার প্রদর্শনই মুখ্য চেষ্টা হয়। এই আত্ম-প্রদর্শনের মধ্য দিয়াই বাঙালী স্বকীয়ত্ব প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হয় সর্বক্ষেত্রেই সে আত্ম-প্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট হয়। রঙ্গমঞ্চ-নির্মাণ, অভিনয় ও নাটকরচনার মধ্যেও ঐ মূল প্রবৃত্তিটি নানরূপে অভিব্যক্ত হয়। এই সময়, একদল যাহা আছে তাহাকেই পরিবেশন করিতে থাকেন, আর একদল—প্রতিভাসম্পন্নরা—যাহা নাই তাহা সৃষ্টি করিয়া সাহিত্যের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিতে আত্মনিয়োগ করেন। একদিকে পুরাতন বিস্মৃতপ্রায়কে স্মরণের সম্মুখে লইয়া আসা—তথা দেশবাসীর আত্মাভিমানকে পুষ্ট করা অন্যদিকে নূতন নূতন সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রতিভাকে প্রসারিত করিয়া দেওয়া। এই চেষ্টার একদিকে 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে কে বাঁচিতে চায়'—ঐকান্তিক জিজ্ঞাসা, অন্যদিকে 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁয়া'-র দিকে আঙ্গুলি-নির্দেশ, 'কুলীনকুল সর্বস্বকে' লইয়া 'পরিহাস, আবার বিধবার অশ্রুপাতের এবং সধবার একাদশীর করুণ অবস্থার জন্য অনুশোচনা। জাতি পুরাতনের স্মৃতি ও নূতন সৃষ্টি লইয়া আত্মপ্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হয়। কিন্তু বিশেষ লক্ষণীয় এই যে জাতি আপনার শ্রেষ্ঠত্ব, তাহার আধ্যাত্মিক সাধনার—ধর্ম সাধনার উৎকর্ষের মধ্যে উপলব্ধি করে এবং তাহা করে বলিয়াই জাতি আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যকেই বড় করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিতে চায়। এক বিষয়ে অন্ততঃ আমরা যে বড—এই চেতনাই আমাদের নূতন সঞ্জীবনী শক্তির কাজ করে।

আমাদের রাজনৈতিক ইতিহাস উজ্জ্বল না হইতে পারে—সাম্রাজ্য বিস্তারে আমাদের কোন গৌরব না থাকিতে পারে, কিন্তু আমরা পরমপুরুষের সাধনায় যে পিছাইয়া নাই তাহার ইতিহাস আমাদের আছে।

এই প্রবণতার ফলেই উনবিংশ শতাব্দীর অষ্টম দশক হইতে পুরাণ-কাহিনী নাট্যকারদের প্রধান উপজীব্য হইয়া উঠে। গিরিশচন্দ্র যুগের নাড়ী ভালভাবেই

অনুভব করেন। বাঙালী জনসাধারণের মনের স্বাভাবিক গঠন—শিক্ষার সূত্র জাতীয় সংস্কার সম্বন্ধে তিনি সচেতন। 'বার মাসে তের পার্বণের' দেশে পৌরাণিক কাহিনীর কাটতি বেশী হইবে—এই হিসাবটুকু সকলের মনেই কম বেশী থাকা স্বাভাবিক। প্রহসনে হাস্যরসের চাহিদা মিটিতে পারে, ঐতিহাসিক নাটকে নানা রসের সহিত জাত্যভিমানও আস্বাদিত হয়, সামাজিক নাটকে সমাজ ও জীবন রহস্যকে একাধারে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হয় কিন্তু পৌরাণিক ও ধর্মমূলক নাটক একাধারে কাহিনী, রস, ভাব এবং জীবনের পরম পুরুষার্থ—ধর্মের এবং ভগবৎশক্তির লীলা মাহাত্ম্য পরিবেশন করে। যে যুগে যে পুরুষার্থের চাহিদা বেশী সেই যুগে সেই পুরুষার্থপ্রধান সৃষ্টিই যে বেশী হইবে তাহা অনুমান করা যায়। গিরিশচন্দ্রের সময়ে জাতির সম্মুখে ধর্ম-পুরুষার্থেরই বড় মহিমা। গিরিশচন্দ্র ধর্মকেই বাঙালীর জাতীয় ভাব বলিয়া ঘোষণা করেন। তাঁহার ধারণা * "ধর্ম হিন্দু জীবনের কেন্দ্রস্বরূপ, হিন্দুকে জাগাইতে ও তাঁহার জীবন উন্নত করিতে হইলে ধর্মের দ্বারাই হইবে। ধর্ম হইতে তাহার জাতীয় জীবন পৃথক করিলে চলিবে না" এই ধারণাটি খুবই লক্ষণীয় এবং এই ধারণার মধ্যে যেমন জাতীয় চেতনার উন্মেষের ইতিহাস প্রতিফলিত হইয়াছে তেমনি গিরিশচন্দ্র কেন পৌরাণিক ও ধর্মমূলক নাটকের দিকে বেশী ঝুঁকিয়াছেন তাহার কারণ নিহিত আছে।

বাঙালী সমাজের এবং বাংলা রঙ্গমঞ্চের এইরূপ এক ঐতিহাসিক পর্যায়ে 'বিল্বমঙ্গলঠাকুর' নাটকের জন্ম। সকলেই জানেন—১৮৭৭ খ্রীঃ "আগমনী"র অঞ্জলি লইয়া নাট্যকার গিরিশচন্দ্র নাট্যভারতীর মন্দিরে প্রবেশ করেন এবং একের পর এক পৌরাণিক (মাঝে মাঝে ২।১ খানা অন্যজাতীয়) নাটক রচনা করিতে থাকেন ১৮৮৪ খ্রীঃ ২রা আগষ্ট, নাট্যশালার ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন উপস্থিত হয়।

শ্রীচৈতন্য সশরীরে ও ভাব-শরীরে প্রেমভক্তির অমৃত রসে যেমন সমগ্র দেশকে মাতাইয়া তুলেন, বহুকাল পরে তাঁহারই অলৌকিক লীলার নাট্যরূপ—

"চৈতন্যলীলা" সমগ্র বঙ্গদেশে আলোড়ন সৃষ্টি করে। দেশী-বিদেশীর সমাগমে সত্যই— "নাট্যশালা হ'ল তীর্থ" (অমৃতবসু)। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ—যিনি ভারতের আধ্যাত্মিক সাধনার পরম প্রকাশ—তাঁহার পবিত্র পদধূলি দিয়া তীর্থের মাহাত্ম্য শতগুণে বাড়াইয়া দেন। কর্ণেল অলকট্, ফাদার লাফো প্রভৃতি সজ্জন সাহেবরাও অভিনয় দেখতে আসেন এবং মুগ্ধ না হইয়া পারেন না। যে প্রেম-ভক্তির বন্যা একদিন শান্তিপুর ডুবু ডুবু নদে ভেসে যায়'—অবস্থা, তাহারই বন্যায় আসার রঙ্গমঞ্চ প্লাবিত হইয়া যায়। রঙ্গমঞ্চের এবং অভিনেত-অভিনেত্রীর ইতিহাসে সে একটা দিন বটে।

বাস্তবপক্ষে, রঙ্গালয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের পদার্পণ খুবই স্মরণীয় এবং তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। পতিত রঙ্গালয়, পতিত গিরিশ এবং পতিত অভিনেতা অভিনেত্রীগণ সকলেই ধন্য হয়। কাহারও বুঝিতে বাকী থাকে না— পতিতের মুক্তির জন্য পতিতপাবন নিজেই উপস্থিত। সকলেই দেখে —পতিতেরও মুক্তির ভরসা আছে। এই ভাবেই 'পতিতের মুক্তি'-সমস্যার মত বড় সমস্যার সহজ সমাধানের পথ মুক্ত হয়। চৈতন্যলীলার পতিতোদ্ধারের দৃশ্য দর্শক ও অভিনেতা সকলেই দেখেন—কিন্তু রামকৃষ্ণ যে গিরিশচন্দ্রকেও উদ্ধার করেন সে দৃশ্য অনেকের চোখেই পড়ে না। শুধু 'চৈতন্য'-রূপী বেশ্যা বিনোদিনীকেই রামকৃষ্ণ 'চৈতন্য হোক' আশীর্বাদের ছলে কৃপা করেন তাহা নহে, গিরিশচন্দ্রের চৈতন্যকে আপনার করিয়া লন— আর এক পতিতও উদ্ধারের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। তাহার মনের তখন মহাজিজ্ঞাসা—পতিতের গতি আছে কিনা। রামকৃষ্ণ সব সমস্যার সমাধান করেন—প্রেম-ভক্তি থাকিলে ভগবানের পায়ে আত্ম-সমর্পণ করিলে পতিতের মুক্তি কে ঠেকায়।

'গিরিশচন্দ্র জিজ্ঞাসা করেন— "আমি আপনাকে পেয়েছি, আবার কি আমার ওখানে (থিয়েটার) যেতে হবে? আর কি দরকার?" ঠাকুর বলেন—হাঁ যেতে হবে বৈকি? তুমি যা কচ্ছো, তাই করবে। **ওতে লোকশিক্ষা হবে, তাই তোমার দরকার"**। বড় সাধনা প্রবৃত্তিকে ভগবৎ-মুখী করা।

প্রবৃত্তির সহজ সংস্কারের পথেই ভগবানকে পাওয়া যায়—যদি সেই প্রবৃত্তিরই বিষয়ীভূত হ'ন ভগবান। দুর্বার কাম-প্রবৃত্তি—কামিনী-অনুরাগ কৃষ্ণপ্রেমে পরিণত হইয়াছে—এ দৃষ্টান্ত তো ভক্তমাল-গ্রন্থে ছড়ান রহিয়াছে। বিল্বমঙ্গল-ঠাকুরের জীবনই তো উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। বেশ্যাসক্ত কামার্ত জীবনেও যে কৃষ্ণ-প্রেমের অমৃতবন্যা বহিয়া যাইতে পারে—কৃষ্ণ-কৃপায় আনন্দ আনন্দ বৃন্দাবন রচিত হইতে পাবে, বিল্বমঙ্গল চরিত্রে সেই সত্যেরই উজ্জ্বল অভিব্যক্তি রহিয়াছে। পতিতের জীবনের এত বড় রূপান্তর—কামের প্রেম-ভক্তিতে পরিণতি বিল্বমঙ্গল ছাড়া এমন ভাবে আর কাহার জীবনে হইয়াছে ?

বিল্বমঙ্গলঠাকুরের জীবন-চরিতকে বিষয়বস্তু নির্বাচন করার মধ্যে আর যে যে প্রেরণাই কাজ করুক—শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাবের, নূতন জীবনের জিজ্ঞাসা ও সমাধানের প্রয়াসও এই নির্বাচনে প্রতিফলিত হইয়াছে।

নাটকের অভিনয়:—১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে 'ষ্টার'-রঙ্গমঞ্চে ১২ই জুন প্রথম অভিনয় হয়। প্রথম রজনীর অভিনয়ে নিম্নলিখিত অভিনেতা-অভিনেত্রীবর্গ অংশ গ্রহণ করেন :

১। বিল্বমঙ্গল—অমৃত মিত্র।	(২) সাধক—বেলবাবু
৩। ভিক্ষুক—অঘোর পাঠক।	(৪) সোমগিরি—প্রবোধ ঘোষ
৫। চিন্তামণি—বিনোদিনী।	(৬) থাক—ক্ষেত্রমণি
৭। পাগলিনী—গঙ্গামণি।	(৮) অহল্যা—বনবিহারিণী

শ্রেণী-পরিচয়

শ্রেণী-পরিচয় দেওয়ার আগে, শ্রেণী-পরিচয় দেওয়ায় সাধারণ রীতি এবং শ্রেণী-বিভাগ—পরিকল্পনা সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিয়া ভূমিকা করিয়া লওয়া যাইতে পারে, এবং এই ভূমিকাটুকুর প্রয়োজনও আছে। কারণ শ্রেণী-পরিচয় যদিও 'প্রাধান্যেন ব্যপদেশ'—সূত্রানুসারেই দেওয়ার রীতি আছে,—বিলক্ষণ লক্ষণটির ভিত্তিতেই পরিচয় দেওয়া হইয়া থাকে বটে, কিন্তু শ্রেণী-বিভাগ

পরিকল্পনা বলিতে যাহা বুঝায় তেমন কোন সুশৃঙ্খল "শ্রেণী-বিভাগ ব্যবস্থা," নাট্য সাহিত্য শাস্ত্রে দেখা যায় না। (আধ্যাপক এলারডাইস নিকল মহাশয়ের 'দি থিওরি অফ ড্রামা' সম্মুখে রাখিয়াও এ কথা বলা যায়) পরিপাটি শ্রেণী-বিভাগ ব্যবস্থা বলিতে বুঝায়—সকল প্রকার সম্ভাব্য ভিত্তিতে নাট্যের শ্রেণী-পরিকল্পনা (এইরূপ পরিপাটি শ্রেণী-পরিকল্পনা নাট্যসাহিত্যশাস্ত্রে পাওয়া যায় না) এবং পরিপটি শ্রেণী-পরিচয় বলিতে বুঝায়—বিশেষ একখানি নাটককে উল্লিখিত নানা-ভিত্তিক শ্রেণী-পরিকল্পনা অনুসারে, কি কি শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব তাহাই নির্দ্ধারণ করা। এইরূপ শ্রেণী-পরিচয় দেওয়ার রীতিও প্রচলিত নহে। বলা বাহুল্য পরিপাটি পরিচয় দিতে হইলে পরিপাটি শ্রেণী-পরিকল্পনাও চাই।

সুতরাং প্রথমেই শ্রেণী-পরিকল্পনার একটি নির্ঘণ্ট এখানে দেওয়া যাইতেছে। [*"নাট্য তত্ত্ব-মীমাংসা"-গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত]

১। বিষয়বস্তুর *উৎসের ভিত্তিতে :—

(ক) পৌরাণিক (খ) ঐতিহাসিক (গ) ঐতিহাসিককল্প (ঘ) কল্প-ঐতিহাসিক (ঘ) উপকথা-মূলক (চ) সামাজিক (ছ) কাল্পনিক।

২। *প্রকৃতি-ভিত্তিতে :—

(ক) ধর্ম-মূলক বা আধ্যাত্মিক (খ) নীতি-মূলক (গ) সমাজসমস্যা-মূলক (ঘ) প্রেম মূলক (ঙ) ভক্তি-মূলক (চ) বাৎসল্য মূলক (ছ) ষড়যন্ত্র-মূলক (জ) প্রতিহিংসা-মূলক (ঝ) অপরাধাবিষ্কার-মূলক ··ইত্যাদি······

৩। সংবেদনার ভিত্তিতে :—

(ক) ট্র্যাজেডি (খ) হাইকমেডি (গ) ট্র্যাজি কমেডি (ঘ) কমেডি (ঙ) ফার্স

[*রসের ভিত্তিতে :—১। শৃঙ্গার ২। হাস্য ৩। করুণ ৪। রৌদ্র ৫। বীর ৬। ভয়ানক ৭। বীভৎস ৮। অদ্ভুত ৯। শান্ত ১০। বাৎসল্য প্রভৃতি]

৪। কাহিনীর গঠন ভিত্তিতে—

ক) ক্লাসিকাল ও রোমান্টিক (খ) জটিল (Complex) বা সরল (Smiple) এপিসোডিক।

৫। উপস্থাপনা-রীতির ভিত্তিতে—(ক)
বাস্তবিক (Realistic) (খ) আদর্শান্বিত (Idealistic) (গ) রূপক (Allegorical) (ঘ) সাংকেতিক (Symbolistic) (ঙ) ঐ (Expressionistic)

৬। উপাদান-যোজনার ভিত্তিতে—
(ক) যাত্রা নাটক বা অপেরা (খ) নাটক ও যাত্রাধর্মী নাটক (গ) গীতিনাট্য।

৭। উদ্দেশ্য ভিত্তিতে—
(ক) ঘটনা মুখ্য (drama of incidence) Melodrama (খ) রস মুখ্য (drama of passion) (গ) চরিত্র-মুখ্য (drama of Charactor) (ঘ) ভাব বা তত্ত্ব-মুখ্য (drama of Idea.) (* "মিশ্র"ও হইতে পারে)

এখন পরিপাটি শ্রেণী পরিচয় বলিতে বুঝাইবে নিম্নলিখিত প্রশ্নের সিদ্ধান্তের আলোকে কোন নাটকের পরিচয় স্পষ্ট করিয়া তোলা—১। উৎসের ভিত্তির হিসাবে নাটকখানি— ২। বিষয়ের প্রকৃতি বিচারে
৩। সংবেদনার ভিত্তিতে (রসের ভিত্তিতে)
৪। কাহিনীর গঠন-ভিত্তিতে ৫। উপস্থাপনা-রীতির ভিত্তিতে
৬। উপাদান যোজনা ভিত্তিতে ৭। উদ্দেশ্যের প্রাধান্য বিচারে

বিল্বমঙ্গলঠাকুর-নাটকের শ্রেণী-পরিচয়, আমরা উল্লিখিত প্রশ্নের আলোকেই দেওয়ার চেষ্টা করিব। সুতরাং প্রথম প্রশ্ন—উৎসের ভিত্তিতে শ্রেণী-বিভাগ করিতে গেলে আমরা—বিল্বমঙ্গলঠাকুরকে কোন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিতে পারি ? একটি কথা প্রথমেই মনে রাখা দরকার — বিল্বমঙ্গল কবিকল্পিত কোন ব্যক্তি নহে। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত' গ্রন্থের রচয়িতা রূপে বিল্বমঙ্গল বিখ্যাত এবং বৈষ্ণব সাধকের সাধনার ইতিহাসেও—এককথায় ভারতের আধ্যাত্মিক সাধনার ইতিহাসেও বিল্বমঙ্গলের নাম চিরস্মরণীয় হইয়া

আছে। এই হিসাবে—এবং ইতিহাসের ব্যাপক অর্থে, বিল্বমঙ্গল একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি। অধিকন্তু, বিল্বমঙ্গল পৌরাণিকযুগেরও কোন ব্যক্তি নহেন। তাঁহার পরিচয় তথ্যাভাবে অস্পষ্ট হইলেও, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে বিল্বমঙ্গল ঐতিহাসিক যুগের এবং কিছু-পরিমাণে ঐতিহাসিক ব্যক্তি—জাতির কাছে স্মরণীয় ব্যক্তি। এই জাতীয় সুবিখ্যাত মহাপুরুষদিগকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রের 'মহাপুরুষ' হইতে পৃথক করিবার জন্যই—শুধু ঐতিহাসিক না বলিয়া 'ঐতিহাসিক কল্প চরিত' বলাই বাঞ্ছনীয়। এই হিসাবে—বিল্বমঙ্গল ঠাকুর নাটকখানি ঐতিহাসিককল্প শ্রেণীর চরিত নাটক। অবশ্য নাটকখানিতে পৌরাণিক আবহাওয়া যথেষ্ট মাত্রায়ই আছে

তৃতীয়তঃ, সংবেদনার ভিত্তিতে আমরা নাটকখানিকে "সিরিয়াস বা হাই কমেডি" বলিতে পারি। এই সংজ্ঞাস্থলিক একটু ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া বলা দরকার। আমরা জানি- নাট্যশাস্ত্রের আদি সমালোচক মনীষী এরিস্টটল—সংবেদনার বা অনুভবের ভিত্তিতে নাটককে মোটামুটি—দুই শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছিলেন,—এক, ট্র্যাজেডি। দুই—কমেডি, যাহা "মিলনান্ত"—যাহা ভয়ানক ও করুণ ঘটনার উপস্থাপনা, তাহাই ট্র্যাজেডি, আর যাহা হাস্যোদ্দীপক ঘটনার উপস্থাপনা—dramatization of tne ludicrous তাহাই "কমেডি" ক্রমে—এই দুই শ্রেণীর মধ্যে সব সৃষ্টির স্থান দেওয়া সম্ভব হয় নাই বলিয়া কমেডির মধ্যে উপ-বিভাগ কল্পনা অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল—"হাইকমেডি বা সিরিয়াস কমেডি" হাস্যোদ্দীপক বিশুদ্ধ কমেডি হইতে পৃথক করা হইয়াছিল। যে নাটকের ঘটনা—গুরু-গম্ভীর বা গুরু-ভাবগর্ভ অথচ নাটকের পরিণাম বিষাদান্ত নয়—সেইরূপ নাটকই 'হাইকমেডি'।

বিল্বমঙ্গল নাটকের ঘটনা—খুবই ভাবগর্ভ এবং গুরুভাবাত্মক। ভারতীয় হিন্দু সাধনার চরম লক্ষ্য—পরমপুরুষার্থ- মোক্ষ, আত্ম সাক্ষাৎকার, নির্বাণ, ঈশ্বরকৃপালাভ। এই পুরুষার্থ সিদ্ধি কঠিন সাধনা-সাপেক্ষ এবং এই সাধনতত্ত্বে কত নিগূঢ় রহস্য, সাধ্য-সাধকের সম্পর্ক লইয়া, সাধনার পন্থা লইয়া কত মত

কত পথ। বাস্তবিক, আমাদের সাধকদিগের জীবন শুধু ধর্মানুষ্ঠানের আচার-বিচারমাত্র নহে—তাঁহাদের জীবন—পরাতত্ত্বের সহিত আত্মতত্ত্বের সংযোগ-স্থাপনের ঐকান্তিক সাধনার জীবন। সে জীবনে কত ভাব, কত ভাবদ্বন্দ্ব; যত বড় বাসনা, তত বড় যাতনা,— যত তীব্র মোহ, তত বড় অন্তর্দ্বন্দ্ব—তত বড় বৈরাগ্য, যত অনুরাগ তত উন্মত্ততা,—যত বড় মোহ, তত বিস্ময়কর মোহ-মুক্তি। এই জীবন যে ভাব-মহত্ত্বপূর্ণ এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

কিন্তু তবে যাহাই গুরুভাব-রসাত্মক তাহাই যে ট্র্যাজেডি হইবে এমন কোন কথা নাই বিশেষতঃ সাধক-চরিত্র লইয়া ট্র্যাজেডি সৃষ্টির অবকাশ খুবই কম। তাঁহাদের জীবনে বাধা, দুঃখ দুর্ভোগ শোচনীয় ভাগ্য-বিপর্যয়ও আসে কিন্তু শেষ পর্যন্ত আসে—অপার প্রশান্তি অফুরন্ত আনন্দ। ঐ সকল বাধা পথের বাধা মাত্র, পথের বাধা অতিক্রম করিয়া তাঁহারা যে পদ লাভ করেন তাহাই তো বিশ্বের পরমা গতি'—পরমং পদম্। তাঁহারা লাভ করেন তাঁহাকেই যাঁহাকে লাভ করিলে আর কোন কিছু লাভ করিবার থাকে না – পরমপদের অধিকারী হইয়া তাঁহারা দিব্যানন্দের অধিকারী হন এবং অমৃতের পুত্র—অমৃতমগ্ন তে। সুতরাং সেখানে শোকের অবকাশ কোথায়? তবে সাধু-সন্ত দগের বা পুরোহিতের চরিত্র অবলম্বনে ট্র্যাজেডি রচিত না হইয়াছে তাহা নহে। গটহোল্ড্ এফ্রাম্ লেসিঙ তাঁহার 'হাম্বুর্গ ড্রামাটার্জি'-তে (১৭৬৯) ঐ জাতীয় নাটককে "Christian Tragedies" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে—রচিত টি, এস. এলিয়টের—"মার্ডার ইন্ দি ক্যাথিড্রাল" নাটকখানি—"রিলিজিয়াস ট্র্যাজেডি" নামে অভিহিত হইয়াছে। আমাদের দেশেও পুরোহিতের জীবনকে ট্র্যাজেডির (রিলিজিয়াস) বিষয় না করা হইয়াছে তাহা নহে। (বিসর্জন নাটকের রঘুপতি)। কিন্তু যাহারা সাধক তাঁহাদের জীবন একটু স্বতন্ত্র। ছোটখাট আশা নিরাশার দ্বন্দ্ব ও বেদনাকে অতিক্রম করিয়া তাহাতে এক পরম দিব্যানুভূতি ঐশ্বর্য ও আনন্দ বিরাজ করে। বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের জীবনেও দুঃখ আছে, আঘাত আছে, ভাগ্য-বিড়ম্বনাও আছে, কিন্তু এ সবই

'এহবাহ্য'। তাঁহার জীবন দুঃখের অন্ধকারেই মিলাইয়া যায় নাই, ভাগ্য-বিপর্যয়ের স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে শোচনীয় পরিণতির আবর্তে ডুবিয়া যায় নাই। তাঁহার জীবন—কৃষ্ণার্তিতে রসোজ্জ্বল, বৃন্দাবনের নিত্যলীলাদর্শনে চিরকৃতার্থ। সকল দুঃখের কাঁটা তাঁহার রাধাকৃষ্ণের যুগল মিলন দর্শনের সৌভাগ্যে পারিজাত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

এই প্রসঙ্গেই প্রশ্ন আসে—বিল্বমঙ্গল ঠাকুর কোন্ রসের নাটক ?

রসের প্রশ্ন আলোচনা করার আগে রসভিত্তিক শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে দুই একটি কথা জানিয়া লওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রথম কথাটি এই যে, সংস্কৃত নাটকের শ্রেণী-বিভাগ একমাত্র রসের ভিত্তিতেই হয় নাই—সংস্কৃত শ্রেণীবিভাগে রস নানা বিভাজকের মধ্যে অন্যতম বিভাজক। দ্বিতীয় কথাটি এই—রসের ভিত্তিতে শ্রেণী বিভাগ অসম্ভব এবং অবৈজ্ঞানিক কোন ব্যাপার নয়। তৃতীয় কথাটি এই যে 'রস' কথাটিকে বুঝিতে চেষ্টা করিলেই দেখা যাইবে যে ভাবে যখনই শিল্পরূপ লাভ করে তখনই তাহা 'রসাত্মক' বা রসোত্তীর্ণ আখ্যা লাভ করে এবং ভাব-হীন জীবন সম্ভব নয় বলিয়াই রসহীন কাহিনীকাব্যও সম্ভব নয়। ভরতের উক্তিটি—ন ভাবহীনোঽস্তি রসো ন রসো ভাববর্জিত...এখানে স্মরণ করা যাইতে পারে। ভাব আছে রস নাই বা রস আছে ভাব নাই এমন অবস্থা সম্ভব নয়। সুতরাং এমন কাহিনীকাব্য লেখা সম্ভব নয় যেখানে কোন রস নাই! এমন কি রূপক সাংকেতিক নাটকের মত তত্ত্বমুখ্য নাটকেও অর্থাৎ যেখানে একটা তত্ত্বকেই রূপ-সংকেতে উপস্থাপিত করা মুখ্য উদ্দেশ্য, সেখানেও রস অবশ্যম্ভাবী। সাহিত্য—সত্যের তত্ত্বমূর্তি নয়, তথ্যমূর্তিও নয়, সত্যের 'রসরূপ'। রসরূপত্বই কাব্যত্ব, এবং নাটকের পক্ষেও তাহা অপরিহার্য। চতুর্থ কথা এই—যে, 'রস', রসাভাস, ভাব ভাবাভাস, রসশবলতা ভাবশবলতা, সর্বেঽপি রসনাৎ রসাঃ, সব কিছুই, আনন্দদায়ক বলিয়াই রসপদবাচ্য। অর্থাৎ রস কথাটিকে একেবারে 'রসতামেতি রত্যাদি স্থায়িভাবঃ সচেতসাম্,—এই সূত্রটির আভিধানিক অর্থে ব্যবহার না করিয়া ব্যাপক অর্থেই গ্রহণ করিতে

হইবে। ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করিলেই—কাব্যের রসাত্মকতা স্পষ্টভাবেই প্রতিভাত হইবে - কারণ এমন অনেক ভাবের কাব্য আছে যাহা স্থায়িভাবের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা যায় না এবং যাহা না বলিয়াই রসতামেতি ইত্যাদি সূত্র প্রয়োগ করা যায় না। সেই সকল ক্ষেত্রে উল্লিখিত বিশেষ সূত্রটি প্রয়োগ করিলেই সমস্যার সমাধান সহজেই হইয়া যাইবে। [রসভিত্তিক শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে 'দি থিওরি অফ ড্রামা' গ্রন্থে অধ্যাপক নিকলের প্রশংসা দ্রষ্টব্য] এখন বিচার্য

বিল্বমঙ্গলঠাকুর নাটকের প্রধান রস বা অঙ্গী রস কোন্‌টি— অর্থাৎ নানারস নিরন্তর থাকিলেও কোন রসটি অঙ্গী বা প্রধান বলিয়া দাবী করিতে পারে—কোন রসটি প্রধানতঃ আস্বাদিত হয়। যে ভাবটি অঙ্গীরসে পরিণত হয়, সেই ভাবটিকে বলা হয়—স্থায়িভাব - "the idea" or "impression" received from witnessing a dramatic work of art"। এই প্রশ্নটির মীমাংসা আপাতদৃষ্টিতে যত সহজসাধ্য মনে হয়, তত সহজসাধ্য নয়—বেশ একটু জটিল; কারণ, এই নাটকের কেন্দ্রীয়-চরিত্রে আদ্যন্ত বিশেষ একটি স্থায়ীভাব—অনুভাব-ব্যভিচারিভাবের যোগে রস-পরিণতি লাভ করিয়াছে তাহা বলা যায় না। এখানেই সমস্যার জটিলতা। নাটকের মুখ-সন্ধিতে—যে স্থায়িভাব দেখা যায় তাহা রতি, বিশেষতঃ কাম মোহ। এই রতির বিষয়,—'চিন্তামণি,—বেশ্যা। শেষের দিকেও 'রতি' এবং সেই রতির বিষয়—চিন্তামণি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। অর্থাৎ রতি 'রমণী-বিষয়া রতি' নহে—"দেবতা-বিষয়া রতি"—রাধা রমণরতি, এককথায় কৃষ্ণ-রতি। সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে—'রতি'ই এই নাটকের স্থায়িভাব, এবং সেই হিসাবে নাটকখানি "শৃঙ্গার-রসের" নাটক। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত যে শাস্ত্রসম্মত নয় একটু তলাইয়া দেখিলেই দেখা যাইবে। নামসাদৃশ্য থাকিলেও,—প্রথমাংশের 'রতি' ও দ্বিতীয়াংশের 'রতি'—উভয় রতি, বিষয়ভেদে স্বরূপতঃ স্বতন্ত্র। রমণীরতির সহিত ভাগবদ্ রতির অভিব্যক্তিগত অর্থাৎ অনুভাবসঞ্চারিভাবগত সাদৃশ্য অনেক পরিমাণে

আছে বটে কিন্তু বিষয়ের বৈশিষ্ট্য ভেদে রতিতে রূপরঙের স্বাতন্ত্র্য রহিয়াছে। এই কারণেই দেবতা বিষয়ক রতিকে স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে দেখা হইয়াছে, বলা হইয়াছে "ভাব"—বলা হইয়া থাকে—প্রেমভক্তি-রস, ভক্তি (সা ভক্তিঃ পরানুরক্তিরীশ্বরে'—ঈশ্বরের প্রতি পরানুরাগ। এই ভক্তি-ভাব জীবের সহজাত স্থায়িভাব নহে কিনা, সে বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও ইহা যে মানুষের প্রবল একটি উপভাব বা ভাববন্ধ (Sentiment) এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। স্থায়ীভাব বা কোন আবেগ যখন বিষয়কে আশ্রয় করিয়া নূতন ভাববন্ধে সংগঠিত ও অভিব্যক্ত হয়—ইহার যেন স্থায়িভাব বন্ধেরই ঊর্দ্ধমুখী যুক্তবেণী ভাবতীর্থ (Sentiments) সুতরাং মানবী-রতিকে দেবতা-রতির সহিত একাসনে স্থান দেওয়া যুক্তিযুক্ত হইবে না—ইহাই স্বাভাবিক অভিমত।—অর্থাৎ এই সিদ্ধান্তই সমীচীন যে সাধারণ রতির ভাববন্ধ হইতে দেবতাবিষয়ক রতির ভাববন্ধ স্বতন্ত্র—কাজেই উভয়ের রসের আস্বাদ এবং নামও ভিন্ন।—তবে এ কথাও সঙ্গে সঙ্গে বলা দরকার যে এই নাটকে রতিরই উহার বৈষয়িক রূপের ও আধ্যাত্মিক রূপের ঐক্যের মধ্যে স্থাপন করিয়া প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। রতিতত্ত্বই যে নাটকখানির—অন্যতম প্রধান ভাব এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। রতি ত লৌকিকজগতে বিষয়ের মধ্যে চরিতার্থতা খুঁজিয়া থাকে - এবং কাম নামে পরিচিত. সেই রতিই বিষয়াতীতের বিশ্বাতীত—বিশ্বময়ের অভিমুখে উৎসারিত হইলেই, 'পরানুরক্তিরীশ্বরে'—রূপ পরিগ্রহ করিলেই ভক্তি-রূপ ধারণ করে। এই নাটকে রতির কামরূপ ও প্রেমভক্তিরূপ এই দুই রূপ এবং উহাদের অঙ্গাঙ্গিযোগ দেখাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে—দেখান হইয়াছে কাম প্রেম-ভক্তিতে রূপান্তরিত বা ঊর্দ্ধায়িত হইতে পারে।

প্রেম-ভক্তিকেই আমরা বিল্বমঙ্গল নাটকের মুখ্যভাব বলিয়া ধরিতে পারি। বিল্বমঙ্গলের জীবন-আশ্রয়ে নাট্যকার প্রেম-ভক্তিকেই—'ভগবানে কামার্পণে'র ভাবটিকেই প্রধানভাবে রূপ দিতে চেষ্টা করিয়াছেন, এই হিসাবে ভগবদ্-বিষয়ারতি—পরানুরক্তিই নাটকের প্রধান ভাব। অন্যান্য ভাব এই ভাবেরই

পরিপোষক মাত্র। বিল্বমঙ্গলের জীবনের প্রথম পর্যায়ে যে কাম মোহ, যে রমনী বিষয়ারতি দেখা যায় তাহা ভগবদ্‌বিষয়া রতিরই পটভূমি বিশেষ।—কাম-মোহই পরে প্রেম-বৈরাগ্যে রূপান্তরিত হইয়াছে। কাম-মোহ এখানে সহায়ক বা উপায়, প্রেম-বৈরাগ্যই উপেয় সুতরাং মুখ্য। অতএব সিদ্ধান্ত করা যায় যে **প্রেম-ভক্তি** এই নাটকের মুখ্য ভাব এবং **প্রেমভক্তিরসই** নাটকের প্রধান রস।

এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে—'দেবতাবিষয়ারতিকে বলা হইয়াছে "ভাব" এবং স্থায়ীভাবের যে প্রচলিত তালিকা আছে তাহাতে 'প্রেম-ভক্তি,' নামে কোন ভাবের উল্লেখ নাই।" "রসতামেতি রত্যাদি স্থায়িভাবঃ সচেতসাম্" এই সূত্রানুসারে 'রস' পদবাচ্য হইতে পারে স্থায়িভাবেরই অভিব্যক্তি। সুতরাং যাহা স্থায়িভাব-রূপে গণ্য নয় তাহা রসপদবাচ্য হইবে কি উপায়ে?

এখানেই শরণ্য এই বিশেষ সূত্রটি—

রসভাবৌ তদাভাসৌ ভাবস্য প্রশমোদয়ৌ
সন্ধিঃ শবলতা চেতি সর্বেঽপি রসনাদ্রসাঃ॥

অর্থাৎ রস, ভাব, রসাভাস, ভাবাভাস, ভাবপ্রশম, ভাবোদয়, ভাবসন্ধি ভাবশবলতা প্রভৃতি সবকিছুই আস্বাদ্য বলিয়াই "রস" রূপে গণ্য। এই নিয়ম-অনুসারে, "প্রেমভক্তি" ভাব হওয়া সত্ত্বেও,—বিভাবাদি দ্বারা অভিব্যক্ত হইলে অবশ্যই রস-আখ্যা লাভের অধিকারী। অতএব "প্রেম-ভক্তি—ভাবের" নাটককে প্রেম-ভক্তিরসাত্মক নাটক বলিলে অশাস্ত্রীয় কোন কাজ করা হয় না।

চতুর্থতঃ গঠনের দিক দিয়া নাটকখানি ক্লাসিকাল নয়— রোমান্টিক অর্থাৎ গঠনের ঐক্য-বিধির আনুগত্য মানা হয় নাই। প্রধান কাহিনীর সহিত উপকাহিনীর ধারাই শুধু জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে তাহা নহে, নাটকখানির গঠনে "double theme"—বা বিষয়-দ্বৈততার আভাস আসিয়া পড়িয়াছে—

ফলে 'ঘটনা-ঐক্য' অপেক্ষা "নায়ক-ঐক্যের রূপটিই বেশী স্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। অতএব গঠনের দিক দিয়া নাটকখানি রোমান্টিক-ধর্মী এবং সরল বা এপিসোডিক।

পঞ্চমতঃ, উপস্থাপনা রীতির দিক দিয়া নাটকখানি—অধিকমাত্রায় আদর্শায়িত এবং কিছু কিছুমাত্রায় সাংকেতিকও বটে। বিল্বমঙ্গল-চিন্তামণির কাহিনী রূপ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নাট্যকার এমন কয়েকটি চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন যাহারা বৈষ্ণব ভাবতত্ত্বের বিশেষ বিশেষ রূপটি সংকেতিত করিতে সক্ষম হইয়াছে। পাগলিনী, সাধক, থাক, বণিক-বণিকপত্নী ইহারা প্রত্যেকেই যেমন এক একটি ব্যক্তি, তেমনি ভাবের সংকেতও বটে।

ষষ্ঠতঃ, উপাদান যোজনার ভিত্তিতে যে শ্রেণী-বিভাগ করা হইয়াছে 'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর' সেই বিভাগের কোনটির অন্তর্ভুক্ত তাহা না বলিলেও স্পষ্ট অর্থাৎ বিল্বমঙ্গলঠাকুর যাত্রা বা গীতিনাট্য নহে—একখানি নাটক (প্লে) তবে গানবিহীন নাটক নহে নাটকে গান থাকিলেই তাহাকে যাত্রাধর্মী বলা সঙ্গত নহে এবং বিল্বমঙ্গলের কোন কোন গান সহজভাবেই কাহিনীর সহিত অন্তরঙ্গযোগে যুক্ত হইয়াছে—ইহা সত্য কিন্তু গান যেখানে অনুচিতভাবে রসকে পোষণ ও সঞ্চার করিবার বিশেষ উদ্দেশ্যে যোজিত হয়, সেইখানেই আমরা যাত্রার আবহাওয়া পাই। বিল্বমঙ্গলের কোন কোন গানে দেখা যায় সেইরূপ আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়াছে। অতএব যাত্রাধর্মিতার স্পর্শ এখানে একেবারেই নাই এ কথা বলা চলে না।

সপ্তমতঃ—উদ্দেশ্যের দিক দিয়া, নাটকখানিকে আমরা রস-মুখ্য ও ভাব-মুখ্য নাটকের মিশ্রণ বলিতে পারি। রস ও তত্ত্ব নাটকে প্রায় সমানভাবেই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। তবে সংক্ষেপে আমরা ইহাকে ভাব-মুখ্য নাটক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি।

এখানেই নাটকখানির শ্রেণী-পরিচয় শেষ হইল।

* * সমালোচনা * *

* [Of genius the only proof is in the act of doing well what is worthy to be done, and, what was never done before, of genius in the fine arts, the only infallible sign is the widening of the sphere of human sensibility, for the delight, honour and benefit of human nature. Genius is the introduction of the new element to the intellectual universe, or if that be not allowed, it is the application of powers to object on which they had not before been exercised or the employment of them in such a manner as to produce effects hither to unknown. What is all this but an advance or a conquest, made by the soul of the poet—(Wordsworth-1815)]

সমালোচনা করিবার পূর্বে উল্লিখিত উক্তিটি বিশেষ ভাবেই স্মরণীয়। কারণ কবি-প্রতিভা বিচার করিতে হইলে ওয়ার্ডস্বার্থের নির্দেশিত পথেই অগ্রসর হইতে হইবে—দেখিতে হইবে রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—বিশ্বের উপর হৃদয়ের অধিকার কতখানি এবং স্থায়ী আকারে তাহা ব্যক্ত হইয়াছে কতটা। কবি ভাবনায় ভাবে ভাষায় নূতন কিছু আবিষ্কার করিয়াছেন কিনা ইহাও যেমন অনুসন্ধেয় তেমনি বিচার্য—আবিষ্কৃত বিষয়কে কবি উল্লেখযোগ্য রসরূপ দিতে সক্ষম হইয়াছেন কি না। প্রতিভার বিচার শেষপর্যন্ত নূতনের আমদানীর এবং পুরাতনের নূতন রূপদানের মূল্য বিচার—

এই সাধারণ সূত্র স্মরণ করিবার পরেই বিশেষ সূত্র প্রয়োগ করিতে হইবে। বিচার যেহেতু শিল্পমূল্য বিচার এবং শিল্প যখন নানা উপাদানের সমবায়ে গঠিত অঙ্গী বিশেষ, তখন বিচার বা সমালোচনা শেষপর্যন্ত—বিবিধ উপাদানের ও উহাদের সংযোজনার মূল্য বিচার। নাটকের কথাই ধরা যাউক; নাটকের অঙ্গ মোট ছয়টি—১। কাহিনী বা ঘটনা ২। চরিত্র ৩। ভাবনা ৪। প্রকাশ

৫। গীত ৬। দৃশ্য। সুতরাং নাটক বিচার শেষ পর্যন্ত কাহিনী-গঠন চরিত্র সৃষ্টি, ভাব মহিমা কবি-কল্পনা, গান ও দৃশ্যের সমালোচনা। নাট্যকারের প্রতিভা বড় কি ছোট তাহা উল্লিখিত উপাদানগুলির সৃষ্টি ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। মোটকথা যে নাট্যকার—অধিক সংখ্যক ক্ষেত্রে এবং প্রধান প্রধান বিষয়ে কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন, সেই নাট্যকারের প্রতিভাকেই আমরা উঁচুদরের প্রতিভা বলিয়া থাকি বা বলিতে পারি।

এখন, বিল্বমঙ্গলঠাকুর-নাটক সমালোচনায় উল্লিখিত সূত্র প্রয়োগ করার চেষ্টা করা যাউক।

প্রথম আলোচ্য—*কাহিনী-গঠন।

বিল্বমঙ্গলঠাকুর নাটকের প্রধান কাহিনী 'ভক্তমাল' গ্রন্থ হইতে গ্রহীত হইয়াছে এ কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। সুরদাসের কাহিনীর সহিত বিল্বমঙ্গল কাহিনীর লক্ষণীয় সাদৃশ্য আছে দেখিয়া জনৈক সমালোচক লিখিয়াছেন—"ভক্তমালে বর্ণিত বিল্বমঙ্গল কাহিনীর সঙ্গে সুরদাসের কাহিনী মিলাইয়া নাটকটির আখ্যান কল্পিত হইয়াছে" (বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস-সু—সেন)। সমালোচকের মন্তব্যে নূতনত্ব থাকিলেও, সত্য নাই কারণ ভক্তমাল গ্রন্থে যে কাহিনীটি আছে বিল্বমঙ্গলঠাকুর নাটকের প্রধান কাহিনীটুকু তদপেক্ষা বেশীও নহে—কমও নহে। তাদের উপকাহিনীর ধারাটিও সুরদাসের কাহিনী হইতে গৃহীত নহে, উহা কবি-কল্পিত।

বিল্বমঙ্গলের কাহিনীটিকে, মোটামুটি পাঁচটি পর্বে ভাগ করা যাইতে পারে। প্রথম পর্বে—মোহ, দ্বিতীয় পর্বে—মোহমুক্তি তৃতীয়পর্বে—পুনর্মোহ ও মোহমুক্তি, চতুর্থপর্বে—কৃষ্ণার্তি, পঞ্চমপর্বে কৃষ্ণপ্রাপ্তি। এই পঞ্চ-পর্বিক কাহিনীকে নাট্যকার পাঁচটি অঙ্কে বিভক্ত করিয়া নাট্যরূপ দিয়াছেন। প্রথম অঙ্কে উপস্থাপিত—মোহের রূপ, দ্বিতীয় অঙ্কে—মোহভঙ্গ, তৃতীয় অঙ্কে—মোহভঙ্গের পরে দীক্ষা—বণিকপত্নী দর্শনে পুনর্মোহ ও চির-মোহমুক্তি; চতুর্থ অঙ্কে—কৃষ্ণদর্শনলালসায় বৃন্দাবনাভিমুখে যাত্রা—পথে রাখালবেশী

শ্রীকৃষ্ণের ভক্তবাৎসল্যের লীলা সম্ভোগ এবং পঞ্চম অঙ্কে—দিব্যদৃষ্টিলাভের পরে শ্রীকৃষ্ণ দর্শন—কৃষ্ণলীলা-সম্ভোগ। বলা বাহুল্য—পঞ্চ-পর্বিক কাহিনীকে পাঁচটি অঙ্কে বিভক্ত করিবার মধ্যে কোন গঠন প্রতিভার পরিচয় নাই—যে কোন লোকের হাতেই বিল্বমঙ্গল কাহিনী এইরূপ পাঁচঅঙ্কেই বিভক্ত হইবে। কিন্তু যাহা সকলের হাতে হইবে না বা সকলের সাধ্যে কুলাইবে না তাহা ঐ উপকাহিনীটির উদ্ভাবন। এই উদ্ভাবনের মধ্যেই—নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের সৃজনী প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রহিয়াছে। প্রধান কাহিনীর সহিত অপ্রধান কাহিনী মিশাইয়া নাট্যকার যে নূতন কাহিনীর পরিকল্পনা করিয়াছেন—তাহাতে শুধু যে ঘটনা-বিন্যাসের বা পরিস্থিতিকল্পনার ক্ষমতাই প্রকাশ পাইয়াছে তাহা নহে তাহাতে একটা ভাবের মহামণ্ডল সৃষ্টি হইয়াছে তথা নাট্যকারের ভাবাদর্শের মহত্ত্ব—সংশ্লেষণী-শক্তির নৈপুণ্যও প্রকটিত হইয়াছে। এখানে যে শক্তি প্রকাশ পাইয়াছে তাহা খুবই দুর্লভ এবং প্রথম শ্রেণীর নাট্যকার প্রতিভাতেই সম্ভব।

উপচরিত্র বা পারিপার্শ্বিক চরিত্রের উপযোগিতা কাহিনীতে কি ও কত প্রকার তাহা আমরা অনেকেই জানি ঘটনা সংক্ষেপের জন্য, দুই ঘটনার মধ্য-কালীন ঘটনার বার্তা জ্ঞাপনের জন্য, চরিত্রের মনোভাব প্রতিফলনের জন্য, রস-বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্য, এবং কোন জটিল ভাবের ব্যাখ্যার জন্য পারিপার্শ্বিক চরিত্রের প্রয়োজন কাহিনী কাব্যে সব সময়েই স্বীকৃত হইয়াছে। প্রাচীন ক্লাসিকাল নাটকেও—যেখানে "উপবৃত্ত" যোজনা দোষ বলিয়াই পরিত্যক্ত,—পারিপার্শ্বিক চরিত্রের স্থান বাঁধা আছে, তারপর এই সকল প্রধান প্রধান পারিপার্শ্বিককে কেন্দ্র করিয়াই কাহিনীর মধ্যে ছোট খাট উপ-বৃত্ত গড়িয়া উঠিতে থাকিল এবং ক্রমে—উপবৃত্তযুক্ত কাহিনীর প্রচলন হইল। রোমান্টিক-গঠনের নাটকে আমরা এই উপবৃত্তযুক্ত গঠনই দেখিতে পাই এবং আজ ঐরূপ গঠনই নাটকের স্বাভাবিক গঠনে পরিণত হইয়াছে। তবে উপবৃত্ত যুক্ত কাহিনীর যেমন কয়েকটি সুবিধা আছে, তেমনি অসুবিধা বা আশঙ্কাও আছে। সুবিধা এই যে এইরূপ কাহিনীতে চরিত্রের বিকাশ ও বৈচিত্র্য, ঘটনার বৈচিত্র্য, রসের বৈচিত্র্য

দেখান তথা মানব জীবনের রূপকে ব্যাপকভাবে রূপ দেওয়া সম্ভব হয়। উপবৃত্ত দ্বারা প্রধান কাহিনীর ভাব ও রসকে পরিপুষ্ট করা সম্ভব হয়—তুলনা—সাদৃশ্য অথবা বৈসাদৃশ্য দ্বারা মূল ভাব ও রসকে উজ্জ্বলতর করিয়া তোলার সুযোগ পাওয়া যায়। আশঙ্কা এই যে অনেকক্ষেত্রেই "উপ-বৃত্ত," উপসর্গে পরিণত হয়, মূল-কাহিনী হইতে বহু দূরে সরিয়া যায় এবং প্রধান কাহিনীর অগ্রগতিকে ও রসকে ব্যাহত ও খণ্ডিত করিয়া ফেলে। এইরূপ স্থলে অন্তরের আতিশয্য এত বেশী হয় যে—'গৃহস্থ'ই ঘরে স্থান পায় না। এই কারণেই উপবৃত্ত-যোজনায় মাত্রাজ্ঞানের অভাব, নাট্যের সুগঠনের পক্ষে খুবই মারাত্মক। যে নাট্যকার উপবৃত্ত যোজনায় সর্বোত্তম মাত্রা-বোধ দেখাইতে পারেন, প্রত্যেকটি চরিত্র ও ঘটনাকে নাটকের প্রধান ঘটনা ভাব ও রসের সহিত অবিরোধে অপরিহার্য রূপে স্থান করিয়া দিতে পারেন সেই নাট্যকারকেই আমরা গঠন প্রতিভার জন্য প্রথম পুরস্কার দিতে পারি। গঠনের শক্তি দুর্লভ; বড় বড় প্রতিভার মধ্যেও অনেক সময় গঠন-নৈপুণ্যের অভাব দেখা যায়—এমন নাট্যকার খুব কমই আছেন যাঁহার প্রত্যেকটি চরিত্র, প্রত্যেকটি উপবৃত্ত একচুল এদিক-ওদিক না হইয়াছে।

নাট্যে পারিপার্শ্বিকের প্রয়োজনকে আমরা মোটামুটি দুইভাগে ভাগ করিয়া লইতে পারি—একটি শৈল্পিক প্রয়োজন অন্যটি ভাবগত প্রয়োজন, প্রধান কাহিনীটির অগ্রগতির জন্য, রসপ্রাণতা রক্ষার জন্য, পারিপার্শ্বিক পাত্র-পাত্রীর যে প্রয়োজন তাহাই শৈল্পিক প্রয়োজন, আর যে বিশেষ ভাবকে ব্যঞ্জিত করিবার জন্য সৃষ্টি কল্পিত সেই ভাবের পরিপোষণের বা বিস্তারের প্রয়োজন—ভাব-গত প্রয়োজন।

যে নাট্যকার পারিপার্শ্বিকের এই দুই প্রয়োজনকে একাধারে স্থাপন করিতে পারেন—অর্থাৎ একটি চরিত্র দ্বারা শৈল্পিক ও ভাবগত প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে পারেন, তাঁহাকে প্রথম শ্রেণীর গঠনশিল্পী বলা যাইতে পারে। নাট্যকার গিরিশচন্দ্র বিল্বমঙ্গলঠাকুর নাটকের গঠনে বাস্তবিক প্রথম শ্রেণীর নাট্যকার-

প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে—বিল্বমঙ্গলঠাকুর নাটকে নাট্যকার ভাব-মহামণ্ডপ সৃষ্টি করিয়াছেন। নাট্যকারের দৃষ্টিতে, বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের রূপ ও তত্ত্ব, সমান স্বচ্ছতায় প্রতিভাত বলিয়া নাটকখানি শুধু বিল্বমঙ্গল চিন্তামণি কাহিনীর নাট্যরূপেই পর্যবসিত হয় নাই, সাধন-তত্ত্বের এক মহা ভাব পরিমণ্ডলে পরিণত হইয়াছে। যে পারিপার্শ্বিক কাহিনী ও চরিত্রের সাহায্যে বিল্বমঙ্গলঠাকুরের কাহিনীকে রূপ দেওয়া হইয়াছে তাঁহারা শুধু যে শৈল্পিক প্রয়োজনেই কল্পিত হইয়াছে তাহা নহে, তাহাদের প্রত্যেকেরই এক একটা ভাব-গত প্রয়োজনও সৃষ্টি হইয়াছে। তাহারা শুধু বিল্বমঙ্গল-চিন্তামণির জীবনের গতি পরিণতি নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে তাহা নহে, নাট্যকারের দার্শনিক উপলব্ধির কুক্ষিতে, বৈষ্ণব রাগ-সাধনার নানারূপ প্রকৃতি বিকৃতির সংকেত বা প্রতিনিধি-স্থানীয় হইয়া উঠিয়াছে। বিল্বমঙ্গল-কাহিনীকে কেন্দ্র করিয়া সাধ্য সাধনতত্ত্বের নানা রূপ নিজ নিজ কক্ষপথে আবর্তিত হইতে হইতে, সমুচিত পরিণামের দিকে কেহ বৃন্দাবনের দিকে কেহ বা—প্রণাশের (বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি) দিকে অগ্রসর হইয়াছে। ফলে নাটকখানি বস্তুতঃ বিল্বমঙ্গল-চরিতের নাট্যরূপ বটে, কিন্তু, নাটকের অন্তরে ভাব-সাধনার এক গৌরমণ্ডলের রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে।

নাটকের কেন্দ্রীয় পাত্র-পাত্রী—বিল্বমঙ্গল ও চিন্তামণির পাশে যে-সকল ক্রিয়াসহায়ক কল্পিত হইয়াছে—যেমন ভিক্ষুক, থাক, সাধক, পাগলিনী, অহল্যা, বণিক, সোমগিরি, সকলেই একাধারে ক্রিয়াসহায়ক এবং এক একটা বিশেষ তত্ত্বের বাহন। তাহাদের প্রত্যেকেরই যেমন আছে কম-বেশী শৈল্পিক প্রয়োজন, তেমনি আছে—সাংকেতিক প্রয়োজন—ভাব গত প্রয়োজন। যেমন ধরা যাক—ভিক্ষুককে। ভিক্ষুকের শৈল্পিক বা নাটকীয় প্রয়োজন—মোহগ্রস্ত বিল্বমঙ্গলঠাকুরের দৌত্য-কার্যে—সাধক চরিত্রের স্বরূপ উদ্ঘাটনে চিন্তামণির সাহচর্যে; রসবৈচিত্র্যেও তাঁহার একটা দান আছে। কিন্তু এইটুকু প্রয়োজন পরিধির মধ্যেই ভিক্ষুক নিঃশেষ হইয়া যায় নাই। ভিক্ষুক, মুগ্ধকাহিনীর ভাবটিকেই ভগবানে কামার্পণকে—সহজ প্রবৃত্তিকে কৃষ্ণমুখী

করিয়া তোলার সাধনাকেই—সংকেতিত করিতে সক্ষম হইয়াছে। যে-কোন ঐকান্তিক প্রবৃত্তিকে এবং জন্মজাত সংস্কারকে মহত্তর বিষয়ে অভিনিবদ্ধ করিয়া, সহজিয়া পথেই শোধিত বা পরিবর্তিত করা যায়—যে কোন একান্তস্বভাব বৃত্তিকে কৃষ্ণাভিমুখী করিয়া তুলিতে পারিলেই সংস্কারানুকূল সহজ সাধনার পথেই পরমতত্ত্ব কৃষ্ণকে লাভ করা যায় এই ভাবটিরই সুন্দর অভিব্যক্তি যেমন দেখান হইয়াছে বিল্বমঙ্গলে তেমনি ভিক্ষুকেও। বিল্বমঙ্গলে কাম কৃষ্ণার্পিত ভিক্ষুকে কৃষ্ণার্পিত—চৌর্য। একই এষণা লৌকিক বিষয়ে যখন আবদ্ধ তখন কাম, যখন অলৌকিক কৃষ্ণে নিবদ্ধ তখন প্রেম। তেমনি চৌর্য্য-এষণাও যখন পার্থিব বস্তুতে অভিপ্রেত তখন চৌর্য্য এবং যখন তাহা কৃষ্ণকে চুরি করার জন্য উদ্যত তখনই তাহা কৃষ্ণপ্রেমে পরিণত তেমনি বণিক-বণিক পত্নীর শৈল্পিক প্রয়োজন—পুনর্মোহ ও মোহমুক্তির পরিস্থিতি পরিকল্পনায় বটে, কিন্তু ঐ প্রয়োজন-সিদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার ফুরাইয়া যায় নাই। বণিকপত্নী অহল্যা বাৎসল্য-ভাবের প্রতীক হইয়াছেন—রাখাল বেশী কৃষ্ণের মুখে "মা"-ডাক শুনিতে পাইলে তিনি আর কিছুই চাহেন না। এই বণিক-বণিকপত্নীর মধ্যে—বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর ভাবটি সুন্দর ভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে। তারপর গুরু সোমগিরি শুধু বিল্বমঙ্গলেরই দীক্ষাগুরু নন তিনি চিন্তামণির গুরু, ভিক্ষুকের গুরু—একাধারে তিন গুরু ও গুরু-তত্ত্ব। অধিকন্তু তিনি বৈধী ভক্তির প্রতিনিধি এবং সেই হিসাবে, রাগাত্মিকা সাধনার বিপরীতবর্ণ পটভূমিও বটে। তারপর—ধরা যাক রহস্যময় চরিত্র "পাগলিনী"কে: পাগলিনী—পাত্র পাত্রীর মানসিক দ্বন্দ্ব ও দ্বিধার ক্ষণে উপস্থিত হইয়া তাহাদের গতি-বিধি নিয়ন্ত্রণ করিয়াছে,—এই নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই আছে উহার শৈল্পিক প্রয়োজন। কিন্তু পাগলিনীর ভাব গত প্রয়োজন বিস্ময়কর। "প্রচ্ছন্ন মহাপুরুষ পাগলিনীর ভূমিকা দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের উপদেষ্টা ব্রাহ্মণীর আদর্শে পরিকল্পিত" এই মন্তব্যটুকুই পাগলিনীকে বুঝিবার জন্য যথেষ্ট নহে, পাগলিনী যে ভাবের বিগ্রহ সেই

ভাবটিকে না ধরিতে পারিলে, 'পাগলিনী'তে (নাট্যকারের) পাগলামি ছাড়া আর কিছুই দেখা যাইবে না। পাগলিনী ব্যক্তি হিসাবে পাগলিনী বটে, কিন্তু ভাব-হিসাবে—"মহাভাব"। সে যেন ভাব-সাধনার পরাদর্শ (archetype) মহাভাব-বিগ্রহ। সে যেন সেই আদ্যা রাগময়ী প্রকৃতি—বৈষ্ণবী মহাপ্রকৃতি, যে পরম পুরুষের সর্বনাশা প্রেমের আকর্ষণে আত্মহারা হইয়া সেই পরম-পুরুষের অভিসারে ঘর ছাড়িয়া পথে বাহির হইয়াছে—কোন্ মহাপাগলে যেন তাহাকে পাগল করিয়া ঘর ছাড়া করিয়াছে—শ্মশান-বাসিনী করিয়া তুলিয়াছে। সে যেন পরমাত্মার জন্য জীবাত্মার অনন্ত আকুতি—অনন্ত আর্তির দিব্যোন্মাদ। পাগলিনী রাগ-সাধনার মহাভাব-বিগ্রহ—মহাসমন্বয়ের সংকেতময়ী প্রমূর্তি সে যেন রাগসাধনার মহা-সামান্য (Summun Gouns)—বিশেষ সাধনায় সেই মহাভাবই নানা রূপে আত্মপ্রকাশ করে। পাগলিনীকে শুধু "আমাদের অন্তরাত্মার প্রতীক" (মঃ মেঃ বং) বলিলেই চলিবে না, পাগলিনীকে রাগাত্মিকা সাধনার স্বরূপ মহাভাবের প্রতীক হিসাবেই গ্রহণ করিতে হইবে। ভুলিলে চলিবে না পাগলিনীতেই মহাসমন্বয়ের—রাধা-কৃষ্ণের সাধনার চরম সংকেত প্রকটিত হইয়াছে।)

তারপর—সাধক এবং থাক। থাকও শৈল্পিক প্রয়োজন—চিন্তামণি-চরিত্রের মহচ্চরিত্ররূপ—চিন্তামণির বৈরাগ্যের অন্যতম নিমিত্ত কারণ রূপেও, কিন্তু "থাক" যে ভাবের প্রতীক তাহার নাম—বিষয়-তৃষ্ণা—ভোগ বাসনা। "থাক" অন্তর্জড়-হৃদয়া, প্রেম হীনা এবং বিষয় পরায়ণা রমণী—এক কথায় বিষয়-বিষে মগ্ন। কিন্তু সে কোন ব্যাপারেই ঐকান্তিক নহে, তাহার কোন প্রবৃত্তিই উদ্দাম বা অবাধ্য নহে। তেমনি সাধকের শৈল্পিক প্রয়োজন—প্রাচীর হইতে বিল্বমঙ্গলের পতন দৃশ্যে এবং চিন্তামণির বৈরাগ্যের অন্যতম কারণ রূপে বটে, কিন্তু ভাব-পরিমণ্ডলে সাধকের স্থান বিকৃতির কক্ষে। সাধক প্রেম-ভক্তির ও সহজিয়া সাধনার সুন্দর বিকৃতি। তাহার মধ্যে প্রেম

নাই—কামলিপ্সা আছে, তাহার বৈরাগ্যের ছদ্মবেশের তলে এক উৎকট ভোগী ও ভণ্ড বিরাজ করে। থাক যেমন প্রেমহীনা সাধক তেমনি ভণ্ড, এই কারণেই উভয়েই কৃষ্ণকৃপালাভে বঞ্চিত। দুইজনের একজনেরও প্রবৃত্তি একাগ্র নহে, এবং নহে বলিয়াই কৃষ্ণার্পণের সম্ভাবনা হইতে দূরে রহিয়াছে। ভিক্ষুকের সহিত সাধকের পার্থক্য এখানেই। ভিক্ষুক চোর বটে, কিন্তু সাধকের মত ভণ্ড নহে। তাহার সংস্কার খুব প্রবল এবং প্রকৃতি খুব একাগ্র। চোর ইচ্ছা করিলে মাখন-চোরকে চুরি করিতে মরিয়া হইয়া উঠিতে পারে, কিন্তু ভণ্ডের পক্ষে তাহা সম্ভব নহে—তাহার পক্ষে কোন সহজ পথ খোলা নাই, যে পথটি তাহার জন্য সর্বদাই খোলা সে পথটি 'জেল' বা 'আত্মহত্যা'র মধ্যে গিয়া শেষ হইয়াছে। সাধক থাক'র এই উপধারাটি—মূল কাহিনীর পক্ষে একটি বিপরীতবর্ণ পটভূমিকার কাজ করিয়াছে; সাধক-থাক'র বিকৃত প্রেমের পটভূমিতে বিল্বমঙ্গল চিন্তামণির একাগ্র প্রেমানুরাগের আলেখ্য অত্যুজ্জ্বল রূপ-রেখায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। উপবৃত্তটির যেমন আছে একটি শৈল্পিক উপযোগিতা তেমনি রহিয়াছে—ভাব-প্রতিনিবিম্ব বা সাংকেতিকতা।

তারপর—রাখালবেশী কৃষ্ণ তো একরকম 'কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং'। বৃন্দাবন তাহার নিত্যলীলার—বহুরূপী লীলার আনন্দধাম। রাখাললীলা তাহার আদিলীলা—সখ্য-বাৎসল্যের বিগ্রহই তো এই রাখালরাজ্যগোপালমূর্তি। এই লীলার পরেই—মধুর রাস-লীলা, সেইখানেই রাধা-কৃষ্ণের যুগল-মিলনের অখিল-রসামৃত মূর্তি। রাখাললীলায় কৃষ্ণলীলার আরম্ভ, মধুরলীলায় ভাবলীলার চরম অখণ্ড-স্ফূর্তি। তাই লীলারম্ভে রাখালবেশীর প্রবেশ লীলা-তত্ত্বটিকেই সংকেতিত করিয়াছে।

বিল্বমঙ্গলঠাকুর নাটকে যে গঠন-পারিপাট্য প্রকাশ পাইয়াছে, বাস্তবিক, তাহা খুবই প্রশংসনীয়—নাট্যকার গিরিশচন্দ্র গঠন-পরিকল্পনায় দুর্লভ শক্তির পরিচয় দিয়াছেন এবং সেই শক্তি এই কারণেই আরো দুর্লভ যে, তাহা যেমন রূপকের ভাব-সর্বস্বতার দুর্বলতা হইতে নিজেকে মুক্ত রাখিয়াছে,

তেমনি অতিবাস্তবিকের রূপসর্বস্বতার তথা ব্যঞ্জনাহীনতার দুর্বলতাকেও জয় করিয়াছে। ভাব ও রূপকে স্ব স্ব মহিমায় প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া, রূপের মাঝারে ভাবকে সুষ্ঠু অঙ্গ যিনি দিতে পারেন তাঁহার কৃতিত্ব কে অস্বীকার করিবে? প্রতিভা যদি হয়—doing well what is worthy to be done and what was never done before — গিরিশচন্দ্রের প্রতিভা সে ক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণীর প্রতিভা।

এই প্রসঙ্গেই সংগীত-যোজনা সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতে পারে। পূর্বেই বলা হইয়াছে—গানের দ্বারা রস সৃষ্টি বা রস সঞ্চার যাত্রার অন্যতম লক্ষণ বটে, কিন্তু গান থাকিলেই নাটক যাত্রার স্তরে নামিয়া যায় না। যেখানে গান পরিবেশের স্বাভাবিক অঙ্গে পরিণত হয় যেখানে গান ক্রিয়ার স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবে দেখা দেয় সেখানে গান তেমন আপত্তিকর হইতে পারে না। বরং নাট্যকারের কৃতিত্বই প্রকাশ পায় যেখানে গান যথাসম্ভব স্বভাবিক ও পরিবেশের বাস্তব অঙ্গ হয়। নাট্যকার গিরিশচন্দ্র এ বিষয়েও কম কৃতিত্ব দেখান নাই। ভিক্ষুকের গানে এবং টহলদারদিগের গানে যেমন আছে পরিবেশ-গত স্বাভাবিকতা তেমনি আছে ভাব-ব্যঞ্জনা—ও নাটকীয় উপযোগিতা। পাগলিনীর মুখে গানও অস্বাভাবিক নহে, তবে গানের মধ্যে ভাব পাগলিনীর যত পরিচয় পাওয়া যায়, 'ব্যক্তি' পাগলিনীর তত পরিচয় ফুটে নাই। ভিক্ষুক ও টহলদারদিগের কথা ধরা যাক- ভিক্ষুক গান গাহিয়া ভিক্ষা করে, তাহার মুখে গান খুবই স্বাভাবিক। টহলদারদিগের গানও তেমনি স্বাভাবিক। ভিক্ষুকের গান বিল্বমঙ্গলের অবস্থাটিকে—'টানে প্রাণে যায়রে ভেসে কোথায় নে' যায় কে জানে—অবস্থাটিকে সুন্দরভাবে ফুটাইয়া তোলে। তেমনি টহলদারদিগের গান—বিল্বমঙ্গলের বৈরাগ্যের মুখে গীত হইয়া বৈরাগ্যের সমর্থ পরিপোষক হইয়াছে। অন্যান্য গীতের মধ্যে যাত্রাধর্মীতার স্পর্শ কিছু কিছু আছে। তবে এই স্পর্শ দোষে পরিণত হয় নাই এই কারণে যে—নাটকখানির 'বিষয়বস্তু' স্বভাবতই

অতিপ্রাকৃতময় এবং অতি বাস্তবভূমি হইতে বেশ একটু দূরের সামগ্রী বলিয়া বাস্তবিকতার চাহিদা এখানে সদাসতর্ক ও ঐকান্তিক নহে।

এইবার 'দৃশ্যযোজনা'র দোষগুণ আলোচনা করিয়া গঠন অধ্যায়ের আলোচনা শেষ করা যাউক:—দৃশ্য পরিকল্পনার গুরুত্ব নাটকে যে কত বড় তাহা দৃশ্যকাব্য লক্ষণ হইতেই বুঝা যায়। এই দৃশ্য পরিকল্পনার মধ্যেই নাট্যকারের গঠন [illegible] ফুটিয়া উঠিয়া থাকে। কাহিনীর কোন অংশকে প্রত্যক্ষভাবে রূপ দিতে হইবে, কোন অংশকে বর্ণনার সাহায্যে বিবৃত করিতে হইবে,—কোন্ ঘটনা গ্রহণ করিতে হইবে, কোন্ ঘটনাকে বর্জন করিতে হইবে—নাট্যকারের কাছে তাহা এক প্রধান সমস্যা।

দৃশ্য পরিকল্পনার সাফল্য প্রথমতঃ উক্ত সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের উপর নির্ভর করে—দ্বিতীয়তঃ নির্ভর করে, পরিকল্পনার মধ্য দিয়া নাট্যকার কালের কালব্যাপ্তিকে অক্ষুণ্ণভাবে প্রকাশ করিতে পারেন কি না তাহার উপর। কালের গতিধারা ও ব্যাপ্তি নাটকে দৃশ্যপরিকল্পনার মধ্য দিয়া রক্ষা করা—ঘটনার পর্যায় পারম্পর্যের মধ্যে কাল ও চৈতন্য বজায় রাখা, নাট্যকারের মস্ত বড় একটা সমস্যা। নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের সম্মুখে বিল্বমঙ্গল-কাহিনী—কম বড় "কাল"-সমস্যা লইয়া উপস্থিত হয় নাই। সমস্যাটি এই যে, একটি রাত্রির ঘটনা—একটি দৃশ্যে পরিকল্পিত করিতে হইবে—অথচ রাত্রির কাল-ব্যাপ্তিটিকে রক্ষা করিতে হইবে। নাট্যকার সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছেন—খুবই সতর্কভাবে, তবে একথাও স্বীকার্য যে তিনি কালের গতিপ্রবাহের চেতনা উদ্রিক্ত করিতে সক্ষম হন নাই। প্রাচীর হইতে পতনের পর—যে সময়টুকু ব্যাপিয়া কথোপকথন আছে তাহা রাত্রি কাটিয়া যাইবার মত কোন ব্যাপার নহে। অথচ পরবর্তী প্রভাতকালীন শবের দৃশ্য খুবই অব্যবহিত ভাবে কল্পিত হইয়াছে। দৃশ্য পরিকল্পনায় কাল-ধারাটিকে তিনি সমুচিত রূপ দিতে পারেন নাই—ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। আর একটা কথাও এখানে বলা দরকার নাট্যকার

বিল্বমঙ্গল-কাহিনীর—উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ঘটনাকে 'দৃশ্য' করিতে চেষ্টা করেন নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপে বলা যায়—সোমগিরির আশ্রমের জীবন, যেমন গোপাল রাজ মন্ত্রে দীক্ষা—'লীলাশুক' উপাধিলাভ—বিদায় লইয়া বৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রার দৃশ্য প্রভৃতি। অবশ্য যাহা তিনি করেন নাই তাহা লইয়া মামলা করিবার কিছু নাই, যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাই আমাদের মুখ্য বিচার্য। তবে কি হইলে রূপটি আরো বাস্তবিক ও রসাত্মক হইত সমালোচনার সময় তাহা উল্লেখ করা একেবারে অপ্রাসঙ্গিক নহে। এইরূপ "Normative Criticism"—আদর্শ রূপটি বুঝিতে সাহায্যই করে।

চরিত্র-সৃষ্টি

এইবার চরিত্র-সৃষ্টির কথা। চরিত্রের' সংজ্ঞা দিতে যাইয়া এরিস্টটল লিখিয়াছেন—'Character is that which reveals moral purpose, showing what kind of things a man chooses or avoids "By character I mean that in virtue of which we ascribe certain qualites to the agents"- "Character determines men's qualities ......" * এবং কায়-মনো-বাক্যে য ব্যক্তির এই চরিত্র ব্যক্ত হয় তাহাও পরোক্ষভাবে বলিয়াছেন চরিত্রের গুণ কি কি তাহা উল্লেখ করিতে ভুলেন নাই—বলিয়াছেন চরিত্র সৃষ্টি ব্যাপারে চারিটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে, প্রথম বিষয়—"it must be good" অর্থাৎ নীতি নিষ্ঠা দ্বিতীয় বিষয়— "propriety"- ঔচিত্য, তৃতীয়—'character must be true to life"—অর্থাৎ বাস্তবতা বা স্বাভাবিকতা, চতুর্থ— 'consistency— সঙ্গতি। বলা বাহুল্য এখনো চরিত্রের দোষ-গুণ সম্বন্ধে এরিস্টটল যে-সকল মন্তব্য করিয়াছেন তাহার প্রায় সবগুলিই চরিত্র-সমালোচনায় প্রযুক্ত হইয়া থাকে। তবে "চরিত্র"-এর সংজ্ঞাটি আজ আরো ব্যাপক হইয়াছে, একথা বলিতেই হইবে। চরিত্রকে আজ আর অপরিণামশীল, স্থাবর (static) কোন ধর্ম বলিয়া গ্রহণ করা হয় না। চরিত্র বলিতে বুঝায়—"the dominant sentiments and beliefs of an individual at any given time whereby his attitude to himself and his environment is determined" এবং চরিত্র বলিতে আজ আরো ব্যাপক-কিছু বুঝায়— বুঝায় একটা সমগ্র ব্যক্তিত্বকে—(personality"-কে। চরিত্র—এক কথায়, বিশেষ ব্যক্তির আচরণ বৈশিষ্ট্যের সমষ্টি। চরিত্র-সৃষ্টি বলিতে, তাই বুঝায়—জীবনের

রূপ-বৈচিত্র্য প্রদর্শন করা, জীবন-রহস্যের আবরণ উন্মোচন করিবার চেষ্টা করা। সঙ্গীত, বাস্তবতা, ঔচিত্য প্রভৃতি যেমন চরিত্রের গুণ, জীবন-সত্যতা তেমনি চরিত্রের আত্মা—

—সর্বপ্রধান গুণ। যে চরিত্র জীবন্ত নহে—জীবন সত্যের প্রতিরূপ নহে তাহার মূল্য খুবই কম

এই চরিত্র নাটকের কাব্যে আমরা প্রধানতঃ দুইরূপে পাই, এক—টাইপ বা প্রতীক চরিত্ররূপে, অর্থাৎ প্রকাশধর্মী চরিত্ররূপে, দুই বিবর্তনশীল—বিকাশধর্মী চরিত্ররূপে। প্রকাশধর্মী চরিত্র একই "dominant sentiments and beliefs" লইয়া শুরু ও শেষ করে, আর বিকাশধর্মী চরিত্রকে নানা অবস্থার মধ্য দিয়া নানা ভাবান্তরের মধ্য দিয়া পরিবর্তনের দিকে লইয়া যাওয়া হয়—সংস্কার ও আচারের দ্বান্দ্বিক গতি তাহার মধ্যে দেখা যায়—সংস্কার যেমন তাহার আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে, আবার আচরণের প্রতিক্রিয়ায় সংস্কারও পরিবর্তিত হয়। এইভাবে সংস্কারের ও আচরণের ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ায় তাহার জীবনের গতি প্রভাবিত হয়।

বিল্বমঙ্গলঠাকুর-নাটকের প্রধান চরিত্রগুলি আমরা উক্ত দুই ধর্ম অনুসারে নিম্নলিখিতভাবে সাজাইয়া লইতে পারি।

১। বিল্বমঙ্গল—বিকাশধর্মী

২। চিন্তামণি—ঐ

৩। ভিক্ষুক—ঐ

৪। সাধক—প্রতীককল্প বা প্রকাশধর্মী

৫। থাক—ঐ

৬। বণিক
বণিক-পত্নী —ঐ

উল্লিখিত চরিত্রগুলি বিশ্লেষণ করিলেই নাট্যকারের চরিত্র-সৃষ্টির ক্ষমতা স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা যাইবে, সুতরাং বিশ্লেষণ প্রসঙ্গেই আমি চরিত্রের দোষ

গুণ আলোচনা করিতে চেষ্টা করিতেছি এবং চরিত্রসৃষ্টি সম্বন্ধে আমার যাহা সিদ্ধান্ত তাহা প্রত্যেকটি চরিত্রবিশ্লেষণের উপসংহারেই ব্যক্ত করিতেছি।

বিল্বমঙ্গল-চরিত্রের বিশ্লেষণ ও বিচার

বিল্বমঙ্গল কাহিনীর পাঁচটি পর্বের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। সেখানে আমরা দেখি—প্রথম পর্বে কাম-মোহ'—বেশ্যা চিন্তামণির প্রতি অত্যাসক্তি, দ্বিতীয় পর্বে—মোহভঙ্গ ও বৈরাগ্য, তৃতীয় পর্বে—পুনর্মোহ ও মোহমুক্তি, চতুর্থ পর্বে—কৃষ্ণতৃষ্ণা ও পঞ্চম পর্বে—কৃষ্ণদর্শনলাভ। বলা বাহুল্য বিল্বমঙ্গল-চরিত্র-সৃষ্টির শিল্পমূল্য বিচার, উল্লিখিত পাঁচটি পর্বে বিল্বমঙ্গলে ঐ ভাবগুলি কতখানি সার্থকভাবে রূপায়িত হইয়াছে, তাহারই বিচার।

প্রথমপর্বে—বিল্বমঙ্গল অতিমোহগ্রস্ত,—বেশ্যা চিন্তামণি-গত প্রাণ। চিন্তামণি তাঁহার ধ্যান, চিন্তামণি তাঁহার জ্ঞান। চিন্তামণির বাহিরে যে জগৎ সে জগৎ তাঁহার কাছে শূন্য। অতি আসক্তির ঘোর-বিকার বিল্বমঙ্গলকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। যত একাগ্র এই আসক্তি তত লেশমাত্র বাধায় অভিমানের প্রবলোচ্ছ্বাস। এমনি এক অভিমানের উচ্ছ্বাসেই বিল্বমঙ্গল সেদিন চিন্তামণির ঘর ছাড়িয়া পথে আসিয়াছেন। দুদণ্ডের বিলম্বে চিন্তামণিও অভিমানিনী, সেই অভিমানের প্রত্যাঘাতে বিল্বমঙ্গলের মধ্যে অভিমানের প্রবল আবেগ দেখা দিয়াছে। চিন্তামণির আস্পর্দ্ধাও কম নয়। বিল্বমঙ্গল সমস্ত রাত্রি জাগিয়া বসিয়াছিলেন অথচ চিন্তামণি একটি মিষ্টি কথাও বলে নাই; তিনি সঙ্কল্প করিতে চেষ্টা করেন—"আমি যদি বিল্বমঙ্গল হই আর তার মুখদর্শন কচ্ছিনি।" কিন্তু সঙ্কল্প করিতে যে হৃদয় কাঁদিয়া উঠিতে চায়। না-বলিয়া চলিয়া-আসাকে তিনি যেন সমর্থন করিতে পারেন না। ভাবিতেও ব্যথা লাগে—আর দেখা হইবে না! তাই মনকে সান্ত্বনা দিতে বলেন—"যদি কখনও দেখা হয় দু-টো কথা শুনিয়ে দোবো।" তবে শুনাইবেন বটে কিন্তু কড়া কথা চিন্তামণিকে বলা তাঁহার দ্বারা কিছুতেই তো সম্ভব হইবে না—মিষ্টি করিয়াই বলিবেন। না

বলিয়া আসাতে নিজের উপর বিরক্তি আসে। প্রাণ কাছে যাইবার জন্ত ব্যাকুল—সেই ব্যাকুলতাকে অভিমান দিয়া চাপিয়া রাখিতে চেষ্টা করেন। [অভিমান ও মোহের দ্বন্দ্বের রূপটি এখানে অনবদ্য না হইলেও রমণীয়ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে।]

এমন সময় প্রবেশ করে—ভিক্ষুক—মুখে একটি প্রেমের গান—ওগো বাবা, প্রেমের তুফানে॥। ভিক্ষুকের গানে বিল্বমঙ্গল নিজের অবস্থারই আস্বাদন করেন। চিন্তামণির অবস্থা জানিবার জন্ত অদম্য তাঁহার কৌতূহল— তাঁহার নিশ্চিত ধারণা—"বেটীর মন একটু ধকপক কচ্চেই হবে।" ব্যথা দিয়া আনন্দ পাওয়ার ইচ্ছে জাগে- ভিক্ষুককে দিয়া বলিয়া পাঠান—"মনে কচ্চ সে আসবে সে আর আসচেনা" ভিক্ষুককে পাঠাইয়াও স্বস্তি নাই—নিজে বোপের মধ্যে লুকাইয়া চিন্তামণির কথা শুনিতে চাহেন। চিন্তামণি দেখিয়া ফেলায় তিনি বাহিরে আসেন এবং দেখাইতে চাহেন—তিনি যেন 'এপারে কাঠ কিনতে' আসিয়াছেন এবং দৈবাৎ যখন দেখা হইয়াই গিয়াছে তখন যে একটা কথা বলিবার আছে তাহা বলিয়াই যাইবেন—কথাটি পুরাতন একটি প্রবাদ--'যত হাসি তত কান্না ব'লে গেছে রামশর্মা'। [বিল্বমঙ্গলকে চিন্তামণি ছোটলোকের ভাষায় গালাগালি করা সত্ত্বেও বিল্বমঙ্গলের মোহাচ্ছন্নতা তেমনই প্রবল থাকে—এত মোহ যে চিন্তামণি অনুরোধ করিতেই তিনি স্বীকার করেন-- "না।" রাগ নাই। "বাপের শ্রাদ্ধ"—করিতে হইবে বলিয়া তিনি বিদায় লইতে চাহেন বটে কিন্তু প্রাণ কিছুতেই ছাড়িয়া আসিতে চাহে না। বিল্বমঙ্গল—ছলে ও ছলে বারবার ফিরিয়া ফিরিয়া আসেন। এমন সব কথার অবতারণা করেন যাহা বলা শুধু নিষ্প্রয়োজন নহে,—প্রকৃতিস্থের কাছে হাস্যোদ্দীপকও বটে। [এখানে মোহের অবশ ও দীন রূপটি স্পষ্ট আকারেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। তবে বিল্বমঙ্গল চরিত্র সম্বন্ধে প্রথমেই একটি কথা মনে হয়—সে কথাটি এই যে, বিল্বমঙ্গল যে পণ্ডিত ও কবীন্দ্র তাহার পরিচয় এ নাটকে তেমন ফুটে নাই। বিল্বমঙ্গলের মোহ-মুগ্ধ অবস্থাটিকে আরো গুরু-গম্ভীর করিবার অবকাশ আছে

এবং বিল্বমঙ্গলের হৃদয়ের ক্রিয়ার সহিত মস্তিষ্কের ক্রিয়ার সামঞ্জস্য ঘটাইতে না পারায় চরিত্রটির ভাব-গাম্ভীর্য যথেষ্ট পরিমাণে ফুটিয়া উঠে নাই। ব্যক্তিত্বের ভাব তথা ভাব-গাম্ভীর্যের মাত্রা যে যথেষ্ট মাত্রায় রক্ষিত হয় নাই, একথা মানিতে হইবে।]

বিল্বমঙ্গল পিতৃশ্রাদ্ধ কোনও ভাবে শেষ করেন বটে, কিন্তু সন্ধ্যা আসিতেই প্রাণে টান ধরে। ব্রাহ্মণ-ভোজনাদি ব্যাপার অপেক্ষা চিন্তামণির ভাবনাই মনকে অধিকার করিয়া থাকে—ভোলাকে বলেন 'তুই দাঁড়িয়ে থেকে ভাল ভাল জিনিস সব তুলে আনবি—পাঁচ চেঙারি'। এমন কি—দেরি হইবার ভয়ে বাড়ীতে বসিয়া খাইতেও চাহেন না—'চিন্তামণির সঙ্গে একসঙ্গে' খাওয়ার ইচ্ছাই বড় হইয়া উঠে। এদিকে ঝড় উঠায় ব্রাহ্মণভোজন পণ্ড হইবার উপক্রম হয় কিন্তু বিল্বমঙ্গলের সেজন্য কোন দুশ্চিন্তা নাই। দারওয়ান বলে—মশাই ব্রাহ্মণভোজন পণ্ড হয়। বিল্বমঙ্গল ছোট একটি "হোক" বলিয়া সে প্রসঙ্গ চাপা দেন—চিন্তামণিকে দেওয়ার জন্য একশ টাকা ঠিক করিতে বলেন। বাড়ী বাঁধা ভিন্ন উপায় নাই জানিয়াও তিনি বলেন—"তা যেমন করে হয়।" বৃষ্টি মাথায় করিয়াই তিনি বাহির হইয়া পড়েন—নদী পারে যাইতেই হইবে। [ছন্নছাড়া রূপটি এখানে সুস্পষ্ট।]

তারপর বিল্বমঙ্গল নদীতীরে—শ্মশানে। মুষলের ধারে বৃষ্টি কিন্তু কোন দৃকপাত নাই। মনে ভাবেন—'চিন্তামণি হয়ত নদীর ধারে দাঁড়িয়ে ভিজছে।' বুকে তাহার চিতের আগুনের মতই—প্রেমাগুন; কোন বৃষ্টি-ঝড়েই তাহা নিবিবে না যে। সম্মুখে ভয়ঙ্কর তুফান—এদিকে প্রাণ তাহার ব্যাকুল—যায় যায়। তাই চিন্তামণির ভালবাসার কথা মনে পড়িয়া প্রাণে আরো ব্যাকুলতা জাগে—কারণ তাহার প্রাণ তো তাঁহার নিজের নয়—চিন্তামণির প্রাণ। শ্মশানের কাঠ খুঁজিতে যাইয়াই সম্মুখে পাগলিনীকে দেখেন—পেত্নী বলিয়াই সন্দেহ হয়, কিন্তু বিল্বমঙ্গল মরিয়া—এয়েও প্রাণ গেছে অয়েও প্রাণ গেছে—ভয় ত্যাগ করিয়া পেত্নীর কাছেই পার করিয়া দেওয়ার জন্য প্রার্থনা জানান।

পাগলিনী চিন্তামণির নাম শুনিয়া নিজের চিন্তামণির কথাই বলিয়া যায়। বিল্বমঙ্গলের ব্যাকুলতার বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায়—আর্তনাদ করিয়া বলেন—"চিন্তা-মণি। চিন্তামণি। বুঝি নদীকূলেই প্রাণ যাবে।" পাগলিনী নিজের মনে-মনে ই কথা—'প্রাণ তো যাবার নয় প্রাণ যাবে না'...বিল্বমঙ্গলের মনে বেশ দাগ কাটে—। প্রাণের জন্য তাহার মমতা এই জন্যই—'চিন্তামণিকে যে আর দেখতে পাব না।' আবার ব্যাকুলতায় তিনি চিন্তামণি চিন্তামণি বলিয়া আকুল আহ্বান জানাইয়া জলে ঝাঁপ দেন। [বিল্বমঙ্গলের মোহ, ঘৃণা-লজ্জাকে আগেই পদদলিত করিয়াছে; এখানে ভয় বন্ধও বন্ধ হইয়া গিয়াছে। বাহ্যজ্ঞান-শূন্য—মোহের রূপটি এখানে সুন্দরভাবেই ব্যক্ত হইয়াছে।]

এই বাহ্যজ্ঞানশূন্য মোহের রূপের নিদর্শন দেখা যায়—শবাবলম্বনে নদী পার হওয়ার মধ্যে—সাপের লেজ ধরিয়া প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করার মধ্যে।

প্রাচীর হইতে পতিত হওয়ার পর যদিও বিল্বমঙ্গলের মূর্ছিতপ্রায় অবস্থা—তবু মন প্রাণ তাহার চিন্তামণিতেই নিবদ্ধ চিন্তামণি ডাকই সর্বপ্রথম মুখে বাহির হয়। চিন্তামণির কাছেই তিনি 'একটু জল' চাহেন এবং চিন্তামণির গলা ধরিয়াই তিনি উঠিয়া ঘরে যাইতে চাহেন, কিন্তু এই আঘাতের উপর চিন্তামণি গঞ্জনার আঘাত দিতে থাকেন।—চিন্তামণি ছোট ভালবাসার ধরন মত বলেন—রাত দুপুরে দেখতে এয়েচ মানুষ নে আছি না একলা আছি। কিন্তু বিল্বমঙ্গলের এক কথা "তোমায় দেখতে এসেচি চিন্তামণি।" চিন্তামণির মনে প্রশ্ন জাগে, ঝড-বৃষ্টিতে নদী পেরুলো কি করে?...পাঁচোল টপকালেই বা কি করে?—বিল্বমঙ্গল বলেন—তুমি যে দড়ি ফেলে রেখেছিলে চিন্তামণি। চিন্তামণি স্বভাবসুলভ ভাষায় গালি দেন, বলেন—"খেংরে বিষ ঝেড়ে দোব," তোর দড়ি দেখাবি চল্ তো।" [নাট্যকার বিল্বমঙ্গলের মানসিক জড়তাকে এমন সুন্দর রূপ দিয়াছেন যে—অভিনেতার অভিনয়ে প্রতিফলিত না হইলে তাহার সবটুকু ধরা সম্ভব নহে। মোহ যেন বিল্বমঙ্গলের সবটুকু চেতনাকে মূর্ছিত করিয়া ফেলিয়াছে।]

দড়ি দেখিতে যাইয়া সকলেই দেখিল—"গোখ্‌রো সাপ। বিল্বমঙ্গলও দেখেন কিন্তু দেখিয়াই তিনি চিন্তামণির মুখে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন—এবং বোধ হয় যে মুখ তাহাকে সব-কিছু ভুলাইয়াছে, সেই মুখের রহস্যকেই খুঁজিয়া দেখিতে চাহেন। একদৃষ্টিতে তিনি চিন্তামণির মুখের দিকে চাহিয়া থাকেন। চিন্তামণির প্রশ্নের উত্তর তিনি দেন বটে কিন্তু দৃষ্টি যেমন অকম্পিত মুখে তেমনি একটি ধ্রুব-বচন—"তুমি অতি সুন্দর, তুমি অতি সুন্দর—অতি সুন্দর।" ক্রমে বিল্বমঙ্গলের দৃষ্টি চিন্তামণিকে ভেদ করিয়া অতীন্দ্রিয় পরম সুন্দরের অভিমুখে উধাও হইতে থাকে। বিল্বমঙ্গল বলেন—"অবশ্যই তুমি অতি সুন্দর নইলে এতদিন কার পূজা করিচি ? তোমায় দেখচি তুমি দেবী, কি রাক্ষসী! যদি দেবী হ'তে আমার মনের ব্যথা বুঝতে, নিশ্চয় তুমি রাক্ষসী! কিন্তু অতি-সুন্দর—অতি সুন্দর" [এই স্থলে মোহভঙ্গের প্রথম ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার রূপ প্রকাশ পাইয়াছে। এই রূপটিতে যে নিঃশব্দ মুখরতার সৃষ্টি করা হইয়াছে—সাত্ত্বিক ভাবের যে উদ্দীপনা সৃষ্টি করা হইয়াছে তাহার তুলনা পাওয়া যায় না। এখানে বিল্বমঙ্গল চরিত্রে আধ্যাত্মিক অনুভূতির যে গভীরতা দেখা যায় তাহা শুধু অনবদ্য নহে—বিস্ময়করই বটে।]

ইহার পর পচা মড়া দেখিয়া কাহারও আর সংশয় থাকে না। চিন্তামণি নিজেই বিল্বমঙ্গলের চরিত্রকে প্রকাশ করে—'তুমি সত্যই উন্মাদ। তোমার ঘৃণা নেই, লজ্জা নেই, ভয় নেই। তুমি দড়ি ব'লে সাপ ধর, কাঠ ব'লে পচা মড়া ধর।' বিল্বমঙ্গল কিন্তু তখন আর বিল্বমঙ্গল নাই। বৈরাগ্যের আবেগে হৃদয় আত্মহারা। নিত্যানিত্য বিবেক দেখা দিয়াছে। অনিত্য দেহ-মায়া, ছায়ার সংসার—এ জ্ঞানও আসিয়া গিয়াছে। আত্মার "প্রেমের পাথার"-এর জন্য ব্যাকুলতাও দেখা দিয়াছে—আত্মার আত্মীয়কে দেখিবার জন্য এখন তাঁহার মধ্যে ঐকান্তিক তৃষ্ণা। সংশয় টুটিয়া যায়। বিশেষ জ্ঞান হয়—"অবশ্যই আছে—আমি অন্ধকারে দেখতে পাচ্ছিনি—আছে—আমার কাছে কাছে আছে।" বিল্বমঙ্গলের প্রাণ 'পরমসুন্দর'কে পাইবার জন্য, দেখিবার জন্য অস্থির হইয়া

উঠে। "দেখা দাও, কথা কও, আমার প্রাণ জুড়াও" বলিতে বলিতে বিল্বমঙ্গল চিন্তামণির কক্ষ হইতে প্রস্থান করেন।

ইহার পরে সোমগিরির সহিত বিল্বমঙ্গলের দেখা হয়। তখন 'কে কোথায় আছে প্রেমময়? প্রেম দিতে আছে বড় সাধ—' এ আর্তির আর অন্ত নাই। সোমগিরিকে গুরুপদে বরণ করেন, রাধাকৃষ্ণের রূপ প্রথম ধ্যান করেন এবং কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন।

কিন্তু সংস্কার তো মরিয়াও মরিতে চাহে না। মনকে একাগ্রভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করা কি সহজ কথা? ইন্দ্রিয়ের বিষয়-তৃষ্ণা দূর হইয়াও দূর হয় না। নামজপ করিয়া বিল্বমঙ্গল চিত্তবৃত্তিকে নিরুদ্ধ করিতে চেষ্টা করেন। করিলে কি হইবে? মন স্থির না হইলে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকা না থাকা সমান কথা। 'চক্ষু' উন্মীলন করিবামাত্র 'অহল্যার' (বণিক পত্নী) প্রতি দৃষ্টি পড়ে এবং 'মন তখনও' ইন্দ্রিয়ের দাস বলিয়া মনও প্রধাবিত হয়। তবে তখন বিবেক জাগ্রত—ঊর্দ্ধতন প্রকৃতি কৌতূহলের সহিত নিম্নতম প্রকৃতির প্রবৃত্তি পর্যবেক্ষণ করে—'ধন্য সংস্কার!' বলিয়া পশু অর্থাৎ মোহান্ধ মনকে তিনি ধিক্কার দেন এবং দর্শন-তৃষ্ণার শেষ চাহিদা মিটাইবার জন্য অহল্যার পিছনে পিছনে যান।

[এখানে বিল্বমঙ্গলের ইন্দ্রিয়ের বিষয়তৃষ্ণার প্রবণতার সহিত, সংস্কারের সহিত জাগ্রত বিবেকের দ্বন্দ্বটি খুব জোরালো তথা লক্ষণীয় হইতে পারে নাই। যেটুকু দ্বন্দ্ব প্রকাশ পাইয়াছে তাহা সাংকেতিক অতিসংক্ষিপ্ততার জন্য দর্শনীয় হইয়া উঠে নাই। তবে জাগ্রত বিবেকের সম্পর্ক সচেতনতা, অন্তর্বীক্ষণের মধ্যে যেন ফুটিয়া উঠিয়াছে।]

বণিক-পত্নীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া এই বিবেকী বিল্বমঙ্গলই ইন্দ্রিয়দাস মনকে ধিক্কার দিতে থাকে—

"মন হাসি পায়
হ'ল তোর বৈরাগ্য উদয়
চলে গেলি একবাসে গৃহবাস ত্যজি

কোথা কৃষ্ণ ?—বলি হলি উতরোলি—
যেন তোর কত প্রেম !

মনকে বুঝাইয়া দেন ইন্দ্রিয়রাই শত্রু, শত্রুকে মমতা করিতে নিষেধ করেন এবং 'উত্তম নয়ন' দেখাবার প্রতিশ্রুতি দিয়া নশ্বর নয়নকে দূর করিয়া দেন।—(চক্ষু বিদ্ধ করেন) এইভাবে বিল্বমঙ্গল বাহির দুয়ারে কবাট লাগাইয়া ভিতর দুয়ার খুলিয়া দেন।

ইহার পরেই বিল্বমঙ্গল প্রেমোন্মত্ত। মুখে হা কৃষ্ণ ! হা কৃষ্ণ !—আর্তস্বর—পরিপূর্ণ সাত্ত্বিক অবস্থা। কৃষ্ণ কৃষ্ণ করিতে করিতে মূর্চ্ছাও হয়। রাধার বা রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত চৈতন্যের মত কর্ণমূলে কৃষ্ণনাম জপ করিতেই মূর্চ্ছাভঙ্গ হয়; প্রলাপ-বিলাপ প্রার্থনায় ব্যাকুলতা ঐকান্তিক ভাবেই প্রকাশ পায়। এখানেই রাখালবেশী কৃষ্ণ আসিয়া তাঁহাকে আবার মমতায় জড়াইতে চেষ্টা করেন—কৃষ্ণ সংস্কারের ঐকান্তিকতা পরীক্ষার জন্যই—রাখালরূপ দ্বারা কৃষ্ণকে আবৃত করিতে চেষ্টা করেন। বিল্বমঙ্গল রাখালের কাছে করুণ মিনতি জানায়—"তুমি যাও ভাই। একে অন্য মন, তাহে তুমি ক'রো না বিমনা" ক্রমে প্রেমোন্মত্ততা চরমে পৌঁছায়, দিব্যোন্মাদের ভাব ঘোর অবস্থা লইয়া রাখালের হাত ধরিয়া বৃন্দাবন অভিমুখে প্রস্থান করেন। [প্রেমোন্মাদের রূপটি নিখুঁত হইতে পারে নাই।]

কিন্তু রাখাল যে হৃদয় অধিকার করিয়া বসিয়াছে। কৃষ্ণদর্শন লালসার সহিত এই নূতন মোহের দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। কৃষ্ণ বলিয়া ডাকিতে 'রাখাল' ডাক বাহির হইয়া পড়ে। রাখালময় চিত্ত—ক্রমে ক্রমে রাখালের মধ্যেই অনাথশরণ শ্রীকৃষ্ণকে আবিষ্কার করে। রাখালরূপী কৃষ্ণের সহিত ভক্ত বিল্বমঙ্গলের লীলা আরম্ভ হয়। রাখালরাজকে পাইয়া বিল্বমঙ্গলের আনন্দ আর ধরে না। ক্রমে দিব্যদর্শন লাভ করিয়া রাধাকৃষ্ণের যুগলমিলন দর্শন করিয়া বিল্বমঙ্গলের প্রেম-তৃষ্ণা পরিনিবৃত্ত হয়।

চিন্তামণি

(খ) চিন্তামণি বারবনিতা বটে কিন্তু তাহাই যে তাহার সবটুকু পরিচয় নহে তাহার প্রমাণ এই স্বীকারোক্তিটুকু—'আমার ছেলেবেলাকার কথা মনে হয়, আমি কি বরাবরই এমনি ? না, পুড়ে পুড়ে কয়লা হয়ে আছি ? আমার প্রাণে কত সাধ ছিল, সে সব কোথায় ?'—আমরা জানি, বরাবরই সে এইরূপ ছিল না প্রাণে তাহার আর দশ জন নারীর মতই কত সাধ ছিল। ইহাও জানা যায়,—সে অনেককে অনেক দাগা দিয়াছে এবং অনেক দাগা নিজেও পাইয়াছে, আর, পুড়িয়া পুড়িয়া শেষ পর্যন্ত কয়লায় পরিণত হইয়াছে। সব সাধ বেশ্যা জীবনের তলে চাপা পড়িয়া গিয়াছে। যদিও সহজ নারীহৃদয়টি আজ সে প্রায় হারাইয়াই ফেলিয়াছে তাঁহার কাছে "ভালবাসা একটা কথার কথা"—প্রেমনিবেদনের ঐকান্তিকতাকে "ভাণ" বলিয়াই মনে হয় তথাপি তাঁহার প্রকৃতিতে প্রেমের প্রবণতা রহিয়াই গিয়াছে বিল্বমঙ্গলকে হারাইয়াই সে প্রেমের মাহাত্ম্য বেশী করিয়া উপলব্ধি করে—আপনার অন্তরের অন্তঃপ্রবাহী প্রেমকেও চিনিতে পারে। মর্মে মর্মে সে বুঝিতে পারে বিল্বমঙ্গলের প্রেমই তাহাকে, ঘৃণিত বেশ্যা জীবনের মধ্যেও, এতদিন [illegible] মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছে। বিল্বমঙ্গল [illegible] সেই বেশ্যা-জীবনের উঞ্ছবৃত্তি তাহার সম্মুখে [illegible]। আজ সে বেদনার সহিত উপলব্ধি করে—"আমি যে বেশ্যা ছিলুম—সেই ঘৃণিত বেশ্যা।"

সেই সময় পাগলিনীর সহিত চিন্তামণির দেখা ও আলাপ হয়। পাগলিনীর কথা শুনিয়া তাঁহার আপাদ-মস্তক কাঁপিতে থাকে—তাহার আত্মায় দোলা লাগিয়াছে—স্বভাব জাগি জাগি করিতেছে, মন কেন যেন পাগলিনীর মত হইতে চাহে (পাগলিনী সম হতে চাও)—চিন্তামণিরও বিবেক জাগে। অনিত্যের প্রতি, নশ্বরের প্রতি আসক্তিকে সে আজ প্রশ্ন করে। পাগলিনীকে সে আত্মজন বলিয়া গ্রহণ করিতে ব্যগ্র হয়—পাগলিনীকে সে মেয়ের স্থানে

বসাইয়া গহনা পরাইয়া তৃপ্তি পায়। তাহার আত্মা বোধ হয় কাঞ্চন-ত্যাগের দ্বারা ত্যাগের সাধনায়—বিষয় বৈরাগ্যের সাধনায় প্রথম দীক্ষা গ্রহণ করে। ইহাই সাধনার প্রথম স্তর।

ক্রমে বিষয়-বিষের স্বরূপ আরো ধরা পড়ে। চিন্তামণির বিবেক যত প্রবুদ্ধ হইতে থাকে উদ্ধার কামনাও তত ঐকান্তিক হইতে থাকে। কিন্তু ঘৃণা লজ্জা না থাকিলেও প্রাণের ভয় তো জীবের মজ্জাগত। পোড়া পেটের ভাবনা তাই পথের কাঁটা—বাধা হইয়া দাঁড়ায়। পাগলিনী তাহার এই ভয় দূর করিয়া দেয়। ইতিমধ্যে থাক-সাধকের ষড়যন্ত্র—বিষপ্রয়োগে চিন্তামণির প্রাণবিনাশের ষড়যন্ত্র, বিষয়-বিষের সম্পূর্ণ রূপটি উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিয়া বৈরাগ্যকে আরো ঐকান্তিক করিয়া তোলে চিন্তামণি মনকে দেখাইয়া দেয়—দেখ, অর্থ কত আপনার।" তাহার মনের প্রকৃতি বদলাইয়া যায়। আগে সে সকলকেই সন্দেহ করিয়া আসিয়াছে—আজ তাহার মন 'প্রত্যয়'কে আশ্রয় করে। পাগলিনীর কথা তাহার মনের সংশয় ও ভয় দূর করে—চিন্তামণি বলে "তবে কেন ভয়? এই তো আশ্রয়।" চিন্তামণির বিষয় বিতৃষ্ণা সম্পূর্ণ হয়—সে অঞ্চলের চাবি খুলিয়া ফেলিয়া দেয় তথা বিষয়-তৃষ্ণাকেও দূরে ছুঁড়িয়া ফেলে। এই ভাবে—গৃহত্যাগে সাধনার দ্বিতীয় স্তর শেষ হয়

কিন্তু চিন্তামণি তখনও একপদে সংশয় অপনোদন করিতে পারে নাই। ভয় যাইয়াও যাইতে চাহে না। পাগলিনীর সঙ্গ ছাড়িয়া একাকী পথ চলিতে এখনও সে কুণ্ঠিত। পাগলিনী তাহার সে কুণ্ঠাটুকুও দূর করে। চিন্তামণি ভাবে—"যদি সকল ত্যাগ করতে পেরে থাকি, তবে এর সঙ্গ ত্যাগ করতে পারব না?... যা হয় হবে!...পাগলিনী চিন্তামণিকে কৃষ্ণনির্ভর করিয়া চলিয়া যায়। তাহার অন্তর হইতে আর্ত প্রার্থনা জাগে—

'ভগবান, পতিতপাবন রক্ষা কর দয়াময়।
মরি, প্রভু মনের বিকারে -
অবলারে কৃপা কর।'

কিন্তু পূর্বসংস্কারকে চিত্ত হইতে মুছিয়া ফেলা তো সহজ কথা নহে। ভিক্ষুকের স্বীকারোক্তি শুনিয়া চিন্তামণিও পূর্বসংস্কারের ক্রিয়া সম্বন্ধে মনে মনে স্বীকারোক্তি করেন, তাহার ভাবনা জাগে।—"কত দিনে সংস্কার হবে দূর।"

(বৃন্দাবনে আসিয়া) চিন্তামণি একে একে বাহিরের রূপ-শোভা দূর করিতে থাকে. বিভূতিকেই সে শ্রেষ্ঠ ভূষণ করিয়াছে—সাধুত্তম বিল্বমঙ্গলের কৃপালাভের জন্য এই ভূষণই শ্রেষ্ঠ ভূষণ। তাহার ধারণা—'তাঁর কৃপা হলে কৃষ্ণচন্দ্রে পাব। পাব আমি পতিত পাবন।' চুল কাটিয়া ফেলিতে উদ্যত হইতেই "রাখাল" (রাখালরাজ) আসিয়া বাধা দেয়—মিষ্টিকথা বলে; রাখালের সহিত চিন্তামণির 'ভাব হয়।' রাখাল চিন্তামণির কৃষ্ণ নিষ্ঠা পরীক্ষা করিতেও ভুল করে না।

কিন্তু—"তৎপদং দর্শিতং যেন" সেই গুরু না হইলে—বিশ্বাসকে অটল করিবেন কে? সোমগিরিকে চিন্তামণিও গুরুপদে বরণ করে; কারণ বিশ্বাসেই মিলায় বস্তু…… পাগলিনী চিন্তামণিকে বিল্বমঙ্গলের কাছে পৌঁছাইয়া দিয়া—অনুরাগকে পরানুরাগের হস্তে সমর্পণ করিয়া প্রস্থান করিলে, চিন্তামণি বিল্বমঙ্গলের কৃপায়—অভিবাঞ্ছিত কৃষ্ণদর্শনলাভে ধন্য হয়।

*[চিন্তামণি-চরিত্রে মহাপাতকী-চরিত্রের ক্রম পরিণতি অতি সুন্দরভাবে দেখান হইয়াছে। চরিত্র এই দিক দিয়া বিকাশধর্মী। প্রেম-চেতনা,—বিবেক—বৈরাগ্য বিষয়-বিতৃষ্ণা, পূর্বসংস্কারের লীলা…একে একে ঘৃণা-লজ্জা-ভয় ত্যাগ…কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ প্রভৃতি স্তরগুলি প্রশংসনীয় ভাবেই বিন্যাস করা হইয়াছে। তবে চরিত্রটি গোড়ার দিকে যত বাস্তবিক হইয়াছে, শেষের দিকে তত বাস্তবিক হইতে পারে নাই; বরং ইহাই বলা যাইতে পারে যে শেষের দিকে অনেক পরিমাণে ভাবতান্ত্রিক হইয়া পড়িয়াছে। পূর্বসংস্কারের সহিত যে দ্বন্দ্ব হইয়াছে তাহার যতটা বিবৃতি আছে, ততটা রূপ নাই।]

(গ) চিন্তামণির পরে আর একটি বিকাশধর্মী চরিত্র উল্লেখযোগ্য—সে ভিক্ষুক। ভিক্ষুকের ছোটকালে নেশাটা ভাঙটা ধরিবার ফলে—একটু

'হাতটান' হইয়াছিল। জীবন খুব ঘটনাবহুল না হইলেও ছোট একটু ইতিহাস আছে। তাহার নিজের ভাষায়—"একটা বাঁধা হুঁকো সাজিয়ে পাঁচশ কোড়া খাই আর ঘানি টানি এক মাস। আমিও কাশী গিয়ে ছিলাম, তোমার মত একটা মোহন্তও পেয়েছিলুম তাঁর জটার ভেতর একখানা সোনার বাটি ছিল······বাটিখানা নিয়ে সরলুম।"

এখন, তাঁহার জীবনে একটিমাত্র 'পাঁচ' আছে—'শান্তিপুর থেকে একটা সোনার বাটি' সরানতে একখানা পরওয়ানা আছে। তাই ভিক্ষুক, ভিক্ষুক। কিন্তু গোয়েন্দার আতঙ্ক মনে লাগিয়াই আছে। কোন লোকের সহিত আলাপ পরিচয় করিবার সময়—লোকটি গোয়েন্দা কিনা সে সন্দেহ একবার না জাগিয়া যায় না এবং নিশ্চিন্ত না হওয়া পর্যন্ত মন খুলিয়া কথা বলিতে সঙ্কোচ করে। বিল্বমঙ্গল একটি টাকা দিতে উদ্যত হইলে—তাহার আশঙ্কা জাগে—"আঁা। ফাঁদিদার ধরিয়ে দেবে না তো বাবা!" সাধককেও সে বলে—বলি, মশাই তো গোয়েন্দা নন? তবে এ প্রশ্ন করে তাহার কারণ সাধককে সে একটু আগেই চিনিয়াছে—বলেও সে 'তোমায় আগে একটু না চিনলে আমার ধাতের কথা খুলতুম না।" লোক চিনবার ক্ষমতা যে তাহার আছে তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। লোক-চরিত্রও তাহার কম জানা নাই। বিল্বমঙ্গলের দৌত্য কার্যেই তাহার প্রমাণ আছে। মনস্তত্ত্বে দীক্ষাও ব্যবসায় হইতেই বেশ হইয়াছে। সাধকের সহিত কথোপকথনে তাহা সুন্দর ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

কিন্তু পাগলিনীর গহনা হাতাইতে যাইয়া তাহার জীবন—নূতন বাঁকের স্রোতের টানে পড়ে। পাগলী তাহাকে বলিয়াছে "বাবা তুই আমার ছেলে।" কথাটি থাকিয়া থাকিয়া তাহার মনে হয়—পাগলীকে সে খাবার আনিয়াও খাওয়ায়। এমন সময় একটি ঘটনায় তাহার মনে হয়—পাগলিনী সামান্য পাগল নহে। প্রশ্নও করে সে—মা, তুই কে মা? পরবর্তী ঘটনা—সাধক-থাকর চিন্তামণিকে বিষ খাওয়াইবার ষড়যন্ত্র। ভিক্ষুক লুকাইয়া শুনে।

পাগলিনী যখন—বিষ! বিষ! বলিয়া বিষয়কে ধিক্কার দেয়, ভিক্ষুক মনে করে ষড়যন্ত্রের কথাই সে জানিয়াছে। ভিক্ষুকের জীবনে, এই নূতন শক্তির মানুষের, ও নূতন সত্যের অভিজ্ঞতা ভাবান্তর আনে। চিন্তামণিকে সে ষড়যন্ত্রের কথা বলিয়া দেয়; চিন্তামণি সব ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়—এই ঘটনাটিও ভিক্ষুকের চোখ খুলিয়া দেয়। 'বেশ্যা' সব ছেড়ে ছুঁড়ে দিয়ে চল্লো......আঃ দূর মন; আমি কা'র জন্যে গাঁট দি।—ভিক্ষুকের মনে ভাবান্তর আসে। চিন্তামণিকে দেখিয়া ভরসাও বাড়ে– ' চিন্তামণি যমের হাত থেকে বেঁচে গেল, আমি আর দারোগার হাত থেকে বাঁচব না।"

ইহার পর—ভিক্ষুক বৃন্দাবন অভিমুখী। কিন্তু দারোগার হাত হইতে বাঁচা যত সহজ সংস্কারের হাতে রেহাই পাওয়া তত সহজ নহে। ভিক্ষুক "দেখে শুনে" ভাবিয়াছে—"ও রোগটা ছেড়ে দোব।" কিন্তু চুরি না করিতে পারিলে রাত্রে তাহার নিদ্রা হয় না. তাই সে সংস্কারকে নির্দোষভাবে চরিতার্থ করে তথা শোধন করে। নির্দোষ চরিতার্থতার প্রক্রিয়া—ভিক্ষুকের নিজের কথায়--"একটা গাছকে মনস্থ করে বল্লেম "এই চোর।" তক্কে ফিকিরে গাছটা যেন ডাক নাড়লেই জেগে আছে, দুপুর রাত্রে যখন কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে আমি ওর - পোঁটলা নিয়ে সরলুম; দৌড় দৌড় যেন, চৌকিদার আসছে। তারপর একটা ঝাঁপে গিয়ে পোঁটলাটা মাথায় দিয়ে তবে ঘুমুই।" এই কারণেই—চিন্তামণির সহিত দেখা হইতেই তাহাকে পাগলীর-দেওয়া গহনা ফিরাইয়া দিতে চায়—উদ্দেশ্যও ব্যক্ত করে—"তোমার ঠেঁয়ে গয়না দিলে আমি চুরি করব, আর গয়না বেচে খাব। আর সব গয়না ফুরিয়ে গেলে ইট বেঁধে পোঁটলাটা নিয়ে নাড়া-চাড়া করব।" চুরির সংস্কারকে সহজভাবে নির্দোষ ও নিষ্ক্রিয় করিয়া ফেলিতেই ভিক্ষুকের এই চুরির সাধনা। সংস্কার যে মরিয়াও মরিতে চাহে না- ভিক্ষুকের শূন্য পোঁটলায় গেরো দেওয়া হইতেই বোঝা যায়। রাখালের কাছে ভিক্ষুক স্বীকার করে—সত্যি,—(ওতে তো কিছু নেই) পথে ভুলে গেরো দিয়েছি। হাত-পা-মন তখনও সংস্কারের অধীন। এখানেই

পুঁটলি' দূরে নিক্ষেপ করিয়া ভিক্ষুক পূর্ব সংস্কার হইতে মুক্ত হয় এবং পরে সোমগিরির কৃপায় কৃষ্ণ-ভজনার সহজ উপায়টিও লাভ করে—মাখন চোরকে চুরি করিতে পারা—চুরির মতন চুরিই বটে—এ সেই বস্তু যাহাকে পাইলে আর কিছুই চুরি করিবার থাকে না।

*[ভিক্ষুক চরিত্র-সৃষ্টিতে গিরিশচন্দ্র চরিত্রাঙ্কন শক্তির অপূর্ব পরিচয় দিয়াছেন। 'যার যেমন মন তেমনি ধন' বা—"যার মনে যা, লাফ দে উঠে তা" প্রবাদটি ভিক্ষুকের মনোভাবে সুন্দরভাবে প্রকটিত।

ভিক্ষুক চোর—চোরের দৃষ্টি, চোরের সংস্কার লইয়াই সে জগৎকে দেখে। বিল্বমঙ্গল সাপের লেজ ধরিয়া প্রাচীর টপকাইয়াছে—ইহাতে আর যাহার যাহাই মনে হউক ভিক্ষুকের মনে যে ভাবটি লাফ দিয়া উঠিয়াছে তাহা এই—"উঃ। মানুষটা যদি চোর হত, সাতমহলের ভেতর থেকে টাকার তোড়া বা'র ক'রে আনতে পারত।" তারপর সংস্কারের সহিত তাহার সংজ্ঞান বুঝাপড়ার চেষ্টাও অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে। ছোট ছোট ঘটনার ধাক্কায় ধাক্কায় তাহার মধ্যে যে পরিবর্তন ঘটান হইয়াছে তাহা নাট্যকারের কৃতিত্বেরই নিদর্শন এই ধরনের চরিত্রে—সংস্কারের পরিশোধন ও উর্দ্ধায়নের রূপ খুবই দুর্লভ। বিল্বমঙ্গল-চরিত্রে পাওয়া যায়—কামের পরিশোধন বা উর্দ্ধায়ন আর ভিক্ষুকে দেখান হইয়াছে চৌর-বৃত্তির মত একটা নিকৃষ্ট বৃত্তির উর্দ্ধায়ন। এই সকল চরিত্রে সংস্কারের ও বৈরাগ্যের যে সূক্ষ্ম ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দেখান হইয়াছে তাহাতে নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় ফুটিয়া উঠিয়াছে।]

(ঘ) সাধকের পরিচয় সাধক নিজ মুখেই কিছুটা দিয়াছে—"আমি নবাব সরকারে চাকরী কত্তেম, আমার নাম রামকুমার সান্যাল।...আমার নামে তহবিল তছরূপের দাবী এল; এতেই সংসারের প্রতি বৈরাগ্য জন্মে, কাশীধামে গমন কল্লেম তথায় ভাগ্যক্রমে আমার গুরুর দর্শন পেলাম ..একজন সিদ্ধব্যক্তি—তিন চার বৎসর পুত্রের মতন আমায় উপদেশ দেন।" কিন্তু আসল পরিচয় এই যে সাধক শুধু চোর নহে একনম্বরের ভণ্ড এবং পুরোদস্তুর-কামুক। এই

গোপন কামাচারের উদ্দেশ্যেই সে থাকমণির কাছে যায়—সহজ ভজনের বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়া থাককে ভোগ করিতে চেষ্টা করে। 'এক কথায়'—বুঝাইয়া বলে—"আমি তোমায় দেখব যেন রাধা, "আর তুমি আমায় দেখবে যেন কৃষ্ণ; তারপর যা খুশি তা কর, আর পাপ নেই।" কিন্তু থাককে রাধা' করিতে যত উৎসাহ, থাকর ভার লইবার ব্যাপারে তত উদাসীনতা ব্রহ্মচারিতার ভাণ। তবে থাকর বিষয়তৃষ্ণাকে—"হরিতাল ভস্ম"—তাঁবাকে সোনা করা প্রভৃতি—দমবাজি দিয়া ধোঁকা দিতে চেষ্টা করে কিন্তু থাক—এ বিষয়ে দুর্ভেদ্য বলিয়া পরাজয়ই ঘটে। অবশ্য সাধকও নাছোড়বান্দা। থাক যত টাকার কথা বলে, সাধক তত—বিশুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেমের কথায় মাতিয়া উঠে। থাক যখন বলে—'যা রোজগার করবি, আমায় দিবি?' সাধক আবেগভরে প্রাণ দিতে চাহে—রোজগারের নাম-গন্ধ মুখে আনে না।

ইহার পর সাধক, চিন্তামণির উদাসীনতার সুযোগে, আরো জঘন্য ও নিষ্ঠুর পাপচারী মূর্তি ধারণ করে—চিন্তামণিকে বিষ খাওয়াইয়া মারিতে চায়—বিষের মোড়াও বাহির করে। আর এত বড় সিদ্ধ শয়তান সে যে 'বিষ' রাখার কারণ দেখাইবার সুযোগে ভালবাসার চমৎকার ভণ্ডামি করে—কার্যোদ্ধারও করে; থাককে বলে "বিষ আমার থাকে—আমি মরবার জন্য সর্বদা প্রস্তুত; কেবল তোমার প্রেমে পড়ে পারিনি। তুমি যদি আমার না হও, আমি প্রাণত্যাগ করব।"

প্রাণত্যাগ সাধককে করিতেই হয়—এবং বিষপান করিয়াই করিতে হয়। চিন্তামণির সিন্দুক ভাঙিতে গিয়া সাধক ধরা পড়ে। "চিন্তামণির ভিক্ষাপুত্র" বলিয়া 'মালেকান স্বত্ব' প্রতিষ্ঠার চেষ্টা সফল হয় না; বিষপান করিয়া সে শাস্তির হাত এড়ায়। বিষয়-তৃষ্ণার পরিণাম যাহা হইবার তাহাই হয়।

(ঙ) সাধকের সহযোগী থাক'—অবশ্য বিষয়-ভোগ ব্যাপারে। থাক প্রেমের স্পর্শ জীবনে কখনও পায় নাই।—'মনের মানুষ' বলিতে যাহা বুঝায় তাহা সে জীবনে পায় নাই। তাহার গভীর আক্ষেপ—মনের মানুষ

পেলুম না। তবে সে সার বুঝ বুঝিয়াছে—"পেটের জ্বালা বড় জ্বালা।" রাধা-প্রেম শিখিতে সে গররাজি নয়।—ধর্মজ্ঞানও তাহার আছে— যেমন হরিনাম না করিয়া জল খায় না তেমনি যে মানুষ অনুগ্রহ করিয়া তাহার কাছে আসে তাঁহাকে স্বামীর মতন দেখে—আর পরপুরুষের মুখ দেখে না।—প্রমাণ—"একাদিক্রমে বাইশ বছর একজনের কাছে ছিলুম।" কিন্তু ফাঁকা কথায় পেট ভরে না এ জ্ঞান তাহার টনটনে। সাধক যত বিশুদ্ধ "কৃষ্ণপ্রেম" শিখাইতে ব্যগ্র, সে তত নিরাপত্তার ও পাওনার হিসাবে ব্যস্ত। সাধককে সে বলে—"আপনি যদি আমার ভার নেন তো:—আমার একটা পেট আর একখানা কাপড়,"... চিন্তামণিকে সান্ত্বনা দিতেও সে নিজ স্বরূপকে প্রকাশ করে, বলে—"এ সংসারে কে কার—মা? তবে, পেট বড় বালাই, তাই লোকালয়ে থাকতে হয় আশীর মুখ দেখা—তুমি ভেংচাও, ভেংচাবে; হাস, হাসবে। পোড়া পেটের জন্যে পরকে আপনার করে রাখতে হয়।" তাহার দৃষ্টি ভোগের দিকে। সাধকের কাছে তাহার দাবি—'যা' রোজগার করবি, আমায় দিবি।

এই বিষয়ভোগ বাসনার প্রেরণাতেই সে চিন্তামণির ধনরত্ন হাত করিতে চাহে—এবং সাধককে উপায় হিসাবে ব্যবহার করে। ফলও পায় হাতে-হাতে। বিষয়-বিষই তাহার জীবনকে শেষ করিয়া দেয়। * [নিম্নতমপ্রকৃতির গণ্ডীর মধ্যে থাক'র জীবন আবদ্ধ। তাহার আচরণ ও চিন্তা নিখুঁতভাবে স্বভাবানুগ।]

এইবার আমরা চরিত্র-সৃষ্টির প্রতিভা সম্বন্ধে সাধারণভাবে এইরূপ মন্তব্য করিতে পারি—নাট্যকার গিরিশচন্দ্র বিকাশশীল ও প্রকাশশীল চরিত্রসৃষ্টিতে যে ক্ষমতা দেখাইয়াছেন তাহাকে শুধু প্রশংসনীয় বলিলেই যথেষ্ট বলা হয় না—তাহার যোগ্য বিশেষণ—'দুর্লভ'। বিল্বমঙ্গলের গভীর আধ্যাত্মিক আলোড়ন, ভিক্ষুকের সংস্কার ও সুবুদ্ধির দ্বন্দ্ব—সাধকের চিত্তাকর্ষক ভণ্ডামি,

থাকর বিষয়-পরায়ণতা যাহার তাহার কলম হইতে বাহির হইবে না—একথা সবিনয়েই বলা যায়। তবে এ কথাও সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখা দরকার যে চরিত্রের পরিকল্পনা যত বড় হইয়াছে, চরিত্রের রূপায়ণ তত পরিপাটি হইতে পারে নাই। এই ত্রুটিটুকু না থাকিলে গিরিশচন্দ্রের চরিত্র-সৃষ্টির প্রতিভা সম্বন্ধে—'ওঁ মধু ওঁ মধু' বলিয়া শেষ করা যাইত।

ভাবোৎকর্ষ বা ভাব-মূল্য

শৈল্পিক মূল্য—(aesthetic value) কথাটি আমরা হামেশাই ব্যবহার করিয়া থাকি এবং সাধারণতঃ 'রস-মূল্যের' বিশেষ বা সংকীর্ণ অর্থেই তাহা প্রয়োগ করি। এ কথাটি অনেক সময়ই আমরা ভুলিয়া যাই যে রস অর্থাৎ aesthetic pleasure, এক প্রকার বিমিশ্র অনুভব—বলা যায়, নানা অনুভবের সমবায়ে সৃষ্ট একটা আনন্দ-পরিণাম মানসিক অবস্থা 'রসো বৈ সঃ' ব্রহ্ম আনন্দ যেমন..বিশ্বের দৃশ্য-গন্ধ গানের মাঝারেই অনুস্যূত, তেমনি রস বা শৈল্পিক আনন্দ ও সৃষ্টির রূপ-রস-গান-ভাব-সবকিছুতেই পরিব্যাপ্ত শৈল্পিক আনন্দ নির্বিকল্প সামগ্রিক আস্বাদনের আনন্দ। এই সামগ্রিক আস্বাদনে 'ভাবের'ও একটা অংশ আছে। কারণ যে বাসনার পরিপূরণে 'আনন্দ-বোধ'—সেই বাসনা বহুমুখী এবং ভাবের খাতে সেই বাসনার একটি ধারা প্রবাহিত। এই কারণেই যেখানে বড় বড় ভাবের অভি-ব্যক্তি আছে সেখানে আমাদের ভাব-বাসনা-পরিপূরণ-জনিত একটি আনন্দও আছে। তাই সৃষ্টির মূল্য-বিচারে—ভাব-মূল্য বিচারের একটা বড় মর্যাদা রহিয়াছে। ভাব-মহিমা যাহার নাই সে সৃষ্টি, রস-সংবেদনার দিক দিয়া গভীর হইতে পারে না—এবং বিশিষ্টদের আনন্দ-বোধকেও সম্পূর্ণভাবে জাগাইতে পারে না। এই ভাব-মূল্যের উপরেই প্রধানতঃ সৃষ্টির নৈতিক মূল্য নির্ভর করে।

বিল্বমঙ্গলঠাকুর নাটকের ভাব-মূল্য বিচার করিতে গিয়া দেখা যায়—ভাবের দিক দিয়া নাটকখানি খুবই সমৃদ্ধ—এককথায় নাটকখানির ভাব গৌরব লক্ষণীয়।

প্রথমতঃ—প্রধানতও বটে,—নাটকখানিতে বৈষ্ণব—ভাব-সাধনার তত্ত্বটিকে চিত্তাকর্ষক রসরূপ দেওয়া হইয়াছে। নাট্যকার যে তত্ত্বটির আবিষ্কর্তা নহেন

তাহা বলাই বাহুল্য, কিন্তু যাহার জন্য নাট্যকার কৃতিত্ব অবশ্যই দাবী করিতে পারেন, তাহা এই যে তিনিই প্রথম তত্ত্বটিকে রসরূপ দান করিয়াছেন। সত্যের রসরূপ দেওয়া কবির কাজ। নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের প্রতিভা উল্লিখিত তত্ত্বটিকে প্রথম রসরূপ দিয়া প্রবর্তকের কৃতিত্ব দাবী করিতে পারে। বিল্বমঙ্গল, চিন্তামণি, ভিক্ষুক, বণিক-বণিকপত্নী সকলেই ভাব-সাধক—কাহারও ভাব প্রেম, কাহারও ভক্তি, কাহারও সখ্য, কাহারও ভাব বাৎসল্য। দ্বিতীয়তঃ, ভাব-সাধনতত্ত্বেরই জটিল একটি রূপ—প্রবৃত্তির পরিশোধন ও ঊর্দ্ধায়ন (sublimation) কৃষ্ণে কামার্পণ, অতি দক্ষতার সহিত নাট্যকার এই নাটকে উপস্থাপিত করিয়াছেন।

বিল্বমঙ্গলের জীবনের মাধ্যমে দেখাইয়াছেন—কাম যেখানে পার্থিব বিষয়ে প্রবণায়িত সেখানে উহা কাম বা মোহ মাত্র, যেখানে উহা কৃষ্ণের প্রতি প্রসক্ত সেখানেই তাহা প্রেম, মুক্তির উপায়। প্রবৃত্তিকে কৃষ্ণমুখী করিয়া তুলিতে পারিলেই প্রবৃত্তি নিবৃত্তির মর্য্যাদা লাভ করে, মোহ মুক্তিরূপে ফলিয়া উঠে। যে কোন ঐকান্তিক প্রবৃত্তিকে এইভাবে সহজিয়া পথে আধ্যাত্মিক মুক্তির উপায় করা যায়, আধ্যাত্মিক সাধন ভূমিতে উন্নত করা যায়—এই তত্ত্বটি এই নাটকের কেন্দ্রীয় ভাব বস্তু। এই তত্ত্বের রসময় উপস্থাপনা যে বাংলা নাট্যসাহিত্যের এক অভিনব সম্পদ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কবি ওয়ার্ডস্বার্থের ভাষায় বলা যায় ইহা দ্বারা আমাদের "widening of the sphere of human sensibility"—ঘটিয়াছে। এই তত্ত্বটি ভারতের সম্পদ হইলেও আধ্যাত্মিক তত্ত্ব হিসাবে ইহার মূল্য বা মর্যাদা আছে এবং সেই কারণেই ইহা বিশ্বমানবের আধ্যাত্মিক উপকরণেরও অঙ্গ। নাট্যকার গিরিশচন্দ্র এই তত্ত্বটিকে নাট্যরূপ দিয়া বাস্তবিকই কাব্য জগতের পরিধিকে নূতন ভাব-বস্তুর দিকে অগ্রসর করিয়া লইয়া গিয়াছেন, ইহা—"an advance made by the the Poet".

তৃতীয়তঃ এই তত্ত্বের ঊর্দ্ধে আরো একটি সার্বজনীন ভাব আছে। এই

ভাবটিকে সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে—জীবাত্মার আকুতি। আত্মা মায়াবরণে আচ্ছন্ন থাকিলেও তাহাতে পরমাত্মার জন্য এক সহজ ও নিরুদ্দেশ আকুতি উচ্ছ্বসিত হইয়া থাকে। এই স্বভাব বা সহজ প্রবণতার বশেই সে প্রাণ-মন সমর্পণ করিতে ব্যগ্র হয়, কিন্তু মায়ার আবেশে নিত্যানিত্য বিবেক জাগ্রত থাকে না বলিয়া, কাহার কাছে আত্মসমর্পণ করিবে তাহা সে জানে না। তাই, নশ্বর সংসারের নশ্বর ছায়াকেই প্রাণ মন সঁপিয়া শান্তি পাইবার চেষ্টা করে—'যাহা চায় তাহা ভুল করে' চায়। বুঝে না—ছোট ভালবাসার মধ্যে গভীর প্রেমতৃষ্ণা মিটিতে পারে না, মেটেও না। শেষ পর্যন্ত বিল্বমঙ্গলের মতই আত্মা হাহাকার করে—সেই "প্রেমের পাথার'কে খোঁজে। এই তত্ত্বটি আধ্যাত্মবাদী দর্শনের অন্যতম মূল সূত্র। এই তত্ত্ব-মতে—মানুষের মধ্যে যে সৌন্দর্য-পিপাসা তাহা শেষ পর্যন্ত পরম-সুন্দরকে পাওয়ারই বাসনা—পরমাত্মার প্রতি জীবাত্মার নিগূঢ় আকর্ষণেরই অন্যতম অভিব্যক্তি। মানব যখন পার্থিব বিষয়ের জন্য, সুন্দর পদার্থের জন্য আকুতি প্রকাশ করে, তখন সে অজ্ঞাতসারে অখণ্ড সুন্দরকে লাভ করিবার জন্যই প্রবণান্বিত হয়। বিল্বমঙ্গল চরিত্রে এই ভাবটি অতি সুন্দরভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে। ব্যক্তি-লক্ষ্য প্রেমের মূলে যে নৈর্ব্যক্তিক পরা প্রেম ও সৌন্দর্যের পিপাসাই ক্রিয়াশীল তাহা স্পষ্টভাবেই রূপায়িত হইয়াছে; (২য় অঙ্ক ২য় গর্ভাঙ্ক দ্রষ্টব্য)। প্রাচীরে বিলম্বিত মৃত সর্প—বিল্বমঙ্গল অপলক দৃষ্টিতে চিন্তামণির মুখের দিকে চাহিয়া আছে—কী যেন এক রহস্য খুঁজিয়া দিশাহারা। তাহার মুখে ধ্রুব বাণীর মত শোনা যাইতেছে—"তুমি বড় সুন্দর।" এক হিসাবে সে আত্মহারা বটে, কিন্তু অন্য হিসাবে সে আত্মমগ্ন—আত্মার রহস্য খুঁজিয়া আত্মার গহন লোকে উপনীত। তাইতো প্রশ্ন—অবশ্যই তুমি সুন্দর, নইলে এতাদিন কার পুজা করিচি? এই প্রশ্নেই প্রমাণ—বিল্বমঙ্গলের প্রেম-তৃষ্ণা খণ্ড ব্যক্তির দেহ সীমাকে অতিক্রম করিয়া অখণ্ড সুন্দর—"প্রেমের পাথার"-এর দিকে নিরুদ্দেশ যাত্রা করিয়াছে। এই প্রশ্নেরই উত্তর—"অবশ্যই তুমি পরম সুন্দর। দেখা দাও কথা কও

আমার প্রাণ জুড়াও।" গুরু সোমগিরির ভাষ্যেও এই কথাটি সমর্থিত—

"—স্বার্থশূন্য প্রেমলুব্ধ মন।
'প্রেমের কারণ'
করেছিল বেশ্যা-উপাসনা
বিফল কামনা।
ক্ষুদ্রাধারে প্রেম কোথা পাবে স্থান ?
প্রেমেমত্ত প্রেমিক পুরুষ
প্রেমময় আশে
সংসার দলেছে পায়॥"

—প্রেমময় পরমাত্মার জন্য জ বাত্মায় পরানুরক্তির সহজ প্রবণতা রহিয়াছে এই তত্ত্বটিই এখানে আভাসিত হইয়াছে।

চতুর্থতঃ—পাগলিনী-চরিত্রের মাধ্যমে, পরাশক্তির বহুরূপী এককত্বের তত্ত্বটি সমস্ত সাধন ভজনের মহাসমন্বয়, সুন্দরভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে। রামকৃষ্ণের যত মত তত পথ, সকল প্রকার পরাতত্ত্ব ও আধ্যাত্মিক সাধনাকে শ্রদ্ধার সহিত স্বীকার করিবার অনুপ্রেরনা—নাটকখানির অন্যতম উল্লেখযোগ্য ভাব-সম্পদ। এই কারণে আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণার ক্ষেত্রে যে নাটকখানি প্রগতিশীল বলিয়াই সম্মানিত হইবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

চিন্তামণির পরিচয় দেওয়ার প্রসঙ্গে পাগলিনী বলে—

চিন্তামণি—কভু এলোকেশী
উলঙ্গিনী ধনী
বরাভয়করা ভক্তমনোহরা
শবোপরে নাচে বামা।
কভু ধরে বাঁশী,
ব্রজবাসী বিভোর সে তানে!
কভু রজত ভূধর

দিগম্বর জটাজুট শিরে
নৃত্য করে বব বম্ বলি গালে।
কভু রাস-রসময়ী প্রেমের প্রতিমা
সে রূপের দিতে নারে সীমা
প্রেমে ঢলে বনমালা গলে
কাঁদে বামা
কোথা বনমালী বলে।
একা সাজে পুরুষ-প্রকৃত,
বিপরীত রতি……
কেহ শব, কেহ বা চঞ্চলা।
কভু একাকার
নাহি আর কালের গমন
নাহি হিল্লোল কল্লোল
স্থির স্থির সমুদয় …

এই উক্তির মধ্যে নিরাকার দেশকালাতীত "একং সৎ"-এর এবং সেই সত্তারই সাকার এবং বহুরূপী লীলার চমৎকার বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে।

পঞ্চমতঃ—গুরু সোমগিরির মুখে—অহেতুকী ভক্তিতত্ত্ব, গুরুতত্ত্ব, বৈরাগ্য তত্ত্ব, সাধনার বিকৃতি প্রভৃতির যে ব্যাখ্যা ও বিবরণ পাওয়া যায় তাহারাও নাটকের ভাব-মূল্য বৃদ্ধিতে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। 'অহেতুকী ভক্তি' সম্বন্ধে সোমগিরি যথার্থই বলিয়াছেন—

অহেতুকী ভক্তির বিকাশ
অতীব বিরল ভবে।
* * *
কৃষ্ণে চায় কিবা হেতু
কিছু নাহি জানে

ব্রজের এ প্রেম
তুলনা নাহিক আর তার ॥

গুরুতত্ত্বের ব্যাখ্যাও কম মূল্যবান নহে—

এ সংসার সন্দেহ আগার
বিভু নহে ইন্দ্রিয়গোচর।
ঈশ্বর লইয়া
তর্ক যুক্তি করে অনুমান
যত করে স্থির
সন্দেহ তিমির ততই আচ্ছন্ন করে ।
ঈশলুব্ধ প্রাণ
ব্যাকুলিত জানিতে সন্ধান
কি উপায়ে পুরাইবে মন-আশ
শ্রীনিবাস তাঁর প্রতি সদয় হইয়ে
দেন মিলাইয়ে বাঞ্ছিত রতন তার
অকস্মাৎ কোথা হ'তে কেবা আসে
তাঁর ভাবে হয় হৃদে আশার সঞ্চার
বিশ্বাস বিকাশে প্রাণে
মানে মনে জ্ঞানে
ঈশ্বরের বাক্য বলি
সে হয় নিমিত্ত গুরু তার
যার কথা করিয়ে প্রত্যয়
জগদ্‌গুরু করে লাভ ।

তারপর—কপট ও বিকৃত বৈরাগ্যের পরিচয়টুকুও লক্ষণীয়—

(ক) কেহ কাঞ্চনের তরে
জটা ধরে শিরে (কাঞ্চন-কামনা

(খ) কাহারও বা সাধুর আকার
নারী সহ করিতে বিহার,
সন্ন্যাসীর ভাণ
ভুলাইতে বামাগণে। (কামিনী কামনা)

(গ) কেহ মান করিতে সঞ্চয়
দীর্ঘ জটা বয় (মান-কামনা)

(ঘ কেহ অষ্টসিদ্ধি করে আশ। (অষ্টসিদ্ধি)

উপসংহারে এই কথাটি প্রথমেই মনে করা যাইতে পারে যে বিল্বমঙ্গলঠাকুর নাটকখানি যে ভাব-রসের নাটক সেই রসের আস্বাদন—চাহিদা এখন মন্দা বটে, কিন্তু 'কাহিনী সংগঠন এবং রসের দ্বারা রস কথাটি—এখানে সাধারণ 'চিত্তাকর্ষত্ব' অর্থে নাটকখানি আজও দর্শকচিত্তে আনন্দ দিয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ কাহিনী-পরিকল্পনায় চরিত্র-পরিকল্পনায় ও ভাব ধারণায় নাট্যকার প্রশংসনীয় প্রতিভা দেখাইয়াছেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই বটে, কিন্তু এ কথাও না বলিলে চলিবে না যে নাট্যকার প্রত্যেক পরিস্থিতির সম্ভাব্য প্রকাশকে যে পরাকাষ্ঠা রূপ দিতে সক্ষম হইয়াছেন তাহা নহে এবং বিল্বমঙ্গলকে ভাবে ও ভাবনায় (feeling ও thought) তিনি যে স্তরে লইয়া গিয়াছেন কল্পনায় (imagination) সেইরূপ সমৃদ্ধ করিতে পারেন নাই—অর্থাৎ বিল্বমঙ্গলের অনুভূতির গভীরতা আছে, ভাবের বিস্তারও আছে কিন্তু 'কল্পনা-শক্তি'র স্ফূর্তি তেমন নাই। তৃতীয়তঃ চরিত্রে পরিকল্পনা প্রশংসনীয় হইয়াছে বটে, কিন্তু সর্বক্ষেত্রে চরিত্রে বাস্তবিকতার 'ভর' সমান হয় নাই, কোন কোন ক্ষেত্রে—বিশেষতঃ নাটকের শেষের দিকে—চরিত্রগুলি সাংকেতিককল্প হইয়া উঠিয়াছে। অবশ্য কাহিনীর মধ্যেই সেই স্বাভাবিক প্রবণতা আছে বলিয়া নাট্যকারকে সর্বাংশে যে দায়ী করা চলে না তাহাও মনে রাখা দরকার।

চতুর্থতঃ বিল্বমঙ্গল ঠাকুর নাটকের সাধারণ বিচার শৈল্পিক বিচার বটে কিন্তু বিল্বমঙ্গলঠাকুর নাটকের ঐতিহাসিক বিচার করিবার সময় যে যুগ

বিল্বমঙ্গলঠাকুর রচিত, যে বিষয়বস্তু অবলম্বনে রচিত এবং যে উদ্দেশ্যে রচিত—সেই যুগের বিষয়বস্তুর এবং উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতেই বিচার করিতে হইবে। বিল্বমঙ্গল-সমালোচনায় মার্কসীয় সমালোচনা প্রয়োগ করিবার লোভ যাঁহারা সংবরণ করিতে পারিবেন না, তাহাদিগের কাছে এই কথাটি বলিয়া রাখা দরকার যে—বিল্বমঙ্গলঠাকুর নাটকের রচনা-প্রেরণায় এবং অভিনয়ের মূলে বিশেষ সামাজিক সংস্কার প্রভাব আছে এবং সেই বিশেষ সামাজিক সংস্কারটি রাষ্ট্রনৈতিক ও আর্থনৈতিক সংস্কার সমবায়েও গঠিত, কিন্তু বিল্বমঙ্গলঠাকুর-নাটকের সহিত আর্থনৈতিক ব্যবস্থার কোন প্রত্যক্ষ বা অব্যবহিত যোগ নাই—অর্থাৎ নাটকে উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেণী-দ্বন্দ্বের রূপ প্রতিফলিত করার চেষ্টা করা হয় নাই। ইহাতে বারবণিতার জীবন দেখান হইয়াছে বা পতিতকেও মুক্তির অধিকারী করা হইয়াছে বলিয়া এ কথা বলা উচিত হইবে না—থাকর 'পেটের জ্বালা বড় জ্বালা'র মধ্যে শোষিত জনের ক্রন্দনকে প্রতিফলিত করা হইয়াছে বা পতিতকে মুক্তির অধিকার দেওয়ার মধ্যে—গণতন্ত্রের কামনাকেই তির্যক-ভাবে ব্যক্ত করা হইয়াছে। বরং এই কথাই বলা সমীচীন যে নাটকখানির বিষয়বস্তু ভারতের জনগণের কাছে আনন্দের সামগ্রী, ভারতীয় আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির স্পর্শনীয় নিদর্শন—সেই কারণেই ভারতীয়-সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের যুগে, পরোক্ষভাবে জাতীয় আত্ম-মর্যাদাবোধ প্রতিষ্ঠার অন্যতম উপায় হিসাবেই এবং প্রত্যক্ষভাবে ভারতীয় আধ্যাত্মিক সাধনার উৎকর্ষ দেখাইবার জন্য বিল্ব-মঙ্গল কাহিনী গৃহীত হইয়াছিল। এই নাটকখানি যে উদ্দেশ্যে লিখিত সেই উদ্দেশ্য যদি সে সিদ্ধ করিয়া থাকে তাহা হইলেই ইহাকে সার্থক সৃষ্টি হিসাবে গণ্য করিতে হইবে। নাটকখানি বিল্বমঙ্গলঠাকুর কাহিনীর সার্থক নাট্যরূপ হইয়াছে—কিনা এই বিচারই এক্ষেত্রে যথার্থ বিচার।

'ট্র্যাজেডি করুণ' নাটকের স্বরূপ

'নাটকের উৎপত্তি' প্রবন্ধে বিশেষজ্ঞদের অভিমত সংগ্রহের প্রসঙ্গে বলিয়াছি যে, ট্র্যাজেডি 'বৎসর দেব', 'শস্য দেব' ও প্রাণ দেব'-এর প্রতীক ডায়োনিসাসের মৃত্যু-শোককে কেন্দ্র করিয়া যে-সকল নৃত্য-গীতাদি অনুষ্ঠিত হইত তাহারই এক বিশেষ পরিণতি। শোকই যে ট্র্যাজেডির মূল অবলম্বন বা উপস্থাপ্য বিষয় তাহার উৎপত্তির ইতিহাসই সেই সাক্ষ্য বহন করিতেছে। আমরা এমন সিদ্ধান্ত আপাততঃ করিতে পারি যে শোক বা শোচনাই ট্র্যাজেডি নাটকের স্থায়ীভাব এবং সেই স্থায়ীভাবকে রসময় অর্থাৎ রসে পরিণত করাই সেই নাটকের উদ্দেশ্য। ট্র্যাজেডি আসলে করুণরসের নাটক, তবে যে উপায়ে রস সৃষ্টি করা হয় সেই উপায়ের বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকার ফলে, উহা বিশিষ্ট বা স্বতন্ত্র মর্যাদা লাভ করিয়াছে।

নাট্যশাস্ত্র প্রণেতা ভরত করুণকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন: তিনি বলেন করুণ (রস) তিন কারণে উপজাত হইতে পারে—এক ধর্মোপঘাত, দুই অপচয়, তিন শোক; অর্থাৎ করুণ তিন জাতীয়—(১) ধর্মোপঘাতজ, (২) অপচয়োদ্ভব, (৩) শোককৃত করুণ। ট্র্যাজেডি-করুণের স্বরূপ আলোচনা করিতে যাইয়া আমরা দেখিব, উহার মধ্যে তিন প্রকারেরই সংমিশ্রণ ঘটিয়া থাকে বা ঘটিতে পারে এবং 'ভয়ঙ্কর ঘটনা'র ফলেই উহা সৃষ্ট হয়।

অ্যারিষ্টটলের মতে ট্র্যাজেডি

গ্রীক নৈয়ায়িক-মনীষার বিস্ময়কর অভিব্যক্তি যাঁহার মধ্যে ঘটিয়াছিল সেই সার্বভৌম পণ্ডিত অ্যারিষ্টটলকেই (৩৮৪ খৃঃ পূঃ—৩২২ খৃঃ পূঃ) সাহিত্যের তথা ট্র্যাজেডির প্রথম সূত্রকারের মর্যাদা দেওয়া হইয়া থাকে। ট্র্যাজেডির স্বরূপ আলোচনায় তাঁহার "পোয়েটিক্স" সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থে আগমের

তুল্য স্থান অধিকার করিয়া আছে। ইনগ্রাম বাই-ওয়াটার পোয়েটিক্‌সের যে অনুবাদ করিয়াছেন সেই অনুবাদ "Aristotle'on the art of Poetry" অবলম্বনে আমি তাঁহার স্থাপনা করিতেছি।

এই গ্রন্থে ট্র্যাজেডির লক্ষণ এইরূপ দেওয়া হইয়াছে : "A tragedy, then, is the imitation of an action that is serious and also, as having magnitude, complete in itself, in language with pleasurable accessories, each kind brought in separately in the parts of the work in a dramatic not in a narrative form, with incidents arousing pity and fear wherewith to accomplish its catharsis of such emotions"

এই লক্ষণটি বিশ্লেষণ করিয়া নিম্নলিখিত উপাদান বা তথ্য পাওয়া যাইতেছে :—

(১) ট্র্যাজেডি "serious action" এর অর্থাৎ যাহা অনুভূতিকে তীব্রভাবে নাড়া দেয় এমন ঘটনার অনুকরণ

(২) ঐ "serious action"-কে complete in itself" অর্থাৎ "সমগ্র বা "একক" হইয়া উঠিতে হইবে।

(৩) যে-ভাষায় লেখা হইবে তাহাতে pleasurable accessories রাখিতে হইবে অর্থাৎ ছন্দোবদ্ধ রচনা ও গান থাকিবে।

(৪) তাহা লিখিতে হইবে নাটকের রীতিতে বা আকারে (অর্থাৎ উক্তি-প্রত্যুক্তি-বন্ধে), কাহিনীর আকারে নহে।

(৫) এমন ঘটনা বা অবস্থা সংযোজনায় অনুকরণ-কার্য করিতে হইবে যাহা (ক) করুণা ও ভয় (pity and fear) সঞ্চারিত বা উদ্রিক্ত করিতে পারে, তথা (খ) উক্ত আবেগের বিমোক্ষণ (catharsis) ঘটাইতে সমর্থ হয়।

অ্যারিষ্টটলের সূত্রের ব্যাখ্যা

প্রথমটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, এ্যাক্‌শান (action) বলিতে কাহিনী (fable ফেবল্) বা বৃত্ত (plot প্লট্) ধরিতে হইবে। এ্যাক্‌শান্ অর্থাৎ ঘটনা নির্বিষয় হইতে পারে না, আপনা আপনি ঘটিতে পারে না, ব্যক্তিই ঘটনার কর্তা। ব্যক্তির কর্ম ও ভাবনায়ই উক্ত ব্যক্তির চরিত্র ব্যক্ত হয়; সুতরাং action-এর মধ্যে কাহিনী বা বৃত্ত এবং চরিত্র উভয়ই অন্তর্ভুক্ত। অ্যারিষ্টটল বলেন, মানুষের সুখদুঃখাদি ঘটনারূপেই আসে; অতএব নাটকে চরিত্র সৃষ্টির উদ্দেশ্য সঠিক হিসাবে ঘটনার মুখ্য বা স্থান নহে, ঘটনার জন্যই চরিত্র সৃষ্টি। (In a play accordingly they do not act in order to portray the characters, they include the character for the sake of the action.) ট্র্যাজেডির (নাটকের) মুখ্য ব্যাপার মানুষের অনুকরণ নহে, ঘটনার তথা জীবনের সুখদুঃখের অনুকরণ, ঘটনা না থাকলে ট্র্যাজেডি হইতেই পারে না, কিন্তু চরিত্র-সৃষ্টি খুব না থাকিলেও ট্র্যাজেডি হইতে পারে।

তবে, যে-কোনও ঘটনার অনুকরণ ট্র্যাজেডি পদবাচ্য হইবে না। ট্র্যাজেডির ঘটনাকে serious হইতে হইবে এবং serious action তাহাই যাহা ভয় ও করুণা উদ্রিক্ত করিতে সমর্থ। করুণ ঘটনার নিদর্শন দিতে অ্যারিষ্টটল লিখিয়াছেন—Whenever the tragic deed, however is done within the family—when murder or the like is done within the family or meditated by brother on brother, by son on father, by mother on son or son on mother—these are the situations the poet should seek after—অর্থাৎ একই পরিবারের মধ্যে যদি এইরূপ ঘটনা ঘটে যে ভাই ভাইকে হত্যা করে বা হত্যার মতই কিছু করে বা করিবার ষড়যন্ত্র করে, পুত্র পিতাকে বা মাকে এবং মাতা বা পিতা পুত্রকে হত্যা

করিতে বা তদনুরূপ (সাংঘাতিক) কিছু করিতে চাহে বা করে, সেই সব ঘটনাই ট্র্যাজেডির সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী উপাদান এবং ঐ সকল ঘটনাই নাট্যকারের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

উচ্চাঙ্গের ট্র্যাজেডি সৃষ্টি করিতে হইলে, তিনি বলেন, তিন প্রকার কাহিনী (প্লট) বর্জন করিতে হইবে—যথা (১) সাধু লোককে কখনও সুখ হইতে দুঃখের মধ্যে ফেলা চলিবে না, (২) মন্দলোককে দুঃখাবস্থা হইতে সুখাবস্থায় অধিষ্ঠিত করা চলিবে না, (৩) অতি মন্দলোককে সুখ হইতে দুঃখের মধ্যে ফেলা চলিবে না, কারণ উহা কাহারও মনে করুণা জাগ্রত করিবার পক্ষে সহায়ক হয় না।

নায়ক সম্বন্ধে অ্যারিষ্টটলের নির্দেশ এই এমন লোককেই নায়ক করিতে হইবে যিনি অতি ধার্মিক বা অতি ন্যায়নিষ্ঠ নহেন; আর নায়কের ভাগ্যবিপর্যয় ঘটিবে নিজের কোনও পাপ বা হীনতার জন্য নহে—ভাগ্য বিপর্যয় ঘটিবে বিচার-বুদ্ধির ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য। (A man not pre-eminently virtuous and just, whose misfortune however is brought upon him not by vice and depravity but by some error of judgment).

কাহিনী (প্লট) সম্বন্ধে তাঁহার নির্দেশ এই, প্লট সরল বা জটিল হইতে পারে; সরল কাহিনী বা প্লট তাহাই যাহাতে "পেরিপেটি" (Peripety) এবং "ডিসকভারি" (Discovery) থাকে না; জটিল কাহিনী ইহারই বিপরীত অর্থাৎ তাহাতে "পেরিপেটি" এবং "ডিসকভারি" থাকে। পেরিপেটিকে বাংলা ভাষায় "বিপরীতি" বা "হিতে-বিপরীতি" বলা যাইতে পারে, কারণ ইহাতে এক উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত কথা ভিন্নরূপ ফল সৃষ্টি করিয়া কাহিনীর গতি পরিবর্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া থাকে। ঈডিপাস নাটকে দূত ঈডিপাসকে নিশ্চিন্ত এবং মায়ের সম্বন্ধে ভয় দূর করিতে আসিয়া এমন কথা বলিয়া বসিল যে ঈডিপাসের

জন্মবৃত্তান্তই প্রকাশিত হইয়া পড়িল। "ডিসকভারি"কে বাংলায় আবিষ্কার বলা যাইতে পারে। যে-আবিষ্কার পেরিপেটি অর্থাৎ বিপরীত পরিণতিমূলক তাহাই উৎকৃষ্ট। এই দুইটি বিষয়—পেরিপেটি এবং ডিসকভারি প্রথম শ্রেণীর ট্র্যাজেডির পক্ষে অপরিহার্য)।

দ্বিতীয় লক্ষণটি—"Complete in itself" সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য এই—কাহিনী আদি মধ্য অন্ত যুক্ত হইবে—নানা অংশের সুষমার অর্থাৎ সুষম যোজনার উপরেই অংশীর সুষমা নির্ভর করে। সুতরাং খুব ছোট এবং খুব বড় এই দুই অতিশয়কেই বর্জন করিতে হইবে। এই প্রসঙ্গেই—"unity of plot (কাহিনীর এককত্ব)" সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন এবং এই কথা বলিয়াছেন—এক ব্যক্তির জীবনের নানামুখী ঘটনার সমাবেশ করিলেও কাহিনীকে একক বলা যাইবে—এ ধারণা ভুল। কাহিনীর এককত্ব বলিতে একটি মাত্র বিষয় বা ঘটনারই অবলম্বন বুঝায় অর্থাৎ একই মানুষের ঘটনা হইলেও ঘটনা যদি একরূপ না হয়, কাহিনীর ঐক্য আছে এ কথা বলা চলিবে না।

তৃতীয় এবং চতুর্থটি সম্বন্ধে আলোচনা অনাবশ্যক আর পঞ্চমটি—"with incidents arousing pity and fear"—সম্বন্ধে অ্যারিস্টটলই যথেষ্ট আলোচনা করেন নাই এবং করেন নাই বলিয়াই পরবর্তীকালে ইহার যথার্থ অর্থ লইয়া কম মতভেদ দেখা দেয় নাই। 'ভয়ানক ও করুণের সমবায়ে রচিত ট্র্যাজেডি' এই লক্ষণটি অ্যারিস্টটলের আমল হইতে আজও পর্যন্ত স্থিরভাবে চলিয়া আসিতেছে। অবশ্য পরবর্তীকালে কাহিনীর ঐক্যের অর্থবিস্তারও যেমন ঘটিয়াছে, তেমনি fear ও pityর ধারণাতেই পরিবর্তন আসিয়াছে।

ষষ্ঠ অর্থাৎ catharsis (ক্যাথারসিস্) সম্বন্ধে অ্যারিস্টটলের বক্তব্য এই যে ভয়ানক ও করুণ ঘটনা শ্রোতার মধ্যে অনুরূপ আবেগ সৃষ্টি করিয়া শ্রোতার ভিতরকার প্রবৃত্তিদের পরিশোধন করে—বিমোক্ষণ

ঘটায়। এই শব্দটিকে লইয়াও পরবর্তীকালে কম জল্পনা হয় নাই। কেহ কেহ ইহারই মধ্যে 'ট্র্যাজেডি করুণ' আনন্দ দেয় কেন সেই 'কেন'কে দেখিয়াছেন, আবার কেহ কেহ ইহার নৈতিক উদ্দেশ্য এবং সামাজিক কল্যাণ-সাধনের শক্তি বড় করিয়া দেখিয়াছেন।

ট্র্যাজেডির বন্ধন বা বাঁধুনি সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, ইহাতে নিম্নলিখিত বিষয় বা সন্ধি পর পর থাকিবে :—

(১) Prologue (প্রোলোগ্)

(২) Parode (পেরোড্) = কোরাসের প্রথমটির নাম

(৩) Episode (এপিসোড্) = মূল কাহিনী

(৪) Stasimon (ষ্ট্যাসিমোন) = শেষ কোরাস

(৫) Exode (এক্সোড) = নিষ্ক্রমণ

ট্র্যাজেডিকে অ্যারিষ্টটল চারি শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন :—

১। প্রথম শ্রেণী—জটিল ট্র্যাজেডি (ইহাতে পেরিপেটি এবং ডিস্কভারির মাত্রা খুবই বেশী)।

(২) দ্বিতীয় শ্রেণী—দুঃখ ভোগজনিত ট্র্যাজেডি (Tragedy of Suffering)।

(৩) তৃতীয় শ্রেণী—চরিত্রজনিত ট্র্যাজেডি Tragedy of Character)।

(৪) চতুর্থ শ্রেণী - দৃশ্যজনিত ট্র্যাজেডি (Tragcdy of Spectacle)।

কবি বা নাট্যকার উল্লিখিত যে কোন একটি বা একাধিক উপাদানে ট্র্যাজেডি সৃষ্টি করিতে পারেন, এ বিষয়ে তাঁহার কোনও বাধ্যবাধকতা নাই। আসল কথা—ভয়ানক-মিশ্র করুণ রস সৃষ্টি করা। সেই লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য নাট্যকার—দৃশ্য, চরিত্র, দুঃখভোগ প্রভৃতি যে কোনও উপায় অবলম্বন করিতে পারেন।

দার্শনিক হেগেলের মতে ট্র্যাজেডি

হেগেল (১৭৭০-'৮৩১) জার্মানী-দেশীয় বিখ্যাত দার্শনিক। ট্র্যাজেডির আলোচনায় তাঁহার মত উল্লেখযোগ্য এবং বিশেষ করিয়া উল্লেখযোগ্য এই জন্য যে, বিশুদ্ধ ভাববাদের বা অধ্যাত্মবাদের দিক দিয়া আলোচনায় অগ্রসর হইলে হেগেলের কাছেই শেষ পর্যন্ত পৌঁছিতে হইবে। তাই তাঁহার মতবাদ জানিবার জন্য ভাববাদের স্বরূপ জানা একান্তই আবশ্যক।

হেগেলের দার্শনিক সিদ্ধান্ত অনেকটা আমাদের বেদান্ত দর্শনের সিদ্ধান্তের মত—পরম এক চৈতন্য-স্বরূপ সৃষ্টির মধ্য দিয়া রূপে রূপে আপনাকে আস্বাদন ও উপলব্ধ করিতেছেন। সেই দিক দিয়া বিশ্ব-বিধান ঐ চৈতন্যস্বরূপ পরা সত্তার (Absolute) আত্মপ্রকাশেরই রীতি। খণ্ডের বা অসীমের পারস্পরিক সম্বন্ধের মধ্যে নানারূপে উহা বর্তমান রহিয়াছে। মানুষের মধ্যে ইহারই নানা রূপ ও নানা নাম আছে, যেমন ভক্তি, প্রেম, স্নেহ, কর্তব্য, ন্যায় প্রভৃতি। মানুষের জীবন ইহাদেরই অভিব্যক্তি এবং ইহারাই মানুষের নৈতিক উপাদান (ethical substance)। অতএব মানুষের জীবনে যে দ্বন্দ্ব দেখা যায় সে দ্বন্দ্ব আত্মার সহিত আত্মারই দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বের দুঃখই মানুষের জীবনে বড় দুঃখ। এই দুঃখই—আত্মার সহিত আত্মার দ্বন্দ্বের ফলে যে দুঃখ জন্মে—যথার্থ ট্র্যাজেডির বিষয়।

এইরূপ দৃষ্টি-কোণ হইতে হেগেল ট্র্যাজেডির আলোচনা করিয়াছেন এবং দ্বন্দ্বকেই (conflict) ট্র্যাজেডির প্রধান লক্ষণ বলিয়াছেন। তাঁহার মতে দুঃখের চিত্র বা বর্ণনা থাকিলেই কোনও রচনা 'ট্র্যাজেডি' পদবাচ্য হইতে পারে না, ট্র্যাজেডি হইয়া উঠিবে তখনই যখন সেই দুঃখ নাটকীয় দ্বন্দ্বের পরিণতিরূপেই দেখা দেবে। দ্বন্দ্ব বলিতে ইহাই বুঝিতে হইবে যে দুইটি পক্ষ আছে, সেই দুই পক্ষের একটির সহিত অন্যটির বিরোধ বর্তমান, এই

বিরোধের বা সংঘর্ষেরই বিশেষ নাম 'দ্বন্দ্ব' (conflict)। ব্যাখ্যা করিলে বিষয়টা এইরূপ দাঁড়াইবে যে প্রত্যেক পক্ষেরই দাবী আছে; এবং প্রত্যেক পক্ষই উহার দাবী পূর্ণ করিতেও ইচ্ছুক। উক্ত দাবী, দাবী হিসাবে, অন্যায্য নহে, অর্থাৎ উহার স্বকীয় গৌরব আছে, এবং সেই কারণেই উভয়েই শক্তিমান। এইরূপ শক্তিমান দুই পক্ষের শক্তি-পরীক্ষার নাম দ্বন্দ্ব।

হেগেল বলেন, ট্র্যাজেডিতে যে দ্বন্দ্ব থাকিবে তাহা সত্যের সহিত মিথ্যার বা ভালর সহিত মন্দের দ্বন্দ্ব নহে, তাহা সত্যের সহিত সত্যেরই, ভালর সহিত ভালরই এবং ন্যায়ের সহিত ন্যায়েরই দ্বন্দ্ব। দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয় এই জন্য যে এক সত্য বা ন্যায় যে-দাবী করে অন্য সত্যের বা ন্যায়ের দাবীর সহিত উহার বিরোধ থাকে—একের দাবী পূর্ণ করিতে গেলে অন্যের দাবী অস্বীকৃত হইয়া পড়ে। আত্মা পরস্পর-বিরোধী অংশের দাবী মিটাইতে না পারিয়া দো-টানায় পড়িয়া বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। ট্র্যাজেডির দুঃখ আত্মার ঐ দ্বন্দ্বেরই দুঃখ। হেগেলের মতবাদ উপস্থিত করিতে বিখ্যাত সমালোচক ব্র্যাডলে লিখিয়াছেন—'The essentially tragic fact is the self-division and intestinal warfare of the ethical substance not so much the war of good with evil as the war of good with good. Two of these isolated powers face each other making incompatible demands.'

পরস্পর-বিরোধী শক্তির দ্বন্দ্বের ফলে আত্মার ভারসাম্য নষ্ট হইয়া যায়, আত্মা বিক্ষুব্ধ বেদনায় অস্থির হইয়া উঠে, কিন্তু আত্মা তাহার ভারসাম্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য অবিরাম চেষ্টা করিতে থাকে। বিপরীত দাবীর মধ্যে সমন্বয় ঘটাইয়াই করুক, অথবা কোন এক দাবীকে শেষ পর্যন্ত বর্জন করিয়াই করুক, আত্মা তাহার ভারসাম্য, তাহার সমগ্রতা উদ্ধার করিতে চেষ্টা করে। শেষ পর্যন্ত দ্বন্দ্বের মীমাংসা তাহাকে করিতেই হয়। এই

মীমাংসা যদি দুর্ঘটনা বা বিপত্তিতে (catastrophe) অর্থাৎ নায়ক নায়িকাদি প্রধান চরিত্রের মৃত্যুতে পর্যবসিত হয়, সে পর্যবসানের মধ্যেও, হেগেল বলেন, দ্বন্দ্ব-শান্তির বা সমাধানের (reconciliation) অস্তিত্ব থাকে। হেগেল বলিতে চাহেন, এই সমাধানবোধ (feeling of reconciliation) হইতেই সনাতন ন্যায়ের (Eternal Justice) উপলব্ধি এবং তাহা হইতেই ট্র্যাজেডি নাটক দর্শনের আনন্দ জন্মে। ভয় ও করুণাবোধের উপরে থাকে ঐ সমাধানবোধ। আর এই সমাধানবোধের মধ্যে "সনাতন ন্যায়" আত্ম-প্রকাশ করে বলিয়া ট্র্যাজেডির আনন্দ আসলে 'সনাতন ন্যায়'বোধেরই আনন্দ। Tragedy নামক গ্রন্থে হেগেলের মত উপস্থাপিত করিতে যাইয়া W. M. Dixon মহাশয় লিখিয়াছেন—Above mere fear and tragic sympathy they are Hegel's words, we have the feeling of reconciliation which tragedy provides in virtue of its vision of Eternal Justice paramount over all merely contracted aims and passions

ব্র্যাড্‌লের বক্তব্য

শেক্‌সপীয়রের বিখ্যাত সমালোচক ব্র্যাড্‌লে Hegel's theory of Tragedy-নামক প্রবন্ধে হেগেলের মত ও নিজের অভিমত প্রকাশ করিয়া ট্র্যাজেডির স্বরূপের উপর যথেষ্ট আলোকপাত করিয়াছেন। এখানে আমরা তাঁহার বক্তব্য উদ্ধৃত করিতেছি—

(ক) কেবলমাত্র দুঃখ-কষ্ট-ভোগ বা ভাগ্য-বিপর্যয় থাকিলেই তাহা ট্র্যাজেডি হইবে না, দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়া যে দুঃখ-দুর্বিপাক দেখা দিবে তাহাই ট্র্যাজেডির বিষয়।

(খ) ঘটনা যত করুণ বা ভয়ানকই হউক, যদি তাহা মনুষ্য-সৃষ্টি না হয় এবং কিয়ৎ পরিমাণে দুঃখভোগীর স্বভাবের দ্বারা সৃষ্ট না হয় তাহা হইলে

তাহা ট্র্যাজেডি-করুণ হইবে না। (No mere suffering or misfortune, no suffering that dose not spring in great part from human agency, and in some degree from the agency of the sufferer, is tragic, however pitiful or dreadful it may be.)

(গ) তবে ভাগ্য-বিপর্যয়ের ও তজ্জনিত ক্লেশের মূলে যদি মানুষের ঘটানো ঘটনার এবং আত্মকৃত ব্যাপারের প্রেরণা থাকে তাহা হইলে— ঐশ্বর্য হইতে দারিদ্র্যের মধ্যে পতন এবং আনুষঙ্গিক দুঃখভোগও ট্র্যাজেডি-করুণ হইয়া উঠিবে; অনেক ট্র্যাজেডিই এই ধরনের দুঃখ-ভোগের উপাদানে গঠিত। (হেগেল এ বিষয়ে না কি সচেতন ছিলেন না।)

(ঘ) দুঃখভোগের রীতির বা বৈশিষ্ট্যের জন্যও উহা (দুঃখভোগ) ট্র্যাজেডি-করুণ হইতে পারে। যে দুঃখ মর্মকে জ্বালাইয়া খাক্ করিয়া দেয় অথচ বাহিরে তাহার কোনও বিচলিত অভিব্যক্তি নাই—এমন অবিচলিত দুঃখভোগ (noble endurance of faith) ট্র্যাজেডি-করুণ হইবে।

(ঙ) তবে, আর এক বিশেষ ধরনের ভাগ্য বিপর্যয় ও দুর্বিপাক আছে যাহার মূলে মানুষের হাত থাকে না—ইহার মূলে থাকে অদৃষ্টশক্তি। এই ভাগ্য-বিপর্যয়-জনিত দুঃখও ট্র্যাজেডি-করুণ হইতে পারে। "ঈডিপাস টাইরেনাস" প্রভৃতি নাটক ইহার উদাহরণ। শেক্সপীয়রের যে সব নাটকে 'চরিত্রই নিয়তি (character is destiny)' সেই সব নাটকও ইহার উদাহরণ।

(চ) দ্বন্দ্বের সমাধান সম্বন্ধে হেগেল যে আলোচনা করিয়াছেন তাহা খুব মূল্যবান; তবে পরিপূর্ণ বা এককোটিক সমাধানের (complete reconciliation) উপর হেগেল যতটা জোর দিয়াছেন অতটা জোর দেওয়া ঠিক হয় নাই। সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সনাতন ন্যায়বোধের মধ্যে মিলাইয়া যায় এ কথা বলা সঙ্গত নয়, কারণ এরূপ ঘটে না বা ঘটিতে পারে না (this is surely neither is

nor can be)। অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের মন দ্বিধাবিভক্ত থাকিয়া যায়, বেদনার ভার একেবারে কাটে না। তারপর এমন সমাধানও দেখা যায় যেখানে দুঃখের সঙ্গে কেবল ন্যায়ের মর্যাদা মাথা পাতিয়া লওয়ার ভাবই থাকে না, মহত্ত্বের অপূর্ব মিশ্রণও থাকে।

(ছ) ট্র্যাজেডি-করুণের সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে ইহাই বলিতে হইবে যে; যে আত্মিক দ্বন্দ্বে আত্মার আত্মিক ক্ষয় ঘটে তাহাই ট্র্যাজেডিকরুণ। (any spiritual conflict involving spiritual waste is tragic.)

(জ) ট্র্যাজেডির নায়ক যে পরিমাণে মহৎ সেই পরিমাণে উহা (ট্র্যাজেডি) করুণ ও সার্থক। (The tragedy in which the hero is as we say, a good man is more tragic than that in which he is, as we say, a bad one. The more spiritual value, the more tragedy in conflict and waste.) নৈতিক পাপ ব্যক্তির আত্মিক মূল্য বা গুরুত্ব হ্রাস করিয়া দেয়। কোনও ব্যক্তিকে ট্র্যাজেডি-করুণের আলম্বন করিতে হইলে ব্যক্তিত্বের মধ্যে কোনও প্রকারের মাহাত্ম্য আকর্ষণীয় মাত্রায় রক্ষা করিতেই হইবে, নতুবা উহা ট্র্যাজেডি-করুণের পর্যায়ে উঠিতে পারিবে না।

(ঝ) ট্র্যাজেডির দুই প্রকার পরিণতি বা উপসংহার ঘটিতে পারে: এক, সমাধান-পরিণতি বা সমন্বয়-পরিণতি; দুই, বিপত্তি-পরিণতি (Catastrophe)। বিপত্তি পরিণতি– বিভক্ত আত্মার ঐক্য প্রতিষ্ঠার ভীষণ চেষ্টা (the violent self-restitution of the divided spiritual unity)। আর সমন্বয় পরিণতি—যুযুধান পক্ষের মধ্যে কোনরূপ অগত্যা সন্ধি স্থাপন (ঐ সন্ধি ও মিলন বাহ্যতঃ মিলনের মত দেখায়, কিন্তু উহা হাহাকারে হৃদয় বিদারক, আন্তরিকতায় নিঃস্ব বা শূন্য ।)

প্রাচীন ও আধুনিক ট্র্যাজেডির পার্থক্য

প্রাচীন ও আধুনিক ট্র্যাজেডির পার্থক্য বিচারের প্রসঙ্গে হেগেল কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। বিষয় কয়টি এই: (ক) আধুনিক ট্র্যাজেডির বিষয়-বস্তুর বৈচিত্র্য, (খ) ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা (subjectivity), (গ) দ্বন্দ্বের পরিণতি।

(ক) প্রথম বিষয় সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে প্রাচীন ট্র্যাজেডিতে কেবলমাত্র পারিবারিক সম্বন্ধ সমূহেরই দ্বন্দ্ব দেখা যায়, কিন্তু আধুনিক ট্র্যাজেডিতে যত সম্বন্ধে মানুষ সম্বন্ধ, সেই সকল সম্বন্ধেরই যে কোন রূপ দ্বন্দ্বের দুঃখই বিষয়রূপে থাকিতে পারে।

(খ) দ্বিতীয় বিষয়—ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা, ব্যক্তি মনের ভাব-দ্বন্দ্বের প্রতি বেশী ঝোঁক বা গুরুত্ব দেওয়া। এই বিষয়টিতে বেশী গুরুত্ব দেওয়াতে বিষয়-বস্তুর বৈচিত্র্য আসিয়াছে, ব্যক্তিত্বের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করায় যে কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তির তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বই ট্র্যাজেডির বিষয় হইতে পারে। ব্র্যাডলের ভাষায়—"For when so much weight is attached to personality almost any fatal collision in which a sufficiently striking character is involved may yield material for Tragedy. এই কারণেই ক্রমে ক্রমে ঘটনা অপেক্ষা চরিত্র সৃষ্টির দিকেই বেশী ঝোঁক পড়িয়াছে এবং পড়িয়াছে বলিয়াই আত্মকেন্দ্রিক নিষ্ঠুর চরিত্রও নায়কের মর্যাদা লাভ করিয়া থাকে। ম্যাক্‌বেথের মত "egoistic and anarchic" চরিত্রও—ব্র্যাডলে বলেন—নায়কের মর্যাদা পায়। কারণ আধুনিক মনের কাছে ব্যক্তিত্বের বিশালতা বা জটিলতাই বড় কথা।

(গ) তৃতীয় বিষয়—দ্বন্দ্বের পরিণতি। হেগেল বলেন—আধুনিক ট্র্যাজেডির উপসংহারে 'ন্যায়' না থাকে এমন নহে, তবে এ ন্যায়ের সহিত

'প্রাচীন ট্র্যাজেডির ন্যায়ের' পার্থক্য আছে। প্রাচীন ট্র্যাজেডির পরিসমাপ্তিতে সনাতন ন্যায়ের প্রতিষ্ঠাই বিলক্ষণরূপে প্রতিভাত হয়, আর 'আধুনিক ট্র্যাজেডি'র ন্যায়, অনেকটা দণ্ডবিধির ন্যায়, criminalistic; উহা যেন অতি আত্মপ্রতিষ্ঠাকামী বিশেষের (particular) বিরুদ্ধে সামান্য বা সাধারণের (universal) প্রতিক্রিয়া। যে ক্ষেত্রে নায়ক ন্যায়ের বিরুদ্ধে কোনও কাজ করে এবং পাপের মধ্যে ডুবিয়া যায় (যেমন রিচার্ড, ম্যাক্‌বেথ), আমাদের মনে হয়, যেমন কর্ম তেমন ফলই ফলিয়াছে। এই দিক দিয়া আধুনিক ট্র্যাজেডির সমাধানে ত্রুটি আছে।

একথা স্বীকার্য যে—মনীষী হেগেল আধুনিক ট্র্যাজেডির তথা আধুনিক সাহিত্যেরও বিশেষ একটি লক্ষণ ধরিতে পারিয়াছিলেন—এবং সেই লক্ষণটি আত্মকেন্দ্রিকতা (Subjectivism) অর্থাৎ ঘটনা অপেক্ষা ব্যক্তির ভাব-দ্বন্দ্বের উপর অধিকতর গুরুত্ব অর্পণ করা। আমরা দেখিয়াছি—অ্যারিষ্টটল ব্যক্তি অপেক্ষা ঘটনার উপরেই বেশী জোর দিয়াছেন; কিন্তু আধুনিক ট্র্যাজেডিতে—অন্যবিধ সাহিত্যেও—ব্যক্তিত্বেরই আজ বড় আসন, বর্ণনা অপেক্ষা বিশ্লেষণেরই আজ বড় মহিমা। ফলে ট্র্যাজেডির সংজ্ঞা-পরিধি অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। তাই যথেষ্ট মর্যাদাশালী চরিত্র বা ব্যক্তি সাংঘাতিক দ্বন্দ্বের মধ্যে পতিত হইলেই, তাহার দুঃখ-ভোগ ট্র্যাজেডি-করুণ আখ্যা পাইবার অধিকারী হইয়াছে। ট্র্যাজেডির নায়ক হইবার যোগ্যতা আজ কোনও বিশেষ শ্রেণীর লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে। রাজা বা সামন্ত বা জমিদারকেই নায়ক না করিলে ট্র্যাজেডি হইতে পারে না এমনও কোন কথা নাই। আজ অতি সাধারণ ব্যক্তিরও দ্বন্দ্ব-করুণ জীবন-কথার রূপায়ণ ট্র্যাজেডির মর্যাদা পাইতে পারে। গ্রীক ট্র্যাজেডির বা শেক্‌সপিয়রীয় ট্র্যাজেডির যে পরিবেশ, ইবসেনের সামাজিক ট্র্যাজেডির পরিবেশ তাহা নহে, এবং এই কারণেই নহে যে, সাধারণ ব্যক্তির সামাজিক মর্যাদা ইবসেনের কালে অনেক বাড়িয়া গিয়াছিল—ব্যক্তি-মর্যাদা মঞ্চের পাদ-

প্রদীপের সম্মুখে স্থান লাভ করিয়াছিল এবং করিতেছিল এবং ভিতরে বাহিরে সর্বত্র ব্যক্তির মহিমা উপলব্ধি হইয়াছিল। ব্যক্তির এই প্রাধান্তই সাহিত্যে ব্যক্তিত্বের প্রাধান্তের রূপ লইয়া বিরাজ করিতেছে। ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা ও আধুনিকতা তাই এক কথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অতএব ট্র্যাজেডির আদর্শ বলিতে শুধু গ্রীক ট্র্যাজেডি বা শেক্‌সপীয়রের লেখা ট্র্যাজেডিই লক্ষ্য করিলে চলিবে না; বিশেষতঃ বহিরঙ্গ দেখিয়া বিচার করিলেও চলিবে না, আন্তর ধর্ম দিয়াই ট্র্যাজেডিত্ব নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। ব্যক্তির মর্যাদা কেবলমাত্র সামাজিক শ্রেণী-সংস্থার মধ্যেই আবদ্ধ নাই, আজ প্রত্যেক ব্যক্তিই ব্যক্তিত্বের জটিলতার জন্য রহস্যময়, সামাজিক অধিকারের দিক দিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠ (অন্ততঃ অভিমানে)। তাই নাট্যসাহিত্যে ট্র্যাজেডির বিষয়ের ক্ষেত্রও আজ অতি স্বাভাবিক ভাবেই ব্যাপক; এবং এই ব্যাপকতার জন্য অতি সাধারণের দুঃখ-শোকও নাটকে (দ্বন্দ্ব-করুণ) "serious action"-এর মর্যাদা পাইতে পারে।

'ট্র্যাজেডি করুণ' নাটক আনন্দ দেয় কেন?

ট্র্যাজেডির সাধারণ আলোচনা করিবার পরে যে প্রশ্নটি আমাদের কাছে উত্তর দাবী করিতে থাকে, সেই প্রশ্নটা এই যে 'ট্র্যাজেডি' অভিনয় দেখিয়া আমরা আনন্দ পাই কেন? রসের স্বরূপ আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা এ প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া আসিয়াছি, কিন্তু তৎসত্ত্বেও পুনর্বিচার করিবার কারণ এই যে, প্রশ্নটি সম্বন্ধে 'নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্' অবস্থা রহিয়াছে। এই অবস্থাটিকে সুস্পষ্টভাবে দেখাইয়া দিতেই এই প্রশ্নের অবতারণা করা হইয়াছে।

(ক) অ্যারিষ্টটলের অভিমত:

প্রথমেই অতি স্বাভাবিকভাবেই মনে পড়িবে অ্যারিষ্টটলের কথা—
—পোয়েটিকস-এর লেখকের কথা। অ্যারিষ্টটল প্রশ্নটির উত্তর খুব সঙ্গত ভাবেই করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে "মাইমেসিস্" অর্থাৎ অনুকরণ দেখিয়াই

আনন্দ জন্মে—অনুকৃতি দেখিলেই মানুষ আনন্দিত হয়। লৌকিক জগতে যাহা দেখিলে আমরা বেদনা অনুভব করি, তাহাই শিল্পের মধ্যে অনুকৃত রূপে দেখিয়া আনন্দ বোধ করি। (And it is also natural for all to delight in works of imitation. The truth of this second point is shown by experience—though the objects themselves may be painful to see, we delight to view the most realistic representations of them in art)

মুখ্য ব্যাপার অনুকরণের সঙ্গে আরো একটা ব্যাপার ঘটে। এই ব্যাপারটি জ্ঞানের ব্যাপার। তিনি বলিয়াছেন জ্ঞানের মত আনন্দ আর নাই; কোন কিছুকে জানার আনন্দ সর্বাপেক্ষা বড় আনন্দ। (...to be learning something is the greatest of pleasures not only to the philosophers but also to the rest of mankind however small their capacity for it). দেখা যাইতেছে যে শৈল্পিক আনন্দ, অ্যারিষ্টটলের মতে, অনুকরণজনিত এবং জ্ঞানজনিত আনন্দ।

(খ) দার্শনিক হেগেলের অভিমত :

হেগেলের মত পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। তাঁহার মতে—ট্র্যাজেডির আনন্দ সমাধানবোধ (sense of reconciliation) তথা সনাতন ন্যায়বোধ (sense of eternal justice) হইতেই জন্মে। মানুষের বিশেষ বিশেষ অনুভূতির উপরে আছে সনাতন ন্যায়বোধ। ঐ সনাতন ন্যায়বোধের আলোকে সমাধান ঘটে বলিয়া বিশেষ ভয় বা বিশেষ করুণা সমাধানবোধের মধ্যে সমাহিত হইয়া যায়। ফলে ট্র্যাজেডি আনন্দ দিতে সক্ষম হয়, কারণ সমাধান সনাতন ন্যায়বোধে পরিপ্লুত, আর সনাতন ন্যায়বোধেই আনন্দ। আসল কথা, ট্র্যাজেডি-নাটকের আনন্দ সনাতন ন্যায়বোধেরই আনন্দ।

(গ) শোপেনহাওয়ারের (১৭৮৮-১৮৬০) অভিমত :

শোপেনহাওয়ার নৈরাশ্যবাদী দার্শনিক। তাঁহার কাছে সংসার অবাস্তব, মৃত্যু অনিবার্য, জীবন একটি মস্ত ভুল, বাসনা ও বাঁচার ইচ্ছা ত্যাগ না করা পর্যন্ত জন্ম-জরা-মৃত্যু-শোক-তাপ ভোগ করিতেই হইবে। এই ধরনের দার্শনিকের কাছে যে উত্তর স্বাভাবিক তাহাই আমরা পাইয়াছি। তিনি বলেন, ট্র্যাজেডির মধ্যেই আমরা প্রকৃত অবস্থার মুখোমুখি দাঁড়াইয়া থাকি, সেখানে সেই সংসারেরই নগ্নরূপ দেখি, যেখানে অবিরাম হানাহানি, অবর্ণনীয় দুঃখজ্বালা শয়তানের জয়, নিয়তির নিষ্ঠুরতা বর্তমান ; নিরীহ সৎলোকের শোচনীয় অপঘাত-মৃত্যু যেখানে নিয়তি-নির্বন্ধিত অমোঘ নিয়ম। ট্র্যাজেডি দেখিয়া আমরা আনন্দ পাই এই জন্য যে ইহাতে আমরা দেখি—শ্রেষ্ঠ মহাপ্রাণ নায়ক বহু দ্বন্দ্বের ও দুঃখের পরে তাঁহার দ্বন্দ্ব ত্যাগ করে, বৃথা আশা-আকাঙ্ক্ষা-অহংকার বর্জন করে এবং শেষ পর্যন্ত জীবনকেও সমর্পণ করে। শোপেনহাওয়ারের মতে—আত্মসমর্পণের মধ্যেই ট্র্যাজেডির আনন্দ—Tragedy leads to resignation. ট্র্যাজেডি দর্শনের ফলে এই বোধই জাগ্রত হয় যে জগৎ ও জীবনের প্রতি মায়া করা বৃথা। নায়কের দশা দেখিয়া শ্রোতা বা দর্শক জীবনের বৃথা অভিমান ত্যাগ করে, বাসনাকে প্রশমিত করে এবং নিয়তির কাছে নায়কের মতই আত্মসমর্পণ করে। এই spirit of resignation-এর মধ্যেই ট্র্যাজেডির আনন্দ।

(ঘ) নীৎসের (১৮৪৪-১৯০০) অভিমত :

দার্শনিক নীৎসের ট্র্যাজেডির জন্ম 'Birth of Tragedy' নামক গ্রন্থ ট্র্যাজেডির স্বরূপ আলোচনায় উল্লেখের দাবী অবশ্যই করিতে পারে। নীৎসে বলেন—ট্র্যাজেডির স্বরূপ বুঝিতে হইলে ডাওনিসীসীয় এবং এ্যাপোলোীয় শিল্পের উৎসের কাছে ফিরিয়া যাইতে হইবে। ডাওনিসাসকে কেন্দ্র করিয়া করুণ-গীতি উৎসারিত হইয়াছে, আর এ্যাপোলোকে কেন্দ্র করিয়া দুঃখবিজয়ী ও মৃত্যুঞ্জয়ী আশা-আকাঙ্ক্ষা—অক্ষয় সৌন্দর্যের তৃষ্ণা স্ফুরিত হইয়াছে। ট্র্যাজেডি দুঃখের

এবং দুঃখ-জয়েরই কথা—ইহাতে ডাওনিসীসীয় সত্য এ্যাপোলীয় আশা-আকাঙ্ক্ষায় ও দুঃখজয়ের আনন্দে মিলাইয়া যায়। নীৎসের মতে—Tragedy is the art of metaphysical comfort, a metaphysical supplement to the reality of nature—অর্থাৎ ট্র্যাজেডি পারমার্থিক সান্ত্বনার কৌশলী সৃষ্টি, বাস্তবিক জগতের আধ্যাত্মিক পরিপূরক।

নীৎসে আরো বলেন যে, আমাদের মধ্যে একটা secret instinct for annihilation, গোপন বিনাশন প্রবৃত্তি আছে। এই বিনাশন আমাদের ব্যক্তি-সত্তাকে অখিল সত্তার মধ্যে বিলীন করিয়া দেয় বলিয়া ব্যক্তি-বিনাশে আমরা আনন্দিত হই।—ট্র্যাজেডিতে ব্যক্তি-সত্তাকে অস্বীকার করা হয়—বিনাশ করা হয়; সেই বিনাশ—অখিল সত্তার মধ্যে ব্যক্তি-সত্তার নিমজ্জন বা বিলয়—দেখিয়া আমাদের মনে অপার আনন্দ জন্মে। The spectator sees before him the tragic hero in epic clearness and beauty and nevertheless delights in his annihilation. He feels the action of the hero to be justified and is nevertheless still more elated when these actions annihilate their originators. (Dixon-এর ভাষায়)। দেখা যায়—নীৎসের কাছে ট্র্যাজেডির আনন্দ ব্যক্তি-বিনাশ-দর্শনের আনন্দ।

(চ) জিঘাংসাবাদী ও প্রতিশোধবাদী অভিমত :

কেহ কেহ এইরূপ বলিতে চাহিয়াছেন যে আমাদের রক্তে হিংসার বীজ রহিয়াছে (জিঘাংসাবাদ ? Malevolence Theory ?)। ফলে কেবল শত্রুর দুঃখ-দুর্দশা দেখিলেই যে আমাদের আনন্দ হয় তাহা নহে, যাহারা আমাদের কোনও ক্ষতি করে নাই এমন লোকেরও দুঃখ-দুর্দশা দেখিলে আমাদের আনন্দ হয়। লুক্রেসিয়াসের ভাষায় বলা যায়—sweet it is when the winds are at work on the waters to witness from shore the another's deep distress.

জিঘাংসাবাদের সগোত্র আর একটি মতবাদ—প্রতিশোধবাদ। এই মতের বক্তব্য এই যে মানুষের মনের আসংজ্ঞান স্তরে অপ্রশমিত ক্ষতিবোধ আছে (subconscious sense of unredressed injury); এই ক্ষতিবোধ প্রতিশোধে বা ঈর্ষায় চরিতার্থতা লাভ করে। এই কারণেই আমরা অতি-দর্পীর দর্প চূর্ণ হইতে দেখিয়া বা শুনিয়া আনন্দিত হই।

(চ) বেদনায় আনন্দ-রূপান্তর (ডিক্সন প্রমুখ):

এই মতে বেদনাই আনন্দমূর্তি গ্রহণ করে। করুণ আবেদনে আমরা যখন কাঁদি নিজের জন্যই কাঁদি, আর কান্নার মধ্যে আনন্দ পাই কারণ ঐ কান্না নিজের জন্যই কাঁদা। কবি শেলীর অনুকরণে বলা যাক—আমাদের আত্মার মধ্যে সঙ্গতির ব্যাঘাত ঘটিলেই আমরা বেদনা পাই, কিন্তু সঙ্গতি-হানির মধ্য দিয়া আত্মা নিগূঢ়ভাবে আপন সত্তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়া থাকে—The pain of the inferior is frequently connected with the pleasures of the superior parts of our being—অপরা সত্তার বেদনার সহিত পরা সত্তার আনন্দ জড়িত-বেদনার মধ্যে যে আনন্দ বর্তমান বা অন্তর্নিহিত, ট্র্যাজেডি সেই আনন্দেরই আভাস দেয় (Tragedy delights by affording a shadow of that pleasure which exists in pain—Tragedy by Dixon), W. M. Dixon এ সম্বন্ধে এরূপ মন্তব্য করিয়াছেন—It may very well be that beyond its broad and common ways, in the gloomier defiles of life, amid the grief-worn faces and under the clouded skies of tragedy we may seek knowledge, wisdom, an enlargement of the spirit, the meaning of things or some other ends—অর্থাৎ ট্র্যাজেডির আনন্দ—জ্ঞানের আনন্দ, আত্ম-বিস্তারের আনন্দ।

(ছ) এ. এইচ. থর্নডাইকের অভিমত (A. H. Thorndike):

লৌকিক জীবনে আমরা মানুষের আনন্দে, সুখে এবং বিজয়ে যেমন আনন্দলাভ করি, তেমনি মানুষের শোকে, দুঃখে এবং দুর্দশায়ও আমাদের কম উৎসাহ থাকে না। মানুষের আনন্দাবেগ যে ভাবে আমাদের প্রভাবিত করে ঠিক তেমনি ভাবেই চঞ্চল করে তাহার দুঃখাবেগ। ট্র্যাজেডি দুঃখাবহ ঘটনা উপস্থাপিত করিলেও আমাদের মুগ্ধ করে, তন্ময় করিয়া তোলে। (In life we are enormously in grief and suffering and disaster, as we are also in joy, pleasure and success······we are stirred by the painful emotions of our fellows as readily as by their pleasurable ones······and Tragedy dedicated to painful actions also interests, fascinates, absorbs us).

আনন্দকে বিশ্লেষণ করিয়া তিনি এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, আনন্দের মধ্যে (১) ভাবমোক্ষণ (catharsis) থাকে, (২) সহানুভূতি-প্রদর্শন-জনিত আত্মাভিস্পন্দন তথা অহমিকা-চরিতার্থতা থাকে (egoistical satisfaction, i.e., self-congratulation that comes with the exercise of sympathy), (৩) শৈল্পিক আনন্দ (aesthetic delight) থাকে, এবং সঙ্গে সঙ্গে থাকে (৪) অনন্তের রূপ দর্শনের বিস্মিত উল্লাস (exaltation due to vision of the eternal).

(ভ) গিলবার্ট মারের অভিমত :—

'The classical tradition in Poetry' নামক গ্রন্থের Drama শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত গিলবার্ট মারে মহাশয় ট্র্যাজেডির জন্ম ও স্বরূপ সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি স্পষ্টভাবে প্রশ্ন তুলিয়াছেন—

Why do we enjoy it ? প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিয়াছেন—জিঘাংসাবাদ বা প্রতিশোধস্পৃহা দ্বারা ট্রাজেডির আনন্দ ব্যাখ্যা করা সম্ভব নহে। কারণ যে আবেগানুভূতি লইয়া আমরা ঈডিপাস, ম্যাক্‌বেথ ও ওথেলোর ভাগ্য-বিপর্যয়

গ্রহণ করি—সকলেই স্বীকার করিবেন—তাহা খাঁটি করুণা এবং ভয়, প্রতিহিংসার লেশমাত্র তাহাতে নাই। করুণা জাগে এই দেখিয়া যে অত বড এক ব্যক্তি ঐরূপ দুর্দশায় পতিত, আর ভয় হয় এই জন্য যে তাহার সহিত একাত্মকতা বোধ করি, তাহার ভাগ্যের মধ্য দিয়া নিজের ভাগ্য-বিডম্বনাই উপলব্ধি করি।

শ্রীযুক্ত মারে'র বিশেষ বক্তব্য এই যে ট্র্যাজেডির মধ্যে করুণা ও ভয়ের আবেদন ছাডাও আর একটা অনুভব থাকে, সে অনুভব এই যে নিয়তি যে দুর্বিপাকের ও দারুণ পরিণতির মধ্যে মানুষকে টানিয়া লইয়া যায়, তাহা আপাতঃদৃষ্টিতে যত নিষ্ঠুর ও মর্মান্তিক করুণ হউক, হয়ত একেবারে অন্যায্য নহে। (There is a curious suspicion that the brutal and meaningless disasters inflicted by fortune are in some mystical way not quite unjust). উক্ত অনুভব প্রচলিত ন্যায়-অন্যায়ের ধারণা হইতে আসে না, আসে নিগূঢতর ন্যায়-অন্যায়-নীতি-চেতনা হইতে—profounder scheme of values হইতে।

আর একটি ধারণাও সঙ্গে সঙ্গে থাকে। মানুষের আত্মা ক্লেশ ও বিপত্তিকে জয় করে—মৃত্যুর দেশেই মৃত্যুকে জয় করে। এই দিক দিয়া ট্র্যাজেডির আনন্দ মৃত্যুকে জয় করার আনন্দ (It must show beauty-out shining horror it must show human character somehow triumphing over death and it can create and maintain that illusion only by high and continuous and severe beauty of form)। দেখা যাইতেছে যে গিলবার্ট মারে মহাশয়ের মতে, ট্র্যাজেডি-দর্শন-জনিত আনন্দে—'profounder scheme of values' বোধের একটা অংশ আছে, মৃত্যুকে জয় করিবার অভিমান আছে এবং 'severe beauty of form' অর্থাৎ প্রকাশের চমৎকার সৌন্দর্য আছে।

(ঝ) বিশ্বনাথ কবিরাজের অভিমত :

'সাহিত্যদর্পণ' প্রণেতা, বিশ্বনাথ কবিরাজও স্পষ্টভাবে প্রশ্ন করিয়াছেন—করুণ 'রসে' পরিণত হইবে কি উপায়ে ? তিনি ইহার উত্তর দিয়াছেন—

অলৌকিকবিভাবত্বং প্রাপ্তেভ্যঃ কাব্যসংশ্রয়াৎ
সুখং সঞ্জায়তে তেভ্যঃ সর্বেভ্যোঽপীতি কা ক্ষতিঃ।

অর্থাৎ বিভাবাদি লৌকিক অবস্থায় দুঃখদায়ক হইবে বটে, কিন্তু অলৌকিক অবস্থায় আনন্দ দিতে সক্ষম। উল্লিখিত শ্লোকটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি যাহা লিখিয়াছেন (সুরতে দন্তঘাতাদিভ্য ইব সুখমেব জায়তে) তাহা হইতে এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে বিশ্বনাথ বলিতে চাহেন—অবস্থা ভেদে একই ঘটনা বিভিন্ন অনুভূতি জাগাইতে পারে ; যাহা লৌকিক ঘটনা হিসাবে করুণ, তাহাই যখন অলৌকিক অর্থাৎ কবি-কল্পিত রূপে উপস্থিত হয়, দুঃখের পরিবর্তে আনন্দ সৃষ্টি করে। অতএব বিশ্বনাথের মতে—শৈল্পিক আনন্দ সৃষ্টি চমৎকারিত্বের উপলব্ধির জন্য আনন্দ—এ কথা বলা যাইতে পারে। কারণ অলৌকিক তাহাই যাহা কবি দ্বারা কল্পিত ও সৃষ্ট হইয়া উঠে ;

দেখা গেল, ট্র্যাজেডি-করুণ নাটক আনন্দ দেয় কেন এই প্রশ্নটির উত্তর নানা দৃষ্টিভঙ্গী হইতে দেওয়া হইয়াছে। কেহ আধ্যাত্মিক রহস্যের ধূম্রজালে বক্তব্য আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছেন, কেহ বা বিসংবাদিতকে স্বতঃসিদ্ধ রূপে গ্রহণ করিয়া তাহা হইতে উপসিদ্ধান্ত টানিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা শৈল্পিক আনন্দের (aesthetic pleasure) বা রসের সিদ্ধান্ত দ্বারা প্রশ্নটির উত্তর দিকে অগ্রসর হইয়াছেন, কেবলমাত্র তাঁহাদেরই ব্যাখ্যা সন্তোষজনক হইয়াছে বলা যাইতে পারে। আমরা প্রশ্নটিকে শৈল্পিক আনন্দের বা রসের সিদ্ধান্ত অনুসারেই বিচার করিবার পক্ষপাতী।

বাংলা নাটকের ধারা ও দ্বিজেন্দ্রলাল

বাংলা নাট্য সাহিত্যের উৎপত্তিকাল নির্দ্ধারণ করিতে যাইয়া কেবলমাত্র ঊনবিংশ শতাব্দীর পরিধির মধ্যে আবদ্ধ থাকিলে চলিবে না, সেই সময় পর্যন্ত যাইয়া পৌঁছিতে হইবে যে-সময়ে বাংলা ভাষায় প্রথম 'উক্তি-প্রত্যুক্তি-বন্ধ-যুক্ত' রচনা দেখা দিয়াছিল—এক কথায়, বাংলাভাষায় দৃশ্য-কাব্য-জাতীয় রচনার আরম্ভ হইয়াছিল। এই সকল রচনায় আধুনিক নাটকের তুলনায় আকারে-প্রকারে যত হীনই হউক—শৈল্পিক বা সাহিত্যিক মূল্যের দিক দিয়া যত নগণ্যই হউক, বাংলা নাট্য-সাহিত্যের প্রারম্ভিক সীমান্ত প্রদেশে ইহারা যে আদিম অধিবাসী এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে। মঞ্চে অভিনীত নহে বলিয়া ইহাদের কৌলীন্য কম হইতে পারে, কিন্তু 'দৃশ্য-কাব্য'ত্বের কোনও হানি তাহাতে ঘটে না ; জাতি বিভাগে ইহাদের স্থান দৃশ্য-কাব্যের গণ্ডিতেই পড়িবে। সংস্কৃত নাটকের পঞ্চ সন্ধি-সমন্বিত অবয়ব লইয়া বাংলা নাট্য-সাহিত্য প্রথমেই জন্মগ্রহণ করে নাই, বিষয়বস্তুর দিক দিয়া সংস্কৃত নাটকের ব্যাপ্তি ধারণ করিতে পারে নাই, এবং মঞ্চে অভিনীত হইবার গৌরবও তাহার ছিল না—এ সবই সত্য কথা, কিন্তু উৎপত্তি নির্দেশ করিবার সময় অবয়বের বা অভিনয়ের রীতির প্রশ্ন ছাড়াও আর একটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। বিষয়টি এই—দৃশ্য-কাব্য-জাতীয় বিশেষ শ্রেণীর রচনা আমরা সর্বপ্রথম কোন সময়কার পাইতেছি। উক্তি-প্রত্যুক্তি-বন্ধের এই বিশেষ জাতীয় রচনাই দৃশ্য-কাব্যের গোড়ার কথা—তাহার আদিম নিদর্শন (তা যত ক্ষুদ্রই আকার হউক)।

সংস্কৃত নাটকের পূর্ণাঙ্গ অবয়ব লইয়া বাংলা নাটক দেখা দেয় নাই কেন, বিষয়বস্তুর দিক দিয়া তাহা অত নিঃস্ব কেন এবং কেন উহার

'মঞ্চে অভিনয়' রীতি প্রচলিত হয় নাই—এ সম্বন্ধে প্রশ্ন জাগিবে ইহা খুবই স্বাভাবিক। এ প্রশ্নের উত্তর 'বাংলা নাটকের উৎপত্তি' আলোচনাকালে আলোচনা করিয়াছি, এ স্থলে তাহার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন বলিয়া কেবলমাত্র সিদ্ধান্তটুকু স্মরণ করিতেছি।

মুসলমান শাসকদের ইচ্ছাকৃত বাধা বা হস্তক্ষেপের জন্য নাটকাভিনয় অনুষ্ঠিত হইতে পারে নাই তথা নাটকও রচিত হয় নাই এ কথা যথার্থ সত্য নহে। বিশৃঙ্খলা, অনিরাপত্তা বাঙালীর স্বাভাবিক জীবনযাত্রার গতিকে ব্যাহত করিয়াছিল সত্য, সেই সময় নাট্যাভিনয়াদি সম্মেলনমূলক অনুষ্ঠানাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইতে পারে নাই ইহাও সত্য, কিন্তু সর্বাপেক্ষা বড় সত্য বোধ হয় এই যে, বাঙালীর সাংস্কৃতিক সংস্থা তখন এমন ছিল যাহাতে নাটক সৃষ্টির প্রেরণা সে পায় নাই। বিশেষতঃ 'মঞ্চে অভিনয়' রীতির সহিত বিশেষ পরিচয় যে বাঙালীর ঘটে নাই এইরূপ অনুমান না করিয়াও উপায় নাই।

'নাটকের জঘন্য অপভ্রংশ'

তাই দেখা যায় যে কৃষ্ণলীলা অভিনয়ে বাঙালীকে হামাগুড়ি দিতে হইয়াছে এবং মঞ্চে অভিনয় ব্যাপারে বিদেশীর কাছে হাতে-খড়ি লইতে হইয়াছে। শ্রীচৈতন্য চন্দ্রশেখরের গৃহে যে 'কৃষ্ণলীলা' অভিনয় করিয়াছিলেন সেই অভিনয়ানুষ্ঠানটি প্রাচীনতম অভিনয় বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে বটে, কিন্তু তাহার বিশেষ বিবরণ পাওয়া না যাওয়ায় দৃশ্য-কাব্য হিসাবে কৃষ্ণলীলার আকার-প্রকার কিরূপ ছিল জানিবার উপায় নাই। ৺রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় ১৮৫৯ খ্রীঃ 'যাত্রার' উৎপত্তি সম্বন্ধে 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' পত্রিকায় যে নিবন্ধ লিখিয়াছিলেন তাহা হইতে উদ্ধার করিয়া দেখানো যাইতে পারে "বহুকালাবধি নাটকের জঘন্য অপভ্রংশ স্বরূপ এক প্রকার যাত্রা এতদ্দেশে বিদিত আছে।"

'কৃষ্ণলীলা' এই 'জঘন্য অপভ্রংশ' কি না বিচার্য বিষয়—কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় বিচার করিবার কোনও উপাদান হাতে নাই। যাহা হউক, এই সকল রচনাকে নাট্য-সাহিত্যের সূত্রপাত হিসাবে গ্রহণ করা অযুক্তিযুক্ত নহে এবং বলা যাইতে পারে যে বাংলা নাট্য-সাহিত্যের সূত্রপাত পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ পাদেই ঘটিয়াছে এবং উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত ইহা যাত্রা রূপেই চলিয়া আসিয়াছিল। ১৭৯৫ খ্রীঃ হেরেসিম লেবেডফ নামক জনৈক রুশ-দেশবাসী কলিকাতার ডুমতলাতে 'রঙ্গালয়' স্থাপন করিয়া যে দুইখানি প্রহসন (ইংরাজীর অনুবাদ) অভিনীত করাইয়াছিলেন তাহা মঞ্চে অভিনীত নাট্য-সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন হইলেও খাঁটি নাটকের মর্যাদা পাইতে পারে বলিয়া মনে হয় না। লেবেডফের এই চেষ্টা বাঙালীর মনে কতখানি প্রেরণা সৃষ্টি করিয়াছিল নির্দ্ধারণ করিবার উপায় নাই, তবে রঙ্গমঞ্চে বাংলা নাটকের প্রথম অভিনয় হিসাবে ইহার প্রভাব অনস্বীকার্য—লেবেডফ নিজেই বলিয়াছেন যে দুইটি অভিনয়েই নাট্যশালা লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

বিদেশী আদর্শে নাটক

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেই—১৮১৭ সনে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে—শিক্ষিত এবং বিশিষ্ট বাঙালীরা উপলব্ধি করিয়াছিলেন—'ইংরেজ সম্প্রদায়ের মত তাহাদের আমোদ-প্রমোদের স্থান নাই' (সমাচার চন্দ্রিকার উক্তির অনুবাদের অনুবাদ); সমাচার চন্দ্রিকা প্রস্তাবও করিয়াছিল—"সুতরাং ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা যাহাতে একত্র হইয়া ইংরেজের মত শেয়ার গ্রহণ করিয়া একটি নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা করেন···তাহা নিতান্তই বাঞ্ছনীয়।" এই ধরনের প্রস্তাবের ও আন্দোলনের ফলে শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রভৃতি "শিষ্ট বিশিষ্ট মহাশয়গণ" উদ্যোগী হইলেন এবং ১৮৩১ খ্রীঃ হিন্দু নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত

করিলেন। কিন্তু "যে সকল নাটকের ক্রীড়া হইবে সে সকলি ইংলণ্ডীয় ভাষায়" হইবে এইরূপ সঙ্কল্প লওয়ায় হিন্দু নাট্যশালা বাংলা নাটক রচনায় কোনও প্রত্যক্ষ উৎসাহ যোগায় নাই ইহা "স্কুল অথবা কলেজের ড্র্যামাটিক ক্লাবের বৃহত্তর সংস্করণের মত একটা জিনিষ ছিল।"

বাঙালীর উদ্যোগে বাংলা নাটকের অভিনয় হয় শ্যামবাজারে নবীনচন্দ্র বসুর নাট্যশালাতে। এই নাট্যশালায় ১৮৩৫ খ্রীঃ অক্টোবর মাসে বিখ্যাত বাংলা উপাখ্যান "বিদ্যাসুন্দর" নাট্যাকারে মঞ্চস্থ হয়। যাত্রাআসরের বিদ্যা-সুন্দরের আঙ্গিক ও আঙ্গিকে পার্থক্য কি ছিল জানা যায় না বটে, কিন্তু দেখা যায় যে বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যানটি যাত্রার উপজীব্য হইয়াও মঞ্চে আরোহণ করিয়া নাটক খ্যাতি লাভ করিয়াছে। কিন্তু শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বাংলা নাটকের উৎপত্তি আলোচনা প্রসঙ্গে আমাদের বিশেষভাবে সাবধান করিয়া দিয়া বলিয়াছেন: "বঙ্গীয় নাট্যশালা ও নাটকের উৎপত্তি ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালীদের দ্বারা বিদেশী আদর্শে এ কথাটি ভাল করিয়া স্মরণ রাখা উচিত। পুরাতন যাত্রার সহিত বাংলা নাটকের কোনও নাড়ীর যোগ নাই, যাত্রা হইতে বাংলা নাটকের উদ্ভব হয় নাই।" "নাড়ীর যোগ" বলিতে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কি বুঝাইতে চাহিয়াছেন ঠিক বুঝা না গেলেও একটি বিষয়ে আমাদের 'কিন্তু' না আসিয়া যায় না। বিষয়টি আর কিছুই নহে, বিদ্যাসুন্দরের মঞ্চে অভিনয়ের তাৎপর্য। বিদ্যাসুন্দরের মঞ্চে অভিনয়কে কি যাত্রাভিনয়েরই ক্রমোন্নতি বলিয়া ধরা চলে না? বিদ্যাসুন্দরের অভিনয়কে যাত্রা ও নাটকের সংযোগ-সেতু বলা চলে না কি? আর একটি বিষয়েও সতর্ক হওয়া উচিত। বিষয়টি এই—ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালীদের সম্মুখে কেবলমাত্র বিদেশী আদর্শই যে ছিল এমন নহে, সংস্কৃত নাটকের আদর্শও ছিল। বাংলা নাটকের গোড়ার কথা পর্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাইব—সংস্কৃত নাটকের আদর্শই বেশী কার্যকরী হইয়াছে।

সংস্কৃতের প্রভাব কতটুকু

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে—তৃতীয় দশকে রচিত 'প্রবোধ চন্দ্রোদয়' নাটকের বাংলা অনুবাদ 'আত্মতত্ত্বকৌমুদী'কে প্রথম বাংলা নাটক বলিলে, 'হাস্যার্ণব' (১৮২২) 'কৌতুকসর্বস্ব' (১৮০৮) প্রভৃতিকেও নাটকের মর্যাদা দিলে পুর্বোক্ত মন্তব্যই সমর্থন পায়। তারপর পঞ্চম দশকের নাটক বলিয়া আমরা যদি (১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে অনূদিত) রামতারক ভট্টাচার্য কৃত 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকের অনুবাদকে এবং নীলমণি পাল রচিত 'রত্নাবলী নাটিকা'কে (১৮৪৯) গ্রহণ করি তাহা হইলেও একই কথা বলা যাইতে পারে। তারপর গৌরীভা গ্রামের বৈদ্য নন্দকুমার রায় কর্তৃক রচিত 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা'কে যদি প্রথম অভিনীত বাংলা নাটক বলা যায় (১৮৫৫ রচিত, ১৮৫৭-এ আশুতোষ দেবের বাড়ীতে অভিনীত) তাহা হইলেও সংস্কৃত নাটকের আদর্শের প্রভাবের কথা হেয় হয় না। শ্রদ্ধেয় শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও এবস্থলে বলিয়াছেন "সংস্কৃত হইতে অনুবাদ করিয়া পৌরাণিক উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া এবং ক্ষেত্র বিশেষে বাঙালী জীবনের ঘটনা লইয়া উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এইরূপে বাংলা নাট্য-সাহিত্যের যে ধারার সূত্রপাত হইল তাহা আর বাধা পাইল না।" সুতরাং একদিক দিয়া উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা নাটকের অভিনয়কে পাশ্চাত্যের অনুকরণ বলা যায়, কিন্তু আর এক দিয়া উহাকে অতীতের সর্বাঙ্গ-সম্পন্ন ভারতীয় সভ্যতার সহিত সংযোগ স্থাপনও বলা যাইতে পারে। ইংরেজদের নাট্যাভিনয়ই বাঙালীর মনে নাট্যাভিনয়ের স্পৃহা জাগাইয়াছিল, কিন্তু বাঙালী ইংরেজী আদর্শের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকে নাই, কারণ সংস্কৃত নাটক আকৃতিক সৌষ্ঠবে ও বৈষয়িক গৌরবে ইংরেজী শিক্ষিতদের দৃষ্টি ও মন আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। সর্বাপেক্ষা বড় কথা—জাতীয় জীবন ও সংস্কৃতির ধারক বলিয়া সংস্কৃত নাটকই বাঙালীর প্রথম শরণ্য হইয়াছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকে যে সকল নাটক রচিত হইয়াছিল তাহাদের

লক্ষ্য করিলেই আমরা শ্রদ্ধেয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের এবং আমাদের মন্তব্যের সমর্থন পাইব। যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'কীর্তিবিলাস' (১৮৫২), তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রার্জুন' (১৮৫২), নাটুকে রামনারায়ণের 'বেণীসংহার নাটক' (১৮৫৬), 'রত্নাবলী নাটক' (১৮৫৮), কালীপ্রসন্ন সিংহের 'বিক্রমোর্বশী নাটক' (১৮৫৭), 'সাবিত্রী সত্যবান নাটক' (১৮৫৮) ও 'মালতী মাধব নাটক' (১৮৫৯), মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা নাটক' (১৮৫৯)—এই সাক্ষ্যই বহন করিতেছে যে বাঙালী সংস্কৃত নাটকের অনুবাদকে এবং পৌরাণিক কাহিনীকে আশ্রয় করিয়া নাট্যাভিনয়ের পথে অগ্রসর হইয়াছে।

সমাজ সচেতন বাংলা নাটক

তবে সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলিতে হইবে যে বাঙালীর মধ্যে সৃজনী প্রতিভাও এই দশকেই দেখা দিতে আরম্ভ করে। অনুবাদের ও পৌরাণিক কাহিনী আশ্রয়ের পর-নির্ভরতার পাশেই আত্ম-নির্ভর সৃজন দেখা যায়—সমাজ-সচেতন রচনা পাওয়া যায়। কৌলীন্য প্রথা, বাল্য-বিবাহ প্রথা, বিধবা বিবাহ, বহু বিবাহ, সুরাপান, বেশ্যাসক্তি প্রভৃতি আধি-ব্যাধির প্রকোপে সমাজ-দেহ বিষাক্ত স্ফোটকে ছাইয়া গিয়াছিল। (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেষ্টায় "বিধবা বিবাহ আইন" ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে বিধিবদ্ধ হইলে সমাজ আপাদ-মস্তক আন্দোলিত হইয়া উঠিয়াছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে কবি-কল্পনাও সক্রিয় না হইয়া পারে নাই)। নাটুকে রামনারায়ণের (১৮২২-১৮৮৬) কৌলীন্য প্রথা অবলম্বনে (১৮৫৪ খ্রীঃ) রচিত "কুলীন-কুল-সর্বস্ব নাটক", বিধবা বিবাহ অবলম্বনে রচিত উমেশচন্দ্র মিত্রের "বিধবা-বিবাহ নাটক" (১৮৫৬), বহু-বিবাহ অবলম্বনে রচিত তারকচন্দ্র চূড়ামণির "সপত্নী নাটক" (১৮৫৯), সুরাপানাদি অবলম্বনে রচিত শ্রীমধুসূদনের "একেই কি বলে সভ্যতা" (১৮৫৯) প্রভৃতি এই দশকের সামাজিক নাটকের প্রতিনিধি।

সপ্তম দশকে নাটুকে রামনারায়ণ ও মধুসূদনের পাশে দীনবন্ধু এ

মনোমোহন বসু আসিয়া দাঁড়াইলেন। রামনারায়ণ অনুবাদের পরিধির মধ্যে এবং সামাজিক সমস্যার ক্ষেত্রেই আবদ্ধ থাকিলেন। 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ নাটক' (১৮৬০) এবং 'মালতীমাধব' (১৮৬৭) অনুবাদের এবং "যেমন কর্ম তেমনি ফল" (১৮৬৫?) ও বহু বিবাহ প্রভৃতি কুপ্রথা বিষয়ক 'নব নাটক' (১৮৬৬)—সমস্যামূলক নাটকের নিদর্শন। মাইকেল মধুসূদন এই দশকে "একেই কি বলে সভ্যতা" (১৮৬০), 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' (১৮৬০), 'পদ্মাবতী' (১৮৬০), এবং 'কৃষ্ণকুমারী নাটক, (১৮৬১) লিখিলেন এবং শেষোক্ত দুইখানিতে পৌরাণিক ক্ষেত্র ছাড়িয়া ঐতিহাসিক ক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। দীনবন্ধু 'নীলদর্পনং নাটকং' (১৮৬০) হস্তে নাট্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন এবং রাজ-আর্থনৈতিক সমস্যাকে রূপ দেওয়ার প্রথম চেষ্টা করিয়া সাহিত্যের বৈষয়িক ক্ষেত্রকে বাড়াইয়া দিলেন। কিন্তু উক্ত সমস্যার ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া থাকা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই; তাই দেখা যায় সামাজিক অন্যান্য সমস্যার ক্ষেত্রে যাইয়া বিষয় আহরণ করিয়াছিলেন। 'নবীন তপস্বিনী' (১৮৬৩), 'বিয়েপাগলা বুড়ো' (১৮৬৬), 'সধবার একাদশী' (১৮৬৬) এবং 'লীলাবতী' (১৮৬৭) সামাজিক ও প্রহসন নাটকগুলিতে নীলদর্পণ রচয়িতার চেতনা চাপা পড়িয়া গিয়াছে। দীনবন্ধুর সাহিত্যিক জীবন খুবই অল্পায়ু—১৮৬০ হইতে ১৮৭৩; মৃত্যু বৎসর পর্যন্ত দীনবন্ধু সাতখানি নাটক লিখিয়াছিলেন, তন্মধ্যে পাঁচখানিই সপ্তম দশকে রচিত। বাকী দু'খানি 'জামাইবারিক', 'কমলে কামিনী' নাটক যথাক্রমে ১৮৭২ এবং ১৮৭৩ খ্রীঃ রচিত।

রঙ্গালয়ের যুগ আরম্ভ

নাট্যকার মনোমোহন বসু (১৮৩১-১৯১২) এই দশকেই প্রথম নাটক রচনা আরম্ভ করেন এবং 'রামাভিষেক নাটক' (১৮৬৭) ও 'প্রণয় পরীক্ষা নাটক' (১৮৬৯) রচনা করেন। ৮ম দশকে—'সতী নাটক' (১৮৭৩),

'হরিশ্চন্দ্র' (১৮৭৪), 'নাগাশ্রমে'র অভিনয় (১৮৭৫), ৯ম দশকে—'পার্থ পরাজয়' (১৮৮১), 'রাসলীলা' (১৮৮৯), ১০ম দশকে—'আনন্দময় নাটক' (১৮৯০) রচিত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর অষ্টম দশক বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষভাবে স্মরণীয়। এই দশকের প্রথমেই বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শন (১৮৭২) প্রকাশিত হয় এবং জোড়াসাঁকোর মধুসূদন সান্ন্যালের বাড়ীতে প্রথম সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হয় ও রঙ্গালয়ের যুগ আরম্ভ হয়। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের হিন্দু মেলার মধ্যে যে চেতনা সংহত হইতেছিল সেই চেতনার পরোক্ষ অভিব্যক্তি এই দশকের বিলক্ষণ বৈশিষ্ট্য। কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভারতমাতা' (১৮৭৩), হরলাল রায়ের "বঙ্গের সুখাবসান" (১৮৭৪), জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পুরুবিক্রম' (১৮৭৪), লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তীর 'নবাব সিরাজদ্দৌলা' (১৮৭৬), রজনীকান্ত গুপ্তের 'মহারাষ্ট্র কলঙ্ক', অক্ষয় চৌধুরীর 'দুর্গাবতী নাটক' (১৮৭৪), গঙ্গাধর চক্রবর্তীর 'তারাবাঈ' নাটকের মধ্যে স্বদেশ চেতনার অভিব্যক্তি দেখা যায়। এই দশকে আমরা প্রাচীন নাট্যকার নাটুকে রামনারায়ণের 'উভয় সঙ্কট' (১৮৭০ ?) ও 'চক্ষুদান' (১৮৭০) এই দুইখানি প্রহসন এবং 'রুক্মিনীহরণ নাটক' (১৮৭১), 'স্বপ্নধন নাটক' (১৮৭৩), 'ধর্মবিজয় নাটক' (১৮৭৫) ও কংসবধ নাটক' (১৮৭৫ ?) এবং মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মায়াকানন' (১৮৭৪) দীনবন্ধু মিত্রের 'জামাইবারিক' (১৮৭২) এবং 'কমলে কামিনী' (১৮৭৩) এবং মনোমোহন বসুর তিনখানি পৌরাণিক নাটক পাই।

এই দশকের প্রথম দিকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৮-১৯২৫) "কিঞ্চিৎ জলযোগ" হস্তে ১৮৭২ খ্রীঃ সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করেন; এই সময়েই রসরাজ অমৃতলাল বসু রসসৃষ্টিতে আত্মনিয়োগ করেন এবং যুগন্ধর নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১১) ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে "আগমনী" গাহিয়া নাট্য-ভারতীর মন্দিরে প্রবিষ্ট হন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের কয়েকখানি প্রহসন এবং 'পুরুবিক্রম নাটক' (১৮৭৪), 'সরোজিনী' (১৮৭৫), 'অশ্রুমতী,

(১৮৭৯) ও 'স্বপ্নময়ী নাটক (১৮৮২) ছাড়া সাহিত্য ভাণ্ডারে অনুবাদের পুঁজিই বেশী। মনোমোহন বসু ১৮৬৭ হইতে ১৮৯০ পর্যন্ত প্রধানতঃ পৌরাণিক কাহিনীরই রস নিস্কাষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সাময়িক সুখ্যাতি তাঁহার ভাগ্যে যথেষ্টই ঘটিয়াছিল কিন্তু তাঁহার কোনও নাটক কালাতিক্রমক্ষম হইতে পারে নাই।

নাট্যকার গিরিশচন্দ্র

গণনায় ও গুণে যাঁহার রচনা সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য তিনি গিরিশচন্দ্র। গিরিশচন্দ্রের সাহিত্যিক জীবনকে পাঁচটি অধ্যায়ে ভাগ করা হইয়া থাকে—প্রথম অধ্যায় ১৮৭৭ হইতে ১৮৮১ পর্যন্ত, দ্বিতীয় অধ্যায় ১৮৮১ হইতে হইতে ১৮৮৪, তৃতীয় অধ্যায় ১৮৮৪ হইতে ১৮৮৯, চতুর্থ অধ্যায় ১৮৯১ হইতে ১৯০৫, এবং পঞ্চম অধ্যায় ১৯০৫ হইতে ১৯১১। প্রথম হইতে তৃতীয় অধ্যায় পর্যন্ত—অর্থাৎ ১৮৭৭ হইতে ১৮৮৯ পর্যন্ত গিরিশচন্দ্র প্রধানতঃ রামায়ণ মহাভারতের ও ভাগবতের কাহিনী এবং চৈতন্য বুদ্ধের জীবনকথা নাট্যে রূপায়িত করিয়া জাতির অধ্যাত্ম বৈশিষ্ট্যকে প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। চতুর্থ অধ্যায়ে তিনি সৃষ্টি করিলেন 'প্রফুল্ল' (১৮৯১), 'হারানিধি' (১৮৯০), 'জনা' (১৮৯৩), 'পাণ্ডবগৌরব' (১৮৯৯), 'ভ্রান্তি' (১৯০২), 'সংনাম' (১৯০৪) ও 'বলিদান'। পঞ্চম অধ্যায়েই (১৯০৫-১৯১১) একষট্টি বৎসর বয়স্ক গিরিশচন্দ্রকে বিয়াল্লিশ বৎসর বয়স্ক দ্বিজেন্দ্রলালের সহিত প্রতিযোগী হিসাবে দাঁড়াইতে হইল।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গের আন্দোলনে সমগ্র দেশ তড়িৎস্পৃষ্টের মত আপাদমস্তক কাঁপিয়া উঠিয়া যে ভাব-তরঙ্গ সৃষ্টি করিল, নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের মধ্যে তাহা সমাহৃত হইয়া 'সিরাজদ্দৌলা, (১৯০৫), 'মীরকাশিম' (১৯০৬) ও 'ছত্রপতি' (১৯০৭) নাটকের আকারে আত্মপ্রকাশ করিল। 'সিরাজদ্দৌলা', 'মীরকাশিম' ও 'ছত্রপতি' নাটককে রুদ্ধকণ্ঠ জাতির স্বাধীনতা-

স্পৃহার প্রথম ও নির্ভর অভিব্যক্তি বলিলে একটুও অন্যায় বলা হয় না। ইংরাজ-বিদ্বেষের প্রতিমূর্তি সিরাজকে সমসাময়িক মানদণ্ডধারী বনিক ইংরাজরা যেমন বরদাস্ত করিতে পারে নাই, গিরিশচন্দ্রের সিরাজদ্দৌলার মধ্যে মৃত সিরাজের মূর্তি দেখিয়া তাঁহাদেরই রাজদণ্ডধারী বংশধরগণ সেই অশরীরী সিরাজের কণ্ঠরোধ না করিয়া স্বস্তি পায় নাই।

গিরিশচন্দ্রের কনিষ্ঠ সমসাময়িক দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের এবং ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদের মধ্যেও স্বাধীনতা অভিমানের পুনরুদ্বোধনের প্রয়াস দেখা যায়। দ্বিজেন্দ্রলালের উদ্দীপনা 'প্রতাপসিংহ' (১৯০৫এর পূর্বে রচিত ?), 'দুর্গাদাস' (১৯০৬), 'মেবার পতন' (১৯০৮) নাটকে শরীরী হইয়া দাঁড়াইল এবং ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের উদ্দীপনা 'প্রতাপাদিত্য', 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত', 'পদ্মিনী' (১৯০৬), 'চাঁদবিবি' (১৯০৭), 'নন্দকুমার' (১৯০৭), 'বাঙ্গলার মসনদ' (১৯১০) নাটককে মাধ্যম করিয়া অভিব্যক্ত হইল। কিন্তু যাহা অভিব্যক্ত হইল তাহার বিশেষ বৈশিষ্ট্যই দ্বিজেন্দ্রলালকে প্রথম শ্রেণীর নাট্যকারের মর্যাদা এবং ক্ষীরোদপ্রসাদকে শুধু নাট্যকার খ্যাতিটুকু দান করিল।

নাট্যশালায় আনন্দবাজার

দ্বিজেন্দ্রলাল এমন এক প্রতিভ-প্রভা লইয়া দেখা দিলেন যে নাট্য-রসিকগণ বিস্মিত পুলকে তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন না করিয়া পারিলেন না। নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর নাটকের আদর্শ—গতি ও পরিণতির পরিচয় পাইয়া তাঁহারা বাঙ্গলা নাট্য সাহিত্যে এক নূতন যুগের আবির্ভাব লক্ষ্য করিলেন। "যাঁহারা বাঙ্গলা থিয়েটারে যাইতে ঘৃণা বোধ করিতেন এমন অনেক ব্যক্তিও ডি. এল. রায়ের নাটকের অভিনয় দেখিতে যাইতে আরম্ভ করিলেন।" নবকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয়ের ভাষায়—"দ্বিজেন্দ্রলাল নাট্যশালাগুলিকে বেল্লিকবাজার হইতে

আনন্দবাজারে পরিণত হইবার প্রকৃষ্ট পথ প্রদর্শন করিলেন।" ১৩২০ সালের (১৯১৩) ভারতী পত্রিকায় শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় দ্বিজেন্দ্রলালের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন—"মানব-হৃদয়ের বিবিধ ভাব, সেন্টিমেন্ট, প্রবৃত্তি যেন আকার পাইয়া তাঁহার নাটকে মূর্তিমান হইয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গলা নাটকে সেন্টিমেন্টের এমন লীলা দ্বিজেন্দ্রলালের পূর্বে কোন নাট্যকারই স্বীয় নাটকে দেখাইতে পারেন নাই। তাহার উপর… তাঁহার নাটক প্রকাশিত হইবার পর হইতেই বাঙ্গলা রঙ্গমঞ্চ সমূহের নাটক-রচনা-প্রণালীতে একটা পরিবর্তন আসিয়াছে। থিয়েটারী ঢং হইতে মুক্তি পাইবার জন্য রঙ্গমঞ্চের নাটক চেষ্টা পাইতেছে। থিয়েটারী সাহিত্যে একটা intellectual আবহাওয়াও যে সম্প্রতি প্রবেশলাভের চেষ্টা করিতেছে, ইহাও দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক-সংসর্গের ফল।"

দ্বিজেন্দ্রলাল যে নূতন মানস-পরিমণ্ডল সৃষ্টি করিয়াছিলেন এ বিষয়ে অনেকেই এক মত। দ্বিজেন্দ্রলালের ব্যক্তিত্ব বিশ্লেষণ করিলে, এবং অভিনব সংস্কার পর্যালোচনা করিলেই আমরা নূতন পরিমণ্ডলের ব্যাখ্যা করিতে পারি। দ্বিজেন্দ্রলাল স্বভাবতঃ সংবেদনশীল, জ্ঞানের দিক দিয়া সঞ্চয় তাঁহার পর্যাপ্ত এবং অন্তর্ভূতির সূক্ষ্ম গতি-তরঙ্গ পর্যবেক্ষণের তাঁহার আণুবীক্ষণিক পারদর্শিতা। ঐ পারদর্শিতা আসিয়াছিল চিত্তের সংবেদনশীলতা হইতে এবং আংশিকভাবে শেক্সপীয়র প্রভৃতি নাট্যকারের নাটক অনুশীলনের ফলে। তিনি নিজেই বলিয়াছেন যে শেক্সপীয়রের নাটক তিনি বার বার পড়িতেন। এই বার বার পঠনের ফলে দ্বিজেন্দ্রলালের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর নাটকের আকৃতিক ও প্রাকৃতিক আদর্শের ধারণা সহজ হইয়া গিয়াছিল, এবং আর একটি ধারণাও বদ্ধমূল হইয়াছিল যে নাটক দৃশ্যতঃ ও কাব্যতঃ উভয়তঃ চিত্তাকর্ষক না হইলে সার্থক সৃষ্টি হইয়া উঠে না। তিনি বাঙলা নাট্য-সাহিত্যে "স্বাভাবিকতা ও আখ্যানবস্তু-গঠনে অসাধারণ নৈপুণ্য" দেখিয়াছিলেন, কিন্তু "তাহাতে কবিত্বের অভাব" ও উপলব্ধি

করিয়াছিলেন। তাই কবিত্বের অভাব পরিপূরণ করিবার ঐকান্তিক চেষ্টা তাঁহার প্রত্যেক নাটকেই সংলক্ষ্য হইয়া দেখা দিয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের সর্বাপেক্ষা অসামান্য বৈশিষ্ট্য—হৃদয়-ভাবের ও ব্যক্তিত্বের দ্বান্দ্বিক গতির ভিতর দিয়া নানা-ব্যক্তিত্ব-যুক্ত চরিত্র-সৃষ্টি। এইখানেই দ্বিজেন্দ্রলাল অদ্বিতীয়। অন্তর্দ্বন্দ্বের গতি-বৈচিত্র্য দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্যে এমন সজীব ভাবে রূপ পাইয়াছে, অন্তর্দ্বন্দ্ব এমন ভাব-বর্ণালীতে বিচ্ছুরিত হইয়াছে, কবিত্বের সহিত প্রকাশের বা রূপায়ণের এমন অন্তরঙ্গ যোগ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে, সমালোচক Stoll শেকৃসপীয়র সম্বন্ধে যে-কথা বলিয়াছেন সেই ভাষায়ই বলা যায়—the illusion he offers is the widest and highest the emotion he arouses the most irresistible and overwhelming.

শশাঙ্কমোহন সেন মহাশয় যথার্থ কথাই লিখিয়াছেন "দ্বিজেন্দ্রলালের লেখনীতে এমন একটা তীক্ষ্ণতা, সুস্পষ্ট ছবি গ্রহণের শক্তি, ঋজুতা, বাস্তব-বুদ্ধি এবং প্রমোদ-আনন্দের পরিচয় আছে যাহা পূর্ব পূর্ব কবিগণের মধ্যে দুর্লভ—তাঁহার চরিত্রাঙ্কন-প্রণালীর মধ্যেও তেমন একটা সুমার্জিত সীমা পরিচ্ছিন্ন এবং রেখা ব্যবহারের প্রণালীও বোধগম্য।" দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য -জাতিপ্রীতি ও দেশহিতৈষণার সঙ্গে সঙ্গে জাতি-দেশ-নিরপেক্ষ বিশ্বমানবতার বা মনুষ্যত্বের মহিমা প্রচার। তাঁহার মানসী চারণী মেবার-পতনের মানসীর মুখে আমরা উদাত্ত উদ্‌ঘোষণা পাই—"যেমন স্বার্থ চাইতে জাতীয়ত্ব বড তেমনি জাতীয়ত্বের চেয়ে মনুষ্যত্ব বড। জাতীয়ত্ব যদি মনুষ্যত্বের বিরোধী হয় ত মনুষ্যত্বের মহাসমুদ্রে জাতীয়ত্ব বিলীন হয়ে যায় যাক।" এই উদার মনুষ্যত্বের উদ্বোধন দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের নৈতিক প্রেরণা—আদর্শগত লক্ষ্য। বিষয়-গরিমায়ও দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক দ্যুতিমান ও দুর্লভ এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যায়।

'হাস্য ও অশ্রুরেখা, কৌতুক ও কল্পনা'

নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল (১৮৬৩-১৯১৩) তীব্র ব্যঙ্গের ঝাঁঝভরা হাসির বাষ্প ছাড়িতে ছাড়িতে ১৩০২ সালে (১৮৯৫-৯৬) বাঙলা নাট্য-সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। 'কল্কি-অবতার'এ (১৩০২) তিনি পণ্ডিত, গোঁড়া, নব্যহিন্দু, ব্রাহ্ম, বিলেত-ফেরত এই পঞ্চ সম্প্রদায়কে ঢেঁড়াদার ডাকিয়া নির্মমভাবে সতর্ক করিতেই, "হাসির গানের" নূতন রসের আস্বাদ পাইয়া বঙ্গসমাজে আনন্দের অভিনব উৎস উৎসারিত হইয়া দ্বিজেন্দ্রের জয়জয়কার ধ্বনিত হইয়াছিল।" ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে (১৩০৪) থিয়েটারে অভিনীত প্রথম পুস্তক "বিরহ" নামক হাস্যরসাত্মক নাটকখানি প্রকাশিত হইল তথা হাস্যরসের কবি বলিয়া তাঁহার নামও ছড়াইয়া পড়িল। তারপর ১৩০৭ সালে (১৯০০) "ত্র্যহস্পর্শ বা সুখী পরিবার" এবং ১৩০৮ সালে "বহুৎ আচ্ছা" (প্রায়শ্চিত্ত) প্রকাশিত ও অভিনীত হইয়া কবি-খ্যাতি আরো দূরপ্রসারী হইল। 'আষাঢ়ে' নামক (১৮৯৮) ব্যঙ্গ কবিতা সংগ্রহের সমালোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যাহা লিখিয়াছিলেন, ইহাদের সম্বন্ধে সেই একই কথা প্রযোজ্য—"বাঙলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতন এবং কবি অপূর্ব প্রতিভাবলে ইহার ভাষা, ভঙ্গী, বিষয় সমস্তই নিজে উদ্ভাবন করিয়া লইয়াছেন।" দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রবেশটি বেশ যে অভিনব ও চমকপ্রদ হইয়াছিল, সে কথা বলাই বাহুল্য।

'আষাঢ়ে' প্রকাশিত হইলে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন—"যাহাতে হাস্য ও অশ্রুরেখা, কৌতুক ও কল্পনা, উপরিতলের ফেনপুঞ্জ এবং নিম্নতলের গভীরতা একত্র প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাই তাঁহার কবিত্বের যথার্থ পরিচয়। তিনি যে কেবল বাঙালীকে হাসাইবার জন্য আসেন নাই, সেই সঙ্গে তাহাদিগকে ভাবাইবেন এবং মাতাইবেন এমন আশ্বাস দিয়াছেন।" দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথের আশা সবটুকুই পূর্ণ করিয়াছেন—তিনি

বাঙালীকে শুধু হাসাইয়াই ক্ষান্ত হন নাই, প্রকৃতই তাহাদিগকে "ভাবাইয়া" ও "মাতাইয়া" তুলিয়াছিলেন। পরবর্তী নাটকগুলিতে আমরা এই ভাবনা ও মাতনার অপূর্ব সমন্বয় দেখিতে পাই।

'পাষাণী' (১৯০০), 'সীতা' (১৯০২) এবং 'তারাবাঈ' (১৯০৩)—এই তিনখানি নাট্য-কাব্য (কবিতায়) লেখার পরে দ্বিজেন্দ্রলাল ১৯০৫ হইতে ১৯১২ এই সময়ের মধ্যে ক্রমান্বয়ে নিম্নলিখিত নাটকগুলি রচনা করেন :—

১। প্রতাপসিংহ (১৯০৫ ?) ২। দুর্গাদাস (১৯০৬)
৩। নূরজাহান (১৯০৬) ৪। মেবারপতন (১৯০৮)
৫। সাজাহান (১৯০৮) ৬। চন্দ্রগুপ্ত (১৯০৯)
৭। বঙ্গনারী (১৯১০) ৮। পুনর্জন্ম (১৯১০)
৯। পরপারে (১৯১১) ১০। ভীষ্ম (১৯১২)
১১। আনন্দবিদায় (১৯১২) ১২। সিংহলবিজয় (১৯১৩)
(প্যারডি নাটক)

উপসংহারে বক্তব্য এই—দৃশ্যত্ব এবং কাব্যত্ব—এই দুই ধর্মের চমৎকার সমন্বয় দৃশ্যকাব্যের জন্য যদি একান্ত অপরিহার্য হয় অর্থাৎ নাটককে যদি "great stage and literary success" হইতে হয়, স্বাভাবিক কামনার এবং সামাজিক বা আদর্শগত প্রেরণার—pleasure principle ও reality principle-এর পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া তথা দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়া চমৎকার চরিত্রসৃষ্টি এবং রসসৃষ্টি করা যদি নাটকের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে দ্বিজেন্দ্রলাল শুধু স্রষ্টা নহেন, প্রথম শ্রেণীর স্রষ্টাদের মধ্যেও শক্তিমান্ স্রষ্টা। তাঁহার সৃষ্টি আপাদ-মস্তক নিখুঁত এ কথা যেমন বলা চলে না—কোন নাট্যকার সম্বন্ধেই বলা চলে না—তেমন একথা খুবই জোর দিয়া বলা যায় গুণসন্নিপাতের মধ্যে দোষ নিমজ্জিত হইয়া যায়। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে সমালোচনার আলোকে আমরা এই গুণ-দোষ উভয়ই দেখিতে পাইব।

চন্দ্রগুপ্তের সাধারণ সমালোচনা

চন্দ্রগুপ্ত একখানি পঞ্চাঙ্ক ঐতিহাসিক নাটক। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের শৌর্যবীর্যময় জীবন-কথা লইয়া নাটকখানি রচিত। চন্দ্রগুপ্তের জীবনে যে কয়টি ঐতিহাসিক সম্পর্কের সন্ধান পাওয়া যায় তাহাদের প্রত্যেকটিকে নাট্যকার নাটকের মধ্যে আপেক্ষিক গুরুত্ব অনুসারে স্থান করিয়া দেওয়ার আয়োজন করিয়াছেন। চন্দ্রগুপ্তের কথা মনে করিতেই যাঁহার কথা সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে সেই বিদ্বান-বিচক্ষণ-কূট চাণক্য বা কৌটিল্য তাঁহার সর্বদমন ব্যক্তিত্ব লইয়া যেমন 'ব্যক্তি' চন্দ্রগুপ্তের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, তেমনি নাটকের উপরও সেই অনুপাতেই আধিপত্য বিস্তার করিয়া আছেন। দ্বিতীয়তঃ চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য আক্রমণ করিতে আসিয়া যে গ্রীক বীরকে কণ্ঠাপণে সন্ধি ক্রয় করিয়া ফিরিয়া যাইতে হইয়াছিল, সেই সেলুকসের তথা গ্রীক-সম্পর্কের কথাও যথোচিত স্থান লাভ করিয়াছে। তৃতীয়তঃ বহুপ্রচলিত ও ব্যাপক কিংবদন্তীতে এবং সাহিত্যিক সাক্ষ্যে যে পার্বত্য শক্তির সহায়তার কথা পাওয়া যায় সে প্রসঙ্গও উপেক্ষিত হয় নাই।

নাটকের ধারা ও উপধারা

নাটকখানির নাম, উদ্দেশ্য ও কাহিনী-সংযোজনা লক্ষ্য করিলে বলা যায় যে নাটকে একটি প্রধান ও তিনটি অপ্রধান কাহিনী-ধারা সংগ্রথিত করা হইয়াছে। প্রধান ধারা চন্দ্রগুপ্তের জীবনের ঘটনা-পরম্পরা—সেকেন্দার সাহের সহিত সাক্ষাৎকার হইতে চাণক্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ, নন্দের পরাজয় (ও নিধন), রাজ্যজয়, গ্রীকশক্তির পরাভব প্রভৃতি, ক্রমে ভারতের অধীশ্বরত্বলাভ এবং হেলেন ও ছায়ার সহিত বিবাহ পর্যন্ত ব্যাপ্ত। তিনটি অপ্রধান ধারা বা উপধারা :—

(১) সেলুকস, হেলেন ও আন্টিগোনাসের কথা।

(২) চাণক্য, নন্দ, আত্রেয়ী কথা।

(৩) চন্দ্রকেতু ও ছায়া কথা।

প্রথম উপধারা—সেলুকস ও আন্টিগোনাসের সামরিক প্রতিস্পর্দ্ধা হইতে হেলেনকে কেন্দ্র করিয়া সেই প্রতিস্পর্দ্ধার সামাজিক মর্যাদা বাদের প্রেরণায় ঘোর শত্রুতায় পর্য্যবসান, সেলুকসের পরাজয় এবং বিজয়ী হইয়াও আন্টিগোনাসের আত্মিক পরাজয়, পিতৃপরিচয় জানিবার জন্য বিক্ষিপ্ত চিত্তে আন্টিগোনাসের মাতার অনুসন্ধান এবং শেষে পিতৃপরিচয়ের উদ্ধার—দুই যুযুধান জাতির মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠাকল্পে হেলেনের চন্দ্রগুপ্তকে পতিত্বে বরণ এবং আন্টিগোনাস ও সেলুকসের মধ্যে প্রকৃত সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার পরে আন্টিগোনাসের চন্দ্রগুপ্তের সভায় গমন পর্যন্ত প্রবাহিত।

দ্বিতীয় উপধারা—কন্যার অপহরণে মেরুদণ্ডভাঙ্গা চাণক্যের স্বর্গচ্যুতি ও স্বর্গপ্রাপ্তির ইতিহাস—নরক হইতে স্বর্গে উঠিবার কথা। বিদ্বান-বিচক্ষণ-কূট, প্রতিহিংসা-মত্ত কৌটিল্যের আচরণের তলে যে কন্যাস্নেহাতুর পিতা-চাণক্য ছিল, এই উপধারা সেই পিতারই বিচ্ছেদ-ব্যথার ও মিলন-সান্ত্বনার কথা।

তৃতীয় উপধারা—একদিকে চন্দ্রকেতুর অকৃত্রিম, নিষ্কাম এবং অটল বন্ধুপ্রীতি ও অন্যদিকে তাহার ভগিনী ছায়ার ঐকান্তিক ভালবাসার বিচিত্র ক্রমবিবর্ত—সানুরাগ আরম্ভ হইতে অনাহূত আত্মত্যাগ অবধি প্রত্যাখ্যান, অভিমান ও বেদনায় করুণ অভিব্যক্তির মধ্য দিয়া এক মিলনাত্মক ও পরিতৃপ্ত পরিণাম—ছায়ার মৌন ও আত্মসমর্পণে-একান্ত প্রেমের গতিধারা এখানে অভিমানে ক্ষুব্ধ প্রত্যাখ্যানে বেদনার্ত হইয়া মিলনের প্রশান্ত সাগরে গিয়া শেষ হইয়াছে।

বহুধারার নাটকীয় ত্রুটি

প্রত্যেকটি উপধারার মধ্যে ক্রমপরিণতি ও গতিসৃষ্টি করিতে যাইয়া নাট্যকার প্রত্যেকটিকে যতখানি পরিসর দিয়াছেন এবং যে-পরিমাণে ভাব-মুখর ও আবেগ-চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছেন, তাহাতে প্রধান ধারার গতি বেশ ব্যাহত হইয়াছে বলিতেই হইবে। নাটকের গতি-পরিণতির প্রয়োজন সিদ্ধ করাই উপধারার একমাত্র বা মুখ্য উদ্দেশ্য হইলেও স্বতন্ত্রভাবে একটা পরিণতির দিকে বিকশিত হওয়াও বাঞ্ছনীয়। এই নীতি অবলম্বন করিয়াই নাট্যকার উপধারার মধ্যে ক্রমপরিণতি সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং তাহারই ফলে প্রয়োজনাতিরিক্ত ব্যাপার উপস্থাপিত করিয়াছেন। তাই দেখা যায় চাণক্যকে তিনি আত্রেয়ীর হাত ধরাইয়া মনুষ্যত্বের স্বর্গে পৌঁছাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। আন্টিগোনাসের জন্ম-রহস্য উদ্ঘাটন করিবার জন্য সুদূর গ্রীসের পল্লীগ্রামের এক নিভৃত কুটীরে তাহার মাতাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন এবং আন্টিগোনাসকে গ্রীস হইতে ভারতবর্ষে আনিয়া সেলুকসের কাছে—তাহার "পিতার সমাচার" শুনাইয়াছেন। এই সকল প্রয়োজনাতিরিক্ত বা সুদূর-প্রয়োজন উপস্থাপনা রস-ভাব-মাধুর্যে অতুলনীয় আকর্ষণ সৃষ্টি করিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রধান ধারা যতখানি ব্যক্ত হওয়া উচিত ততখানি ব্যক্ত হইতে পারে নাই এবং এই না হওয়া একটা ত্রুটি। চাণক্যের সর্বদমন ও অদ্ভুত ব্যক্তিত্বের ঔজ্জ্বল্য যে চন্দ্রগুপ্তের দীপ্তিকে হীনপ্রভ করিয়া রাখিয়াছে ইহার জন্য নাট্যকারকে দায়ী করিয়াও তাহার পক্ষে এইটুকু বলা চলে যে, চন্দ্রগুপ্তের জীবন-ইতিহাসে চাণক্যের অপ্রতিহত প্রভাবের কথা ইতিহাসে এত কথিত এবং কিংবদন্তীতে এত পল্লবিত যে চাণক্যকে 'চাণক্য' করিতে হইলে অদ্ভুত ক্ষমতাশালী ও ব্যক্তিত্বশালী না করিয়া উপায় নাই; চন্দ্রগুপ্তের অভ্যুত্থানের সঙ্গে চাণক্যের মন্ত্রণা এত ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে চাণক্যকে

দৃশ্যে রাখিয়া চন্দ্রগুপ্তকে কোন ভাবেই প্রদর্শন করা চলে না; মনে হয় চাণক্যকে বড না করিলে চন্দ্রগুপ্তই যেন ছোট হইয়া যায়। এই কারণেই চন্দ্রগুপ্ত নাটকে চাণক্যের প্রাধান্য মনে হয় অনিবার্য এবং অপরিহার্যও। তবে অতিথি আসিয়া গৃহস্থকে খেদাইলে যেরূপ অন্যায় হয়, সেইরূপ অন্যায় হইয়াছে কি না বিচার্য বিষয়।

নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র কে?

এ কথা প্রথমেই স্বীকার করিয়া লইতে হইবে যে নাটকখানির উদ্দেশ্য চন্দ্রগুপ্তের জীবন-কথা উপস্থাপিত করা এবং সেই কারণেই অন্যান্য চরিত্রে দীপ্তি প্রতিপত্তি এবং আকর্ষণ সত্ত্বেও চন্দ্রগুপ্তই কেন্দ্রীয় চরিত্র। চন্দ্রগুপ্তকে কেন্দ্রশক্তি বলিয়া স্বীকার না করিলে নাটকখানির দৃশ্য সংযোজনা কোন ভাবেই ব্যাখ্যা করা চলে না। বিশেষতঃ প্রথম ও শেষ দৃশ্য আপত্তিকর ভাবে নিরর্থক হইয়া যায় এবং গ্রীক দৃশ্যগুলিরও সার্থকতা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। চন্দ্রগুপ্তের প্রয়োজনে এবং তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়াই যে মোটামুটি দৃশ্যগুলি সজ্জিত হইয়াছে, একটু অনুধাবন করিলেই দেখা যায়।

প্রথম দৃশ্যে চন্দ্রগুপ্তের বীরত্বের সহিত তাঁহার জীবনের প্রধান এবং প্রতিপাদ্য ব্যাপারের উদ্‌ঘোষণা দেখা যায়; সেকেন্দার সাহের মুখে আমরা যে ভবিষ্যদ্বাণী শুনি তাহাই নাটকের বিষয়োপস্থাপন বলিয়া ধরিতে হইবে—এইভাবে চন্দ্রগুপ্তের হৃতরাজ্য উদ্ধার এবং দিগ্বিজয়ই নাটকখানির মূল বর্ণনীয় বিষয়। দ্বিতীয় দৃশ্যের অদ্ভুত চাণক্য এবং তৃতীয় দৃশ্যের অপমানিত চাণক্য—সেই বিক্ষুব্ধ ব্রাহ্মণ্যশক্তি যাহার সাহায্যে চন্দ্রগুপ্ত হৃতরাজ্য উদ্ধার করেন এবং দিগ্বিজয়ী বীর হন। তৃতীয় দৃশ্যের শেষাশেষি চন্দ্রগুপ্তের প্রবেশ এবং মায়ের অপমানের প্রতিশোধ লইবার সঙ্কল্প সক্রিয় চন্দ্রগুপ্তকে দর্শকের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছে। চতুর্থ দৃশ্যে—

চন্দ্রগুপ্তেরই আহ্বানে চাণক্য আসিলেন এবং আসিয়া চন্দ্রগুপ্তকে দিয়া পা ছোঁয়াইয়া প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইয়া মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিলেন। এই দৃশ্যেই পার্বত্যশক্তির প্রতিনিধি চন্দ্রকেতুর সেবাপরায়ণ বন্ধুত্বের পরিচয় পাওয়া যায় এবং ছায়ার অনুরাগের 'কিরণমাখা পাখা' দেখা যায়। প্রথম অঙ্কে চন্দ্রগুপ্তই যে কেন্দ্রীয় চরিত্র এ বিষয়ে কোন সন্দেহ আসিতে পারে না।

দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে কন্যা-স্নেহ-দুর্বল সেলুকস ও হেলেনের—গ্রীক উপধারার—উপস্থাপন করিলেও "সেই মগধের রাজপুত্র।" হেলেনের মনের উপর প্রতিফলিত হইয়া দর্শকের চোখের সম্মুখে একবার ভাসিয়া উঠে। দ্বিতীয় দৃশ্যে যুদ্ধক্ষেত্রে চাণক্যের শিবিরে, অনিবার্য যুদ্ধের বাধা হইয়া শুধু মুরাই দেখা দেয় নাই, মুরার কাকুতি অপেক্ষা বিপত্তিজনক বাধা চন্দ্রগুপ্তেরই 'উচ্চাশার চেয়ে বলবতী একটা প্রবৃত্তি।' এ দৃশ্যে চাণক্য, মুরার ও চন্দ্রগুপ্তের চরিত্রের ব্যাখ্যাকার হইয়া আছেন—তাঁহার নিজের 'প্রতিহিংসা-জ্বালা ও মর্মদাহ' যতই থাক। তৃতীয় দৃশ্য গ্রীক উপধারার প্রস্তুতি মাত্র এবং চতুর্থ দৃশ্যে ছায়ার ঐকান্তিক প্রেমের অভিব্যক্তির এবং চন্দ্রগুপ্তের 'বিপন্ন অবস্থা'র জন্যই আমরা কৌতূহলী হই। পঞ্চম দৃশ্যে চন্দ্রগুপ্তের 'ক্লৈব্য' দূরীকরণের জন্য চাণক্যের বৈচক্ষণ্য প্রয়োগ দেখা যায়; এ দৃশ্যের উদ্দেশ্য চন্দ্রগুপ্তের চরিত্রের দ্বৈত ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্ব দেখান। এই পরাজয়ে চাণক্যের প্রতিজ্ঞা পূরণ ব্যাহত হইবে—এ আশঙ্কা কোথাও ব্যক্ত হয় নাই, ইহাই ব্যক্ত হইয়াছে যে চন্দ্রগুপ্ত যেন—"মুহূর্ত্তে জীবনের সাধনা নিষ্ফল" করিয়া না দেয়। এই অঙ্কেও চন্দ্রগুপ্তই কেন্দ্রীয় চরিত্র। দ্বিতীয় অঙ্কেই চন্দ্রগুপ্তের জীবনের প্রথম ব্যাপার "রাজ্যোদ্ধার" নিষ্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

তৃতীয় অঙ্কে প্রথম দৃশ্যে আন্টিগোনাসের স্বদেশ যাত্রা—পিতৃপরিচয় সংগ্রহের উদ্দেশ্যে; দ্বিতীয় দৃশ্যে কারাগারে আবদ্ধ নন্দ ও কাত্যায়নের কথোপকথনের ভিতর দিয়া কাত্যায়নের সুপ্ত প্রতিহিংসাপরায়ণতার একটা উচ্ছ্বাস প্রকাশ পাইয়া কাত্যায়নের ক্ষুব্ধ হৃদয়কে স্পষ্ট করিয়া তোলে। আর একটি

বিষয়েও দর্শক ভাবিত হয়—নন্দের রক্তে রঞ্জিত হস্তে শিখা বাঁধিবার প্রতিজ্ঞা যে করিয়াছে সেই চাণক্যের কোপদৃষ্টি হইতে নন্দকে বাঁচাইতে চন্দ্রগুপ্ত সক্ষম হইবে কি? তৃতীয় দৃশ্যে নন্দকে বলি দেওয়ার উদ্যোগ পর্ব—চাণক্যের প্রতিজ্ঞা পূরণের জন্য দৃঢ়পদে অগ্রসরণ। চতুর্থ দৃশ্যে আমরা চন্দ্রগুপ্তের বীরত্বের পরোক্ষ প্রমাণ পাই—এক বৎসরে চন্দ্রগুপ্ত ভারতে গ্রীক উপনিবেশ নির্মূল করিয়াছেন, তাই সেলুকস ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া শোধ দেওয়ার জন্য বদ্ধপরিকর। পঞ্চম দৃশ্যে ছায়ার প্রেমকে চন্দ্রগুপ্তের কাছে ব্যক্ত করিয়া তাহার জীবনে ছায়া-হেলেনের দ্বৈত আকর্ষণের সূত্রপাত করা হইয়াছে। ষষ্ঠ দৃশ্যে চাণক্য তাঁহার প্রতিজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ করিয়াছেন, কিন্তু মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের আজ্ঞা অমান্য করিয়া আর একটি বিরোধকে অনিবার্য করিয়া তুলিয়াছেন। মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের আত্ম-প্রতিষ্ঠা-কামনার সহিত চাণক্যের কর্তৃত্বের সংঘর্ষ দেখা দিল। এখানে চন্দ্রগুপ্তের অশরীরী এবং শরীরী ব্যক্তিত্ব সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে চন্দ্রগুপ্তের জীবনের রাজনৈতিক সঙ্কটের—গ্রীকদের সিন্ধুনদ পার হওয়া ও বিদ্রোহীদের ষড়যন্ত্রের আভাস দেওয়া হইয়াছে। এবং সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রী হিসাবে চাণক্যের যতখানি সতর্কতা ও কর্তব্য বাঞ্ছনীয় তাহাও দেখান হইয়াছে। আর দেখান হইয়াছে—পিতা চাণক্যের হৃদয়ের সেই করুণ হাহাকার। দ্বিতীয় দৃশ্যে চন্দ্রগুপ্ত ক্ষুব্ধ অভিমানে চন্দ্রকেতু ও চাণক্যকে বিতাড়িত করিয়া একাধিপত্য ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং "সত্যই মহারাজ" হইলেন, কিন্তু রাজনৈতিক সঙ্কটের পথ আরো সুগম করিয়া তুলিলেন। তৃতীয় দৃশ্যে মন্ত্রিহীন এবং বন্ধুহীন চন্দ্রগুপ্তকে আক্রমণ করিবার জন্য সেলুকসের উদ্যোগ বর্ণিত হইয়াছে, সুতরাং চন্দ্রগুপ্ত পরোক্ষতঃ উপস্থিত। চতুর্থ দৃশ্যে গ্রীক আণ্টিগোনাস তাহার পিতৃপরিচয় সংগ্রহ করিয়াছে তথা হেলেনের বক্ষ হইতে "পর্বত-ভার" নামাইবার আয়োজন করিয়াছে। পঞ্চম দৃশ্যে—রাজনৈতিক সঙ্কট দেখা দিয়াছে। "বাহিরে শত্রু ঘরে শত্রু"—চন্দ্রগুপ্ত "নিজের উপর প্রতিশোধ" লইবেন—"আত্মহত্যা" করিবেন।

এ আত্মহত্যা ভীরুর বা পলাতকের আত্মহত্যা নহে, এ আত্মহত্যা মহৎ-হৃদয়ের আত্ম-বিস্মৃতির ও ত্রুটির জন্য আত্ম-শাসন। যুদ্ধক্ষেত্রে নক্ষত্রখচিত মুক্ত নীল আকাশের তলে সৈন্যের মধ্যে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিতে করিতে মরিবার জন্য যে-চন্দ্রগুপ্ত অগ্রসর হইলেন, তাঁহাকে ভীরুতার কালিমা স্পর্শ করিতে পারে কি? এই দৃশ্যেই সঙ্কটের অবসান ঘটে—চাণক্য ও চন্দ্রকেতু আসিয়া চন্দ্রগুপ্তের পাশে দাঁড়াইলেন, চন্দ্রকেতুর ক্ষমা চন্দ্রগুপ্তের সমস্ত শূন্যতা পূর্ণ করিয়া দিল, সমস্ত গ্লানি নিঃশেষে মুছিয়া ফেলিল। ষষ্ঠ দৃশ্যে সেই ঐতিহাসিক সান্ধ- যাহার ফলে সেলুকসকে কন্যাদান করিতে হইয়াছে চন্দ্রগুপ্তকে—আর ছায়ার সমস্ত আশাকে দেওয়া হইয়াছে নির্মমভাবে দলিত করিয়া। এই অঙ্ক সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্রের ভাষায় বলা যায়—'প্রত্যক্ষনেতৃচরিত'।

পঞ্চম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে নন্দের পূর্বকথিত প্রমোদোদ্যানে সেলুকস ও হেলেনের কথোপকথনের মাঝে চন্দ্রগুপ্তের আবির্ভাব ও তাহার কথা চন্দ্রগুপ্তের মধ্যকার দ্বৈত আকর্ষণকে বেশ সুস্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছে। একদিকে প্রেম আর একদিকে কর্তব্য ও করুণা গ্রীক-বিজয়ী চন্দ্রগুপ্তের মধ্যে যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করিয়াছিল এখানেই তাহার প্রকাশ। এই অঙ্কটি মোটের উপর এ সমস্যারই একটি সমাধান। দ্বিতীয় দৃশ্যে চাণক্য-আত্রেয়ী-উপধারার পরিসমাপ্তি। তৃতীয় দৃশ্যে চন্দ্রগুপ্তের ছায়া সম্বন্ধীয় অবদমন এবং ছায়ার ব্যর্থ অবদমনের পরিচয় পাওয়া যায়। দূতের মুখে যখন শুনি—"সম্রাটেরও ঐ দশা" অথচ সম্প্রতি তাঁর বিবাহ?—তখন আমাদের বুঝিতে বাকী থাকে না— কোথায় যেন গলদ আছে। এই দৃশ্যটির নাটকীয় মূল্য খুবই বেশী এইজন্য, ইহা যেমন চন্দ্রগুপ্তের হৃদয়ের সংবাদ দেয়, তেমনি নাটকের ভাবী দৃশ্যেরও প্রাণশক্তি বৃদ্ধি করিয়া তোলে। চতুর্থ দৃশ্যে আমরা জানিতে পারি হেলেন "মানবের মঙ্গলহিতে আত্মবলিদান" দিয়াছে, সেলুকস ও চন্দ্রগুপ্তের বিদ্বেষবহ্নি নিজের শোণিতে নির্বাণ করিয়াছে, দুই যুধ্যমান জাতির মধ্যে পড়িয়া তাহাদের উদ্যত খড়্গ নিজের বক্ষ পাতিয়া লইয়াছে। আর এখানেই সেলুকস অ্যান্টিগোনাসের মুখে

তাহার পিতৃপরিচয় জানেন। পঞ্চম দৃশ্যে চন্দ্রগুপ্তের জীবনের 'ছায়া' সমস্যার সমাধান এবং হেলেনের জীবনে আন্টিগোনাস সমস্যার অবসান। আন্টিগোনাসের প্রবেশ বেশ নাটকীয় গতি সৃষ্টি করে, ছায়ার প্রবেশে তাহা আরও চঞ্চল হইয়া উঠে, এবং শেষে বেদনার্ত মুহূর্ত সহসা আনন্দে মুখরিত হইয়া যায়।

কেন্দ্রীয় চরিত্র নিষ্প্রভ কেন?

দৃশ্যগুলি পর্যবেক্ষণ করিবার পর নি:সংশয়ে বলা যায়— চন্দ্রগুপ্তই নাটকখানির কেন্দ্রীয় চরিত্র— যদিও চরিত্রটি আকর্ষণের দিক দিয়া তেমন স্বাতন্ত্র্যলাভ করিতে পারে নাই। চাণক্যে যত দীপ্তিই থাক, আর চন্দ্রগুপ্তের উপর তাঁহার যত আধিপত্যই থাক, চাণক্যকে কোনভাবেই কেন্দ্রীয় চরিত্র বলা যায় না। অন্ততঃ নাটকখানি হইতে তাহা প্রমাণ করা চলে না। বর রূপে-গুণে বরযাত্রী অপেক্ষা হীন হইলেও বরের আসন তাহারই প্রাপ্য।

আর চন্দ্রগুপ্তের শৌর্যবীর্য ও মহত্ত্ব প্রকাশ করিতে নাট্যকার কোন সুযোগের অপব্যবহার করিয়াছেন এ কথাও বলা চলে না। প্রত্যক্ষ অপেক্ষা অনুমানের কাচ-খণ্ডের ভিতর দিয়া শৌর্যবীর্যের প্রভা বিচ্ছুরিত হইয়াছে, এ কথা স্বীকার করিবার সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও স্বীকার্য যে, বিচ্ছুরিত প্রভার আভায় দীপ্তি আশানুরূপ না হইলেও হতাশকর নহে। মঞ্চের সামর্থ্য সীমাবদ্ধ বলিয়া নাট্যকারের অনেক বিষয়ে প্রত্যক্ষ অপেক্ষা পরোক্ষের আশ্রয় না লইয়া গত্যন্তর থাকে না। সেই কারণেই কার্য অপেক্ষা বাক্য দ্বারাই অনেক ক্ষেত্রে বীরত্ব প্রকাশ করিতে হয়, ঘটনার তৃষ্ণা বর্ণনা দ্বারা মিটাইতে হয়—রাজ্যজয়, বিপ্লব, যুদ্ধ প্রভৃতির বিক্রম, বীরত্ব, উদ্যোগ ও পরিসমাপ্ত ফল বর্ণনার দ্বারাই ব্যক্ত করিতে হয়। চন্দ্রগুপ্ত নাটকে নাট্যকারকে অনেক পরিমাণে এই সকল অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। চন্দ্রগুপ্তের জীবন—এক কথায় বলা

চলে—যুদ্ধ-শিবিরের জীবন;—রাজ্যোদ্ধার, রাজ্য বিস্তার, গ্রীক বিতাড়ন—চন্দ্রগুপ্তের শৌর্যবীর্যের প্রধান নিদর্শন। সুতরাং নাট্যকারকে ঘটনা অপেক্ষা বর্ণনা দ্বারা অনেক কায সম্পন্ন করিতে হইয়াছে এবং তাহা করিতে যাইয়া চরিত্রের সহজ্ গতি-চাঞ্চল্যকে অন্যভাবে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতে হইয়াছে।

আমার মনে হয়—প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে চন্দ্রগুপ্তের আঘাতে ভূপতিত আন্টিগোনাসের তরবারি চন্দ্রগুপ্তের যে শৌর্যের নির্বাক পরিচয় দিয়াছে, সেকেন্দার সাহর সম্মুখেই স্পর্দ্ধিত বচনে ও তরবার উন্মোচনে যে-শৌর্যের যে দীপ্ত প্রকাশ ঘটিয়াছে সে শৌর্য-জ্যোতি চন্দ্রগুপ্তকে কখনও ত্যাগ করে নাই। প্রথম যুদ্ধে তাঁহার যে পরাজয় ঘটিয়াছিল তাহা তাঁহার দুর্জয় শৌর্যকে একটুও মলিন করিতে পারে নাই এই জন্য যে সে পরাজয় তাহার শৌর্যের পরাজয় নহে, সে পরাজয় তাহার নিজের হৃদয়ের কাছে নিজেরই তরবারির সঙ্কল্পিত হিংসার পরাজয়, ভ্রাতৃবাৎসল্যের কাছে উচ্চাকাঙ্ক্ষার পরাজয়। তারপর চতুর্থ অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যে শত্রু-সৈন্য-পরিবেষ্টিত চন্দ্রগুপ্তের মধ্যে আমরা যে বিক্ষোভ দেখিতে পাই, তাহাও তাঁহার শৌর্য-জ্যোতিকে ম্লান করিয়া তুলে নাই। "যাক্ সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে যাক্—আমি যুদ্ধ কর্ব না"—ভীরু চন্দ্রগুপ্তের পলাতক সাহসের আত্মসমর্পণ নহে, ইহা সেই চন্দ্রগুপ্তেরই আত্মহত্যার জন্য প্রস্তুতি যে নিজের বিবেকের কাছে কিছুতেই মুখ দেখাইতে পারিতেছে না, যে-চন্দ্রগুপ্ত সাম্রাজ্যের বিনিময়ে জীবনের বিনিময়ে চন্দ্রকেতুর এক বিন্দু ক্ষমার জন্য লালায়িত হইয়া উঠিয়াছে। সমগ্র নাটকখানির মধ্যে এমন কোন স্থান নাই যেখানে চন্দ্রগুপ্তের শৌর্য-জ্যোতি ম্লান হইয়া বা নির্বাপিত হইয়া গিয়াছে। তবে যতখানি 'প্রত্যক্ষবৎ' হইলে চন্দ্রগুপ্তের চরিত্রটি দর্শক বা পাঠকের হৃদয়ে দাগ কাটিয়া বসিতে পারিত, ততখানি 'প্রত্যক্ষবৎ' হইয়া উঠে নাই এবং না-হইয়া উঠা যে একটা ত্রুটি পূর্বেই বলা হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গেই আর একটা কথা বলা প্রয়োজন যে নাটকখানির পরিসমাপ্তি

কোন রাজনৈতিক ঘটনার অর্থাৎ রাজ্যোদ্ধার বা রাজ্য বিস্তারের কোন এক চমৎকার পর্যায়ে ঘটে নাই। রাজনীতি চন্দ্রগুপ্তের জীবনে যে ব্যক্তিগত সমস্যা উপস্থিত করিয়াছিল সেই সমস্যার সমাধানেই নাটকখানির উপসংহার ঘটিয়াছে। পার্বত্যশক্তির সাহায্য লইতে গিয়া চন্দ্রগুপ্ত যে মুগ্ধা যুবতীর জীবনের সর্বস্ব হইয়া পড়িলেন, সেই অনুরাগিনী ছায়ার প্রতি কর্তব্যের আকর্ষণে এবং সেলুকসের সহিত বৈবাহিক সর্তে সন্ধির ফলে যে গ্রীক যুবতীকে চন্দ্রগুপ্তের কাছে আত্মসমর্পণ করিতে হইয়াছিল, সেই রূপবতী হেলেনের প্রেমমোহের আকর্ষণে সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের জীবনে বেশ এক দ্বন্দ্ব দেখা দিয়াছিল। যে ছায়া আশ্রান্ত ধারায় জীবনকে চন্দ্রগুপ্তের পায়ে ঢালিয়া দিয়াছে, প্রাণ তুচ্ছ করিয়া তাহার প্রাণ রক্ষা করিয়াছে, যে ছায়া তাহার চিন্তায় নিজের অস্তিত্বকে একেবারে লীন করিয়া দিয়াছে, সেই ছায়াকে নৈরাশ্যের অন্ধকারে চিরদুঃখিনী করিয়া ছাড়িয়া দিয়া চন্দ্রগুপ্তের স্বস্তি কোথায়? হেলেনকে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করিবার পথে ছায়ার চোখের জল কাঁটা হইয়া পায়ে না বিঁধিয়া পারে না। উপসংহারে আমরা ছায়া-হেলেন-দ্বন্দ্বেরই এক শ্যাম-ও-কুল রাখা সমাধান দেখিতে পাই।

কিন্তু নাট্যকার চন্দ্রগুপ্তের মধ্যে প্রেমের দ্বন্দ্বকে রাজকীয় সংযমের কঠিন আবরণের তলে অতি সূক্ষ্মভাবে মাত্র দুই চারিটি কথায় এবং ঈষদলক্ষ্য হৃদয়াবেগে ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ফলে এই দ্বন্দ্বের আবেগ-চাঞ্চল্য ক্ষণকালীন হওয়ায় পাঠক বা দর্শকের হৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়া তেমন গম্ভীরভাবে আন্দোলিত করিতে পারে না। এই কারণেই চরিত্রটি তাহার প্রাপ্য কৌতূহল অনেকখানি হারাইয়া ফেলে। কিন্তু এই কথা বলিবার সঙ্গে সঙ্গেই যে কথা না আসিয়া যায় না সে এই যে, নাটকখানির উদ্দেশ্য বিচার করিয়া দেখা যায় চন্দ্রগুপ্তের প্রেম নাটকখানির মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় নহে। তাহার রাজনৈতিক জীবনের গতিপথে প্রেম আসিয়া সিংহাসন পাতিয়াছিল এবং তাহার জীবনের

এক দিকে এক সমস্যা সৃষ্টি করিয়াছিল। নাটকখানির শেষের দিকে এই সমস্যার সমাধান করা হইলেও তাহাকে মুখ্য বলিয়া গ্রহণ করা হয় নাই। হেলেনের সহিত চন্দ্রগুপ্তের বিবাহ নিছক ব্যক্তিগত এবং প্রেমঘটিত ব্যাপার হইতে পারে নাই এই জন্য যে হেলেন সন্ধির পণ স্বরূপেই হস্তগত হইয়াছিল এই কারণেই হেলেনের সহিত চন্দ্রগুপ্তের বিবাহ বিজয়োৎসবেরই পরিশিষ্ট ছাড়া আর কিছু নহে, রাজনৈতিক আবহাওয়া সেখানে উৎসবের আলোকমালাকে কুয়াশার মত আচ্ছন্ন করিয়া থাকে। দেখিতে গেলে এ বিবাহে চন্দ্রগুপ্তের প্রেমের প্রতিষ্ঠা হয় নাই, হইয়াছে আত্মপ্রতিষ্ঠা। হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের মধ্যে যে আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রথম চরিতার্থতা দেখা দিয়াছে, দাক্ষিণাত্য বিজয় ও গ্রীক বিতাড়নে যাহার বিশাল ব্যাপ্তি ঘটিয়াছে, বিবাহের মধ্যে তাহারই এক আকাঙ্ক্ষিত পরিণতি দেখা যায়। নাটকখানির মুখ্য উদ্দেশ্য যদি চন্দ্রগুপ্তের আত্মপ্রতিষ্ঠাকেই রূপায়িত করা হয়, তাহা হইলে প্রেমের দ্বন্দ্বকে সুপরিস্ফুট না করিবার জন্য নাট্যকারকে দোষী বলা চলে না। প্রেমের দ্বন্দ্বকে অধিকতর তীব্র আবেগে প্রকাশ করিলে চন্দ্রগুপ্তের আকর্ষণীয় শক্তি বৃদ্ধি পাইত, কিন্তু তাহার রাজকীয় গাম্ভীর্য বেশ ক্ষুন্ন হইয়া যাইত বলিয়া মনে হয়। চন্দ্রগুপ্তের চরিত্রে বীর রসের ও শৃঙ্গার রসের সংমিশ্রণ রহিয়াছে এ কথা বলিলে এইটুকুই বুঝায় যে বীর রসের মাত্রা যেখানে সাড়ে পনের শৃঙ্গার রসের মাত্রা সেখানে মাত্র দুই।

নাটকের সংস্থানিক বিচ্ছিন্নতা

যে একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার সে এই যে নাটকখানিতে প্রকৃত প্রস্তাবে 'বিষয় ঐক্য' (unity of action) নাই, কারণ নাট্যকার চন্দ্রগুপ্তের সমগ্র জীবনকে নাটকে স্থান করিয়া দেওয়ার

চেষ্টা করিয়াছেন। রাজ্যোদ্ধার ব্যাপার সম্পন্ন হওয়ার সঙ্গে একটি বিষয় শেষ হয় এবং পরে গ্রীক আক্রমণ ব্যাপারের সহিত আর একটি বিষয় আরম্ভ হয়। নাট্যকার এই দুইটি বিষয়কে এক সঙ্গে জুড়িয়া নাটকখানি নির্মাণ করিয়াছেন। চন্দ্রগুপ্তের সমগ্র জীবনকে একক (unit) বলিয়া মনে করায় এবং তদনুযায়ী সংযোজনা করায় নাটকখানিতে বীজের-বৃক্ষে-পরিণতির মত কোন পরিণতি বা বিকাশ (unfoldment) দেখা যায় না, নাটকখানি যেন ঘটনা-পরম্পরা—ঘটনার চাহিদায় ঘটনার সমাবেশ। এই বৈষয়িক ঐক্য না থাকায় সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রানুযায়ী পঞ্চসন্ধি বিচারে (মুখ প্রতিমুখ-গর্ভ-বিমর্ষ-উপসংহার) বিচার করা এখানে সম্ভব নহে। কারণ প্রধান রসের অনুসন্ধান করিতে যাইয়া এই ক্ষেত্রে বিভ্রান্ত হইয়া পড়িতে হইবে, পঞ্চসন্ধিতে নাটকখানিকে ভাগ করিতে গেলে এইরূপ দাঁড়াইবে:—হৃত রাজ্যোদ্ধারের ও পিতৃশত্রুর ইচ্ছা 'মুখ', উদ্ধারের জন্য সঙ্কল্প ও চেষ্টা 'প্রতিমুখ', রাজ্যোদ্ধার ও দাক্ষিণাত্য জয় 'গর্ভ', গ্রীক আক্রমণের ও বিদ্রোহীদের ষড়যন্ত্রের ফলে রাজনৈতিক সঙ্কট 'বিমর্ষ', সেলুকসের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ এবং পরবর্তী ঘটনা উপসংহার। এই বিভাগের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝিতে পারা যায়, বৈষয়িক ঐক্যের অভাব নাটকখানির রসনিষ্পত্তির পথে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা হইয়া আছে। সন্ধিগুলির মধ্যে ধারাবাহিক গতি নাই, সন্ধিগুলি যেন অসংলগ্নভাবে পর পর সাজানো। যাহাই হউক, এই সন্ধি-বিভাগের উপর ভিত্তি করিয়া মোটামুটি বলা যায় যে, নাটকখানির স্থায়ী রস বীর, অবশ্য যদিও কোথাও রস প্রত্যক্ষ, কোথাও অনুমান-গম্য।

এইসকল সাংগঠনিক বা আঙ্গিক ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও নাটকখানি চিত্তাকর্ষক। নাটকের প্রতিটি দৃশ্য, নিজস্ব রস-ভাব-সমুজ্জ্বলতায় এত চিত্তাকর্ষক যে, দর্শক ও পাঠক আত্মহারা না হইয়া পারেন না।

সমালোচক Stoll-এর কথা "The core of drama is not character but situation and effect of compression and contrast"। স্মরণে রাখিয়া বলা যায়, দ্বিজেন্দ্রলাল এমন সব 'situation' সৃষ্ট করিয়াছেন যাহার আকর্ষণে 'the spirit of man'—'মানুষের আত্মা' না মাতিয়া পারে না, 'perfect consistency"র কথা একেবারেই ভুলিয়া যায়। নাটকখানির 'লাবণ্য' এত বেশী যে অবয়ব-সংস্থানের আনুপাতিক বৈষম্য কাহারও চোখে লাগে না। নাটক যদি—"but an illusion and above all, an illusion whereby the spirit of man shall be moved" হয়, চন্দ্রগুপ্ত নাটকে সে illusion বা 'মায়া' যথেষ্ট পরিমাণে আছে এবং আছে বলিয়াই নাটকখানি চিত্তাকর্ষক হইয়া আছে।

নাটকে চারিত্রিক অসঙ্গতি

তারপর, এই নাটক সম্পর্কে অপর অভিযোগ ইহার কয়েকটি চরিত্রের মধ্যে পুরাপুরি সঙ্গতি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

( ) চন্দ্রগুপ্তের মাতা মুরার চরিত্রের মধ্যে নাট্যকার মাতৃত্বের ও জাতিত্বের (শূদ্রাণী) যে দ্বন্দ্ব দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা দুই এক স্থলে অযৌক্তিক আচরণে ব্যাহত হইয়া গিয়াছে। যে মুরা যুদ্ধের পূর্বে দ্বিপ্রহর রাত্রিতে যুদ্ধক্ষেত্রে চাণক্যের শিবিরে যাইয়া চাণক্যকে যুদ্ধ বন্ধ করিয়া দিতে ব্যাকুল হৃদয়ে অনুরোধ করিয়া বলিয়াছিলেন, "চন্দ্রগুপ্ত আমার পুত্র। আর নন্দ—সেও আমার পুত্র। চন্দ্রগুপ্ত আর নন্দ এক বৃন্তে দু'টি ফুল। আমার হৃদয় আকাশের সূর্য-চন্দ্র। তাদের সংঘাতে যে আকাশ চূর্ণ হ'য়ে যাবে", সেই মুরাকে হাড়ি-কাঠে-ফেলা নন্দের মুখের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বিনা প্ররোচনায়

"আমার আজ্ঞা—বধ কর' বলিতে শুনিলে 'কিন্তু' না আসিয়া পারে না—যদি না এই অনুমান করা যায় যে 'আমার আজ্ঞা বধ কর' এই আদেশ করিবার সময় তাহার মধ্যে শূদ্রাণীর অপমানের জ্বালা মাতৃত্বকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। কিন্তু এই আদেশ করিবার পূর্বে এই দৃশ্যে (৩য় অঙ্ক, ষষ্ঠ দৃশ্য) এমন কোন ঘটনা ঘটে নাই যাহা মুরার মাতৃত্বকে আচ্ছন্ন করিয়া অপমানহত জাত্যভিমানকে বলবত্তর করিয়া তুলিতে পারে। "তাকে বাঁচাতে এসে এ কি করলাম!"—এর উপর ভিত্তি করিয়া "complex"এর ক্রিয়া বলিয়া ব্যাখ্যা করিলে ব্যাখ্যা হইতে পারে, কিন্তু নাট্যকারের দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করিবার চেষ্টা তাহাতে খুব সার্থক হয় না।

(৬) প্রথম অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে নন্দের প্রমোদোদ্যানে লাঞ্ছিতা মুরার উদ্ধারের জন্য 'মুক্ত তরবারি হস্তে চন্দ্রগুপ্তের প্রবেশ' স্বাভাবিক হইলেও বাচালকে মাত্র 'পদাঘাতে ভূপাতিত' করিয়া এবং নন্দকে "ভীরু! পাষণ্ড কাপুরুষ! এর প্রতিফল পাবে" বলিয়া মাত্র শাসাইয়া প্রস্থান করা চন্দ্রগুপ্তের পক্ষে খুব স্বাভাবিক ও সঙ্গত হয় নাই মুক্ত তরবারির কোন ক্রিয়াই দেখা যায় না। কারণের তুলনায় কায অনেক কম হইয়াছে। দর্শকের 'কিন্তু' তুলিবার অবকাশ আছে।

দ্বিতীয়তঃ দ্বিতীয় অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যে যখন "চন্দ্রগুপ্ত" তাহার স্বীয় তরবারি দিয়া নন্দের শিরশ্ছেদ করিতে উদ্যত হইলে নন্দ হস্ত দিয়া নিবারণ করিতে গিয়া কহিলেন "আমায় বধ কোরো না" তখন চন্দ্রগুপ্তের মধ্যে "উচ্চাশার চেয়ে বলবতী আকাঙ্ক্ষা কার্যকরী হইলেও এবং নন্দকে বধ করিতে না পারা স্বাভাবিক হইলেও 'তৎক্ষণাৎ তরবারি দূরে নিক্ষেপ' করিয়া নন্দকে জড়াইয়া ধরিয়া "আমার বক্ষে এস ছোট ভাইটি আমার" বলা চন্দ্রগুপ্তের পক্ষে খুব স্বাভাবিক নহে। যে চন্দ্রগুপ্ত সুদূর সিন্ধু-নদ-তীরে সেকেন্দার সাহের রণকৌশল শিক্ষা করিতে

গিয়াছিলেন নির্বাসনের প্রতিশোধ লইবার জন্য, মাতার কেশাকর্ষ· যাহার প্রতিশোধ-স্পৃহাতে পূর্ণাহুতি দিয়াছিল, সেই চন্দ্রগুপ্তের পক্ষে নন্দের মুখে 'আমায় বধ করো না' শুনিবামাত্র তাহাকে বক্ষে জড়াইয়া ধরা একান্তই অপ্রত্যাশিত। ভ্রাতৃপ্রেমের প্রাধান্যবশতঃ শিরশ্ছেদ করিতে ইতস্ততঃ করিলে চরিত্রের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বটুকু উপভোগ্য হইয়া উঠিত। আকস্মিক উচ্ছ্বাসে এখানে ভ্রাতৃপ্রেমের এক চমকপ্রদ অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে বটে, কিন্তু ঔচিত্যের হানি ঘটিয়াছে অনেকখানি। সমালোচক E. E. Stoll এর অভিমত—"the most striking generally secured at great cost to probability" দ্বারা কি ইহাকে সমর্থন করা চলে? শেক্সপীয়রের নাটকেও এমন ঔচিত্য-হানি অনেক আছে, 'great striking' 'great cost to probability' দ্বারা স্পষ্ট হইয়াছে—কিন্তু Stoll সমর্থন করিলেই ঔচিত্য-হানিকে ত্রুটি বলিয়াই স্বীকার না করিবার কোন কারণ থাকে না।

তৃতীয়তঃ যে ছায়াকে বন্ধুবর চন্দ্রকেতু মৃত্যুকালে চন্দ্রগুপ্তের হস্তে সমর্পণ করিয়া গিয়াছিলেন এবং করিয়াছিলেন বলিয়াই তাহার প্রতি কর্তব্যের প্রেরণায় চন্দ্রগুপ্ত 'নিরুপায়' হইয়া তাহার মানসী প্রতিমাকে সম্রাজ্ঞীর আসনে বসাইতে অক্ষমতা জ্ঞাপন করিয়াছেন—"না-না এ হ'তে পারে না, এ হ'তে পারে না" বলিয়া কর্তব্যকেই অনুসরণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন সেই ছায়াকে গ্রহণ না করিবার কোন কারণ নাটকে দেখান হয় নাই। "রাজ্যের কল্যাণে ছায়া তুচ্ছ স্বার্থ বলি দিতে" গিয়া 'অসংযত পদক্ষেপে হেলেনের কাছে গিয়া তাহার কর ধারণ করিয়া স্থিরমূর্তি চন্দ্রগুপ্তের করে যোজিত করিয়া' চক্ষে বস্ত্র দিয়া দ্রুত প্রস্থান করিলে চন্দ্রগুপ্ত স্বপ্নোত্থিতবৎ বলিয়াছিলেন—'না-না-না, এ হ'তে পারে না, এ হ'তে পারে না। চন্দ্রকেতু! না—কখন না। সম্রাট আপনারা মুক্ত'। ইহার পর এমন কোন ব্যাপার ঘটিতে দেখা যায় না যাহা ছায়াকে গ্রহণ করিবার অন্তরায় হইয়া পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছে। চাণক্যের আদেশ বা ছায়ার প্রত্যাখ্যান

কোনও কিছু স্পষ্টই ভাবে চন্দ্রগুপ্তের দ্বন্দ্বের মীমাংসা করিয়া দেয় নাই।

(৩) বাচালের প্রমোদোদ্যানের বাচলামি যদিও বা সমর্থন করা যায়, কারাগারাবদ্ধ নন্দের সহিত তাহার ভাঁড়ামি কিছুতেই সমর্থন করা চলে না। বাচাল যে হাস্যরস সৃষ্টি করিয়াছে তাহা এত তরল ও পানসে যে রস বলিলে তাহাকে প্রশংসাই করা হয়। নাটকের অন্যান্য রসের গাঢতার সহিত বাচালের পানসে ভাঁড়ামির এত গুণগত পার্থক্য যে এক পাতে তাহাদের কিছুতেই দেওয়া চলে না। বাচাল আর একটু সামাল থাকলেই ভাল হইত। অপদার্থ নন্দের অপদার্থ শ্যালক হইলেও অত বে-চাল বাচলামি শোভন হয় নাই বাচাল মৃচ্ছকটিক নাটকের শকার হইয়াছে - King Lear-এর 'Fool' হইতে পারে নাই।

(৪) কাত্যায়নের আর যাহাই থাকুক, মন্ত্রী হওয়ার যোগ্যতা নাই। পাণিনি-বার্তিকের পাশাপাশি খানিকটা চারিত্রিক দৃঢ়তা রাখা উচিত ছিল। মন্ত্রী হইতে হইলে যে পরিমাণ বুদ্ধি-তীক্ষ্ণতা থাকা দরকার কাত্যায়নের তাহা নাই। যে কাত্যায়নের বুদ্ধি-জড়তার বিনিময়ে অনেক স্থলে হাস্যরস সৃষ্টি করা হইয়াছে, সে কাত্যায়নকে "যোগ্য মন্ত্রী" বলিলে ব্যঙ্গ করা হয় না কি?

সংলাপ যোজনার ত্রুটি

সংলাপ-যোজনার যে ত্রুটি দেখা যায় তাহার সম্বন্ধে নাট্যকারের স্বীকৃতি উদ্ধার করা যাইতে পারে—"কবিতায় আমার অত্যধিক আসক্তি থাকায় আমি গদ্যের ভাষাকে কবিতার আসনে বসাইবার প্রলোভন পরিত্যাগ করিতে পারি নাই। এ কথা মানিতেই হইবে কবিতার প্রতি অত্যধিক আসক্তি থাকা কবির গৌরব কিন্তু নাট্যকারের কলঙ্ক। দ্বিজেন্দ্রলালের

চরিত্রগুলির মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক উচ্ছ্বাস দেখা যায়। এই উচ্ছ্বাস অনেকক্ষেত্রে যেমন গুণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে তেমনি কোন কোন ক্ষেত্রে অনৌচিত্য দোষে পরিণত হইয়াছে। চাণক্যের মত পণ্ডিতের বা হেলেনের মত বিদুষীর ভাষা কাব্যময় হইলে কাহারও মনে কোন ধাক্কা লাগিতে পারে না; কিন্তু মুরার মত শূদ্রাণী এবং ছায়ার মত পার্বত্য কন্যার মুখে অজস্র উচ্ছ্বাস ঔচিত্য-বোধকে ধাক্কা না মারিয়া ছাড়ে না। পাত্রোচিত ভাষা প্রয়োগের অভাবে অনেকক্ষেত্রে স্বাভাবিক আবহাওয়া নাটকীয় আকার ধারণ করিয়া থাকে এবং করে বলিয়া অপ্রাকৃত বলিয়া প্রতীয়মান হয় ও তাহাতে সত্যভ্রান্তির (illusion of reality) পথে ব্যাঘাত ঘটে। অবশ্য সমালোচক Stoll বলিবেন—"the whole is more important than any part, the dramatic and poetic structure than the characters and emotional illusion than verisimilitude, অর্থাৎ Stoll-এর মতানুসারে "emotional illusion-" সৃষ্টি আসল কথা, "verisimilitude or consistency" গৌণ ব্যাপার—নগণ্য। এ কথাও অবশ্য মনে রাখিতে হইবে যে এই কাব্যিক উচ্ছ্বাস নাট্যকারের বহু চরিত্রকে চিরস্মরণীয় করিয়া তুলিয়াছে। হৃদয়ভাবের প্রতিফলিমেঘের রূপ, সুখ দুঃখের আলোছায়ার খেলা তাঁহার ভাষার ভঙ্গিমায় যে সহজ স্ফূর্তি লাভ করিয়াছে, তাহার তুলনা বাঙলা সাহিত্যে খুব কমই পাওয়া যায়। হৃদয়ের অন্তস্তম তলের ভাবানুকম্পনকে যাঁহাদের ভাষা নিখুঁতভাবে ধরিতে সক্ষম হইয়াছে দ্বিজেন্দ্রলাল সেই মুষ্টিমেয় স্রষ্টৃবর্গের অন্যতম শক্তিমান পুরুষ। এমন হৃদয়গ্রাহী ও হৃদয়োৎসারী ভাষা দ্বিজেন্দ্রলালের পূর্বে বাঙলা নাটকে কেহই ব্যবহার করিতে পারেন নাই।

উপসংহারে এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে—চন্দ্রগুপ্ত নাটক খানিতে সাংগঠনিক যে ত্রুটিই থাক অভিনেয়ত্ব ও কাব্যগুণে—রসভাব-সমুজ্জ্বলতায় নাটকখানি নাট্যামোদিগণের হৃদয়কে আজও তৃপ্ত করিয়া

থাকে। পাঠক ও দর্শকগণ বুদ্ধিগ্রাহ্য ও হৃদয়ভোগ্য সর্ববিধ আনন্দই আস্বাদন করিয়া থাকেন। বাঙলার রঙ্গমঞ্চ আজও 'চন্দ্রগুপ্ত' অভিনয়ে শত শত দর্শককে আকর্ষণ করে—মঞ্চে ও হৃদয়ে চন্দ্রগুপ্তের অসামান্য সাফল্য রহিয়াছে।

চন্দ্রগুপ্ত নাটকে ঐতিহাসিকতার পরিমাণ

ঐতিহাসিক নাটক বা উপন্যাস উক্তি-প্রত্যুক্তি-রীতিতে গ্রথিত ইতিহাস মাত্র নহে—ইতিহাস-বর্ণিত এক বা একাধিক ব্যক্তির অথবা ঐতিহাসিক-ঘটনা-প্রভাবিত ব্যক্তির জীবন-কথার রসময় রূপায়ন। যেহেতু 'অপারে কাব্যসংসারে কবিরেক: প্রজাপতি:' রূপদক্ষ কবির ইতিহাসোপস্থাপিত ঘটনা সমূহ গ্রহণ বা বর্জন করিবার এবং নূতন কিছু সংযোজন করিবার স্বাধীনতা স্বত:সিদ্ধের মতই স্বীকার্য। এই স্বাধীনতা থাকে বলিয়াই ঐতিহাসিক নাটক, কাব্য এবং উপন্যাস রচনা সম্ভব হয়। তবে এই স্বাধীনতা বলিতে এমন কিছু বুঝায় না যে কবির নিরালম্ব স্বৈরাচার করিবার নিরবধি অধিকার থাকে। ইতিহাস যদি কোন সম্ভাব্য সুস্পষ্ট নির্দেশ না দিয়া থাকে কবি কল্পনা দ্বারা সম্ভাব্যের মূর্তি গঠন করিয়া লইতে পারেন—according to the law of probability or necessity (Aristotle). কিন্তু ইতিহাস যে যে বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশ বা স্থির মীমাংসা জানাইয়া রাখিয়াছে কবি তাহা যদি লঙ্ঘন করেন তাহা হইলে ইতিহাসকে বিকৃত করিবার অপরাধে কবি অপরাধী হইবেন। মোটকথা যাহাকে 'দিবালোকে খুন' বলা হয় ইতিহাস সম্বন্ধে কবি তেমন কোন কিছু না করিলে কোনভাবেই অভিযুক্ত হইতে পারেন না—ঐতিহাসিক সাহিত্য বিচার করিবার পূর্বে এই কথাটি বিশেষভাবে স্মরণে রাখা দরকার। কোন ঐতিহাসিক সাহিত্যে ঐতিহাসিকতার পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিতে হইলে কবি-কৃতিতে ইতিহাস কতখানি অনুসৃত হইয়াছে তাহাই বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। এই অনুসরণ ঘটনা-সমাবেশে ও পাত্রপাত্রীর ব্যক্তিত্বে যাচাই করিয়া দেখিলে যে মাত্রায় পৌঁছবে কবি-কৃতির ঐতিহাসিকতার পরিমাণও তন্মাত্রিক হইবে।

এই নীতি প্রয়োগ করিয়া চন্দ্রগুপ্ত নাটকের ঐতিহাসিকতার পরিমাণ নির্দ্ধারণ করা যাউক।

নাট্যকারের গৃহীত বৃত্তান্ত

মনঃসমীক্ষকের কাছে রোগীর স্বীকারোক্তি, বিচারকের কাছে অপরাধীর বিবৃতি বা স্বীকৃতি এবং সমালোচকের কাছে গ্রন্থের ভূমিকা একই পরিমাণে মূল্যবান। গ্রন্থের ভূমিকা শুধু গ্রন্থেরই পরিচায়িকা নহে, কবির মনোভূমিরও অন্যতম দিগ্‌দর্শন। কোন্ ঐতিহাসিক ভূমিকার উপর কবি তাঁহার নাটকের সুরম্য অট্টালিকা নির্মাণ করিয়াছেন—এ প্রশ্নের মীমাংসার জন্য অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার পূর্বে কবির বিবৃতি সংগ্রহ করিতে পারা যায় কি না চেষ্টা করিয়া দেখা উচিত। নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল নাটকখানির ভূমিকায় যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহা এই—"চন্দ্রগুপ্তের জীবন-বৃত্তান্ত ইতিহাসে বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। পুরাণমতে তিনি মহাপদ্মের শূদ্রাণী-পত্নী-গর্ভজাত পুত্র ও নন্দের বৈমাত্রেয় ভাই। তিনি বাহুবলে নন্দকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া মগধের রাজা হন এবং মন্ত্রী চাণক্যের সাহায্যে ভারতে একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপন করেন। সেলুকসের সহিত তাহার যুদ্ধ এবং সেলুকসের কন্যার সহিত তাহার বিবাহ—দুই ব্যাপারের উল্লেখমাত্র পুরাণে নাই। গ্রীক-ইতিহাস পাঠে এ বৃত্তান্ত অবগত হই। উভয় বৃত্তান্ত একত্র পাঠ করিলে বোঝা যায় যে * (১) চন্দ্রগুপ্ত তাহার বৈমাত্রের ভাই নন্দ কর্তৃক নির্বাসিত হইয়াছিলেন, (২) সেকেন্দার সাহের সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, (৩) তিনি পার্বত্য সেনার সাহায্যে নন্দকে পরাজিত করিয়া মগধের সিংহাসনে বসেন, (৪) চাণক্যের সাহায্যে আসমুদ্র ভারত অধিকার করেন এবং (৫) সেলুকস তাঁহার সাম্রাজ্য আক্রমণ করিলে তিনি সেলুকসকে পরাস্ত করিয়া তাঁহার কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। এই বৃত্তান্ত লইয়া বর্তমান নাটকখানি রচিত হইয়াছে।"

* সংখ্যা-চিহ্ন লেখকের দেওয়া।

গৃহীত বৃত্তান্তের ঐতিহাসিকতা

এখন নাট্যকার-গৃহীত পূর্বোক্ত বৃত্তান্ত ইতিহাস-সম্মত কি না এই প্রশ্নের মীমাংসার উপরই নাটকের ঐতিহাসিকতার পরিমাণ নির্ভর করিতেছে বলাই বাহুল্য। দেখা যাক বৃত্তান্ত সমূহ ইতিহাসে আছে কি না; না থাকিলে কিরূপে আছে এবং কবি যেভাবে গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে কোন রসহানি ঘটিয়াছে কি না।

(১) প্রথম তথ্য—চন্দ্রগুপ্ত তাহার বৈমাত্রেয় ভাই নন্দ কর্তৃক নির্বাসিত হইয়াছিলেন।

Early History of India নামক গ্রন্থে ইতিহাসকার স্মিথ Smith। স্বীকার করিয়াছেন যে চন্দ্রগুপ্ত নির্বাসিত হইয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন—"whatever be the truth, young Chandragupta, in some way, incurred the displeasure of his kinsman Mahapadma Nanda, the reigning King of Magadha and was obliged to go into exile". (pp. 123)

অন্যান্য ইতিহাসকার নির্বাসন ব্যাপার সম্বন্ধে 'না-গ্রহণ না-বর্জন' নীতি গ্রহণ করিলেও, চন্দ্রগুপ্ত কেন পাঞ্জাবে গিয়া গ্রীক শিবিরে উপস্থিত হইয়াছিলেন এ প্রশ্নের মীমাংসা করিতে এই সিদ্ধান্তেই উপস্থিত হইয়াছেন যে, চন্দ্রগুপ্ত রাজনৈতিক কারণে মগধ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং মগধের অত্যাচারী রাজার শাসনের অবসান ঘটাইতে বিজয়ী আলেকজাণ্ডারকে প্ররোচনা দিতে গিয়াছিলেন। Political History of Ancient India গ্রন্থে ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত রায়চৌধুরী মহাশয় লিখিয়াছেন—"Chandragupta visited Alexander with the intention of inducing the conqueror to put an end to the rule of the tyrant of Magadha." পুরাণ বা ঐতিহাসিক সাহিত্যের

ভিতর দিয়া যে মতবাদ চলিয়া আসিয়াছে কোনও ঐতিহাসিক তাহার বিরুদ্ধে কোন সুস্পষ্ট নির্দেশ প্রচার করেন নাই। 'সম্ভবতঃ' যোগে যদি কোন অনুমান করা হইয়া থাকে তাহা গ্রহণ করিতে নাট্যকার কেন, কোন [illegible] একান্ত [illegible] নহে।

তারপর, চন্দ্রগুপ্ত যে নন্দবংশের অবৈধ সন্তান—এ বিষয়েও ঐতিহাসিকগণের মধ্যে প্রায় ঐকমত্য দেখা যায়। ঐতিহাসিক স্মিথ চন্দ্রগুপ্তকে "illegitimate scion of the family" বলিয়াছেন।

[illegible] আলেকজান্দারের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। এ বিষয়ে ঐতিহাসিক প্লুতার্ক (Plutarch) বলেন—"Androkottus himself who was then a lad saw Alexander himself"—স্বয়ং এ্যান্ড্রোকোট্টাস (চন্দ্রগুপ্ত) আলেকজান্দারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। J. W. Mc' Crindle "The Invasion of India by Alexander the Great (as described by Arrian Curtius, Diodorus, Plutarch and Justin)" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "Androcottus himself who was then but a youth saw Alexander himself and afterwards used to declare... ... ..." ঐতিহাসিক স্মিথ মহোদয়—Early History of India-তে লিখিয়াছেন, "During his banishment he had the good fortune to see Alexander·······" নির্বাসনকালে তাহার আলেকজান্দারের সহিত দেখা করিবার সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল। আধুনিক শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিকদিগের অন্যতম শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী 'Political History of Ancient India' নামক প্রামাণিক গ্রন্থে প্লুতার্ক প্রমুখ প্রাচীন ঐতিহাসিকগণের উক্ত আলোচনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—"from this passage it is not unreasonable to infer that Chandragupta visited Alexander with the intention of inducing the conqueror

to put an end to the rule of the tyrant of Magadha". এই প্রসঙ্গেই তিনি প্রাচীন ঐতিহাসিক জাষ্টিনের (Justin) মতও উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন—"for we learn from Justin that the Macedonian King did not scruple to give orders to kill the intrepid Indian lad for his boldness of speech". প্রথম অঙ্কে প্রথম দৃশ্যে চন্দ্রগুপ্ত সেকেন্দার সাহর সম্মুখে যে নির্ভীকতা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাও ইতিহাস-সম্মত। সুতরাং দেখা গেল যে দ্বিতীয় তথ্যও ইতিহাস-কথিত।

(৩) তৃতীয় তথ্য—তিনি পার্বত্য সেনার সাহায্যে নন্দকে পরাজিত করিয়া মগধের সিংহাসনে বসেন।

স্মিথ লিখিয়াছেন—চন্দ্রগুপ্ত নির্বাসনকালে যুদ্ধপ্রিয় এবং লুণ্ঠনপ্রবণ জাতির সাহায্যে সৈন্যবাহিনী গঠন করেন এবং ক্রমে তাহার অপ্রিয় আত্মীয় মগধরাজ নন্দকে সিংহাসন-চ্যুত ও নিহত করিয়া পরে গ্রীকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। বিশাখদত্তের "মুদ্রারাক্ষস" নামক নাটকে পাওয়া যায় যে, চন্দ্রগুপ্ত পার্বত্য শক্তির সাহায্যে মগধের সিংহাসন অধিকার করেন। মুদ্রারাক্ষস নাটকের ঐতিহাসিক মূল্য অতিসাম্প্রতিক বিচারে কোথায় গিয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা সঠিক না জানিলেও এইটুকু জানলেই নাটকখানির ঐতিহাসিক মর্যাদা হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারে যে অধ্যাপক রায়চৌধুরী, ভি. এ স্মিথ এবং ম্যাক্‌ক্রিণ্ডল নাটকবর্ণিত অনেক কথা সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন (The dramatist who tells the story asserts and no doubt with truth that Nanda's race perished utterly and was exterminated– E. H. I.—Smith 'মুদ্রারাক্ষস' যাহা চন্দ্রগুপ্ত কাহিনীর প্রথম ও প্রাচীনতম সাহিত্যিক সাক্ষ্য এবং যাহার শরণ লইতে ঐতিহাসিকগণও একরকম বাধ্য হইয়াছেন, বলা চলে, তাহা বাস্তবিক ভাবে যে পরিমাণ সত্যই হউক, প্রায় ঐতিহাসিক মর্যাদা লাভ করিয়া গিয়াছে। সুতরাং পার্বত্য শক্তির সাহায্য গ্রহণ ব্যাপারটিকে অনৈতিহাসিক বলা যাইতে পারে না, অন্ততঃ কোনও

ঐতিহাসিক এ বিষয়ে নিষেধাত্মক কোন মন্তব্য করেন নাই। অবশ্য নাট্যকার মুদ্রারাক্ষসকে হুবহু অনুকরণ করেন নাই। মুদ্রারাক্ষসে পার্বত্যশক্তির সহিত মৈত্রী কেবল নীতির প্রয়োজনে স্থাপিত হইয়াছিল, নাট্যকার তাহা প্রীতির, মাধুর্য্য ও নিষ্ঠার মহত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

চন্দ্রগুপ্তের সহিত শেষ নন্দের দ্বন্দ্বের এবং চন্দ্রগুপ্তের জয়ের কথা মি নন্দপণদেো, পুরাণ, মুদ্রারাক্ষস, মহাবংশটীকা, জৈন-পরিশিষ্ট-পর্ব প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত আছে। ঐতিহাসিক স্মিথ বলেন—"there is no doubt that the last of them was deposed and slain by Chandragupta Maurya who seems to have been an illegitimate scion of the family (Early History of India)—অর্থাৎ এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে তাঁহাদের 'শেষতম' যে-চন্দ্রগুপ্ত কর্তৃক সিংহাসন-চ্যুত এবং নিহত হইয়াছিলেন এই চন্দ্রগুপ্ত নন্দবংশেরই এক অবৈধ সন্তান।

(৪) চতুর্থ তথ্য—চাণক্যের সাহায্যে চন্দ্রগুপ্ত আসমুদ্র ভারত অধিকার করেন।

নাট্যকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন—"ইংরেজ ইতিহাসকারগণ চাণক্যকে ভারতের 'ম্যাকিয়াভেলি' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহাদের মত চাণক্য বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও কূট ছিলেন। আমি সেই মত গ্রহণ করিয়াছি।" সকল ঐতিহাসিকই এ বিষয়ে পুরাণের মত গ্রহণ করিয়াছেন।

চাণক্যের অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও কূটবুদ্ধিই যে—অর্থশাস্ত্রের শেষ শ্লোক বিশ্বাস করিলে—শাস্ত্র, শস্ত্র ও পৃথিবীকে নন্দবংশের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছিল এ বিষয়ে সন্দেহ নাই, এবং প্রকৃতপক্ষে কোনও ইতিহাসকারই ইহাতে অবিশ্বাস জ্ঞাপন করেন নাই। স্মিথ লিখিয়াছেন—"The adviser of the youthful and unexperienced Chandragupta in this revolution was Brahman named Vishnugupta, better known by his patronymic Chanakya or his surname Kautilya, by whose aid he succeeded in seizing the vacant throne."

দ্বিতীয়তঃ, আসমুদ্র ভারত অধিকার সম্বন্ধেও ইতিহাসকারগণ প্রায় একমত। প্লুতার্কের মত এই যে—চন্দ্রগুপ্ত ছয় লক্ষ লোকের এক বাহিনীর সাহয্যে সমগ্র ভারতবর্ষ অধিকার করিয়াছিলেন (subdued whole of India with an army of 600,000 men). Justin বলিয়াছেন—'He was in possession of India' এবং ইতিহাসকার স্মিথ মহাশয়ও চন্দ্রগুপ্তকে—"The first historical paramount sovereign or emperor in India extended from the Bay of Bengal to the Arabian sea" এবং "universal monarch of India' বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। অধ্যাপক রায়চৌধুরী মহাশয় চন্দ্রগুপ্ত সাম্রাজ্যের দাক্ষিণাত্য-সীমা নির্দ্ধারণ প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—"But the view that the arms of Chandragupta possibly reached the Pandya country in the far south of India which abounded in pearls and gems receives some confirmation from the Mudrarakshasa, Act III, Verse 19 ·· ···" এবং সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে প্রথম চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যই বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণবর্তী বিস্তৃত অংশ জয় করিয়াছিলেন। অতএব পঞ্চম অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যে চাণক্য যে উক্তি করিয়াছেন—'মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত! তুমি স্বীয় বাহুবলে হিন্দুকুশ হ'তে কুমারিকা পর্যন্ত এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন ক'রেছ···'তাহা এবং নাটকে উল্লিখিত দাক্ষিণাত্য জয়ের কথা কল্পনা নহে—ইতিহাসেরই অনুসরণ।

(৫) পঞ্চম তথ্য সেলুকস তাঁহার সাম্রাজ্য আক্রমণ করিলে তিনি সেলুকসকে পরাস্ত করিয়া তাঁহার কন্যার পাণিগ্রহণ করেন।

সেলুকস নিকেটর চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন, চন্দ্রগুপ্তের হস্তে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইয়াছিলেন এবং উভয়ের মধ্যে বৈবাহিক সর্তে সন্ধি স্থাপিত হইয়াছিল, এই তিনটি বিষয়ে সকল ইতিহাসকার একমত (ক) Appians-এর ধারণা—"He crossed the Indus and waged

war on Chandragupta ··· and entered into relations of marriage with him.' (খ) Strabo-ও অনুরূপ কথা লিখিয়া গিয়াছেন—But Seleukcs Nicator gave them to Sandrocottus in consequence of a marriage contract and received in turn 500 elephants. (গ) অধ্যাপক রায়চৌধুরী লিখিয়াছেন—There can be no doubt that invedor could not make much headway and concluded an alliance which was cemented by a marriage contract. চন্দ্রগুপ্ত ও সেলুকসের মধ্যে যে বৈবাহিক সর্তে সন্ধি স্থাপিত হইয়াছিল এ বিষয়ে কোনও দ্বৈমত্য দেখা যায় না, কিন্তু সেলুকস কন্যাপণে সন্ধি ক্রয় করিয়াছিলেন কি না এই বিষয়ে ইতিহাসকারগণের মধ্যে মতবিরোধ দেখা যায়, বা বলা চলে নির্দিষ্ট কোন সিদ্ধান্ত নাই (ঘ) ইতিহাসকার স্মিথ মনে করেন—"The high contracting powers ratified the place by a matrimonial alliance which phrase probably means that Selukos gave a daughter to his Indian rival"—যিনি অশোক নামক গ্রন্থে (৩য় সংস্করণ) কন্যাদান বিষয়ে তিনি 'হাঁ' অপেক্ষা 'না'র দিকেই বেশী জোর দিয়াছেন। (ঙ) গ্রীক ইতিহাস বিশেষজ্ঞ J. W. Mc'Crindle সেলুকসের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"The result of the expedition was a treaty by which Seleukos ceded to Sandrokottus his Indian provinces and the region west of the Indus as far as the range of Parapanisos in exchange for 500 elephants and a marriage alliance by which the daughter of Seleukos became the bride of the Indian king (The invasion of India by Alexander)".

দেখা গেল যে ঐতিহাসিকদের কেহ কেহ এইরূপ বলেন যে কন্যাপণে সেলুকসকে সন্ধি ক্রয় করিতে হইয়াছিল। যাঁহারা কন্যাপণে সন্ধি ক্রয় করার সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে ভাবিত হইয়াছেন, তাঁহাদের ভাবনা একেবারে অস্বাভাবিক

না হইলেও, যথেষ্ট যুক্তির আশ্রয় পাইবে বলিয়া মনে হয় না। সংস্কৃত নীতিশাস্ত্রে কন্যাপণে সন্ধি-স্থাপনের উল্লেখ পাওয়া যায়, সুতরাং চাণক্যের ন্যায় নীতি-দক্ষ ব্যক্তি যেখানে মন্ত্রণাদাতা সেখানে এই ধরনের উচ্চ সর্তের ('high contracting') সন্ধি হইবে খুব আশ্চর্যের বিষয় নহে।

যাহা হউক, আমাদের কর্তব্য সন্ধি প্রমাণ করা নহে, অনুসন্ধান করিয়া দেখা—ইতিহাসকারগণের মধ্যে কন্যাপণে সন্ধি ক্রয়ের কথা চলিত আছে কি না। যখন দেখা গেল যে প্রতিষ্ঠাবান ঐতিহাসিকদের কেহ কেহ কন্যাদানের কথা স্বীকার করিয়াছেন, তখন চন্দ্রগুপ্তের সহিত হেলেনের বিবাহ অনৈতিহাসিক ঘটনা হইতে পারে না। সুতরাং পঞ্চম তথ্যটিও সম্পূর্ণ ইতিহাস-সম্মত।

চরিত্রগুলির ঐতিহাসিকতা

এ পর্যন্ত যেটুকু পর্যালোচনা করা হইয়াছে তাহা হইতে এই সিদ্ধান্ত অনায়াসেই করা যাইতে পারে যে চন্দ্রগুপ্ত নাটকখানির ভিত্তি ও আয়তন প্রায় পুরাপুরি ঐতিহাসিক। এইবার চরিত্রগুলির ও উল্লেখিত ঘটনাগুলির ঐতিহাসিকতার মাত্রা পরিমাপ করিয়া দেখা যাক।

(১) চন্দ্রগুপ্ত: নাটকে নায়ক চন্দ্রগুপ্তকে মুরার পুত্র এবং সেই হেতু মৌর্য বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। চন্দ্রগুপ্তের বংশপরিচয় অবিসংবাদিত নহে। নিরঙ্কুশ গবেষণা যেদিকে একটু গন্ধ পাইয়াছে সেই দিকেই ছুটিয়া গিয়াছে। ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যিক ও পণ্ডিতদিগের মধ্যে প্রচলিত ধারণা এই যে চন্দ্রগুপ্ত নন্দবংশেরই একজন। মুদ্রারাক্ষস নাটকে তাঁহাকে 'মৌর্যমুত্র' এবং 'নন্দান্বয়' বলা হইয়াছে। ক্ষেমেন্দ্র ও সোমদেব "পূর্ব-নন্দ-সুত" বলিয়া তাঁহার উল্লেখ করিয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণের টীকাকারের মতে চন্দ্রগুপ্ত নন্দের ঔরসে মুরার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেই জন্যই মৌর্য নামে অভিহিত

হইতেন। মুদ্রারাক্ষসের টীকাকার ধুন্দিরাজ বলেন যে চন্দ্রগুপ্ত নন্দরাজ সর্বার্থসিদ্ধির ঔরসে মুরার গর্ভে মৌর্য নামে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করে তাহারই জ্যেষ্ঠ পুত্র। মৌর্য শব্দটির সূত্র ধরিয়া গবেষকগণ নানাস্থানে বিচরণ করিয়াছেন। মৌর্যবংশ যে সূর্যবংশের তথা ক্ষত্রিয়বংশেরই একটি শাখা মহাবংশটীকা [illegible] কি সেই প্রমাণ বহন করিতেছে। মান্ধাতৃ হইতেই নাকি মৌর্যশাখার সৃষ্টি হইয়াছে। তারপর রাজপুতানা গেজেটিয়ার "মোরি"গণকে মৌর্য [illegible] রাজপুত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে। জৈনগ্রন্থ 'পরিশিষ্টপর্ব'তে চন্দ্রগুপ্তকে 'ময়ূরপোষক'দের গ্রামপতির দৌহিত্র বলা হইয়াছে। মহাবংশ হইতে জানা যায় যে পাটলিপুত্রের প্রাসাদের প্রাঙ্গণে অনেক ময়ূর পোষা হইত। এই মহাবংশেই চন্দ্রগুপ্তকে 'মোরিয়ানাং ক্ষত্রিয়ানাং বংশে জাতং' বলা হইয়াছে। তারপর দিব্যাবদানে চন্দ্রগুপ্তের পুত্র বিন্দুসারকে 'ক্ষত্রিয়মূর্দ্ধাভিষিক্ত' এবং অশোককে "ক্ষত্রিয়" বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। প্রাচীনতম 'মহাপরিনির্বাণ সূত্র'তে দেখা যায় যে মৌর্যগণ পিপ্পলিবনের রাজা এবং জাতিতে ক্ষত্রিয়। এই ধরনের গবেষণার পর অধ্যাপক রায়চৌধুরী চন্দ্রগুপ্তকে ক্ষত্রিয়বংশোদ্ভব বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তবে ইহাও বলিয়াছেন, চন্দ্রগুপ্ত ময়ূরপোষকদের মধ্যে লালিত পালিত হইয়াছিলেন বলিয়া Justin প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ তাঁহাকে "a man of humble origin"—অনভিজাত বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। অধ্যাপক রায়চৌধুরী মহাশয়ের রায় হইতে ইহাই স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় যে ঐতিহাসিকদের মধ্যে চন্দ্রগুপ্তের বংশপরিচয় সম্বন্ধে এককোটিক কোন সিদ্ধান্ত নাই। এ সম্বন্ধে ভি. এ. স্মিথ লিখিয়াছেন—"On the father's side he was a scion of the royal family of Magadha—the principal state in Northern India—and it has hitherto been supposed that his mother or according to another version his grandmother was of lowly origin...The family name

Maurya assumed by the members of the dynasty founded by Chandragupta is said to be a derivative of Mura his mother's or grandmother's name". দেখা গেল, ভারতীয় অভিমতে এবং Justin প্রভৃতি পুরাতন ইতিহাসকারগণের মতে চন্দ্রগুপ্ত নীচবংশীয়, স্মিথ মহাশয়ের মতেও চন্দ্রগুপ্ত নন্দবংশেরই এক "illegitimate scion"—অবৈধ সন্তান এবং তাঁহার মাতা অথবা পিতামহী মুরার নামানুসারে বংশের নাম হইয়াছে 'মৌর্য'।

তারপর আন্তর ধর্মের দিক দিয়া দেখিলেও ইতিহাস চন্দ্রগুপ্তকে যে পরিমাণ শৌর্য-বীর্যের অধিকারী করিয়াছে নাট্যকার সে পরিমাণ হইতে তাহাকে একটুও বঞ্চিত করেন নাই। চন্দ্রগুপ্তের রাজনৈতিক জীবন, বলা চলে, অবিকৃতভাবেই গ্রহণ করা হইয়াছে। নন্দবধ ব্যাপারে চন্দ্রগুপ্তকে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত না করিয়া নাট্যকার ইতিহাসের কোন অবিসংবাদিত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কার্য করিয়াছেন, এরূপ কোন অভিযোগ আনা চলে না। যদিও স্মিথ অনুমান করিয়াছেন যে নন্দ চন্দ্রগুপ্তের দ্বারাই নিহত হইয়াছিলেন, কিন্তু এ বিষয়ে অন্যরূপ অনুমানও প্রচলিত আছে, এমন কি স্মিথও এক স্থানে লিখিয়াছেন—"by whose treachery and he succeeded in seizing the vacant throne" প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষে একটি মত চলিয়া আসিতেছে যে ব্রাহ্মণ চাণক্যই নন্দকে অষ্টপুত্রসহ নিধন করিয়াছিলেন। যাহার জীবন-কথা নিঃসংশয় প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে তাহার সম্বন্ধে বহু-প্রচলিত অনুমানকে ঐতিহাসিক মর্যাদা দেওয়া হইয়া থাকে। চন্দ্রগুপ্তের জীবন সম্বন্ধেও ইতিহাসকারগণ যে পরিমাণ প্রমাণ পাইয়াছেন তাহার অধিক পরিমাণ অনুমান গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

চন্দ্রগুপ্তের সহিত পার্বত্যজাতির সম্পর্ক এবং গ্রীক সম্পর্ক সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। নাট্যকার মুদ্রারাক্ষস হইতে পার্বত্য-

শক্তির সাহায্য, নন্দের মন্ত্রী রাক্ষসের নাম, শাকটাল বৃত্তান্ত, চন্দ্রগুপ্তের শয়নকক্ষে সুড়ঙ্গ কাটার কথা প্রভৃতি কয়েকটি বিষয় গ্রহণ করিয়াছেন। মুদ্রারাক্ষসে যে কূটনৈতিক চাল দ্বারা পার্বত্য শক্তির সহিত স্থাপিত মৈত্রী ভঙ্গ করা হইয়াছে নাটকে তাহা গ্রহণ করা হয় নাই। এই ঐতিহাসিক সম্পর্কের সম্ভাব্য পরিণতি, ঐতিহাসিক কায়াহীন ছায়ার সহিত চন্দ্রগুপ্তের জীবনকে প্রেমের বন্ধনে বাঁধিয়া দেওয়া, নাট্যকারের নির্দোষ কল্পনা।

(২) চাণক্য: চাণক্য সম্বন্ধে বলা যায় যে ইতিহাসের কূটবুদ্ধিসর্বস্ব কৌটিল্যকে সামাজিক ও আধ্যাত্মিক পরিবেশ দিয়া নাট্যকার অন্তর্দ্বন্দ্বময় এক অপূর্ব মূর্তি সৃষ্টি করিয়াছেন। ইতিহাস চাণক্যের ব্যক্তিত্বের একটি দিকেই আলোকপাত করিয়াছে, নাট্যকার তাহার ব্যক্তিত্বের সমগ্র এবং সম্ভাব্য অংশে আলোকপাত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন—অবশ্য ইতিহাসের আলোককে হীনপ্রভ না করিয়াই। আক্রোশী চাণক্যের দুর্বার স্নেহর সরস মূর্ত প্রতীক। Mc Crindle চন্দ্রগুপ্ত সম্বন্ধে বৌদ্ধ বিবরণের বিবরণ দিতে গিয়া লিখিয়াছেন—"There resided at that time in Pataliputra a Brahman who had come from the great city of Taxila in the Punjab and whose name was Chanakya To him king Dhanananda given an insult which could be expiated by nothing short of his destruction while the Brahman was lasting about for means whereby he could clear his score with the offender. Chandragupta, now a boy, fell under his cognisance. নাটকে এই তক্ষশিলাবাসী পাটলিপুত্রপ্রবাসী ব্রাহ্মণ চাণক্যকে আমরা দেখিতে পাই। রাজার মাতামহের শ্রাদ্ধে পৌরোহিত্য করিতে আসিয়া অপমানিত হওয়ার বৃত্তান্ত বহুকালব্যাপী সাহিত্যিক ও সাধারণ কিংবদন্তী হইতে পাওয়া যায়।

(৩) নন্দ, বাচাল, কাত্যায়ন: নন্দ সম্বন্ধে ইতিহাসকারগণ দুই একটি কৃপণ মন্তব্য ছাড়া আর কিছু করিতে পারেন নাই। স্মিথ লিখিয়াছেন যে—"The reigning king was alleged to be extremely unpopular owing to his wickedness ····" অধ্যাপক রায়চৌধুরীও নন্দকে 'infamous Nanda' বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। নাট্যকার নন্দ-চরিত্র সৃষ্টি ব্যাপারে ইতিহাস নির্দিষ্ট পথেই অগ্রসর হইয়াছেন; নন্দকে অপদার্থ ও পাষণ্ড করিয়া সৃষ্টি করিয়া ইতিহাসের কোন স্পষ্ট নির্দেশের বিরুদ্ধে কার্য করেন নাই। বাচাল সংস্কৃত নাটকের বিশেষতঃ মৃচ্ছকটিক নাটকের রাজশ্যালক শকারের ছাট-কাট-দেওয়া এক সংস্করণ।

কাত্যায়ন বা শাকটাল বৃত্তান্ত ইতিহাস-প্রতিপাদিত না হইলেও ইতিহাস-প্রতিবাদিত নহে। মুদ্রারাক্ষস নাটকের ভূমিকা এবং কিংবদন্তী হইতে অবগত হওয়া যায় যে নন্দ শাকটালের সপ্তপুত্রকে কারারুদ্ধ করিয়া মারিয়া ফেলিয়াছিলেন এবং এই শাকটালই কৌটিল্যকে শ্রাদ্ধে প্রধান ব্রাহ্মণের পদে বরণ করিয়া আনিয়াছিলেন। পাণ্ডিত্য, সারল্য ও দুর্বলতার উপাদানে কাত্যায়নের সৃষ্টি এবং এ সৃষ্টি নির্দোষ কল্পনা।

(৪) গ্রীক চরিত্রাবলী: গ্রীক চরিত্রের মধ্যে সেকেন্দার সাহ বা আলেকজান্দার নামতঃ এবং কার্যতঃ ঐতিহাসিক। সেলুকসের রাজনৈতিক জীবন ইতিহাস-সম্মত-রূপেই অঙ্কিত হইয়াছে। আলেকজান্দারের মৃত্যুর পরে আন্টিগোনাস প্রভৃতি সৈন্যাধ্যক্ষদের সহিত আধিপত্য বিস্তার লইয়া যুদ্ধ, প্রথম যুদ্ধে আন্টিগোনাসের হস্তে পরাজয় এবং পরে বিজয়লাভ, চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য আক্রমণ করিয়া পরাজিত হইয়া কন্যাপণে সন্ধি ক্রয় করা সেলুকসের জীবনের মুখ্য ঘটনা। নাট্যকার এই সকল মুখ্য ঘটনা গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু আন্টিগোনাস ও সেলুকসের সামাজিক সম্পর্ক সম্বন্ধে কল্পনাকে নিরঙ্কুশ করিয়া তুলিয়াছেন। সেলুকস আন্টিগোনাসের

মধ্যে যেভাবে রক্ত-সম্পর্কের সেতুস্থাপনা করিয়া পারস্পরিক শত্রুতার ব্যবধানকে মিলাইয়া দিয়াছেন ইতিহাসে কোথাও তাহার উল্লেখ নাই। সোহাব-রুস্তমের কৌতূহলময় কাহিনীর কারুণ্যের ঘোর নাট্যকার বোধ হয় কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই এবং পারেন নাই বলিয়াই সুদূর গ্রীসের ইতিহাসের এক অস্পষ্ট কোণে প্রিয় কল্পনাকে একটু স্থান করিয়া দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছেন 'হেলেন' সেলুকসের পণবদ্ধা কন্যারূপে কার্যতঃ ঐতিহাসিক, কিন্তু বিদুষী ও আদর্শবাদিনী হেলেন নাট্যকারের মানস কন্যা—নামতঃ এবং কার্যতঃও।

উপসংহারে এই সিদ্ধান্ত করা চলিতে পারে যে চন্দ্রগুপ্ত নাটকে নাট্যকার ইতিহাসকে প্রায় সর্বতোরূপে উপস্থাপিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, মুখ্য ঘটনায় ও প্রধান চরিত্র সৃজনে তিনি ইতিহাসকে, বলা যায় প্রায় পদে পদে অনুসরণ করিয়াছেন। তিনি যেটুকু নূতন সংযোজনা করিয়াছেন তাহা যেমন ইতিহাসকে অতি বিকৃত করিয়া দেয় নাই, তেমনি যেটুকু তিনি বর্জন করিয়াছেন তাহাও ইতিহাসকে পঙ্গু ও ক্ষুণ্ণ করিয়া ফেলে নাই।

চন্দ্রগুপ্ত নাটকের চরিত্র বিশ্লেষণ

"By the term character we mean the dominant sentiments and beliefs of an individual at any given time whereby his attitude to himself and his environment is determined······ Personality on the other hand, is a much more complex matter and includes the ego and the character. It involves all the heredity of the individual, that is all the bodily and mental dispositions, both actual and potential with which he is equipped at birth."

—"Personality" by R. G. Gordon.

চাণক্য

বিদ্বান, বিচক্ষণ ও শাণিতবুদ্ধি ব্রাহ্মণ চাণক্যকে ব্রহ্মোত্তর বাজেয়াপ্ত করিয়া মহারাজ, গৃহ শূন্য করিয়া দিয়া গৃহলক্ষ্মীকে সবলে ছিনাইয়া লইয়া ঈশ্বর, যে অত্যাচার ও অবিচারের আঘাত দিয়াছিলেন, তাহাতে হতমান ও আহতমান চাণক্য সংসারের প্রান্তে বিতৃষ্ণ হইয়াছিলেন; আর দস্যু তাঁহার কন্যা অপহরণ করিয়া তাঁহার মেরুদণ্ড একেবারে ভাঙ্গিয়া দিয়া সেই বিতৃষ্ণাকে একেবারে আক্রোশে পরিণত করিয়া দিল, চাণক্যকে বীভৎসের প্রেমিক করিয়া তুলিল, স্বর্গভ্রষ্ট করিয়া দিল—তাঁহার কাছে 'fair' হইল 'foul', 'foul', 'fair'! চাণক্যের হৃদয় এমন এক শুষ্ক মরুভূমি হইয়া উঠিল যেখানে এক কণা করুণা, স্নেহ, বিশ্বাস কিছুই থাকিল না; ব্রাহ্মণের ধর্ম ক্ষমা, তিতিক্ষা, ত্যাগ প্রভৃতি অন্তর্হিত হইল, প্রতিহিংসা-স্পৃহায় তাঁহার হৃদয়-বুদ্ধি কাণায় কাণায় ভরিয়া গেল। নন্দের অপমান হৃদয়হীন

মেরুদণ্ড-ভাঙ্গা চাণক্যের প্রতিহিংসাপরায়ণতার অনলে পূর্ণাহুতি ঢালিয়া দিল ; চাণক্য প্রতিহিংসা গ্রহণের জন্য ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন—ব্রাহ্মণের প্রতিভার প্রভাব, ব্রাহ্মণের অভিশাপের তেজ, ব্রাহ্মণের ক্রুদ্ধ [illegible] ও ব্রাহ্মণের দুর্জয় প্রতাপের শেষ অগ্নিশিখায় ক্ষাত্রশক্তিকে ভস্মীভূত করিতে সমস্ত কৌটিল্য ও তেজ একাগ্র ও উদগ্র করিয়া তুলিলেন। পিশাচী অদৃশ্য শক্তির পাপের মধ্যে নিজেকে [illegible] বিপক্ষে বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইলেন। ঈশ্বর [illegible] আলো [illegible] মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, চৌর্য, হত্যার রাজ্যে যাইয়া উপস্থিত হইলেন—চন্দ্রগুপ্তের আমন্ত্রণ তাঁহাকে এই সুযোগ করিয়া দিল। চন্দ্রগুপ্তের [illegible] প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার [illegible] করিয়া চাণক্য [illegible], ব্রাহ্মণত্বের এবং ঈশ্বরের 'মহান পবিত্র উজ্জ্বল' রশ্মি ছাড়িয়া [illegible]। বীভৎস অদৃশ্য মহাশক্তির 'কুটিল-দৃষ্টি', বক্র হাসি, তিক্ত গন্ধ, তপ্ত নিশ্বাস ও পঙ্কিল স্পর্শের মধ্যে নিজেকে আকণ্ঠ নিমজ্জিত করিয়া দিলেন। প্রতিহিংসার তীব্র জ্বালায় উত্তেজনার বহ্নি উন্মাদনার মধ্যে [illegible] স্নেহাতুর হৃদয়ের হাহাকারকে বিস্মৃতির তলে চাপিয়া রাখিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, বাহিরের বাদ্য দিয়া হৃদয়ের কোলাহলকে চাপিয়া রাখিবার চেষ্টা করিলেন।

প্রতিহিংসা পূর্ণ হইলে, বাহিরের বাদ্য থামিয়া গেলে, চাণক্য হৃদয়ের হাহাকার আবার শুনিতে পাইলেন, তাঁহার হৃদয় কম্পিত আগ্রহে কাহাকে যেন বক্ষে চাপিয়া ধরিতে চায়। হৃদয়ে অগাধ স্নেহরাশি, কিন্তু তাহার কোন পাত্র নাই। উপবাসী হৃদয়ের হাহাকার ক্ষমতার উচ্চ শিখরাসীন চাণক্যকে—ভারতের অধীশ্বর চাণক্যকে—পথের ভিক্ষুক অপেক্ষাও দীন করিয়া তুলিল। বাহিরের অদ্ভুত মনীষা, দুদম তেজ, অটল প্রতিজ্ঞা, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, অনিবার ক্ষমতা স্নেহের অভাব পূর্ণ করিতে পারিল না। অধিকন্তু ঈশ্বরের অক্ষয় সৌন্দর্য, যাহা তাঁহাকে মাঝে মাঝে বিদ্ধ করিয়া

আসিয়াছে, যাহার আলোকমণ্ডিত শিখরের দিকে চাহিয়া নির্বাসিত চাণক্য বার বার দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া আসিয়াছেন, এখন তাঁহাকে আরও হাতছানি দিয়া আহ্বান করিতে লাগিল। বিশ্বের অমৃত-সমুদ্রের তীরে দাঁড়াইয়া তাপিত তৃষিত হৃদয়ে চাণক্য ছটফট্ করিতে লাগিলেন। শুধু হাত ধরিয়া লইয়া যাইবার একটি হাতের অভাবেই চাণক্য অক্ষয় সৌন্দর্যের লোকে ফিরিয়া যাইবার অদম্য আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও, হাত বাড়াইয়াও পা বাড়াইতে পারিতেছিলেন না। হৃদয়ের হাহাকারের সহিত আধ্যাত্মিক আকুলতা মিশিয়া চাণক্যের হৃদয়কে তত্রদহনে দগ্ধ করিতে লাগিল, স্নেহ-ভক্তি-নিঃস্ব চাণক্যের হৃদয় মহাশূন্যতার বেদনায় অস্থির হইয়া উঠিল। এমন এক বেদনার্ত মুহূর্তে চাণক্য তাহার কন্যাকে ফিরিয়া পাইলেন; স্নেহের মোহমন্ত্রবলে পাষাণ ফাটিয়া জল বাহির হইল, শুষ্ক তরু মুঞ্জরিত হইল। মরুভূমির তপ্তবক্ষে সুধাসমুদ্রের ঢেউ খেলিয়া গেল। চাণক্য কন্যার হাত ধরিয়া আলোকিত পরকালের দিকে চলিলেন। স্বর্গচ্যুত আত্মা তাহার হারানো স্বর্গে ফিরিয়া গেল। হৃদয়হীন অপ্রকৃতিস্থ বুদ্ধি হৃদয়ের স্পর্শে প্রকৃতিস্থ হইল।

চাণক্য চরিত্রটি হৃদয় ও বুদ্ধির দ্বন্দ্বের এক অপূর্ব আলেখ্য। একদিকে প্রতিহিংসাপরায়ণ বুদ্ধি, অদ্ভুত মনীষা, অন্যদিকে স্নেহপ্রবণ হৃদয় ও সহজ আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতা—এই দুইদিকের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব চাণক্য চরিত্রটি দ্বৈত ব্যক্তিত্বের অপূর্ব একটি নিদর্শন হইয়া রহিয়াছে। রাজার অত্যাচার, ঈশ্বরের অবিচার স্বাভাবিক মানুষ চাণক্যকে করিয়া তুলিল অপ্রকৃতিস্থ, বিতৃষ্ণ, বিক্ষুব্ধ; কন্যার অপহরণ তাঁহাকে একেবারে কক্ষচ্যুত করিয়া দিল। তাঁহার কাছে বিবেক হইল—'কুসংস্কার,' ঈশ্বর—'নাই'। চাণক্য হৃদয় হারাইয়া ঈশ্বরকেও হারাইয়া বসিলেন। কিন্তু হৃদয় যে হারাইয়াও হারায় না। ঈশ্বরের অক্ষয় আলোকের দিকে জীবের যে সহজ উন্মুখীনতা রহিয়াছে, মুখ ফিরাইয়া লইলেও তাহা যে জীবকে বার বার আকর্ষণ করে,

সংজ্ঞান বিমুখতা সহজাত উন্মুখীনতা দ্বারা বার বার পরাভূত হইয়া যায়। চাণক্যের মধ্যেও আমরা দেখি—ঈশ্বর-বিমুখ চাণক্য ঈশ্বরের অক্ষয় সৌন্দর্যের দিকে বার বার ব্যাকুল আগ্রহে দৃষ্টিপাত করিয়াছে—স্বর্গচ্যুত স্বর্গের দিকে চাহিয়া বার বার দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়াছে।

মন্ত্রী চাণক্য শুধু বিচক্ষণ ও কুট ব্রাহ্মণ নহেন, তাঁহার উৎকেন্দ্রিক ব্যক্তিত্বের মধ্যে এমন এক অনমনীয় অকুতোভয় আত্মপ্রত্যয়শীলতা এবং দৃঢ়তা আছে, যাহা তাহার ব্যক্তিত্বকে সর্বদমন করিয়া তুলিয়াছে, মহারাজাধিরাজের আজ্ঞা অবহেলে অবজ্ঞা করিতে যে ব্যক্তিত্ব ইতস্ততঃ করে না, মহারাজের উপর চোখ রাঙাইতেও ভয় পায় না এই সর্বদমন ও অবহেলন ব্যক্তিত্বের সহিত স্নেহের কোমলতা ও আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতা মিশিয়া চাণক্য চরিত্রটি এক অপূর্ব এবং অবিস্মরণীয় সৃষ্টি হইয়া আছে। শেক্সপীয়রও এই চাণক্যকে সৃষ্টি করিতে পারিলে গর্ব বোধ করিতেন।

চন্দ্রগুপ্ত

মগধরাজপুত্র চন্দ্রগুপ্তের শৌর্য দুর্জয়, নির্ভীকতা বিস্ময়কর। কিন্তু তাঁহার রক্তের মধ্যে আছে এমন এক সহজ স্পর্শকাতর মমতা—স্নেহের দৌর্বল্য—এক 'বলবতী প্রবৃত্তি' যে রক্তের সম্পর্ককে তিনি কিছুতেই আঘাত করিতে পারেন না। ক্ষুব্ধ আত্মমর্যাদার প্রেরণায় হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য নির্বাসনের প্রতিকার করিবার মানসে, চন্দ্রগুপ্ত সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছেন মায়ের অপমানের যোগ্য প্রতিফল দেওয়ার জন্য তাঁহার সঙ্কল্পকে অধিকতর দৃঢ় করিয়া তুলিয়াছেন—স্নেহের দৌর্বল্যের বিরুদ্ধে নিজেকে প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সমস্ত আয়োজন স্নেহবন্ধের তথা স্বভাবের বিদ্রোহে এক মুহূর্তে নিষ্ফল হইয়া গিয়াছে। নন্দের এক করুণ দৃষ্টি ও কথা স্নেহবন্ধের বাঁধ ভাঙ্গিয়া সমস্ত অন্তরকে প্লাবিত করিয়া দিয়াছে—আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে; কতদিনের কত দৃঢ়

সম্বন্ধ স্বভাবের এক উচ্ছ্বাসে ভাসিয়া চলিয়া গিয়াছে। 'বলবতী প্রবৃত্তি'র একটি কথায়—'ভাইয়ের চেয়েও কি মগধের সিংহাসন বড় ?'—উচ্চাকাঙ্ক্ষার সমস্ত উদ্যোগ, আয়োজন, আত্মমর্যাদার সকল ক্ষোভ ও খ্যাতি কোথায় তলাইয়া গেছে। প্রথম যুদ্ধের পরাজয়ের পর, মাতার প্রেরণা ও গুরুর প্ররোচনা মিলিয়া উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে উদ্দীপ্ত করিয়া চন্দ্রগুপ্তকে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাইয়াছে বটে, কিন্তু কোন কালে ইহার শেষ হয় নাই। চন্দ্রগুপ্তের অন্তরবৃত্তি আমাদের নন্দের তরবারির কম্পিত হাতে চন্দ্রগুপ্ত "স্বীয় তরবারি নিয়া নন্দের শির ছেদ করিতে উদ্যত হইলে নন্দ হস্ত দিয়া নিবারণ করিতে গিয়া" যেই বলিলেন "আমায় বধ করো না" চন্দ্রগুপ্ত তৎক্ষণাৎ তাঁহার তরবারি দূরে নিক্ষেপ করিয়া নন্দকে জড়াইয়া ধরিলেন—"আমার বড় এক ছোট ভাইটি আমার"। নন্দের মৃত্যু দৃশ্যেও আমরা চন্দ্রগুপ্তের সহজ ও স্পর্শকাতর মমতার এক লক্ষণীয় নিদর্শন দেখিতে পাই। নন্দের হত্যা তাঁহাকে বিচলিত করিয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহার কাছে যে মা 'চিরদিনই মা,' যে মা তাঁহার 'ধর্ম, সাধনা ঐশ্বর্য', সেই মা সন্তানের কাছে—তাঁহার কাছে অপরাধের শাস্তি চাহে! ইহা তাঁহাকে আরো বিচলিত করিয়া তুলিল। নন্দের ছিন্নমুণ্ড একদিকে যেমন অসহ্য দৃশ্য মায়ের শাস্তি প্রার্থনারতা মূর্তিও আর একদিকে তেমন অসহ্য বেদনা। এক হস্ত নিহত নন্দের দিকে প্রসারিত করিয়া "অপর হস্ত দিয়া চক্ষুর্দ্বয় আবৃত" করিয়া চন্দ্রগুপ্তের "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" উক্তি স্নেহ ও ভক্তির এক দ্বন্দ্বমুখর আলেখ্য।

রাজ্যোদ্ধারের পরে, চন্দ্রগুপ্তের মধ্যে চাণক্যের স্বয়ংসিদ্ধ প্রভুত্বের বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহ দেখা যায়। নন্দকে মার্জনা করিয়া মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত যে পত্র পাঠাইয়াছিলেন চাণক্যের আদেশে নন্দের শির ও সেই পত্র খড়্গের একই আঘাতে দ্বিখণ্ডিত হইল। মহারাজের আত্মাভিমানের পক্ষে ইহা চরম আঘাত। মগধের মহারাজ কে—চন্দ্রগুপ্ত না চাণক্য—ইহার

মীমাংসা না করিয়া মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের স্বস্তি কোথায়? এই বিদ্রোহ দাক্ষিণাত্য জয়ের পরে নগরালোকন ব্যাপারকে নিমিত্ত করিয়া আত্মপ্রকাশ করিল। চাণক্য মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিলেন এবং উত্তেজনার মুখে চন্দ্রগুপ্ত "অকৃত্রিম বন্ধু" চন্দ্রকেতু কর্তৃক—the most unkindest cut of all—নিদারুণ আঘাত দিয়া বসিলেন। কিন্তু এই অন্যায় আঘাতই সাংঘাতিক প্রতিক্রিয়া লইয়া চন্দ্রগুপ্তের বুকে ফিরিয়া আসিল, সাম্রাজ্যনাশের মহতী বিনষ্টি পর্যন্ত তাহার প্রতিক্রিয়াকে প্রশমিত করিতে পারিল না। আত্মাকে তেমন করিয়া অবমাননা করিয়া আত্মরক্ষার বা আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা তাঁহার কাছে নিরর্থক বলিয়া মনে হইল। চন্দ্রকেতুর এক বিন্দু ক্ষমা, সাম্রাজ্য ও প্রাণ অপেক্ষা তাঁহার কাছে কাম্য ও বহুমূল্য হইয়া দেখা দিল। ইহা 'বলবত্তর প্রবৃত্তি'র কাছে উচ্চাকাঙ্ক্ষার পরাজয় ছাড়া কি?

গ্রীক-বিজয়ের পরে চন্দ্রগুপ্তের জীবনে বেশ একটু দ্বন্দ্ব দেখা দিয়াছিল ছায়ার প্রতি কর্তব্যের ও কৃতজ্ঞতার আকর্ষণে এবং হেলেনের প্রতি প্রেমের আকর্ষণে। চন্দ্রগুপ্ত নিজে এ দ্বন্দ্বের কোন মীমাংসা করিতে পারেন নাই। এই অংশে তাঁহার ব্যক্তিত্ব নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িয়াছে, অথবা বলিতে পারা যায়, কর্তব্যবোধ অপেক্ষা প্রেমমোহ তাহার দ্বন্দ্বে জয়লাভ করিয়াছে।

চন্দ্রকেতু

চন্দ্রকেতু পার্বত্য জাতির অকপট ও সরল প্রীতির এবং সত্যনিষ্ঠার একটি ঐকান্তিক আদর্শ। তাহার কাছে একদিনের বন্ধু চিরদিনের বন্ধু; সুখের দিনে বন্ধু তাহাকে বিনাদোষে বিদায় করিয়া দিলেও বন্ধুর দুঃখের দিনে সে অনাহূত ভাবেই সেই বন্ধুর পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়া দুঃখের ভার বহন করে, বন্ধুর জন্য শেষ রক্তবিন্দু অকাতরে ঢালিয়া দিতে কুণ্ঠিত হয় না। অকপট এবং অটল বন্ধুপ্রীতি, অকুণ্ঠ আত্মত্যাগে চন্দ্রকেতুর

মধ্যে চিরস্মরণীয় মহিমায় মণ্ডিত হইয়াছে। চন্দ্রকেতুর মধ্যে গতি কি চত্র চরিত্র সৃষ্টি অপেক্ষা একাগ্রগতিক একটি আদর্শকে বড় করিয়া দেখান হইয়াছে।

কাত্যায়ন

কিন্তু চাণক্যের সমীক্ষণের উপর আস্থা থাকিলে বলিতে হয় কাত্যায়ন—"তাহাতেই গোলমাল। কেবল স্মৃতির উপর নির্ভর করে যায়, কিছু বোঝে না।" কাত্যায়ন কিছু বোঝে না কেবল বলা চলে না এই জন্য যে পাণিনির ব্যাকরণ তিনি এত বেশী বুঝিয়াছেন যে পাণিনি সম্বন্ধে তিনি যারপরনাই অবুঝ, পাণিনির সূত্রের ব্যাখ্যা ও বার্তিক তাঁহার মনের অধিকাংশই জুড়িয়া গিয়াছে। বার্তিককারের মধ্যে ব্যাকরণ-বার্তিক দেখা দিয়াছে। তবে 'কিছু' বলিতে যদি রাজনীতির চাল আর সাংসারিক জ্ঞানের কথা ধরা হইয়া থাকে, তাহা হইলে চাণক্যের কথার প্রতিবাদ করিবার কিছু নাই। সাত-সাতটা পুত্রকে চক্ষুর সম্মুখে অনাহারে মরিতে দেখিয়া তাঁহার মধ্যে প্রতিহিংসা গ্রহণের যে ইচ্ছাটা জাগিয়াছিল তাহারই প্রেরণায় কাত্যায়ন নন্দের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং চন্দ্রগুপ্তের পক্ষে যোগ দিয়া মৌর্য্য চাণক্যকে সংযুক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন—ইহা ছাড়া কাত্যায়নের মধ্যে সাংসারিক জ্ঞানের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। ইহার পরের ইতিহাস—কেবল স্মৃতির উপর কাজ করিয়া যাওয়া। কাত্যায়ন সেই শ্রেণীর দাবা-খেলোয়াড় যাঁহারা পাঁচ চাল হিসাব করিয়া ঘুঁটি চালায় না। সেয়ান হিসাবী হইলে কাত্যায়ন সাত-সাতটা মৃত পুত্রের শেষ অনুরোধ—"বাবা প্রতিহিংসা নিও"—নন্দের সামান্য ক্ষমা-প্রার্থনায় ভুলিয়া যাইতে পারিতেন না, অত সহজে বলিতে পারিতেন না—"যাও নন্দ! তোমায় ক্ষমা করলাম।" আবার সেই বন্দির দৃশ্যে নন্দের কাতর ক্ষমা প্রার্থনায়

বলিতেন না "নন্দ! মহারাজ! আমি ক্ষমা করেছি।" ঘটনার উপরিদেশের প্রকৃতিই তাঁহার স্পর্শকাতর হৃদয়ের পক্ষে যথেষ্ট; এই কারণেই নন্দের কাতর ভাব তাঁহার হৃদয়ে অনুকম্পন সৃষ্টি করিয়া সঙ্কল্পের হিসাব ভুলাইয়া দিল। আবার এই কারণেই চাণক্য যখন তাহার সম্মোহন দৃষ্টি প্রয়োগ করিয়া বলিলেন—"মনে কর কাত্যায়ন! তোমার সপ্ত পুত্রের শীর্ণায়মান পাণ্ডুর মূর্তি—তাদের সেই অন্নের জন্য ক্ষীণ হাহাকার তাদের নিষ্প্রভায়মান দৃষ্টি—তারপর সব হিম, কঠিন, অসাড়—তাদের নিষ্পন্দ নির্নিমেষ চক্ষু দুটির উপর মৃত্যুর করাল মুদ্রাঙ্কন। মনে কর—সেই মৃত্যু তুমি সম্মুখে দেখছো। তুমি তাদের পিতা—তাই দেখছো, মনে কর—কাত্যায়ন। স্বহস্তে তার প্রতিশোধ নাও!" কাত্যায়নের মধ্যে প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া দেখা দিল, যে করুণার বশে ক্ষমা করিয়াছিলেন তাহা পরবর্তী প্রবৃত্তির তলে একেবারে তলাইয়া গেল! কাত্যায়নের খড়্গাঘাতে নন্দের দেহ হইতে মস্তক বিচ্ছিন্ন হইল।

ইহার পরে—কাত্যায়নের মধ্যে স্বাভাবিক ভাবেই 'ঈর্ষা' দেখা দেয়, কিন্তু কোন মহত্তর প্রবৃত্তির দ্বারা জাতীয়তাবোধ বা স্বদেশ-ভক্তি দ্বারা তিনি ইহাকে প্রশমিত করিতে পারেন নাই। "সেলুকস যেই ভজিয়েছে অমনি সেই দিকে" চলিয়াছেন। তাঁহার সহজ প্রবৃত্তি যে জাতির বিরুদ্ধে, দেশের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করিতেছিল, সে খেয়ালও তাঁহার ছিল না চাণক্যের কথায় বলা যাক—কাত্যায়নের "চিরদিন এক রকমে গেল"

সেলুকস

গ্রীক সেনাপতি সেলুকস—যাঁহাকে সেকেন্দার সাহ মৃত্যুর সময় এসিয়ার সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী করিয়া গিয়াছিলেন। না পড়াশুনা

করিয়া মৌলিকতা বজায় রাখিলেও বিদুষী কন্যা হেলেনের কাছে কোনভাবেই মান বজায় রাখিতে পারেন নাই। মৌলিকতার বিরুদ্ধে কাজ করিতে যাইয়া নিজের কথাকে ডিমস্থিনিস, অ্যারিষ্টটল, সফোক্লিস—যাঁহার স্কন্ধেই চাপাইতে গিয়াছেন, দুষ্ট মেয়ে হেলেন তৎক্ষণাৎ তাহা ধরিয়া ফেলিয়া তাঁহাকে অপদস্থ করিয়া তুলিয়াছে; পিতার অভিমান বার বার এইভাবে ক্ষুব্ধ হইয়াছে, কিন্তু মাতৃহারা কন্যার মলিন মুখের কাছে কোনও অভিমানই আঁটিয়া উঠিতে পারে নাই। পিতা যেমন কন্যার মলিন মুখ সহ্য করিতে পারে না, কন্যাও তেমনি পিতার চোখের জল মুছাইতে প্রাণ দিতে পারে। সেলুকস হেলেনের শুধু পিতা নহেন—জন্মাবধি মাতাও, একাধারে মা-বাপ। তাই হেলেনের আব্দারের অন্ত নাই, অসঙ্কোচ ব্যবহারে দ্বিধা নাই, আর সেলুকসেরও কন্যার যুক্ত করের কাছে সকল যুক্তি হার মানে—দৃঢ়তম সঙ্কল্পও টলিয়া যায়।

সেলুকস একাধারে 'পিতা-মাতা' বলিয়া তাঁহার বাৎসল্যের মধ্যে মাতৃস্নেহের কোমলতার পরিমাণই অধিক। তাই কন্যার বিচ্ছেদ-দুঃখে সেনাপতির স্বাভাবিক মর্যাদা-সচেতন গাম্ভীর্য তাঁহার বেদনার্ত চিত্তের উচ্ছ্বাসকে ও চোখের জলকে রোধ করিতে পারে না। আন্টিগোনাসের হস্তে বন্দী সেলুকস, গ্রীক অভিমান জাগ্রত করিয়াও হেলেনকে বিদায় দিতে না কাঁদিয়া পারেন নাই; আবার—যে মাতৃহীনা বালিকাকে বক্ষে করিয়া ঘুম পাড়াইয়া নিজের হাতে খাওয়াইয়া মানুষ করিয়াছেন, বিজয়যাত্রায় সব ছাড়িয়া আসিয়াও সুদ্ধ যাহাকে ছাড়িয়া আসিতে পারেন নাই, সেই হেলেনকে—চিরজন্মের মত বিদায় দিতে যাইয়া তাঁহার পিতৃহৃদয় মাতৃহৃদয়ের অস্থির-আবেগে উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার চক্ষু জলে ভরিয়া গিয়াছে। সেলুকস বাহিরে একজন বিজিগীষু সেনাপতি, কিন্তু ভিতরে তিনি স্নেহপ্রবণ, কন্যাবৎসল এক মাতৃকল্প পিতা। তাঁহার স্নেহের স্বচ্ছ সরোবর স্নেহাস্পদের কঠিন বাক্যনিক্ষেপে চঞ্চল ও বিক্ষুব্ধ হইয়া বেশীক্ষণ থাকিতে পারে না, দেখিতে না দেখিতে ভাবিক শান্ত মাধুর্যে ফিরিয়া যায়।

আন্টিগোনাস

আন্টিগোনাস নির্ভীক বীর, গ্রীক সৈন্যাধ্যক্ষ—পুরুষকারের বলিষ্ঠ প্রতিনিধি। পিতা থাকিতেও শৈশবে সে পিতৃহীন। দাক্ষিণ্যের দ্বারে ভিক্ষুক করিয়া ঈশ্বর তাহাকে বিশ্বে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন; সেই ভিক্ষুক দারিদ্র্যের কঠোর বাধা ঠেলিয়া নিজের শৌর্য ও দক্ষতায় সৈন্যাধ্যক্ষ হইয়াছে। কিন্তু একমাত্র পিতৃ-পরিচয় না জানায়, শৌর্য ও দক্ষতার দীপ্ত মহিমা সত্ত্বেও সে বড় দুর্বল, বড় নিঃস্ব। এই এক মহাব্যাধি, যাহা তাহার সৃষ্ট নহে, তাহার অন্তরকে বিষ-জর্জরিত করিয়া মহিমার অমৃত-পানীয় বিস্বাদ করিয়া দিয়াছে। তাহার সমস্ত ঐশ্বর্যকে করিয়া দিয়াছে মূল্যহীন, ক্ষমতাকে করিয়া রাখিয়াছে নিষ্ফল, অক্ষম।

হেলেনকে পত্নীরূপে পাওয়া দক্ষ সৈন্যাধ্যক্ষ আন্টিগোনাসের পক্ষে অন্যায় কামনা নহে, কিন্তু এই কামনার পথে অলঙ্ঘ্য বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহার জন্ম-পরিচয়। প্রস্তাবের উত্তরে সেলুকস যখন বলিলেন—"যার জন্মের ঠিক নাই তার সঙ্গে সেলুকসের কন্যার বিবাহ অসম্ভব।"—আন্টিগোনাস ব্যঙ্গের জ্বালায় ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। পিতৃ-পরিচয় উদ্ধার না করা পর্যন্ত এই ব্যঙ্গের জ্বালা তাহাকে একটু সময়ের জন্যও স্থির হইতে দেয় নাই।

সেলুকসকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া, বন্দী করিয়া তীব্র ব্যঙ্গের জ্বালাকে সে প্রশমিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, হেলেনকে লাভ করিবার শেষ চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু বাইরের বিজয় তাহার অন্তরের পরাজয়ের গ্লানিকে কিছুতেই প্রশমিত করিতে পারিল না, অন্তরের পরাজয়ে সে পলাতক হইল। 'হাউইকে যেমন একটা মহাজ্বালা আর্তশ্বাসে উর্দ্ধে' উড়াইয়া লইয়া যায়, তেমনি সেই তীব্র ব্যঙ্গ ক্ষিপ্তবেগে তাহাকে ছুটাইয়া লইয়া চলিল, যাহার তাড়নায় "সিংহের গর্জন, ব্যাঘ্রের ব্যাদন, অগ্নির জিহ্বা, করকার প্রপাত, শত্রুর খড়্গ" তুচ্ছ করিয়া, অর্দ্ধেক পৃথিবী ঘুরিয়া আন্টিগোনাস তাহার মাতাকে খুঁজিয়া বাহির করিল—মাত্র পিতার পরিচয়টুকু জানিবার জন্য।

পিতৃপরিচয় লইয়া সে জানিল যে শত্রু সেলুকসই তাহার পিতা; আর হেলেন—যাহাকে পত্নীরূপে লাভ করা তাহার জীবনের একদিকের সিদ্ধি, তাহারই ভগিনী। এই পিতৃপরিচয়টুকু অন্যরূপ হইলে, এই বিলম্বিত পরিচয়োদ্ধারের জন্য আন্টিগোনাসকে হেলেনকে হারাইয়া অনির্বাণ বেদনা-দাহ ভোগ করিতে হইত, কিন্তু এইরূপ পরিচয় আন্টিগোনাসকে সর্বতোভাবে সুখী করিয়া তুলিল—তাহার হৃদয়ের সমস্ত জ্বালা প্রশমিত করিল; হেলেনের বক্ষ হইতেও পাষাণ-ভার নামাইয়া দিল।

হেলেন

সেনাপতি সেলুকসের শৈশবে মাতৃহীনা কন্যা হেলেন। পিতার বক্ষে ঘুমাইয়া, পিতার হাতে খাইয়া সে মানুষ হইয়াছে। বিজয়-যাত্রায় পর্যন্ত পিতা তাহাকে ছাড়িয়া আসিতে পারেন নাই বা সেও পিতাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে নাই। সেলুকসের স্নেহের দুলালী হইয়া শুধু ভাল খাইয়া আর ভাল পরিয়াই সময় কাটায় নাই, গ্রীক সাহিত্যকে সে এমন ভালভাবে পড়িয়াছে যে তাহার কাছে একের উক্তিকে অন্যের উক্তি বলিয়া চালাইয়া দেওয়া একেবারেই অসম্ভব। সেলুকসের কথায় বলিতে গেলে—হেলেন "প'ড়ে প'ড়ে মৌলিকত্ব নষ্ট" করিয়াছে—"মেয়েটা যে সবই পড়েছে।" হেলেন যথার্থই বিদুষী এবং যথার্থই শিক্ষিতা। মানুষের জীবনে সে মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠা চাহে, মহৎ প্রবৃত্তির—'দুঃখীর দুঃখ দূর করা, রোগীর সেবা করা, ক্ষুধার্তকে খেতে দেওয়া, অজ্ঞানকে জ্ঞান দেওয়া'—এই সকলের উদ্বোধন চাহে। বিশ্বপরিবারের একজন হইয়া হিংসা-দ্বেষ-বর্জিত জীবন যাপন তাহার জীবনের আদর্শ। সেই জন্যই যে বিদ্বেষ-অহঙ্কার এই মহা বিশ্বপরিবারকে বিচ্ছিন্ন করিয়া মানুষের মধ্যে হিংসার হানাহানি সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে সে কিছুতেই প্রতিবাদ না করিয়া থাকিতে পারে না এবং এই জন্য মহৎ প্রবৃত্তির প্রেরণায়ই হেলেন মানবের

মহাহিতে আত্ম বলিদান দিয়াছে। এই আদর্শবাদের পাশেই সমান বলীয়ান বা অধিকতর বলীয়ান পিতৃভক্তির নিষ্ঠা। তাহার মধ্যে রহিয়াছে—একাগ্রতা এবং অটলতা লইয়া হেলেন—'শিশুকে অনাহারী, বৃদ্ধকে লাঞ্ছিত, কন্যাকে পরিত্যক্ত, মৃতদেহকে পদদলিত সব মর্মভেদী দৃশ্য' দেখিতে পারে, পিতার চক্ষে সে অশ্রু দেখিতে পারে না—পিতার অপমান, পিতার লাঞ্ছনা সে সহিতে পারে না। তাই দেখা যায়—আন্টিগোনাসের প্রতি তাহার সহজ আকর্ষণ থাকিলেও আন্টিগোনাসের প্রস্তাব সে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে এই জন্য যে আন্টিগোনাস তাহার পিতার স্কন্ধের উপর খড়্গ তুলিয়াছিল। আবার এই জন্যই যখন বন্দী সেলুকসের চক্ষু জলে ভরিয়া গেল, হেলেন নিজের সমস্ত আত্মমর্যাদাকে তুচ্ছ করিয়া আন্টিগোনাসকে বলিয়াছিল—"আমি তোমায় বিবাহ কর্ব। আমি তোমার ক্রীতদাসী।" —বাবার মুক্তির জন্য জানু পাতিয়া ভিক্ষা প্রার্থনা করিল।

চন্দ্রগুপ্তের হস্তে সেলুকসের পরাজয় এবং কন্যাপণে সন্ধির প্রস্তাব গ্রীক-কুমারী হেলেনের কাছে একটা দুর্যোগ হইয়া দেখা দিলেও, আদর্শবাদিনী হেলেনের কাছে শ্রেয়ের বেদীমূলে আত্মত্যাগের এক মহা সুযোগ আনিয়া দিল। অনিচ্ছুক পিতার নিকট হইতে সে অনুমতি আদায় করিয়া লইল—শুধু এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিবার জন্য। আদর্শবাদিনী হেলেন মনে মনে বলিল—"আপনি কি বুঝবেন বাবা, যে আমি এ বিবাহ কর্তে চাই কেন? এত তর্ক কর্তে, অনুনয় যা সাধন করতে পারে নাই, এ বিবাহে তাই সাধন করব।" এই আত্মত্যাগ করিতে সঙ্কল্প করিবার সময় সে আন্টিগোনাসের কাছে চাহিল ক্ষমা আর ঈশ্বরের কাছে চাহিল—হৃদয়ের বল। এই হৃদয়ের বল দিয়াই সে মর্ম ভেদ করিয়া যে ক্রন্দন ঠেলিয়া উঠিতেছিল তাহার গলা টিপিয়া ধরিয়া রাখিয়াছিল। সেলুকস কন্যা হেলেনের পক্ষে এ তো বিবাহ নয়—এ যে মৃত্যু, সেলুকস-কন্যা না কাঁদিয়া পারে না। বিবাহোৎসবের দুন্দুভিনাদ তাহার কর্ণে মরণের আর্তনাদ হইয়াই যে বাজিবে। কিন্তু

আদর্শবাদিনী হেলেনের—যে "পরের হিতে কর্তব্যের জন্য আত্মবলিদান" করিতেছে,—বুকে যে পরম উল্লাস, পরম সুখ। হেলেনের "প্রেয়-কাঙ্ক্ষী আমি" (ego) "শ্রেয়-কাঙ্ক্ষী আমি"র (super ego) কাছে আত্মসমর্পণ করিয়াছে, কিন্তু সে আত্মসমর্পণ অতীব করুণ ও মর্মস্পর্শী। হেলেনের চরিত্র এই দুই আমির দ্বন্দ্ব ও সন্ধির ইতিহাস—"শ্রেয় কাঙ্ক্ষী আমি'র বিজয়ের আর "প্রেয়-কাঙ্ক্ষী আমি'র অবদমনের ইতিহাস। শেষের দিকে হেলেন করুণ মহিমার একখানি লক্ষণীয় আলেখ্য।

মুরা

মুরা শূদ্রাণী, চন্দ্রগুপ্তের জননী, নন্দের ধাত্রী মাতা। নন্দের মাতার মৃত্যুর পর, তাহার মাতৃস্বরূপিণী হইয়া সে তাহাকে মানুষ করিয়াছে, স্তন্যপান করাইয়াছে—বুকে করিয়া ঘুম পাড়াইয়াছে। চন্দ্রগুপ্ত ও নন্দ মুরার হৃদয়-আকাশে সূর্য আর চন্দ্র।

চন্দ্রগুপ্ত ও নন্দের মধ্যে রাজ্যাধিকার লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইলে, নন্দ স্নেহের সমস্ত ঋণের কথা ভুলিয়া গিয়া চন্দ্রগুপ্ত-জননী মুরাকে 'শূদ্রাণী" বলিয়া কঠোরতম আঘাত করিয়াই ক্ষান্ত রহিল না, পারিষদবর্গের মধ্যে তাহার শ্যালককে দিয়া তাহার চরম অপমান ঘটাইল—বাচাল তাহার কেশাকর্ষণ করিল। যখন নন্দ তাহাকে শূদ্রাণী মা বলিয়া সম্বোধন করিল—সে কথা মনে করিতে গেলে তাহার মনে হয়—অগ্নির লেলিহান শিখার মধ্যে সে দাঁড়াইয়া আছে, আর বাচাল যখন কেশাকর্ষণ করিল সে অভাবনীয় কথা ভাবিতে গেলেই তাহার সমস্ত হৃদয় ক্রন্দন হইয়া বাহির হইতে চায়। তবুও শূদ্রাণী মুরা প্রতিশোধের আশায়ই মাত্র জীবন ধারণ করিয়া ছিল! কিন্তু জননী মুরার চোখ যে জলে ভরিয়া উঠে, কোণে কোণে মুখ লুকাইয়া সে যে না কাঁদিয়া পারে না। যতই সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধের দিন নিকটবর্তী হইতে লাগিল ততই

তাহার বক্ষে উদ্দাম ঝড় বহিতে লাগিল। যুদ্ধক্ষেত্রে চাণক্যের শিবিরে রাত্রিকালে ব্যাকুল হৃদয়ে মা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—'কাল যুদ্ধ?'—চাণক্যের উত্তর শুনিয়া অস্থির জননী বলিল,—'গুরুদেব! এ যুদ্ধে কাজ নাই।" "চন্দ্রগুপ্ত আমার পুত্র, আর নন্দ—সেও আমার পুত্র। চন্দ্রগুপ্ত আর নন্দ—এক বৃন্তে দু'টি ফুল। আমার হৃদয় আকাশের সূর্য চন্দ্র। তাদের আঘাতে যে আকাশ চূর্ণ হ'য়ে যাবে। না গুরুদেব কাজ নাই। চন্দ্রগুপ্ত আমার পথের ভিখারী হোক। বিবাদে কাজ নাই।" কিন্তু প্রতিহিংসার জ্বালায় ক্ষিপ্ত চাণক্যের কাছে মায়ের ব্যাকুল হৃদয় কোন মূল্যই পাইল না। নিরুপায় মাতা নিজের ঘরে ফিরিয়া গেল।

কিন্তু যুদ্ধের মধ্যে চাণক্যের ইঙ্গিতে শূদ্রাণী তাহার সমস্ত অপমানের ব্যথা লইয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। যুদ্ধ-বিমুখ চন্দ্রগুপ্তকে প্রতিহিংসাপরায়ণা এই শূদ্রাণীই বলল—"সর্বাঙ্গে দিবারাত্র শত বৃশ্চিক দংশনের জ্বালাকে শীতল করতে পারে—এক নন্দের রক্ত।" তারপর বলির দৃশ্যেও শূদ্রাণী চেতনাই মুরার মধ্যে প্রবল আকারে চন্দ্রকেতু ও কাত্যায়নের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"আমার আজ্ঞা—বধ কর।"—ক্ষমা করিতে পারি না—জানি না। আমি যে শূদ্রাণী!" মায়ের প্রাণ পিঞ্জরের দ্বার ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়া আসিয়া শূদ্রাণীর পায়ে ধরিয়া ভিক্ষা চাহিতেছিল, নন্দের ম্লান অধোমুখ দেখিয়া তাহার অশ্রুর উৎস উথলিয়া উঠিয়া দৃষ্টিপথ রোধ করিতেছিল, কিন্তু শূদ্রাণী তাহার অমননীয় অভিমানে বলিল 'না আমি ক্ষমা কর্ব না। আমি যে শূদ্রাণী—গণিকা।—বধ কর।" রক্ষা করিতে আসিয়া মুরা নন্দকে হত্যা করিয়া বসিল। ঘাতক শূদ্রাণীর মুখের বাক্য শুধু শুনিল, জননীর অন্তরের কথা শুনিতে পাইল না।—ইহার পরে মুরা শুধু মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের মাতা—রাজমাতা!

ছায়া

মগধ রাজদুহিতা ছায়ার জীবন একনিষ্ঠা প্রেমিকার জীবন। প্রথম দর্শনেই সে চন্দ্রগুপ্তকে আত্মহারা হইয়া ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে, জাগতে, নিদ্রায় চন্দ্রগুপ্তই তাহার ধ্যান, চন্দ্রগুপ্তের আড়ালে সমগ্র জগৎ ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। ছায়ার অমূল্য হৃদয় আছে—বীরের ধর্মপত্নী হওয়ার যোগ্যতাও তাহার আছে, কিন্তু এক রূপের অভাবে তাহার প্রাণ গুমরিয়া কাঁদে—"তবে পরাণে ভালবাসা কেন গো দিলে, রূপ না দিলে যদি বিধি হে।" তাহার ইচ্ছা হয় "বিশ্বে যত সৌন্দর্যরাশি, গোমুখীর ধারার মত অশ্রান্তধারে" চন্দ্রগুপ্তের পায়ে ঢালিয়া দিতে। সমস্ত আত্মদানের বিনিময়ে সে চায় চন্দ্রগুপ্তের প্রেমপূর্ণ একটি দৃষ্টি—অন্ততঃ একটি বারের জন্য।

কিন্তু তাই বলিয়া ছায়া নিষ্প্রাণ অনুকম্পার মুষ্টি ভিক্ষা দ্বারা তাহার প্রেমের অপমান করিতে পারে না। মগধের দেবস্তুত মহারাজ হইলেও ছায়া তাহার প্রেমের অসম্মানকারীকে ঘৃণা করে। কিন্তু এই ঘৃণাই তো সব সত্য নহে। যে চন্দ্রগুপ্ত ছায়ার 'জাগ্রতে ধ্যান, নিদ্রায় স্বপ্ন', ইহলোকের সম্পৎ, পরলোকের স্বপ্ন, যাহার দর্শন তীর্থ, অদর্শন অভিশাপ, সেই চন্দ্রগুপ্তকে ছায়া ঘৃণা করিবে কোন প্রাণে? এই তো ছায়ার দুঃসহ বেদনা। অভিমান যাহাকে ঘৃণা করিতে চায়, হৃদয়ের সেই যে সর্বস্ব।

কিন্তু তবু ছায়া অনুগ্রহ-দত্ত সম্মানের ভিখারিণী নহে। 'চন্দ্রকেতুর অন্তিমকালের অনুরোধ হ'য়ে' সে সম্রাজ্ঞীর আসনে বসিয়া নিজেকে ছোট করিতে পারে না; চন্দ্রগুপ্তের প্রস্তাব সে যোগ্য মর্যাদার সঙ্গেই প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। এই সময় হইতেই সে তাহার প্রেমকে আত্মত্যাগে দীক্ষিত করিবার চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু বুদ্ধির শাসন হৃদয়ের বাঁধনকে সংযত রাখিতে পারে নাই, বার বার টুটিয়া গিয়াছে। ছায়া তাহার সমস্ত মর্যাদা বোধকে জাগ্রত করিয়া নির্মমভাবে প্রবৃত্তির কণ্ঠরোধ করিতে চেষ্টা করিয়াছে—

তাহার প্রেমকে sublimate করিতে উদার আত্মত্যাগে উন্নীত করিতে সাধনা করিয়াছে, কিন্তু ছায়া সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারে নাই; তাহার ব্যথাতুর হৃদয়ের দুর্বার উচ্ছ্বাস অভিব্যক্তি তাহার মুখের কথাকে মিথ্যা করিয়া দিয়াছে।

অভিমান ও হৃদয়ের দ্বন্দ্বে ছায়ার চরিত্র করুণ-মাধুর্যে মণ্ডিত হইয়াছে। অভিমান হৃদয়ের কাছে বার বার পরাজিত হইয়া চরিত্রটির আবেগ-প্রাধান্যই ঘোষণা করিয়াছে ছায়া নারী, হেলেনও নারী; ছায়ার চরিত্র আবেগ প্রধান, হেলেনের চরিত্র ভাব প্রধান।

সাজাহান নাটকের ঐতিহাসিক পটভূমি

সাজাহান নাটকখানি ১৬৫৭ খ্রী: হইতে ১৬৬২ খ্রী: পর্যন্ত কালের ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে লিখিত। ১৬৫৬ খ্রী: দিল্লীর স্বাস্থ্য খুব শোচনীয় ও আশঙ্কাজনক হইয়া উঠিয়াছিল। ফলে সাজাহান দরবারসহ গঙ্গাতীরবর্তী গড়মুক্তেশ্বর নামক স্থানে যাইতে বাধ্য হইলেন। মাসখানেকের মধ্যে রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন বটে, কিন্তু সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ না কমায় ১৬৫৭ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী মাসে দিল্লী হইতে পঞ্চাশ ক্রোশ দূর যমুনাতীরবর্তী মুখলিশপুরে বাসস্থান স্থানান্তরিত করিলেন এবং নাম দিলেন ফয়জাবাদ।

১৬৫৭ খ্রী: এপ্রিল মাসের শেষে সাজাহান রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং ৬ই সেপ্টেম্বর তিনি মূত্রকৃচ্ছ্রতা ও কোষ্ঠবদ্ধতা রোগে অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। ক্রমশঃ অবস্থা আশঙ্কাজনক হইয়া উঠিল—পা ফুলিয়া গেল, জিহ্বা শুকাইয়া উঠিল, জ্বরের তাপও বাড়িতে লাগিল। দরবার বন্ধ করিতে বাধ্য হইলেন—প্রত্যহ প্রাতঃকালে অলিন্দ হইতে প্রজাদের যে দর্শন দিতেন তাহাও বন্ধ হইয়া গেল। এক দারা শিকো এবং দুই একজন অতি বিশ্বস্ত লোক ছাড়া আর কেহই রোগশয্যাপাশে যাইতে বা থাকিতে পারিত না। এই সময় ব্যাপকভাবে গুজব রটিয়া গেল—সাজাহান মরিয়া গিয়াছেন, দারা রাজ্যাভিষেক পর্যন্ত সংবাদ গোপন করিতেছেন। এমতাবস্থায়, অসুস্থদেহেই সাজাহানকে ১৪ই সেপ্টেম্বর, শয়নকক্ষের বাতায়নপাশে দাঁড়াইয়া প্রজাদের দর্শন দান করিতে হইল, তথা প্রমাণ করিতে হইল যে তিনি জীবিতই আছেন। ১৫ই অক্টোবর তারিখেও একই ভাবে তাঁহাকে নিজের জীবিতা-বস্থা প্রমাণ করিতে হয়।

চিকিৎসার ফলে রোগ প্রশমিত হইল, কিন্তু তিনি মৃত্যুর হাতছানি

দেখিতে পাইলেন। নিজের অবস্থা সম্যক বুঝিতে পারিয়া দারাকে উত্তরাধিকারী নির্বাচিত করিলেন, এবং ১৮ই অক্টোবর দিল্লী ত্যাগ করিয়া মমতাজের স্মৃতিরাজ্যে শান্তিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিবার জন্য আগ্রাভিমুখে যাত্রা করিলেন। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ না করা পর্যন্ত আগ্রার দুর্গ হইতে তিনি আর বাহির হইতে পারেন নাই। অকারণ লাঞ্ছনা ও অনাবশ্যক অপমানে তাঁহার দেহ-মন অবসন্ন হইয়া পড়িল, ১৬৬৬ খ্রীঃ ২২শে জানুয়ারী জীবন্মৃত সাজাহান জীবনটুকু ত্যাগ করিয়া সংসারের সমস্ত দাহ জুড়াইলেন।

নাটকে গৃহীত ঘটনা

আগ্রায় আসিবার পরে কিছুদিনের মধ্যে, নভেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে, সাজাহান বেশ সুস্থ হইয়া উঠিলেন। রাজকার্যের সমস্ত ব্যাপারেই তখন তাঁহার নির্দেশ লইতে হইত। এই সময়েই সাজাহান নাটকের আরম্ভ এবং সোলেমানের মৃত্যুর পরে—(১৬৬২ খ্রীঃ) নাটকের শেষ। এই সময়ের সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক বার্তা ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের ভাষায় আরম্ভ করিসে—"১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে সাজাহান গুরুতররূপে পীড়িত হইয়া পড়িলেন। এই সংবাদ পাওয়া মাত্র সুজা রাজমহলে সিংহাসন আরোহণ করিলেন এবং নিজ নামে মুদ্রা ছাপিতে লাগিলেন। মুরাদ বক্সও গুজরাটে নিজেকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং কিছুদিন ইতস্ততঃ করিয়া ১৬৪৮ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী মাসে ঔরংজীবও স্বাধীন রাজার ন্যায় আচরণ করিতে লাগিলেন। নিজেদের মধ্যে সাম্রাজ্য ভাগ করিয়া নিবার সর্তে ঔরংজীব ও মুরাদ গোপন সন্ধি করিলেন।"

অবস্থার চাপে সাজাহান বিদ্রোহী পুত্রদের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণের অনুমতি না দিয়া পারিলেন না। (ক) সুজার বিরুদ্ধে জয়সিংহকে এবং সোলেমানকে পাঠাইবার ব্যবস্থা হইল (৩০শে নভেম্বর ১৬৫৭, ২২ হাজার সৈন্যসহ যুদ্ধ যাত্রা)

এবং (খ) পরে ঔরংজীবের ও মোরাদের গতিরোধ করিবার জন্য মারবারের রাজা যশোবন্ত সিংহকে ও কাশিম খাঁকে পাঠান হইল (১৮ই ডিসেম্বর ও ২৬শে ডিসেম্বর), ২৫শে জানুয়ারী ঔরংজীবও উত্তরাভিমুখে স-সৈন্যে যাত্রা করিলেন। পরবর্তী ঘটনা—(গ) ১৪ই ফেব্রুয়ারী জয়সিংহ সোলেমানের সহিত কাশীর নিকটে সুজার যুদ্ধ—এই যুদ্ধে সুজার পরাজয় ঘটে। (ঘ) ১৫ই এপ্রিল ১৬৫৮, উজ্জয়িনীর চৌদ্দ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে ধর্মাট নামক স্থানে সম্রাট-বাহিনী ঔরংজীব-মোরাদ কর্তৃক পরাজিত হয়। (ঙ) ২৯শে মে আগ্রার আট মাইল পূর্বে শামুগড়ের যুদ্ধে দারা ঔরংজীব-মোরাদ কর্তৃক সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হন। (চ) দশ দিন পরে আগ্রার দুর্গ ঔরংজীবের অধিকারে যায় এবং মহম্মদের অধীনে সাজাহান আগ্রা দুর্গে বন্দী হইয়া থাকেন। (ছ) ওদিকে দারা পরাজয়ের পর দোয়াবের দিকে পলায়ন করেন। (জ) সোলেমান জয়সিংহের ও দিলীর খাঁর বিশ্বাসঘাতকতার জন্য যথাসময়ে পিতার সাহায্যে যাইতে পারেন নাই। (ঝ) ১৩ই জুন ঔরংজীব দারার পশ্চাদ্ধাবন করিতে আগ্রা হইতে রওনা হন এবং দশ দিন পরে মথুরায় পৌছান। সেখানেই কৌশলে মুরাদকে বন্দী করিয়া গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী করিয়া রাখেন (৩ বৎসর পরে মিথ্যা অভিযোগে প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন)। (ঞ) ২১শে জুলাই দিল্লীর বাহিরে শালামারের উদ্যানে ঔরংজীবের প্রথম রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। (ট) দারা রাজপুতনার মরুভূমির মধ্য দিয়া আজমীঢ় হইতে গুজরাটে পলায়ন করেন এবং আহ্‌মাদাবাদের শাসনকর্তা সাহানাবাজের (ঔরংজীবের শ্বশুর) কাছে উপস্থিত হন এবং সাহানাবাজ দারার পক্ষে যোগ দেন। (ঠ) ওদিকে সোলেমান শ্রীনগরের রাজা পৃথ্বী সিংহের আশ্রয় প্রার্থনা করিয়া কিছুকাল সেখানে থাকিবার পরে গাড়ওয়ালের পার্বত্য প্রদেশে যাইয়া আশ্রয় লইতে বাধ্য হন—অবশেষে ঔরংজীবের হাতে বন্দী ও নিহত হন। (ড) যখন ঔরংজীব দারার পশ্চাদ্ধাবনে ব্যস্ত তখন সুজা পুনরায় আগ্রা অভিমুখে যাত্রা করেন—ক্রমে ক্রমে রোটাস, চুণার, বারানসী, জৌনপুর ও এলাহাবাদ দখল

করেন। সংবাদ পাইবামাত্র ঔরংজীব তাঁহার গতি রোধ করিবার জন্য মূলতান হইতে ফিরিয়া আসেন এবং ফতেপুর জিলার অন্তর্গত 'খাজোয়া' নামক স্থানে সুজাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেন (জানুয়ারী ১৬৫৯)। (চ) এই যুদ্ধক্ষেত্রেই যশোবন্ত সিংহ ঔরংজীবের শিবির আক্রমণ করেন (৪৮১ পৃষ্ঠা— History of Aurangzeb—Sarkar) এবং পরে দারার পক্ষে যোগ দেওয়া মনস্থ করেন। (ছ) জয়সিংহের সাহায্যে ঔরংজীব যশোবন্ত সিংহকে হস্তগত করিতে সক্ষম হন। [He (জয়সিংহ) therefore tendered his good offices as a mediator with the emperor to secure for Jaswant a full pardon and restoration to his title and mansab as well as a high post under the Crown]. (জ) যশোবন্তকে হস্তগত করার পরে ঔরংজীব দারাকে ও সাহাবাজকে দেবরাই যুদ্ধে (১৬৫৯, ১৩ই মার্চ) পরাজিত করেন। (ঝ) ৮ই জুন (৬৫৯), সুজার শিবির যখন টুণ্ডায় ছিল, মহম্মদ সুজার পক্ষে যোগদান করেন, কিন্তু পরে বিপক্ষে যাইতে বাধ্য হন— ঔরংজীব তাঁহাকে গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী করিয়া রাখেন। (ঞ) ইহার পরে সুজা মীরজুমলা কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া আরাকানে যাইয়া আশ্রয় লইতে বাধ্য হন। (কাফি খাঁর মতে- সুজার কোনও সংবাদ আর পাওয়া যায় নাই। 'জন ত্যাক' নামক জনৈক ডাচ বণিকের কথায় জানা যায় যে সুজা আরাকানের রাজাকে হত্যা করিয়া সিংহাসন অধিকার করিবার ষড়যন্ত্র করেন। এই ষড়যন্ত্রের সংবাদ পাইয়া আরাকানরাজ শাহ সুজাকে হত্যা করেন)। (ট) শেষ যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পরে দারা বোলান গিরিপথের দিকে যান—জিহন খাঁ দারাকে 'দাদর' বাটীতে লইয়া আসেন—যে জিহন খাঁকে দারা প্রাণদণ্ডাদেশ হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন, সেই জিহন খাঁই পুরস্কারের লোভে দারাকে ঔরংজীবের হস্তে অর্পণ করে। (ঠ) বন্দী দারাকে অপমানের শেষ আঘাত দেওয়ার উদ্দেশ্যে ২৯শে আগষ্ট (১৬৫৯) কঙ্কালসার হস্তিনীর পৃষ্ঠে বসাইয়া দিল্লী নগরী প্রদক্ষিণ করানো হয়। (Dara was seated on an uncovered

Howda on the back of a small female elephant covered with dirt……By his side was his second son Siphir Shukho—a lad of fourteen). পরে বিচারের একটা অভিনয় হয়—বিচারক ধর্মদ্রোহের অপরাধে দারার প্রাণদণ্ড বিধান করেন (১৬৫৯)। (প) ইহার পরে—মোরাদের বিচার ও প্রাণদণ্ড হয়—সোলেমানকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করা হয় এবং সাজাহানের কাছে ঔরংজীব মার্জনা ভিক্ষা করেন—জাহানারা মধ্যস্থ হইয়াই পিতা-পুত্রের মধ্যে একটা বুঝাপড় করেন। (Happier than the daughter of much enduring Oedipus she finally won her father's forgiveness for the son who had wronged him so cruelly).

উল্লিখিত ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনেই সাজাহান নাটকখানি রচিত। ঐতিহাসিক নাটককে অক্ষরে অক্ষরে ঐতিহাসিক হইতেই হইবে এমন কোন নিয়ম না থাকিলেও—দেখা যায়, এই নাটকে ইতিহাসকে প্রায় পদে পদে অনুসরণ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। দৃশ্য-যোজনায়, ঘটনা-সমাবেশে এবং চরিত্র-চিত্রণে নাটকখানি ইতিহাসকে কোথায়ও বিকৃত করে নাই।

আমরা দেখি, শাজাহান নাটকের এগারটি পুরুষ-চরিত্রের মধ্যে দশটি পুরাপুরি ঐতিহাসিক—নামতঃ, কার্যতঃও বটে। এক দিলদার নাট্যকারের কল্পনার সৃষ্টি। নারী চরিত্রের মধ্যে মহামায়াকে বা পিয়ারাকে বাহতঃ অনৈতিহাসিক বলিয়া মনে হইলেও আসলে অনৈতিহাসিক বলা যায় না। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়—সুজার অন্তঃপুর নৃত্যগীতে নিত্য-মুখরিত থাকিত; এই কারণে শাজাহান তাঁহাকে একবার ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন। মহামায়ার রাজপুত-বীরাঙ্গনা-অভিমান কল্পনাকে হার মানাইলেও ঐতিহাসিক সত্য। Text Book of Modern India নামক গ্রন্থে সরকার ও দত্ত লিখিয়াছেন, "Jaswant Singh fled to Jodhpur where he found the castle-gates shut against him by his proud wife who could not tolerate her husband's retreat from the field of battle and abandonment of his master's cause"

বিরুদ্ধ মতের খণ্ডন

কিন্তু এতখানি ঐতিহাসিকতা থাকা সত্ত্বেও লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্য-ইতিহাসকার শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডাঃ শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মহাশয় বিপরীত মন্তব্য করিয়াছেন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে (২য় খণ্ড) দ্বিজেন্দ্রলাল সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইয়া তিনি লিখিয়াছেন—"মোগল ও রাজপুত ইতিহাস আশ্রয় করিয়া পাঁচখানি নাটক লেখা হইয়াছিল। প্রতাপসিংহ (১৩১২), দুর্গাদাস (১৩১৩), নূরজাহান (১৩১৪), মেবার পতন ও সাজাহান (১৩১৭) নাটকগুলিতে বাঙলাদেশের সমসাময়িক দেশ-প্রেমোচ্ছ্বাসের ছাপ আছে। কোনটিতেই ঐতিহাসিক রূপ ফুটিয়া উঠে নাই। কি ঘটনা-বিন্যাসে, কি নামকরণে, কি সংলাপে কি চরিত্র চিত্রণে দ্বিজেন্দ্রলাল ইতিহাসের বিন্দুমাত্র মর্যাদা রাখিতে চেষ্টা করেন নাই; উপরন্তু কৌতুক রসের দৃশ্য যোগ হওয়ায় ইতিহাসের গম্ভীর মহিমা নষ্ট হইয়া গিয়াছে।" লক্ষ্য করিবার বিষয় যে ডাঃ সেন মহাশয়ের মন্তব্যটি দ্বিজেন্দ্রলালের সমস্ত ঐতিহাসিক নাটক সম্বন্ধেই করা হইয়াছে এবং "বিন্দুমাত্র" বিশেষণটি মন্তব্যকে সামান্য বচনের (universal) মর্যাদা দিয়াছে। ডাঃ সেন মহাশয়ের মন্তব্যটি যে যথার্থ নহে, ইহা যে কোনও সমালোচক অনায়াসেই অর্থাৎ খুব তলাইয়া না দেখিয়াও ধরিতে পারিবেন। ঘটনা-বিন্যাসে, নামকরণে, সংলাপে এবং চরিত্র-চিত্রণে ইতিহাসের "বিন্দুমাত্র" মর্যাদা রক্ষিত হয় নাই—বিশেষতঃ সাজাহান সম্বন্ধে এ কথা সজ্ঞানে মানিয়া লওয়া যায় না।

প্রথমতঃ ঘটনা-বিন্যাস সম্বন্ধে বলা যাক্। পূর্বে যে সকল ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ করা হইয়াছে সাজাহান নাটকে উহারা প্রায় যথাযথ ভাবেই স্থান পাইয়াছে; এমন কি, দৃশ্য-যোজনায় পর্যন্ত ইতিহাসের আনুগত্য দেখানো হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ নামকরণে ইতিহাসের মর্যাদা বলিতে ডাঃ সেন কি বুঝাইতে চাহিয়াছেন তাহা খুব স্পষ্ট নহে। 'সাজাহান' নামটি অনৈতিহাসিক

—এ কথা নিশ্চয়ই তিনি বলিতে চাহেন না। তাঁহার বক্তব্য বোধ হয় এই যে নাটকের নামকরণ যথার্থ হয় নাই। কিন্তু প্রশ্ন এই যে নাটকের নামকরণের যাথার্থ্যের সহিত ইতিহাসের মর্যাদার সম্পর্ক কি? নাটকের নাম সাজাহান না রাখিয়া জাহানারা রাখিলেই ইতিহাসের মর্যাদা রক্ষিত হইত এ কথা নিশ্চয়ই তাঁহার অভিপ্রেত নহে। আমার মনে হয়, নামকরণে "ইতিহাসের বিন্দুমাত্র মর্যাদা" কথাটি কোনও স্পষ্ট ধারণা জন্মায় না; এই কারণেই উহাকে অসাবধান উক্তি বলিয়াই উপেক্ষা করা উচিত। তৃতীয়তঃ সংলাপে ও চরিত্র-চিত্রণে ঐতিহাসিক মর্যাদার কথা। সংলাপ ও চরিত্র-চিত্রণকে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে দেখা চলে না। কারণ, সংলাপের মাধ্যমেই চরিত্র বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হইয়া থাকে। সাজাহান নাটকের চরিত্রগুলি এমন কোন সংলাপ বলে নাই যাহাতে "ইতিহাসের মর্যাদা" বা 'গভীর মহিমা" সবটুকু নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। সাজাহান, দারা, ঔরংজীব, মোরাদ, মহম্মদ, সোলেমান, যশোবন্ত, জয়সিংহ প্রভৃতি প্রধান চরিত্রের মুখে এমন সংলাপ দেওয়া হয় নাই যাহা ইতিহাস হইতে সমর্থন করা যায় না বা চরিত্রটির স্বধর্ম হইতে স্বাভাবিকভাবে অনুমান করা চলে না। চরিত্র চিত্রণে ইতিহাসের মর্যাদা রাখার অর্থ—নিশ্চয়ই চরিত্রগুলিকে ইতিহাস-সম্মত বা ইতিহাস-অভিপ্রেত রূপে সৃষ্টি করা। তবে ব্যক্তিত্বের আসল রূপটি ঠিক রাখিয়া চরিত্রকে কল্পনা-মাংসল করিবার অধিকার প্রয়োগ করিলে "ইতিহাসের মর্যাদা" ক্ষুণ্ণ করা হয় না। অথবা কবি যদি কোনও ইতিহাসের চরিত্রের সম্ভাব্য পরিণতি দেখাইতে চেষ্টা করেন বা কোনও ঘটনাকে কাটছাট্ করিয়া মনস্তাত্ত্বিক সঙ্গতি রক্ষা করিতে চাহেন, তাহা হইলেও ইতিহাসের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করা হয় বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু যদি এমন অবস্থা ঘটে যে ইতিহাস যে নিশ্চিত মীমাংসায় উপনীত হইয়াছে নাট্যকার সেই বিষয়েই বিরুদ্ধ বা বিপরীত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—বিপরীত বৈশিষ্ট্য দিয়া চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন এবং ফলে ইতিহাস সম্বন্ধে বিকৃত ধারণা জন্মিবার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে, কেবল সেই অবস্থাতেই এমন সিদ্ধান্ত

করা চলে "চরিত্র-চিত্রণে ইতিহাসের মর্যাদা রক্ষিত হয় নাই" এবং "বিন্দুমাত্র" বিশেষণটি একান্ত-অভাব অর্থেই প্রযুক্ত হয় বলিয়া কেবল তখনই প্রয়োগ করা চলে যখন প্রধান-অপ্রধান সকল চরিত্রকেই বিকৃত রূপ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। সাজাহান নাটকের চরিত্র সম্বন্ধে সে অভিযোগ কি করা যায়? কিছুতেই করা যায় না।

সাজাহান সন্তানবৎসল ও স্নেহ দুর্বল এ কথা কবি-কল্পনা নহে—ইতিহাস সমর্থিত। আমরা জানি (মাসুম, আকিল, কম্বু প্রভৃতির সাক্ষ্যে এবং যদুনাথ সরকারের গ্রন্থে) পুত্রগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিলে কর্তব্যের অনুরোধে বিদ্রোহ দমন করিতে সৈন্য পাঠাইতে বাধ্য হইয়া সাজাহান সেনাপতিদের গোপন নির্দেশ দিয়াছিলেন—সেনাপতিরা যেন বিদ্রোহী পুত্রদের প্রথমে মিষ্ট কথায় স্ব স্ব প্রদেশে ফিরাইয়া দিতে চেষ্টা করেন; যদি তাঁহারা মিষ্ট কথায় না ফিরিয়া যান তাহা হইলে যুদ্ধের মহড়া ও পায়তারা দেখাইয়া যেন নিরস্ত করিতে চেষ্টা করেন; আর যদি তাহাতেও সিদ্ধি না হয় তাহা হইলে অগত্যা যুদ্ধে অবতীর্ণ হন, তবে কাহাকেও যেন প্রাণে না মারেন। তারপর ইহাও ইতিহাস-কথিত যে সাজাহান স্নেহবশেই যে যে প্রার্থনা বা প্রস্তাব ঔরংজীব করিয়াছিলেন তাহার সবগুলিই তিনি পূর্ণ করিয়াছিলেন এবং করিয়াছিলেন বলিয়াই আগ্রা দুর্গের পতন অত শীঘ্র ঘটিয়াছিল। সাজাহান সন্তান-বৎসল ও স্নেহ-দুর্বল—এ কথা প্রত্যেক ঐতিহাসিকই স্বীকার করিয়াছেন।

দ্বিতীয়তঃ ঔরংজীবের চরিত্র যে অতি জটিল এ বিষয়ে ঐতিহাসিকরা একমত। ইতিহাসেই পাওয়া যায়—তিনি কাহাকেও বিশ্বাস করিতেন না, বিচক্ষণ ও কূট ছিলেন, প্রয়োজন হইলে সব গর্হিত কার্যই করিতে পারিতেন, অসীম-সাহস যোদ্ধা ছিলেন, ধর্মের ভাণ করিয়া অনেক রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়াছিলেন, দারা-মোরাদ-সোলেমান প্রভৃতিকে বিচারের নামে হত্যা করাইয়াছিলেন, পিতাকে আগ্রার দুর্গে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং

শেষে পিতার কাছে মার্জনা ভিক্ষাও করিয়াছিলেন। নাট্যকার উল্লিখিত উপাদানেই ঔরংজীবকে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতএব ইতিহাসের মর্যাদা অক্ষুণ্ণই আছে।

তৃতীয়তঃ দারা—দর্শন ও উপনিষদ-ভক্ত দারা—শামুগড়ের যুদ্ধে পরাজিত ও পলায়িত দারা, সাহনাবাজের আশ্রয়প্রার্থী দারা, আজমীর যুদ্ধে পরাজিত, পরে পলায়িত এবং বিশ্বাসঘাতক জিহন খাঁ কর্তৃক ঔরংজীবের হস্তে সমর্পিত দারা—এবং ঔরংজীব কর্তৃক অপমানিত, লাঞ্ছিত, মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত দারা—ঐতিহাসিক দারাই।

তারপর "black sheep of the imperial family, a foolish, pleasure-loving and impetuous prince……he had the reckless valour of a soldier (Sarkar)" যে মোরাদ, এবং নাট্যকারের মূর্খ, মদ্যপ, বিলাসী ও দুঃসাহসী রাজপুত্র মোরাদ ইহাদের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? যে মোরাদকে ধর্মধ্বজী ঔরংজীব মদ খাওয়াইয়া মত্তাবস্থায় বন্দী করিয়াছিলেন সে মোরাদ ইতিহাসেরই মোরাদ। (According to one account Aurangzeb even plied Morad with wine and overcame his natural delicacy in drinking before an elder brothor by saying—"Drink in my presence as I long to see you supremely happy after so many adversities").

আরপর সুজা সম্বন্ধে জানা যায় যে বাঙলা দেশের শৈথিল্যজনক জলবায়ুর প্রভাবে সুজা খুবই আরামপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন; বিশেষতঃ নৃত্য-গীতের প্রতি আসক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার অন্তঃপুর নৃত্য-গীতে সদা মুখরিত থাকিত। এমন অন্তঃপুরের অধিষ্ঠাত্রী যে পিয়ারা—তাহার মধ্যে গীতি-আসক্তি অস্বাভাবিক নহে।

যশোবন্ত ও জয়সিংহ পুরাপুরি ঐতিহাসিক সত্তা লইয়াই নাটকে সমুপস্থিত। যশোবন্ত অসম সাহসী বটে, কিন্তু পক্ষ পরিবর্তনেও বিষম পটু; তিনি দারার

সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিতে যেমন কুণ্ঠিত হন নাই তেমনি ঔরংজীবের শিবির লুণ্ঠন করিতেও ইতস্তত: করেন নাই। রাজপুত বীরাঙ্গনা মহামায়া এমন স্বামীর চরিত্রে শ্রদ্ধা রাখিতে পারেন নাই, তাই পরাজিত ও দারার পক্ষত্যাগকারী স্বামীর মুখের উপরে দুর্গদ্বার বন্ধ করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। সেনাপতি জয়সিংহও বিশ্বাসঘাতকতা কম করেন নাই। দারার ভাগ্যাকাশে আঁধার ঘনাইতে দেখিয়া অকুণ্ঠচিত্তে ঔরংজীবের পক্ষে যোগ দিয়াছিলেন এবং দিলীর খাঁকেও ভজাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। (For himself Jai Singh openly refused to follow the losing side any longer, he would go away with his troops and join the new emperor). মোটকথা জয়সিংহ এবং যশোবন্ত সিংহ নীতি অপেক্ষা আত্মোন্নতির দিকেই বেশী লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন। নাট্যকার ইহাদের প্রতি কোন পক্ষপাত দেখান নাই বা ন্যায্য পাওনা বীরত্বের অংশ দিতেও কার্পণ্য করেন নাই।

জাহানারা সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের সংবাদ এই—(ক) জাহানারা দারার পক্ষে ছিলেন (রোশানারা বেগম ছিলেন ঔরংজীবের পক্ষে); (খ) পিতার বন্দীদশায় পিতার কাছেই সর্বদা থাকিতেন এবং সেবা করিতেন (In adversity she rose to a nobler eminence and became an Antigone to her captive father—Sarkar); এবং (গ) শেষে ঔরংজীবের জন্য সাজাহানের নিকট হইতে ক্ষমা চাহিয়া লইয়াছিলেন অর্থাৎ সাজাহানকে দিয়া ঔরংজীবকে ক্ষমা করাইয়াছিলেন। (Happier than the daughter of much-enduring Oedipus, she finally won her father's forgiveness for the son who wronged him so cruelly). নাটকে (ক) এবং (খ) কে পুরোপুরি লওয়া হইয়াছে, কিন্তু সঙ্গতি রক্ষা করিবার জন্য (গ) কে যথাযথভাবে গ্রহণ করা যায় নাই। নাটকে সাজাহানের অন্তর্নিহিত স্নেহ-দৌর্বল্যই মধ্যস্থ ও ঘটক রূপে দেখা দিয়াছে এবং পিতাকে দিয়া পুত্রকে ক্ষমা করাইয়াছে,—জাহানারাও ক্ষমা করিয়াছেন, তবে পিতার অনুরোধেই

করিয়াছেন। এইটুকু ব্যতিক্রম ঘটায় চরিত্রটিকে অনৈতিহাসিক বলা যে সঙ্গত নহে সকলেই স্বীকার করিবেন।

উপসংহারে এ কথা বলা যাইতে পারে যে ডাঃ সেন মহাশয় দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটক সম্বন্ধে যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা সর্বাংশেই হেয়; ঘটনা-বিন্যাসে ও চরিত্র-চিত্রণে ইতিহাসের মর্যাদা নাট্যকার সন্তোষজনক রূপেই রক্ষা করিয়াছেন। ৺দেবকুমার রায় চৌধুরী মহাশয়ের ভাষায় বলা যাক—"তাঁহার ঐতিহাসিক নাটকগুলি অতি সাবধানতার সহিত লিখিত। কোনও স্থানেই তিনি ইতিহাসকে একেবারে অতিক্রম করেন নাই। যেখানে ইতিহাসকার নীরব, মাত্র সেখানেই তাঁহার মোহিনী কল্পনা অতি নিপুণতার সহিত বর্ণপাত করিয়াছে।"

"সাজাহান"কে কি ট্র্যাজেডি বলা যায়?

শুধু রসের বৈশিষ্ট্য দিয়া বিচার করিবার বা গোত্রনির্ণয় করিবার রীতি প্রচলিত বা স্বীকৃত থাকিলে সাজাহান নাটকখানিকে 'করুণ-রসাত্মক' আখ্যা দিয়া অনায়াসেই আমরা গোত্রনির্ণয় ব্যাপার নিষ্পন্ন করিতে পারিতাম এবং সাজাহান ট্র্যাজেডি কি না—এ ধরনের প্রশ্ন উত্থাপন করিবারও কোনও প্রয়োজন দেখা দিত না। কিন্তু আজ কেবলমাত্র 'করুণরসাত্মক' বলিয়াই গোত্রনির্ণয় নিষ্পন্ন করা যায় না; প্রশ্ন উঠে—নাটকখানি কমেডি বা ট্র্যাজেডি বা ট্র্যাজি-কমেডি কি না, মেলোড্রামা বা ফার্স কি না। কারণ সমালোচনা-ক্ষেত্রে আমরা ইংরেজী অনুশাসন মানিয়াই চলিতেছি। করুণরসাত্মক নাটক মাত্রকেই ট্র্যাজেডি বলিতে পারিলে কোনও সমস্যা দেখা দিত না। কিন্তু সমস্যা দেখ দিয়াছে এইজন্য যে, ট্র্যাজেডি নাটক এক বিশেষ জাতীয় করুণ রসাত্মক নাটক অতএব প্রশ্ন উঠিয়াছে—সাজাহানকে কি ট্র্যাজেডি বলা যায়?

সাজাহান নাটকের সমালোচনাকালে এই প্রশ্নটির স্পষ্ট উত্তর দেওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়; কিন্তু কোন সমালোচকই বিশেষভাবে প্রশ্নটি পর্যালোচনা করেন নাই, সুস্পষ্ট উত্তর দেন নাই—ইহা বলিলেও বেশী বলা হয় না। কেহ কেহ নাটকখানির আলোচনা প্রসঙ্গে 'ট্র্যাজেডি' শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন বটে, কিন্তু কাহার ট্র্যাজেডি এবং কেন ট্র্যাজেডি সুস্পষ্টভাবে ধারণা করেন নাই; কেহ কেহ ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে যান নাই, এমনভাবে বাক্যবিন্যাস করিয়াছেন যে, হাঁ'কেও জোর করিয়া ধরা যায় না, 'না'কেও ঠিকভাবে পাওয়া যায় না। আবার কেহ কেন একেবারে নীরব থাকিয়া সুবিধানুসারে 'হাঁ'র বা না'র দলে যোগ দেওয়ার পথ খোলা রাখিয়াছেন।

নবকৃষ্ণ ঘোষের মত

১৩১৪ সালের সাহিত্য-পত্রে (মাঘ ও চৈত্র সংখ্যায়) নবকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয় সাজাহান নাটকের অনতিবিস্তারিত একটি সমালোচনা লিখিয়াছিলেন। সমালোচনাটি নানা তথ্যের জন্ত মূল্যবান, দিগদর্শকও বটে, কিন্তু আমরা যে প্রশ্নটি তুলিয়াছি তাহার সুমীমাংসা উহাতে নাই। সমালোচক লিখিয়াছেন, "দারার মৃত্যুই সাজাহান নাটকের চরম ট্র্যাজেডি—চূড়ান্ত ঘটনা। দারার জীবনাবসানের সহিত নাটকের শেষ যবনিকা পতিত হওয়া উচিত ছিল······ প্রকৃতপক্ষে তাঁহার ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের উপরই নাটকের ভিত্তি স্থাপিত এবং তাঁহার মৃত্যু-ঘটনায় মন এইরূপ অবসাদগ্রস্ত হয় যে নাট্যকারের প্রভূত গুণপণা সত্ত্বেও পরবর্তী দৃশ্যগুলিতে অবহিত হইবার আর ধৈর্য থাকে না।" সমালোচকের উক্তিটি বিশ্লেষণ করিলে এই তথ্যই পাওয়া যাইবে—সাজাহান নাটক ট্র্যাজেডি, তবে মৃত্যুর মধ্যেই ট্র্যাজেডিত্ব অর্থাৎ দারার ট্র্যাজেডি দেখানই নাটকখানির উদ্দেশ্য। এই কারণেই—'দারার জীবনাবসানের সহিত নাটকের শেষ যবনিকা'পাত না করিয়া নাট্যকার অনুচিত কাজ করিয়াছেন।

আমরা দেখিতে পাইব যে—যাহার ভাগ্য-বিপর্যয়ের উপর নাটকের ভিত্তি স্থাপিত, তিনি দারা নহেন—সাজাহান; দারার ভাগ্য-বিপর্যয় নাটকের নানা উপাদানের একটিমাত্র, সাজাহানের শেষ জীবনের সংঘাতের মধ্যে বড একটি আঘাত। নাট্যকারের উদ্দেশ্য সাজাহানের শোচনীয় ভাগ্য-বিপর্যয়ের ও দুঃখ-দুর্দশার উপস্থাপন বলিয়া তিনি 'দারার জীবনাবসানের সহিত নাটকের শেষ যবনিকা' পতিত করেন নাই—নাটকখানির নামকরণ করিয়াছেন 'সাজাহান। দেখা গেল সমালোচক নবকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয় সাজাহান নাটকের প্রকৃতি ঠিক ধরিতে পারেন নাই এবং ট্র্যাজেডি শব্দটি খুব বিচারপূর্বক ব্যবহার করেন নাই। সমালোচক ঘোষ মহাশয়ের মন্তব্য সম্বন্ধে আর আলোচনার প্রয়োজন নাই।

সুকুমার সেনের মত

নিজের সিদ্ধান্ত স্থাপন করিবার পূর্বে পূর্বতনদের যুক্তি-মন্তব্য বিচার করা অত্যাবশ্যক; কিন্তু পূর্বতনদের সকলের যুক্তি বা মন্তব্য সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয় নাই বলিয়া যাঁহাদের সমালোচনা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে এবং অধ্যাপক ও ছাত্রদের বিচারবুদ্ধিকে প্রভাবিত করিবার অবকাশ পাইয়াছে, তাঁহাদেরই মন্তব্য বিচার করিতে চেষ্টা করিতেছি। এই দিক দিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লব্ধপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপক এবং "বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস"-এর লেখক শ্রদ্ধেয় ডাঃ শ্রীসুকুমার সেন মহাশয়ের মন্তব্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এবং বিচার্য। কারণ ডাঃ সেন মহাশয়ের গ্রন্থখানি বি. এ. ও এম. এ. পরীক্ষার্থীদের সহায়ক পাঠ্য হিসাবে গৃহীত হইয়াছে।

ডাঃ সেন আমাদের প্রশ্নের কোনও সুস্পষ্ট উত্তর দেন নই। সুতরাং ট্র্যাজেডি, কি ট্র্যাজেডি নহে, ইহার কোন দিকেই ডাঃ সেনকে স্পষ্টবাদীরূপে দেখা যায় না। তিনি লিখিয়াছেন—"ট্র্যাজেডির দিক দিয়াও সাজাহান নামকরণের সার্থকতা খুব আছে বলিয়া মনে হয় না।" উক্ত মন্তব্যটিকে বিশ্লেষণ করিলে এইরূপ দাঁড়ায় যে সাজাহান নাটক ট্র্যাজেডি নহে, তবে যদি ট্র্যাজেডি বলা যায় তাহা হইলেও 'সাজাহান' নামকরণ নিরর্থক।

যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে ডাঃ সেন নাটকখানিকে ট্র্যাজেডি বলিয়া স্বীকার করেন তাহা হইলে আমরা যে অনিবার্য সিদ্ধান্তে পৌঁছিতেছি তাহা এই যে,—সাজাহান নাটকখানি ট্র্যাজেডি তবে নাটকখানির নামকরণ ঠিক হয় নাই—সাজাহান নামকরণের সার্থকতা (খুব আছে বলিয়া মনে হয় না) নাই। জাহানারা নামকরণ করিলে সার্থকতা থাকিত ("নাটকটির নাম জাহানারা হইলে বোধ হয় ঠিক হইত"—সু. সেন)। লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে ডাঃ সেন বলিতে চাহেন যে সাজাহান নাটকে

সাজাহানের ট্র্যাজেডি ঘটে নাই ("ট্র্যাজেডির দিক দিয়াও সাজাহান নামকরণের সার্থকতা খুব আছে বলিয়া মনে হয় না"), সাজাহানের ট্র্যাজেডি ঘটিয়াছে স্বীকার করিলে নামকরণে আপত্তি করিবার কোনও হেতু থাকে না। ডাঃ সেনকে প্রশ্ন করা চলে—তবে কাহার ট্র্যাজেডি ঘটিয়াছে? এ প্রশ্নের উত্তর ডাঃ সেনের সমালোচনা হইতে সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিলে ন্যায়তঃ যে চমকপ্রদ সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে হয় তাহা এই—যেহেতু "নাটকটির নাম জাহানারা হইলে বোধ হয় ঠিক হইত" এবং সাজাহান ট্র্যাজেডিও বটে যাহার ট্র্যাজেডি তাহার নামানুসারেই নাটকের নামকরণ করিলে নামকরণের সার্থকতা থাকে—সাজাহান নাটকে জাহানারার ট্র্যাজেডিই উপস্থাপিত হইয়াছে। ডাঃ সেনের মন্তব্য যে অনিবার্য সিদ্ধান্তে লইয়া যায়, আমার মনে হয়, ডাঃ সেন তাহা নিজেই ভাবিয়া দেখেন নাই। যদি ট্র্যাজেডি হইয়া থাকে, তবে তাহা কাহার ট্র্যাজেডি—এ প্রশ্নের উত্তর দিতে ডাঃ সেন ন্যায়তঃ বাধ্য। যদি তিনি বলেন—সাজাহানের ট্র্যাজেডি, তাহা হইলে নামকরণে আপত্তি করিবার তাঁহার কোনও যুক্তি থাকে না, যদি বলেন অন্য কাহারও ট্র্যাজেডি, তাহা হইলেও "নাটকটির নাম জাহানারা হইলে বোধ হয় ঠিক হইত" এ কথা বলিবারও কোনও হেতু পাওয়া যায় না। কারণ যাহার ট্র্যাজেডি তাহার নামানুসারে নামকরণেই নামকরণের সার্থকতা। জাহানারা যত 'স্ফুট' ও বলিষ্ঠ চরিত্রই হউক, সাজাহান নাটকে কোন দিক দিয়াই কেন্দ্রীয়ত্ব দাবী করিতে পারে না, এ কথা ডাঃ সেন ভাবিয়া দেখেন নাই কেন বুঝিতে পারা যায় না। 'ট্র্যাজেডি'র দিক দিয়া বিচারে অগ্রসর হইলে 'জাহানারা'কে দাঁড় করানো যায় না, কারণ অতি স্পষ্ট, জাহানারার ভাগ্য-বিপর্যয় বা দুঃখ-দুর্দশা উপস্থাপিত করা নাটকের উদ্দেশ্য নহে। নাটকে সে চেষ্টা দেখাও যায় না।

দ্বিতীয়তঃ রসের দিক দিয়া বিচার করিতে গেলেও—জাহানারাকে

আলম্বন-বিভাবরূপে প্রমাণ করা চলে না—কেন্দ্রীয় চরিত্র বলা চলে না। তবে? কেবলমাত্র স্ফুটতা ও বলিষ্ঠতা দেখিয়াই কি ডাঃ সেন জাহানারার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন? দেখা গেল, ডাঃ সেন ন্যায়তঃ সাজাহানকে ট্র্যাজেডি অথবা 'করুণ-রসাত্মক' কোনটিই বলিতে পারেন না, অথচ আর কিছু বলিবারও উপায় তাঁহার নাই। কি নিরুপায় ডাঃ সেন। অগত্যা আমাদের এ সিদ্ধান্ত করিতেই হইবে যে শ্রদ্ধেয় ডাঃ শ্রীসুকুমার সেন মহাশয় সাজাহান নাটকের সম্বন্ধে যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা যাথার্থ্যের দিক দিয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট এবং সঙ্গতির দিক দিয়া একেবারেই এলোমেলো। এক কথায়—সমালোচনার বা যুক্তির পর্যায়ে স্থান পাইতে পারে না।

অজিতকুমার ঘোষের মত

যে কারণে শ্রদ্ধেয় ডাঃ শ্রীসুকুমার সেন মহাশয়ের মন্তব্যকে বিচার করিতে হইয়াছে সেই একই কারণে বন্ধুস্থানীয় একদা-সহকর্মী শ্রীযুক্ত অজিতকুমার ঘোষ মহাশয়ের আলোচনা বিচার করিবার আবশ্যকতা বোধ করিয়াছি। শ্রীযুক্ত ঘোষের সম্প্রতি-প্রকাশিত 'বাঙলা নাটকের ইতিহাস' সমালোচনা-সমৃদ্ধ মূল্যবান একখানি গ্রন্থ। অধিকন্তু বি এ. ও এম এ পরীক্ষায় সহায়ক পাঠ্য হিসাবে অনুমোদিত বলিয়া গ্রন্থখানির প্রভাব ছাত্রদের ও অধ্যাপকদের মধ্যে সহজেই সঞ্চারিত। এই কারণে, সাজাহান সমালোচনাকালে অজিতবাবুর মত আলোচনা করা অপরিহার্য প্রয়োজন।

প্রথমেই বলিয়া রাখা ভাল যে—সাজাহান ট্র্যাজেডি কিনা, ট্র্যাজেডি হইলে কাহার ট্র্যাজেডি এবং কি ভাবে ট্র্যাজেডি, যদি ট্র্যাজেডি না হয় তবে কি অর্থাৎ কোন্ জাতীয় নাটক, নায়ক কে এবং কেন—এ সকল প্রশ্নের উত্তর অজিতবাবুর সমালোচনায় পাওয়া যায় না। এই কারণে অজিতবাবুর

সমালোচনা আমার মনে হয়, অসম্পূর্ণ এবং অপরিপাটি। প্রশ্নগুলির বিস্তারিত উত্তর দেওয়া স্থানাভাবেই তাঁহার পক্ষে সম্ভব না হইতে পারে, কিন্তু সিদ্ধান্তরূপে দেওয়ার কোন বাধা থাকিতে পারে না। (আশা করি দ্বিতীয় সংস্করণে অজিতবাবু এ বিষয়ে অবহিত হইবেন)। শ্রীযুক্ত ঘোষ নিশ্চয়ই এ কথা বলিতে পারেন না যে—সাজাহান একখানি ট্র্যাজেডি ইহা বলা বাহুল্যমাত্র; আবার এ কথাও বলিতে পারেন না যে সাজাহান একখানি ট্র্যাজেডি এ কথা কেহই বলেন না। পূর্ববর্তী সমালোচনা সাজাহান সম্বন্ধে যদি অবিসংবাদিত সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারিত তাহা হইতে শ্রীযুক্ত ঘোষের নীরবতা তবু সমর্থন করা যাইত। যাহা হউক এইবার আলোচনার মধ্যে প্রবেশ করা যাক্।

অধ্যাপক ঘোষ স্বীকার করিয়াছেন—(ক) সাজাহান দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ, (খ) জনপ্রিয়তায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী, (গ) 'ঐতিহাসিক কাহিনীর প্রতি বিশ্বস্ত থাকিয়া সেই কাহিনী এক অখণ্ড অবিচ্ছিন্ন নাটকীয় রসের মধ্যে জমাইয়া' তুলিবার কৃতিত্ব দ্বিজেন্দ্রলাল দাবী করিতে পারেন—অর্থাৎ নাটকখানি রসোত্তীর্ণ তথা সার্থক সৃষ্টি। কিন্তু অধ্যাপক ঘোষের আপত্তি বোধ হয় নামকরণে। ডাঃ শ্রীসুকুমার সেন মহাশয়ের মন্তব্যকে তারকা-চিহ্নিত স্থান দিয়া নিজে মন্তব্য করিয়াছেন—'সাজাহানের নামে নাটকের নামকরণ হইলেও সাজাহান এই নাটকের সর্বাপেক্ষা প্রধান ও প্রভাবশালী চরিত্র নহে।' আয়োজন দেখিয়া মনে হয়—অজিতবাবু 'সাজাহান' নামকরণের সার্থকতা বিচারে ডাঃ সেনের সহিত একমত, তবে ডাঃ সেন যেমন খোলাখুলিভাবে বলিয়াছেন—নাটকটির নাম জাহানারা হইলে বোধ হয় ঠিক হইত, অজিতবাবু তেমন খোলাখুলিভাবে কাহারও পক্ষ অবলম্বন না করিলেও ঔরংজীবের পক্ষে যথেষ্ট ওকালতি করিয়াছেন এবং ঔরংজীবকে "কাহিনীর মধ্যস্থলে বিরাজ" করাইতে চাহিয়াছেন। সাজাহানকে "স্নেহাতুর অপ্রকৃতিস্থ অসহায়—চলমান ঘটনার নিরুপায় দ্রষ্টা, শক্তিমান স্রষ্টা নহেন"—বলিয়া তিনি অ-প্রধান এবং অ-প্রভাবশালী প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং

ঔরংজীবকে—"প্রকৃতপক্ষে যিনি কাহিনীর মধ্যস্থলে বিরাজ করিয়া সমস্ত চরিত্রকে নিয়ন্ত্রিত ও নিয়মিত করিতেছেন" বলিয়া প্রধান ও প্রভাবশালী বলিতে চাহিয়াছেন, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় মুখ ফুটিয়া সুস্পষ্টভাবে বলেন নাই —ঔরংজীব নাটকের 'কেন্দ্রীয় চরিত্র' ও প্রধান চরিত্র, অতএব তাঁহারই নামে নাটকের নাম করা উচিত ছিল।

এখন ঔরংজীবকে কেন্দ্রীয় চরিত্র ও প্রধান চরিত্র (তথা 'নায়ক') বলিয়া গ্রহণ করিলে কতকগুলি সমস্যার সম্মুখে পড়িতেই হইবে। নাটকখানিকে ট্র্যাজেডি বলিয়া স্বীকার করিলে প্রশ্ন উঠিবে, সাজাহান নাটকে ঔরংজীবের ট্র্যাজেডিই উপস্থাপিত হইয়াছে কি? ঔরংজীবকে ট্র্যাজেডির নায়ক প্রতিপন্ন করিবার দায়িত্ব ঘাড়ে আসিয়া চাপিবে। অন্যথা দেখাইতে হইবে যে, 'কেন্দ্রীয় চরিত্র' এবং সর্বাপেক্ষা প্রধান ও প্রভাবশালী চরিত্র হইলেও ঔরংজীব নায়ক নহেন, নায়ক সাজাহান বা অন্য কেহ। ট্র্যাজেডি না বলিলে—রসের দিক দিয়া বিচার করিতে চেষ্টা করিলে প্রশ্ন উঠিবে সাজাহান কি বীররসের নাটক? ঔরংজীবকে নায়ক বলিলে 'বীররসাত্মক' না বলিয়া উপায় কি? এই সকল সমস্যার সমাধান অজিতবাবুর সমালোচনায় নাই।

প্রধান চরিত্র, কেন্দ্রীয় চরিত্র ও নায়ক

অধ্যাপক ঘোষের মন্তব্য সম্বন্ধে কোনও সিদ্ধান্ত বাক্য উচ্চারণ করিবার পূর্বে কয়েকটি পারিভাষিক শব্দের ব্যাপ্তি ঠিক করিয়া লওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। শব্দগুলি এই, "প্রধান চরিত্র", "কেন্দ্রীয় চরিত্র" ও "নায়ক"। সঙ্গে সঙ্গে এই প্রশ্নগুলিও আলোচনা করিতে হইবে—প্রধান চরিত্র ও কেন্দ্রীয় চরিত্রের পার্থক্য কোথায়? কেন্দ্রীয় চরিত্রই কি নায়ক? প্রধান চরিত্র হইলেই কি কেন্দ্রীয় চরিত্র এবং নায়ক হইবে? নাটকের নামকরণ কোন চরিত্রের নামানুসারে করিতে হইবে? এই—প্রশ্নগুলির সুমীমাংসা না করিলে নিরর্থক বাগবিতণ্ডা

দেখা দিবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। অতএব এ সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্ট রাখা দরকার।

এ কথা সত্য যে আধুনিক নাটকে বিষয়-বস্তুর ঐক্যকে (unity of theme) অ্যারিষ্টলের সূত্র বা বিধান দিয়া যাচাই করিয়া লওয়া হয় না; কিন্তু এ কথা মোটেই সত্য নহে যে নাটকে বৈষয়িক ঐক্য বলিয়া কোন কিছু থাকে না। আধুনিক নাটকের বিষয়গত ঐক্য সম্বন্ধে এমন কথা বলা যায় যে ইহা unity in diversity—বহুর মধ্যে একের প্রকাশ—বিচিত্র চরিত্র এবং দৃশ্যাদির মধ্য দিয়া একটি উদ্দেশ্য সিদ্ধিলাভ করে। বাস্তবিক নাটককে খাপছাড়া কতকগুলি বিশৃঙ্খল ঘটনার নিরুদ্দেশ বিন্যাস বা সমাবেশ না বলা পর্যন্ত এ কথা মানিতেই হইবে যে নাটকের মধ্যে কোনরূপ একটি বিষয় প্রতিপাদ্য বা উপস্থাপ্য রূপে থাকে। নাট্যকার বিষয়টিকে বিভিন্ন নাটকীয় অবস্থার মধ্য দিয়া উপস্থাপিত করিতে চেষ্টা করেন। সাধারণতঃ নাট্যকার দ্বন্দ্বের সাহায্যে বিষয়কে অভিব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। এই দ্বন্দ্বের একপক্ষে থাকে বিষয়ের অধিকারী অর্থাৎ যাহাকে আশ্রয় করিয়া নাট্যকারের উদ্দেশ্য পরিণতি লাভ করে সেই চরিত্রটি ও অন্যান্য অনুকূল চরিত্র এবং অন্যপক্ষে থাকে প্রতিকূল চরিত্রগুলি। ইহারা বিরোধিতা করিয়া উদ্দেশ্য-সিদ্ধির সহায়তা করিয়া থাকে। সাধারণতঃ প্রথমপক্ষের প্রধান চরিত্রটিকে অর্থাৎ অধিকারীকে বলা হয় নায়ক এবং দ্বিতীয়পক্ষের প্রধানকে বলা হয় প্রতিনায়ক। (সাজাহান নাটকে ঔরংজীব প্রতিনায়ক, নায়ক নহেন)।

নাটকে নায়ককেই কেন্দ্রীয় চরিত্র বলা হইয়া থাকে এবং এই কারণে বলা হয় যে উহাকে কেন্দ্র বা অবলম্বন করিয়াই নাটকের প্রতিপাদ্য বিষয় অভিব্যক্ত হয়। নায়কত্ব ও কেন্দ্রীয়ত্ব একই কথা। মুখ্য উদ্দেশ্য যে চরিত্রকে মুখ্যভাবে আশ্রয় করিয়া অভিব্যক্তি লাভ করে সেই চরিত্রই প্রকৃতপক্ষে কেন্দ্রীয় চরিত্র—সেই নায়ক। নায়ক বা কেন্দ্রীয় চরিত্র হইতে হইলে প্রাধান্য—প্রাধান্য কার্যগতই হউক আর ভাবগতই হউক বা উদ্দেশ্যগতই হউক—না থাকিয়া

পারে না, কিন্তু প্রধান হইলেই যে নায়ক হইবে এমন কোনও কথা নাই। এমন হইতে পারে— হইয়াও থাকে যে—সহায়ক বা পারিপার্শ্বিক চরিত্রগুলির একাধিক চরিত্র বুদ্ধির তীক্ষ্ণতায় এবং ক্রিয়াশীলতায় বেশ চিত্তাকর্ষক তথা প্রধান হইয়া উঠে। কিন্তু তাহা হওয়া সত্ত্বেও উহারা কেহই নায়কত্ব বা কেন্দ্রীয়ত্ব দাবী করিতে পারে না। নায়ক বা কেন্দ্রীয় চরিত্র হইতে হইলে মুখ্য আলম্বন-বিভাব হিসাবেই প্রাধান্য অধিকার করিতে হইবে। King Lear নাটকে রাজা লিয়রের প্রতিপক্ষরা ক্রিয়াশীলতার দিক দিয়া যত প্রধানই হউক—কেন্দ্রীয় চরিত্র বা নায়ক রাজা লিয়র। তেমনি চন্দ্রগুপ্ত নাটকে চাণক্যের যত প্রাধান্যই থাক, কেন্দ্রীয় চরিত্র বা নায়ক চন্দ্রগুপ্তই। তারপর নামকরণ বিষয়ে যে রীতি প্রচলিত আছে তাহা এই—নায়কের অর্থাৎ কেন্দ্রীয় চরিত্রের নামানুসারে অথবা প্রতিপাদ্য বিষয়-বস্তুর অনুযায়ী নামকরণ করা হইয়া থাকে।

সাজাহান নাটকে নায়ক কে?

উল্লিখিত মীমাংসা অনুসারে বিচারে অগ্রসর হইয়া প্রথমেই স্থির করিয়া লইতে হইবে যে সাজাহান নামক নাটকে নাট্যকার মুখ্যভাবে কোন্ বিষয়টি উপস্থাপনা করিতে চাহিয়াছেন, তারপর দেখিতে হইবে নাটকের দৃশ্যযোজনা কোন্ উদ্দেশ্য-সাধক হইয়াছে, বিশেষতঃ গঠনের দিক দিয়া নাটকখানি কোন্ উদ্দেশ্যের অভিমুখী হইয়াছে (দৃশ্যযোজনা তথা বীজস্থাপনাদির মধ্যে নিদর্শন থাকে)।

এখন প্রথমেই দ্বিজেন্দ্রলালের বিচার-বুদ্ধির প্রতি অনাস্থা স্থাপন না করিলে অনায়াসেই এ কথা বলা যায় যে নাট্যকার সাজাহান নাটকে সাজাহানের শোচনীয় শেষ জীবনকে রূপায়িত করিতে চাহিয়াছেন—অবশ্য এই 'চাওয়া'কে কতখানি 'পাওয়া'তে পরিণত করিতে পারিয়াছেন, না পারিয়াছেন সমালোচকদের বিচার্য। এখন এ কথা যদি স্বীকার

করা যায় যে নাট্যকারের উদ্দেশ্য—সাজাহানের শোচনীয় শেষ জীবনের দুঃখদুর্দশা উপস্থাপনা করা, তাহা হইলে নাট্যকার উদ্দেশ্যসাধনে সার্থককাম হইতে পারেন নাই এ কথা না বলা পর্যন্ত সাজাহানকেই কেন্দ্রীয় চরিত্র বা নায়ক বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, কারণ সাজাহানই মুখ্য আলম্বন-বিভাব হইতে বাধ্য। সুতরাং নাট্যকারের বিচার-বুদ্ধির এবং সৃজন-শক্তির প্রতি অনাস্থা না জানাইয়া নামকরণে আপত্তি তুলিবার কোন কারণ থাকিতে পারে না। যাঁহারা আপত্তি তুলিয়াছেন তাঁহারা একই মুখে সাজাহানকে শ্রেষ্ঠ নাটক বলিতে পারেন না। কারণ যে নাটকে সাজাহান কেন্দ্রীয় চরিত্র হইবে আর যে নাটকে ঔরংজীব কেন্দ্রীয় চরিত্র হইবে তাহার গঠন এক হইতে পারে না; উভয়ের গঠনগত বৈশিষ্ট্য বা পার্থক্য থাকিবেই। সাজাহান নাটকের গঠনগত বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করিয়া আমরা দেখিব যে নাট্যকারের উদ্দেশ্য অনুযায়ীই নাটকের গঠন-কার্য সম্পন্ন হইয়াছে।

কিন্তু নাট্যকারের দুর্ভাগ্য—সমালোকগণের কেহ কেহ সাজাহানের নায়কত্ব বা কেন্দ্রীয়ত্ব স্বীকার করিতে চাহেন না। কেহ দারাকে, কেহ জাহানারাকে, কেহ বা ঔরংজীবকে কেন্দ্রীয় চরিত্রের মর্যাদা দিতে অগ্রসর হইয়াছেন। দারাবাদী বা জাহানারাবাদীর মত পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে (৺নবকৃষ্ণ ঘোষ ও ডাঃ সুকুমার সেনের মত দ্রষ্টব্য), এইবার ঔরংজীববাদীর মত আলোচনা করা যাইতেছে

ঔরংজীববাদীর প্রধান যুক্তি—"ঔরংজীব সর্বাপেক্ষা প্রধান ও প্রভাবশালী চরিত্র এবং ঔরংজীবই কাহিনীর মধ্যস্থলে বিরাজ করিয়া সমস্ত চরিত্রকে নিয়ন্ত্রিত ও নিয়মিত করিয়াছেন—(অ. ঘোষ)।" অতএব ঔরংজীবই ...... কিন্তু, ঔরংজীবকে কেন্দ্রীয় চরিত্র তথা নায়ক বলিলে কি কি সমস্যা দেখা যায় পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে—এখানেও স্মরণ করা যাক্।—নাটকখানিতে ট্র্যাজেডির নায়ক বা কেন্দ্রীয় চরিত্র অর্থাৎ ঔরংজীব-চরিত্রকে

আশ্রয় করিয়াই নাটকখানির ট্র্যাজেডিত্ব অভিব্যক্ত হইয়াছে। অন্যথা, করুণ-রসাত্মক নাটক বলিয়া স্বীকার করিলে—দেখাইতে হইবে যে ঔরংজীবই করুণ রসের মুখ্য আলম্বন-বিভাব—অর্থাৎ ঔরংজীবকে কেন্দ্র করিয়াই করুণ রস নিষ্পন্ন হইয়াছে। রসের দিক দিয়া ঔরংজেবের কেন্দ্রীয়ত্ব যে নাই বলাই বাহুল্য। ঔরংজীবকে কেন্দ্রীয় চরিত্র বলিলে নাটকখানিকে বীররসাত্মক বলিয়া প্রমাণ করিতে হইবে। সমালোচক ঘোষের আসংজ্ঞান মনে এমন একটা ধারণা যে কাজ করিয়াছে একটি উক্তি হইতে অনুমান করা যাইতে পারে—"ঔরংজেবের সূক্ষ্ম শাণিত বুদ্ধি বার বার জয়লাভ করিয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ জয় হইয়াছে হৃদয়বৃত্তির করুণ আবেদনে—এই বিষয়টি লক্ষ্য করিবার যোগ্য" সমালোচক ঘোষ "লক্ষ্য করিবার যোগ্য" বলিয়া বোধ হয় দেখাইতে চাহিয়াছেন যে "ঔরংজীবের বারংবার জয়লাভ"কে উপস্থাপনা করাই নাটকখানির উদ্দেশ্য অধ্যাপক ঘোষের মন্তব্য মানিতে গেলে নাটকখানিকে না বলা যায় ট্র্যাজেডি, না বলা যায় করুণরসাত্মক, অর্থাৎ বীররসাত্মক নাটক বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। প্রত্যক্ষবাধ না ঘটাইয়া উহা স্বীকার করা যায় কি?

এইবার দেখা যাক—ঔরংজীব চরিত্রকে ট্র্যাজেডি-করুণ বলা যায় কি না। নাটকখানির গঠনের তাৎপর্য আপাততঃ লক্ষ্য না করিয়া যদি চরিত্রের রীতিগত বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়া অগ্রসর হওয়া যায় তাহা হইলে এই পর্যন্তই কোনও প্রকারে যাওয়া যায় যে ঔরংজীব রিচার্ডের মত শয়তান এবং ম্যাকবেথের মত নিষ্ঠুর হইয়াছেন—পিতাকে কারারুদ্ধ করিয়াছেন, ভ্রাতাদের হত্যা করিয়াছেন, ইত্যাদি। কিন্তু যে কারণে উহারা ট্র্যাজেডি-করুণের পর্যায়ে যাইয়া পৌছিয়াছে ঔরংজীবের চরিত্রে সে কারণ—সে পরিণতি কোথায়? শেষ পর্যন্ত ঔরংজীব-চরিত্র ট্র্যাজেডি-করুণ হইয়া উঠিয়াছে ইহা কিছুতে প্রমাণ করা যায় না। পঞ্চম অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যে

ঔরংজীব বিবেকের যবনিকার উপর উত্তপ্ত চিন্তার প্রতিচ্ছবি দেখিয়াছেন বটে, কিন্তু সেই উত্তপ্ত চিন্তাটুকু চরিত্রটিকে ট্র্যাজেডি-করুণের মহিমায় মণ্ডিত করিতে সক্ষম হয় নাই, তাঁহার অন্তর্দ্বন্দ্ব যেমন কারুণ্য সৃষ্টিতে সক্ষম হয় নাই -তাহার পরিণতিও শোচনীয় হইয়া উঠে নাই—pity arouse করিতে পারে নাই

তারপর, নাটকীয় ঘটনার মূল প্রবর্তক ঔরংজীব নহে—সাজাহান। পিতা সাজাহানের সহিত সম্রাট সাজাহানের দ্বন্দ্বে সম্রাট সাজাহান সাময়িক ভাবে জয়লাভ করিয়াছিলেন এবং সৈন্য প্রেরণের আদেশ দিয়াছিলেন, এই আদেশ প্রদানই তাঁহার প্রথম 'error of judgment'—বিচারের ভুল। এই নিরুপায় আদেশের ফলেই ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব, সাজাহানের বন্দীদশা, পুত্র-পৌত্রাদির মৃত্যুজনিত শোক-শেলের আঘাত—নাটকের সমস্ত ঘটনার সৃষ্টি। এই দিক দিয়া দেখিলে সাজাহানই ঘটনার মূল প্রবর্তক- প্রথম স্রষ্টা। অতএব একথা বলা সম্পূর্ণ সঙ্গত নহে যে ঔরংজীব কাহিনীর মধ্যস্থলে বিরাজ করিয়া সমস্ত ঘটনাকে নিয়ন্ত্রিত ও নিয়মিত করিয়াছেন (কারণ ঔরংজীব মূল প্রবর্তক নহে—মূল প্রবর্তক সাজাহান)। 'কাহিনীর মধ্যস্থলে বিরাজ করা' বলিতে যদি কেন্দ্রীয়ত্ব বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়া থাকে তাহা হইলে সে চেষ্টা যে সার্থক হয় নাই পূর্বের আলোচনাতেই দেখানো হইয়াছে। কেন্দ্রীয় চরিত্র সর্বদাই উদ্দেশ্যকে বহন করে—এবং করে বলিয়াই তাহার কেন্দ্রীয়ত্ব। এই হিসাবে, সাজাহান নাটকে ঔরংজীবের বার বার জয়লাভ বা শোচনীয় পরিণাম (?) দেখানোই উদ্দেশ্য, ইহা প্রতিপন্ন না করা পর্যন্ত ঔরংজীবকে কেন্দ্রীয় চরিত্র বলা যাইবে না। আমি মনে করি, ঔরংজীব প্রধান এবং খুবই প্রভাবশালী, কিন্তু প্রতিপক্ষের নায়ক বা প্রতিনায়ক মাত্র—কেন্দ্রীয় চরিত্র বা নায়ক নহেন। ঔরংজীবকে নায়কের মর্যাদা দিলে—নাটকখানিকে না বলা যায় ট্র্যাজেডি, না বলা যায় করুণ রসাত্মক, যাহা বলিতে হয় তাহা এই যে, দ্বিজেন্দ্রলাল

শিব গড়িতে বাঁদর গড়িয়াছেন—তাঁহার শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক নাটকখানা গঠনে ও রসনিষ্পত্তিতে শোচনীয়ভাবে বিকৃত হইয়া গিয়াছে।

নাটকখানির দৃশ্যযোজনার তথা গঠনরীতি লক্ষ্য করিলেও দেখা যায় যে, নাটকখানির মুখপাতেই যে বীজ স্থাপনা করা হইয়াছে তাহার আশ্রয় ঔরংজীব নহে—আশ্রয় বা ধারক সাজাহান। এক দিকে পিতা সাজাহান অন্যদিকে সম্রাট সাজাহান—এই দুই সত্তার দ্বন্দ্বেই নাটকের আরম্ভ, সম্রাট সাজাহানের মর্যাদা-হানিতে এবং পিতা সাজাহানের সন্তানের অকৃতজ্ঞতায়, অন্য সন্তানের ভাগ্য-বিপর্যয়ে—উভয় সত্তারই নিদারুণ আঘাতে ও ক্ষোভে নাটকের গর্ভসন্ধি এবং পিতা সাজাহানেরই একাংশের সহিত অন্যাংশের দ্বন্দ্বে ও বেদনাময় সমাধানে নাটকের উপসংহার। এমনিভাবেই সাজাহানকেই আশ্রয় করিয়া নাটকের মুখ্য স্থায়ীভাব রসে পরিণত হইয়াছে—সাজাহানের শোচনীয় করুণ জীবন উপস্থাপিত হইয়াছে। এই কারণেই সাজাহানই নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র ও নায়ক এবং নাটকখানি ট্র্যাজেডি-করুণ

সাজাহান কিরূপ ট্র্যাজেডি?

প্রথমেই দেখা যাক, যাঁহারা নাটকখানিকে ট্র্যাজেডি করুণ তথা সাজাহানকে ট্র্যাজেডি-করুণ নাটকের নায়ক বলিতে চাহিবেন না তাঁহারা কি কি বিষয়ে আপত্তি তুলিতে চেষ্টা করিবেন। যে যে বিষয়ে আপত্তি তুলিলে নাটকটির ট্র্যাজেডি-করুণত্বে আপত্তি করা হইবে তাহা এই—(ক) সাজাহান চরিত্রে কোনও দ্বন্দ্ব নাই, (খ) কোনরূপ বিচার-বুদ্ধির ভুলের জন্য বা স্বভাবগত দুর্বলতার জন্য সাজাহান কোনও দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করেন নাই অর্থাৎ সাজাহান তাঁহার ভাগ্য-বিড়ম্বনার জন্য একটুও দায়ী নহেন, (গ) সাজাহান যে দুঃখভোগ করিয়াছেন তাহা নিষ্ক্রিয়ভাবেই করিয়াছেন, (ঘ) নায়কের জীবনে বা নাটকের পরিণতিতে কোনরূপ বিপত্তি

ঘটে নাই—বিপত্তি না ঘটিলে ট্র্যাজেডি কোথায়? মোটকথা, আপত্তি করিলে এইরূপ যুক্তি দিয়াই তাহা করিতে হইবে।

এই যুক্তিগুলি খণ্ডন করিবার পূর্বে ট্র্যাজেডি সম্বন্ধে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বা সিদ্ধান্ত মনে রাখা দরকার। যেমন, (ক) ট্র্যাজেডি এক প্রকারের নহে—উহার মধ্যে শ্রেণীভেদ আছে (ট্র্যাজেডির স্বরূপ প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য), এবং (খ) দ্বন্দ্ব (conflict) বলিতে কেবলমাত্র বাহ্য আবেষ্টনীর সহিত দ্বন্দ্ব বুঝায় না, প্রবৃত্তির বা আদর্শের পারস্পরিক দ্বন্দ্বও বুঝায় (conflict of feelings, modes of thought, desires, wills, purposes, conflict of persons with one another or with circumstances or with themselves; one, several or all of these kinds of conflict as the case may be). (গ) ট্র্যাজেডিতে নায়কের মৃত্যু বা সাংঘাতিক বিপত্তি ঘটাইতেই হইবে এমন কোনও ধরাবাঁধা নিয়ম নাই। যদিও ট্র্যাজেডি বলিতে—"the story of unhappiness must have an unhappy end" এইরূপ ধারণাই সাধারণতঃ আছে এবং unhappy end বলিতে নায়ক বা অন্যান্য প্রধান চরিত্রের মৃত্যু বুঝায়, কিন্তু অপেক্ষাকৃত আধুনিক মতে অর্থাৎ হেগেল প্রমুখদের মতে এবং ব্যাপকভাবে পরবর্তী ট্র্যাজেডি নাটকসমূহের বিশ্লেষণ করিলে ট্র্যাজেডির উপসংহারে নায়কের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী ও অপরিহার্য বলিয়া মনে হয় না। সমালোচক ব্র্যাডলে লিখিয়াছেন—"This usage of the word "Tragedy" is comparatively recent; it leaves us without a name for many plays in many languages, which deal with unhappiness without ending unhappily" হেগেলের মতে শান্তি-সমাধানেও দ্বন্দ্ব শেষ হইতে পারে (Sometimes it can end the conflict peacefully and the tragedy closes with a solution—Hegel's Theory of Tragedy). দ্বন্দ্ব-নিষ্পত্তি বিষয়ে

হেগেলের যে মত, সেই মত আলোচনা প্রসঙ্গে ব্র্যাডলেও বক্তৃতার মধ্যে লিখিয়াছেন—"for we need not consider here those tragedies which end with a solution". ব্র্যাডলে বলেন, সমাধান বিভক্ত আত্মার ঐক্য প্রতিষ্ঠারই চেষ্টা ; এই চেষ্টা catastrophe রূপে ভীষণাকারে (violent) আত্মপ্রকাশ করিতে পারে এবং অন্যবিধ সমাধানে শান্ত আকারে প্রকাশ পাইতে পারে। এ সম্বন্ধে সমালোচক A H. Thorndike যে কথা লিখিয়াছেন তাহা খুবই উল্লেখযোগ্য—"In modern times the salvation of the virtuous in Tragedy has had warm defenders including Racine and Dr. Johnson and the essentiality of either an unhappy ending or of deaths has been generally denied······A Tragedy may permit of relief or even recovery for the good or it may minimise the external and physical elements of suffering, but its actions must be largely unhappy though its end is not and destructive even if it does not lead to death" আসল কথা এই যে, ট্র্যাজেডির পরিণতি সব ক্ষেত্রেই যে বিপত্তিময় হইবে এমন নহে ; শান্ত অথচ বেদনাময় সমাধানেও নাটকের উপসংহার ঘটিতে পারে, নায়কের মৃত্যু সেখানে একান্তভাবে অপরিহার্য নহে। (ঘ) যেহেতু নানাজাতীয় ট্র্যাজেডি সম্ভব সেই হেতু নায়কও নানা ধরনের হইতে পারে। ট্র্যাজেডির নায়ক সম্বন্ধে আমাদের সাধারণ ধারণা এই যে নাটকীয় ঘটনার সংঘটনে তাঁহার সক্রিয়তা থাকিবে, কর্মপরম্পরার মধ্য দিয়া তিনি নিজের তথা নাটকের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি ঘটাইবেন। ক্রিয়াশীলতা এবং আত্মদায়িত্ব তাঁহার প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই সাধারণ সূত্রের ব্যতিক্রমও আছে। এমন নায়কও সম্ভব যিনি ঘটনার মূলপ্রবর্তক এবং নিজের পরিণামের জন্য নিজেই অংশতঃ দায়ী হইলেও

বাহ্যত: নিষ্ক্রিয়। কিন্তু তাঁহাকে ঘিরিয়াই পাঠকের বা দর্শকের স্থায়ীভাব রসতা প্রাপ্ত হয় এবং তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়াই নাটকের ঘটনাগুলি সমাবেশিত করা হয়। দৃষ্টান্ত দিতে বলা যায়, হ্যামলেট বা ম্যাক্‌বেথ যে ধরনের নায়ক, রাজা লিয়র সে ধরনের নায়ক নহেন। Shakespearean Tragedy নামক গ্রন্থে King Lear সমালোচনা প্রসঙ্গে প্রথম শ্রেণীর সম্বন্ধে ব্র্যাডলে লিখিয়াছেন, "The reader of Hamlet, Othello or Mackbeth is in no danger of forgetting when the catastrophe is reached, the part played by the hero in bringing it on. His fatal weakness, error, wrong-doing continues almost to the end." আর দ্বিতীয় শ্রেণী সম্বন্ধে লিখিয়াছেন "It is otherwise with King Lear, when the conclusion arrives, the old king has for a long while been passive. We have long regarded him not only as a man more sinned against than sinning but almost wholly as a sufferer, hardle at all as an agent , অন্যত্রও লিখিয়াছেন।—"Othello resembles King in having a hero more acted upon than acting or rather a hero driven to act by being acted upon." ব্র্যাডলের বক্তব্যটুকু বিশেষভাবে স্মরণীয় এইজন্য যে সাজাহানকে নিষ্ক্রিয় বলিয়া যাঁহারা নায়ক বলিতে রাজী হইবেন না তাঁহাদের পক্ষে উক্তিটুকু অঞ্জন শলাকার কাজ করিবে।

উল্লিখিত কথা কয়েকটি মনে রাখিয়া সাজাহান নাটকখানি বিচার করিতে অগ্রসর হইলে—নাটকখানিকে ট্র্যাজেডি করুণ বলিতে কুণ্ঠা আসিবে বলিয়া মনে হয় না। কারণ, প্রথমত: নায়কের চরিত্রে দ্বন্দ্ব যথেষ্ট আছে। একপক্ষে স্নেহপ্রবণ পিতার ব্যাকুলতা, অন্যপক্ষে সম্রাট সাহাজাহানের অভিমান ও কর্তব্যনিষ্ঠা—এই আত্মভেদ (self division) লইয়াই নাটকখানি আরম্ভ। পিতা অবাধ্য মাতৃহারা সন্তানদের স্নেহে বশ করিতে চাহেন, কিন্তু সম্রাট

বিদ্রোহীদের শাস্তি না দিয়া পারেন না। এই দ্বন্দ্বের সমাধান করিতে যাইয়া সাজাহান যাহা করিলেন তাহাকেই প্রথম error of judgment বলা যাইতে পারে—দারার আবেদন ও জাহানারার অনুরোধের বলের সাহায্যে সম্রাট-অভিমান জয়ী হইয়া দারাকে 'পাঞ্জা' প্রদান করিলেন এবং তাহাতেই পরবর্তী নাটকীয় ঘটনাসমূহের প্রবেশ-দ্বার নিরর্গল হইয়া খুলিয়া গেল। স্নেহ ও কর্তব্যকে এক সঙ্গে রক্ষা করিবার জন্য যে হিসাব তিনি করিলেন তাহাই গোড়ার ভুল। তারপর (প্রথম অঙ্কের সপ্তম দৃশ্যে) পিতা সাজাহানের বক্ষে চরমতম আঘাত আসিল পুত্রের জঘন্য কৃতঘ্নতারূপে। পিতা উদ্ধত বিজয়ী পুত্রের জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করিতেছিলেন স্নেহে বশ করিবার একান্ত ও অন্ধ আশা লইয়া। যে অন্তর্নিহিত স্নেহ দৌর্বল্যে তিনি বলিয়াছিলেন—"না দারা, ক্রোধ নেই, আমি তাদের বুঝিয়ে বলবো, কাজ নেই। তাদের নির্বিরোধে রাজধানীতে আসতে দাও"—সেই সহজ স্নেহ-দৌর্বল্যেই তিনি ঔরংজীবের সমস্ত প্রার্থনা (পত্রে লিখিত) পূর্ণ করিয়া আগ্রা দুর্গে সৈন্য প্রবেশের অনুমতি দিয়াছিলেন। কিন্তু কৃতঘ্ন ও নির্মম পুত্র বিনয়ের ছলে তাঁহাকে বন্দী করিল, সম্রাটকে ও পিতাকে একই সঙ্গে চরম আঘাত দিল। সম্রাট সাজাহানের—পিতা সাজাহানের বন্দী দশার পরিবেষ্টনীর সহিত করুণ দ্বন্দ্ব দেখা দিল। এই দ্বন্দ্বের তীব্রতা যাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, তাঁহারা সাজাহানের বাহ্য নিষ্ক্রিয়তাকেই বড় করিয়া দেখিয়াছেন, আন্তর ক্রিয়াশীলতার মাত্র লক্ষ্য করিতে পারেন নাই। সাজাহানের এই দ্বন্দ্বকে যাঁহারা নিষ্ফল বলিয়া উপেক্ষা করিতে চাহিবেন তাঁহাদের মনে রাখা দরকার—বাহ্য প্রতিক্রিয়ার ও সাফল্যের হিসাবে নিষ্ফল হইলেও দ্বন্দ্ব হিসাবে অপূর্ব মহিমায় উহা মণ্ডিত

সাজাহানের বন্দী দশায়—আগ্রা দুর্গের পতনের জন্য—সাজাহান যে আংশিকভাবে দায়ী, সাজাহান নিজমুখেই স্বীকার করিয়াছেন—"সব দোষ আমার। আমি স্নেহবশে ঔরংজীব পত্রে যা চেয়েছিল সব দিয়েছিলাম। ওঃ আমি এ স্বপ্নেও ভাবিনি।" একথা স্বীকার করিতে হইবে যে সাজাহানের

দুঃখভোগের মূলে সাজাহানের বিচার-বুদ্ধির ত্রুটি এবং স্বভাবগত স্নেহ-দৌর্বল্য অংশত কাজ করিয়াছে অর্থাৎ agency of the sufferer আছে এবং আছে, বলিয়াই উহা দ্বন্দ্ব-করুণ (tragic)।

তারপর সাজাহানের যেরূপ সক্রিয়ত্ব দেখা যায় তাহা চরিত্রটিকে ট্র্যাজেডি-করুণের মর্যাদা দেয় না একথা বলা যায় না। ক্রিয়াশীলতার বাহ্য আড়ম্বর না থাকিলে নায়কত্ব তথা নাটকের ট্র্যাজেডিত্ব নষ্ট হইয়া যায় না; শেক্‌সপীয়রের King Lear নাটক তাহার অকাট্য প্রমাণ—আমরা জানি, রাজা লিয়র has for a long while been passive, but almost wholly as a sufferer, hardly at all as an agent হইয়াও ট্র্যাজেডির নায়ক হইয়াছেন। সাজাহান রাজা লিয়রের মত নিষ্ক্রিয় (passive) এ কথা মানিয়া লইলেও ট্র্যাজেডির নায়ক হইবার মর্যাদা তাঁহার আছে একথা স্বীকার করিতেই হইবে।

সর্বাপেক্ষা গুরুতর আপত্তি—নাটকের পরিণতিতে কোনরূপ বিপত্তি-সমাধান নাই; পূর্বে যে আলোচনা করা হইয়াছে তাহাতে দেখানো হইয়াছে যে ট্র্যাজেডিতে বিপত্তি-সমাধান এবং করুণ অথচ সন্ধি-সমাধান—দুই প্রকার সমাধান ঘটিতে পারে। সাজাহান নাটকে দ্বিতীয় প্রকার সমাধান ঘটিয়াছে। সাজাহান নাটকের সমাধান মার্জনায় বটে, কিন্তু সে মার্জনা নামে মাত্র মার্জনা—করুণ মার্জনা। এই মার্জনার বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করিতে না পারিলে নাটকখানিকে ট্র্যাজি-কমেডি বলিবার ঝোঁক আসিতে পারে (অনেকের মধ্যেই দেখা যায়)। সতর্ক না হইলে সাজাহান ট্র্যাজি-কমেডি নাটকের তালিকার অন্তর্ভুক্ত হইবে বলাই বাহুল্য। পূর্বেই বলিয়াছি, সাজাহান নাটকের পরিণতি মার্জনায়, কিন্তু এই মার্জনা, ব্র্যাডলে যাহাকে 'self restitution of the divided spiritual unity' বলিয়াছেন ঠিক তাহাই। সাজাহান যে ভাবে আত্মস্থ বা প্রকৃতিস্থ হইতে চেষ্টা করিয়াছেন তাহা violent অর্থাৎ ভীষণ নহে, কিন্তু তাহা যে কারুণ্যময় এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। উপসংহারে

যে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়াছে তাহা অনুধাবন করিলেই উক্তির যাথার্থ উপলব্ধ হইবে। যে স্নেহ-দৌর্বল্য সাজাহানকে দুঃখযন্ত্রণা আঘাতের মধ্যে ঠেলিয়া দিয়াছিল, সেই স্নেহ-দৌর্বল্যই যে-পুত্র তাঁহাকে নিষ্ঠুরতম আঘাত দিয়াছে, সেই কৃতঘ্ন পুত্রেরই শীর্ণ দেহ, কোটরগত চক্ষু শুষ্ক পাণ্ডুর মুখ দেখিয়া অস্থির হইয়া উঠিল। কিন্তু পিতা সাজাহানের একাংশ (ঔরংজীবের পিতা) মার্জনার জন্য অধীর আগ্রহে অগ্রসর হইতেই—অন্যান্য অংশ (দারার পিতা, মোরাদের পিতা ও সুজার পিতা) মার্জনার পথে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা হইয়া দেখা দিল। সাজাহানের মধ্যে আত্ম-বিচ্ছেদ (self split) তথা দ্বন্দ্ব তীব্রতম রূপ গ্রহণ করিল—মার্জনা এই দ্বন্দ্বের কারুণ্যে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। "আর মার্জনা। ঔরংজীব--ঔরংজীব। না সে সব মনে কর্ব না। ঔরংজীব তোমার সব অপরাধ ক্ষমা করলাম" বলিয়া সাজাহান যখন চক্ষু ঢাকিলেন তখন ক্ষমা আর ক্ষমা থাকিল না; ক্ষমার প্রসন্ন কান্তি দুঃসহ ক্ষতির আর্তনাদের সহিত এক হইয়া গেল। ক্ষমা যে এতখানি করুণ হইতে পারে সাজাহানের ক্ষমা না দেখিলে উপলব্ধি করা যায় না। তারপর জাহানারাও ঔরংজীবকে এমনিভাবেই ক্ষমা দেখাইয়াছে। ক্রুদ্ধ ফণিনীর উষ্ণ নিঃশ্বাসে জহরৎউন্নিসা যে অভিশাপ বর্ষণ করিয়াছে তাহার বিষবাষ্প কারুণ্যের আবহাওয়াকে আরো ঘনীভূত করিয়াই তুলিয়াছে। বস্তুতঃ সাজাহান নাটকের পরিসমাপ্তি করুণ মূর্চ্ছনায় পরিপূর্ণ এবং সেই কারণেই সাজাহান "ট্র্যাজেডি"– ট্র্যাজি-কমেডি নহে।

আমার সিদ্ধান্ত—সাজাহান একখানি ট্র্যাজেডি-করুণ ঐতিহাসিক নাটক। সাজাহানের দ্বন্দ্ব করুণ দুঃখ-দুর্দশা-ভোগ উপস্থাপিত করাই নাটকখানির উদ্দেশ্য। নাটকখানির নায়ক দারা কিংবা জাহানারা অথবা ঔরংজীব নহে, নায়ক সাজাহান নিজেই।

সাজাহানের সাধারণ সমালোচনা

সাজাহান ট্র্যাজেডি-করুণ একখানি পঞ্চাঙ্ক ঐতিহাসিক নাটক মোগল-সম্রাট সাজাহানের শেষ জীবনের শোচনীয় ভাগ্যবিপর্যয়, বিড়ম্বনা, সুদুঃসহ দুরবস্থা, দুঃখশোক, সন্তাপ এবং মর্মস্পর্শী অন্তর্দ্বন্দ্ব অবলম্বনে রচিত Tragedy of Suffering জাতীয় নাটক।

সাজাহানের শেষ জীবন—সুজা ঔরংজীব মোরাদের বিদ্রোহ, পুত্রদের মধ্যে নিষ্ঠুর হানাহানি, আগ্রাদুর্গে বন্দী জীবন, সুজার পরাজয় ও নিরুদ্দেশ পলায়ন, ছলে বন্দী মোরাদের বিচারের নামে হত্যা, দারুণ ভাগ্য-বিড়ম্বনার এবং নিষ্ঠুরতম অপমান-লাঞ্ছনার পরে দারার মর্মন্তুদ নিধন এমনি নানা অসহ্য ঘটনার সান্নিপাতিক আঘাতে দুঃখশোক সন্তাপে পরিপূর্ণ এবং অতি শোচনীয়ভাবে বিড়ম্বিত। এই শোচনীয় শেষ জীবনকে নাট্যকার ইতিহাসের ব্যাপক পরিমণ্ডলে বিশেষভাবে রূপায়িত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন নাটকখানিতে ১৬৫৭ খ্রী. হইতে ১৬৬ খ্রীঃ পর্যন্ত সময়ের ঐতিহাসিক ঘটনাকে সাজাহান-কেন্দ্রিক করিয়া উপস্থাপনার চেষ্টা করা হইয়াছে।

নাট্যকারের চেষ্টা সাফল্যের দিক দিয়া যে সার্থক হইয়াছে সমালোচক দলের এবং দর্শক-পাঠকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা ও নাটকখানির অপ্রতিদ্বন্দ্বী জনপ্রিয়তা তাহার প্রথম নিদর্শন। ৺প্রফুল্লকুমার সরকার বি. এল. মহাশয় বঙ্গদর্শনে (১৩২০) লিখিয়া ছিলেন, "সাজাহানকে বঙ্গসাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক বলিয়াও আমাদের তৃপ্তি হয় না, জগতের সমক্ষে দেখাইবার মত বাঙলা সাহিত্যে যে দুই একটি বস্তু আছে তাহার মধ্যে এই একটি।" ৺নবকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয়ের মতে—"সম্ভবতঃ কালের বিচারে এই নাটকখানিই কবির শ্রেষ্ঠ নাটক বলিয়াও বরিত হইবে।" ডাঃ শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মহাশয়ের মতেও—"দ্বিজেন্দ্রলালের

নাটক এর মধ্যে সাজাহান শ্রেষ্ঠ।" (অবশ্য সকলেই এ বিষয়ে একমত নহেন। ৺দেবকুমার রায়চৌধুরী মহাশয়ের মতে—নূরজাহান শ্রেষ্ঠ; কেহ কেহ 'মেবার পতন'কে 'শ্রেষ্ঠ প্রকাশ' বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। এ বিষয়ে অবিসংবাদিত মীমাংসা পাওয়া যাইবে আশা করা যায় না। কারণ চিত্তের প্রবণতা সকলের এক নহে। শৈল্পিক উৎকর্ষের সঙ্গে বিষয়-গৌরব সংযুক্ত হইয়াই সামগ্রিক আবেদন সৃষ্টি করে। এই কারণেই মূল্য-বিচারে এত তারতম্য দেখা যায়)।

সাজাহান নাটকখানির সামগ্রিক আবেদন অসাধারণ। করুণ-ভাব-বন্ধকে ইহা এত গভীরভাবে আলোড়িত করে যে দর্শক কিছুতেই ইহার প্রভাব বা ঘোর কাটাইয়া উঠিতে পারে না। নাট্যকার চমৎকার পরিস্থিতির মধ্যে হৃদয়ের প্রত্যেকটি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাব-তরঙ্গকে এত সুষ্ঠুভাবে স্পন্দিত ও মুখর করিতে সক্ষম হইয়াছেন যে দর্শকের হৃদয়ে সংবেদন না জাগিয়া পারে না। হৃদয়াবেগের আকুঞ্চন-প্রসারণের বিচিত্র গতি না কি অপূর্ব ভাববর্ণচ্ছটায় বিচ্ছুরিত হইয়া উঠিয়াছে। প্রত্যেকটি দৃশ্য রসভারোজ্জ্বল হওয়ায় কৌতূহলের একটানা প্রবাহ থাকে এবং থাকে বলিয়াই নাটকখানির সামগ্রিক সংবেদন অসামান্য। তারপর চরিত্র-সৃষ্টি ও বৈচিত্র্য এবং চরিত্র-মাধুর্য ও মহিমার আকর্ষণী শক্তিও কম নহে। প্রধান বা পার্শ্বিক প্রত্যেকটি চরিত্রই নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে চিত্তাকর্ষক। দিলদারের বক্রোক্তি, পিয়ারার হাস্যোজ্জ্বল পতিপ্রাণ-প্রিয়তার অন্তরালে অন্তর্বাহিনী প্রেম-মন্দাকিনী, মহামায়ার রাজপুত বীরাঙ্গনার দীপ্ত তেজস্বিতা ও আদর্শনিষ্ঠা, সোলেমানের ও মহম্মদের অসাধারণ পিতৃভক্তি, নাদিরার আত্মবিলোপী পতিভক্তি, ঔরংজীবের বিস্ময়কর শৌর্য-বীর্য বৈচক্ষণ কৌটিল্য নাটকের সংবেদনী শক্তিতে খুবই পুষ্টি সঞ্চার করিয়াছে। দারার করুণ পরিসমাপ্তি এত মর্মস্পর্শী হইয়া উঠিয়াছে যে হৃদয়ের গ্রন্থিগুলি ছিঁড়িয়া যাইতে চাহে, আর সকল আকর্ষণী শক্তির উপরে রহিয়াছে সাজাহানের দ্বন্দ্বময় ভাবাবেগের অতুলনীয় তীব্রতা, গভীরতা, তথা কারুণ্যের আকর্ষণ। স্নেহ-প্রবণ

পিতৃহৃদয় ও সম্রাট-অভিমানের সমবায়ে নাট্যকার সাজাহান চরিত্রটিকে এমন দ্বন্দ্বময় করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন—দারুণ পরিবেষ্টনীর সহিত নিরুপায় মানসিক সংগ্রামের এমন অদ্ভুত ও করুণ চিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন—বিভক্ত আত্মার মর্মদাহী দ্বন্দ্বের এমন অপূর্ব আলেখ্য সৃষ্টি করিয়াছেন যে আমাদের সংজ্ঞান, অসংজ্ঞান, নির্জ্ঞান, এমন কি 'সামষ্টিক নির্জ্ঞান' চেতনাকেও যেন আলোড়িত করিয়া তুলে।

তৃতীয়তঃ সর্বাপেক্ষা বড় আকর্ষণ—ভাষা-গরিমা ও কল্পনা-মহিমা। কল্পনার সৌষ্ঠব ও গৌরবকেই যদি কবিকৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্য বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে এ কথা অকপটে বলিতেই হইবে যে দ্বিজেন্দ্রলাল প্রথম শ্রেণীর স্রষ্টা এবং সাজাহান প্রথম শ্রেণীর কবিকৃতি।

কয়েকটি ত্রুটি

কিন্তু নাটকখানি সর্বতোভাবে নিখুঁত এ কথা বলা যায় না। গঠনে এবং অন্যান্য বিষয়ে নাটকখানিতে অল্পস্বল্প ত্রুটি রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। যদিও আধুনিক নাটকে বিষয়গত ঐক্যের (unity of theme) প্রতি গ্রীক অনুমোদিত নিষ্ঠা দেখানো হয় না (শেকসপীয়রের নাটকেও দেখান হয় নাই) এবং চরিত্র সৃষ্টির ও ব্যক্তিত্ব বিশ্লেষণের দিকেই অধিকতর মনোযোগ দেওয়া হয়, তথাপি এ কথা না বলিয়া উপায় নাই যে বহুর মধ্যে এক গোছের একটি বিষয় না থাকিলে সাহিত্য-সৃষ্টি কতকগুলির বিচ্ছিন্ন ঘটনার বিশৃঙ্খল সমাবেশ হইয়া দাঁড়াইবে তথা খণ্ড খণ্ড অনুভূতির এক জনতা সৃষ্ট হইবে। সে সাহিত্যে আর যাহাই থাকুক, রস-নিষ্পত্তির কোনও সম্ভাবনা থাকিতে পারে না। অতএব

নিরবচ্ছেদ বা সাবচ্ছেদ যে কোনও এক ধরনের 'বিষয়ের ঐক্য' সাহিত্য সৃষ্টিতে থাকিবেই—যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা সাহিত্য বলিতে অনুভূতির জনতা না বুঝিয়া "রসাত্মক বাক্য" বুঝিব। রস সৃষ্টিতে কোন একটি অনুভূতির ক্রমবর্দ্ধমান ও পরম্পরিত সংবেদন অত্যাবশ্যক। এই অনুভূতির নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ বজায় রাখিতে না পারিলে রসনিষ্পত্তি ব্যাহত হইয়া যায়। তবে প্রবাহকে নিরবচ্ছিন্ন রাখিতে নিরবচ্ছেদ বিষয়ের ঐক্য রাখিতেই হইবে এমন কোনও কথা আজ কেহ স্বীকার করেন না; অবচ্ছেদযুক্ত হইয়াও বিষয়ের ঐক্য থাকিতে পারে, অবশ্য ইহাই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য যে, ঐ অবচ্ছেদ বা ব্যবধানের মাত্রা এত দীর্ঘ হওয়া উচিত নহে, যাহাতে স্থায়ীভাব-প্রবাহটি একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়।

আমার মনে হয়—ঐতিহাসিক পরিমণ্ডলটি যথাযথ রাখিতে যাইয়া, ঐতিহাসিক ঘটনা-পরম্পরা যথাযথভাবে বজায় রাখিতে যাইয়া, নাট্যকার অনাবশ্যক দৃশ্য ও ঘটনা যোজনা করিয়া নাটকের স্থায়ীভাবের গতিতে দীর্ঘ তরঙ্গের ছন্দ আনিয়া ফেলিয়াছেন, ফলে স্থায়ীভাবের সংবেদনে একটু ব্যাঘাত পড়িয়া গিয়াছে। যেমন ধরা যাক, তৃতীয় অঙ্কটিতে সাজাহানের কোনও প্রবেশ নাই। তৃতীয় অঙ্কের ছয়টি দৃশ্য এবং চতুর্থ অঙ্কের চারিটি দৃশ্য—মোট দশটি দৃশ্যের পরে সাজাহানের দৃশ্য যোজিত হইয়াছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে প্রত্যেকটি দৃশ্য স্বকীয় আকর্ষণী শক্তি দ্বারা দর্শকের কৌতূহল সতেজ রাখে এ কথা সত্য, কিন্তু সাজাহানের দীর্ঘকালীন অনুপস্থিতি নাটকের প্রধান রসের ধারাটিকে বেশ খানিকটা বদ্ধ করিয়া ফেলে।

সুজা ও পিয়ারার দৃশ্যগুলি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে চিত্তাকর্ষক; কিন্তু সাজাহানের ট্র্যাজেডি সংঘটনে তাহার খুব ঘনিষ্ঠ যোগ নাই; সেই ঘটনাকে অত দীর্ঘ করিবার কোনও যুক্তি থাকিতে পারে না।

সাজাহানের বক্ষে দুঃখের অভিঘাত সৃষ্টি করিতে সুজার পরাজয় ও পলায়ন-বার্তাই যথেষ্ট। তারপর কাশ্মীরে পৃথ্বী সিংহের প্রাসাদ-প্রাঙ্গনে সোলেমানের জন্য যে দৃশ্যটি যোজনা করা হইয়াছে তাহা কাশ্মীরী কন্যাদের গীতির ও প্রীতির জন্য উপভোগ্য বটে, কিন্তু সাজাহান নাটকের পক্ষে অপরিহার্য নহে। এমনকি দিল্লীতে ঔরংজাবের ধর্মনিষ্ঠার তথা কৌটিল্য দেখাইবার জন্য যে আয়োজন করা হইয়াছে তাহা নিরপেক্ষভাবে চমৎকার, কিন্তু সাজাহানের ক্রিয়া বা প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে ইহার কোনও যোগ না থাকায় দৃশ্যটি খাপছাড়া হইয়া গিয়াছে।

তবে প্রধান ও কেন্দ্রীয় চরিত্র সাজাহানের ব্যবহিত উপস্থিতি সত্ত্বেও একটি বিশেষ কারণে নাটকখানির রসধারায় কোন বিচ্ছেদ ঘটিতে পারে নাই। এই বিশেষ কারণটিই "সাজাহান" নাটকের সাফল্যের মূলে রহিয়াছে। নাট্যকার সাজাহানকে কেন্দ্র করিয়া এমন তীব্র ভাবাবেগ-আবর্ত সৃষ্টি করিয়াছেন যে, এক আবর্ত হইতে আর এক আবর্ত পর্যন্ত যে ব্যবধান, দীর্ঘ হইলেও ভাবাবেগের প্রভাব প্রায় অক্ষুণ্ণই থাকে। সাজাহানের আবেগ-আবর্তে মন আকৃষ্ট থাকে বলিয়া এবং সাজাহানের জন্য মন উন্মুখ থাকে বলিয়া অন্তর্বর্তী ঘটনাগুলি রসের ধারাকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিতে পারে না। এই কারণেই নাট্যকার সুজা মোরাদ ঔরংজীব ও দারার কাহিনীকে নাটকে অতখানি স্থান করিয়া দিয়াও নাটকের প্রধান রসধারা অবিচ্ছিন্ন রাখিতে সক্ষম হইয়াছেন। তবে তৃতীয় অঙ্কে ধারাটি যে একটু চাপা পড়িয়া গিয়াছে পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। এই ত্রুটিকে আমরা গঠনের ত্রুটি বলিতে পারি।

দ্বিতীয়তঃ ভাষায় ব্যক্তিগত ভঙ্গিমা অর্থাৎ বৈষম্য বা বৈচিত্র্য নাই। সব চরিত্রের মুখে প্রায় একই রকমের ভাষা অনেক সময়েই কানে লাগে। দুঃসহ শোকের মধ্যে উপমা উৎপ্রেক্ষার প্রয়োগের প্রতিযোগিতা অনুচিত

বলিয়াই মনে হয়। উপমা উৎপ্রেক্ষাদি স্বকীয় উৎকর্ষে যতই চমৎকার হউক অস্থানে অপাত্রে পড়িয়া মাধুর্য হারাইয়া ফেলে; এ কথা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই সাজাহান নাটকে ইহার নিদর্শন খুবই পাওয়া যায়।

অনুচিত চরিত্র

তৃতীয়তঃ কয়েকটি চরিত্র সম্বন্ধে 'কিন্তু' না জাগিয়া পারে না। (ক) দিলদারকে অমানুষিক ব্যঙ্গ-বিলাসী করিয়া সৃষ্টি করা হইয়াছে। মোরাদের কাছে মনোরাজ্য অনাবিষ্কৃত দেশ—ইহা জানিয়াও দিলদার মোরাদকে সতর্ক করিতে চেষ্টা করেন নাই, আর চেষ্টা করিলেও এমন ভাবে করিয়াছেন যে মোরাদের কোনও উপকারই তাহা সাধন করিতে পারে নাই। মোরাদ ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে নামিয়াছেন—দিলদার নিষ্ক্রিয় সাক্ষীর সোপানে দাঁড়াইয়া বলিয়াছেন—"মোরাদ। তোমাকে দেখে আমার মাঝে মাঝে দুঃখ হয়। এত সরল!" দিলদার এশিয়ার বিজ্ঞতম সুধী হইতে পারেন কিন্তু মোরাদের ক্ষেত্রে তিনি হৃদয়হীন ব্যঙ্গ বিলাস সুধী মাত্র। এই দিক দিয়া দিলদার ব্যঙ্গভরা ফানুস হইয়া হাতে হাতে উড়িয়াছেন, রক্তেমাংসে গড়া মানুষ হইতে পারেন নাই। দিলদারের মধ্যে ক্রমপরিণতি পাওয়া যায় না। শেষের দিকে চরিত্রটির অতি মানবীয় আত্মত্যাগের স্পৃহার কারণ স্পষ্ট করিয়া দেখানো হয় নাই। (খ) পিয়ারা সম্বন্ধে সমালোচকরা আপত্তি তুলিয়া বলিয়াছেন পরমাত্মীয়গণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবার মত দুঃসময়ে সমদুঃখভাগিনী স্ত্রীর স্বামীর সহিত পরিহাস কালবিরুদ্ধ ও সম্পর্কবিরুদ্ধ (নবকৃষ্ণ ঘোষ)। এ কথা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই যে যদিও পিয়ারা স্বামীপ্রেমের বশেই পরিহাস দিয়া স্বামীকে ভুলাইয়া রাখিতে, স্বামীর দুঃখভার লাঘব করিতে চেষ্টা করিয়াছে এবং সেই দিক দিয়া পিয়ারা চরিত্রে অদ্ভুত মাধুর্য রহিয়াছে, তথাপি অনেক ক্ষেত্রেই পিয়ারার রসিকতা মাত্রা ছাড়াইয়া গিয়াছে। পিয়ারা—সুজার ভাষায় বলা যাক—"ঘটনার রাজ্যে একবার ভুলেও এসে

নামবে না ?" সত্যিই পিয়ারার 'ঘটনার রাজ্যে নামা' বিষয়ে এত নির্ভুল নির্লিপ্ততা ঔচিত্যবোধে বেশ জোরেই আঘাত করে। কিন্তু পিয়ারা কৈফিয়ত দিয়াছে "তোমার উদ্ধারের উপায় থাকলে আমি তোমায় উদ্ধার কর্ত্তাম। তাই আমি আর সে চেষ্টাও করিনে। আপন মনে গান গাই।" এ কৈফিয়ত পিয়ারা চরিত্রে খুব স্পষ্ট হইয়া প্রকাশ পায় নাই, উদ্ধার করিবার চেষ্টা খুব শক্তিশালী হইয়া কখনই দাঁড়ায় নাই। 'পিয়ারা হাস্যের ফোয়ারা, একটা অর্থশূন্য বাক্যের নদী'—হাস্য- পরিহাস দিয়া সে স্বামীকে যুদ্ধের চিন্তা হইতে ভুলাইয়া রাখে—এ সবই মানা যায়, কিন্তু যুদ্ধের দামামা যখন বাজিয়া উঠিয়াছে, তখন পিয়ারার নির্লিপ্ততা, পরিহাস খুবই চোখে লাগে। (গ) যশোবন্ত চরিত্রের গতি-রেখাও তেমন সুস্পষ্ট হইয়া উঠে নাই। নর্মদা যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পরে কখন এবং কেন ঔরংজীবের পক্ষে গেলেন তাহার কোনও উল্লেখ নাই। তারপর ৮ই জুন আগ্রা দুর্গের পতনের সঙ্গে সঙ্গে সাজাহান বন্দী হন—২১শে জুলাই (১৬৫৮) ঔরংজীব দিল্লীতে সিংহাসনে আরোহণ করেন—এ সকল সংবাদ যশোবন্ত সিংহ নিশ্চয়ই রাখিতেন। কিন্তু রাখা সত্ত্বেও খাজুয়ার যুদ্ধে (১৬৫৯ জানুয়ারী) সুজার বিরুদ্ধে সৈন্য-সাহায্য দিতে আসার এবং আসিয়া সিংহাসন আরোহণের কৈফিয়ত জিজ্ঞাসা করার যথেষ্ট কারণ দেখানো হয় নাই। চরিত্রটির গতি-রেখা এই কারণে কাটা-কাটা বা অসংলগ্ন। তারপর কৈফিয়ত তলব করায় ঔরংজীবের সঙ্গে যশোবন্তের খোলাখুলি মতান্তর ও মনান্তর ঘটিয়া যায়। ঔরংজীব 'সাবধান! পর্যন্ত উঠিলেন, যশোবন্তও 'চোখ রাঙাচ্ছেন কাকে?' পর্যন্ত গিয়াছিলেন ; কিন্তু ইহার পরে যশোবন্তের আর পাত্তা পাওয়া যায় না। ঔরংজীবের পক্ষে থাকিলেন কি পক্ষ ত্যাগ করিলেন কিছুই ভাল ভাবে বুঝা যায় না। যদি বলা যায় যে সকলে 'জয় ঔরংজীবের জয়' দিয়াছে—যশোবন্তও সকলেরই একজন—তাহা হইলে বলিতে হইবে যে যশোবন্তের উত্তেজনা প্রশমনের কোনও কারণ ওখানে ঘটে নাই ; এবং অতখানি বচসার পরে সকলের সহিত

'জয় দেওয়া' খাপছাড়া ব্যাপার। যশোবন্তের মুখে (তৃতীয় অঙ্কের ষষ্ঠ দৃশ্যে). জয় ঘোষণার কারণ দেওয়া হইয়াছে বটে—"এমন ভোজবাজী খেল্লে—যে সর্বপ্রথম আমিই চেঁচিয়ে উঠলাম—জয় ঔরংজীবের জয়।" কিন্তু আমাদের মধ্যে 'কিন্তু' আসিবার বড় কারণ এই যে, চরিত্রটিতে (স্বাভাবিক) পরিণতির পরম্পরা স্পষ্ট হয় নাই। (ঘ) সোলেমানের চরিত্রটি (পঞ্চম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে) বেশ খানিকটা অস্বাভাবিক তথা অতি-নাটকীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জহরৎ যখন ঔরংজীবকে গুলি করিতে উদ্যত হইল তখন সোলেমান তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন—"সে কি জহরৎ! শান্ত হও—হত্যার প্রতিশোধ হত্যা নয়। পাপে পুণ্যের প্রতিষ্ঠা হয় না। কিন্তু হত্যা—মহাপাপ।" সোলেমানের এই উদ্রৈকতা (?) চমৎকার হইলেও আকস্মিক ও অতি-নাটকীয়। (ঙ) প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে ঘটনা-সংস্থাপনেরও একটু ত্রুটি ঘটিয়াছে। সুজা—"আমি যুদ্ধে যাচ্ছি। তুমি শিবিরে যাও। কোনও ভয় নাই পিয়ারা" —বলিয়া প্রস্থান করিবার সঙ্গে সঙ্গেই "নেপথ্যে কোলাহল" করিয়া সোলেমান ও দিলীর খাঁ প্রবেশ করেন এবং সোলেমান দিলীর খাঁকে সুজার পশ্চাদ্ধাবন করিতে আদেশ দেন। প্রস্থানের কিছু পরেই দিলীর খাঁ পুনঃপ্রবেশ করিয়া বলেন—"সাহাজাদা! সুলতান সুজা সপরিবারে নৌকাযোগে পালিয়েছেন। কিন্তু সপরিবারে পলাইবার সময় সুজাকে দেওয়া হয় নাই। কারণ পিয়ারা শিবিরে—সুজা যুদ্ধক্ষেত্রে। "আমি যুদ্ধে যাচ্ছি—তুমি শিবিরে যাও" না বলিয়া সুজার বলা উচিত ছিল—"পিয়ারা শিগ্‌গির নৌকায় চল, না পালালে ধরা পড়তে হবে।" তাহা করিলে—"নৌকাযোগে পালিয়েছেন" উক্তির সঙ্গে সঙ্গতি থাকিত।

মূল কাহিনী ও উপকাহিনী

সাধারণ সমালোচনার উপসংহারে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাহি। সাজাহান নাটকখানিতে তিনটি ট্র্যাজেডিযোগ্য কাহিনীর সমবায় সৃষ্টির চেষ্টা দেখা যায়। একটিকেই পূর্ণরূপে সমভিব্যক্ত করা

হইয়াছে—(১) সাজাহানের কাহিনী, (২) দারার কাহিনী, (৩) ঔরংজীবের কাহিনী, এই তিনটি কাহিনীই ট্র্যাজেডির উপযোগী। সাজাহানের ও দারার জীবন অবলম্বনে King Lear জাতীয় Tragedy of Suffering সৃষ্টি করা সম্ভব আর ঔরংজীবের জীবনকথা অবলম্বনে ম্যাকবেথ, রিচার্ড (তৃতীয়) জাতীয় ট্র্যাজেডি সৃষ্টি অসম্ভব নহে। আলোচ্য নাটকে সাজাহানের জীবন-কথাকেই মুখ্য করা হইয়াছে, তবে দারার কাহিনী বা ঔরংজীবের কাহিনীও অনেকটা বর্দ্ধিত করা হইয়াছে। দারার কাহিনীর মধ্যে একটা আদি মধ্য ও অন্তসন্ধি না আছে, এমন নহে, তেমনি ঔরংজীবের কাহিনীর মধ্যেও সন্ধি লক্ষ্য করা যায়, তবে কাহিনী দুইটি মুখ্যভাবে রূপায়িত না হওয়ায় ট্র্যাজেডি-মহিমায় অন্বিত হইতে পারে নাই। সাজাহান নাটকের এই সামবায়িক সত্তা যাঁহাদের চোখে পড়ে না তাঁহারা দারাকে অথবা ঔরংজীবকে নায়ক মনে করিয়া থাকেন। যাঁহারা বা যিনি ঔরংজীবকে নায়ক বলিতে চাহিয়াছেন তাঁহাদের মনের উপর ম্যাকবেথ ও রিচার্ডের (তৃতীয়) প্রভাব খুব কাজ করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ইহারা ভুলিয়া যান যে ঔরংজীবকে নাটকখানির কেন্দ্রীয় চরিত্র রূপে নাট্যকার রূপায়িত করিতে চেষ্টা করেন নাই এবং ঔরংজীবের পরিণতিতে যথেষ্ট ট্র্যাজেডি-কারুণ্য সৃষ্ট হয় না। যাঁহারা দারাকে কেন্দ্রীয় চরিত্র বলিতে চাহিয়াছেন তাঁহারাও নাটকখানির পরিপূর্ণ রূপটি উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। অংশ ও অংশীর পার্থক্য সম্বন্ধে একটু সচেতন থাকিলেই দারাকে কেন্দ্রীয় চরিত্র মনে করার ভুল স্পষ্টরূপে দেখা দিবে। সাজাহান নাটক নানা কাহিনীর সমবায়ে গঠিত—এই কথাটি সর্বদাই মনে রাখিতে হইবে। এই সকল কাহিনীর ভিতর দিয়া একটি প্রধান রস নিষ্পন্ন হইয়াছে কি না সাজাহান সমালোচনায় এইটিই প্রথম ও প্রধান দেখিবার বিষয়। আমরা দেখিয়াছি—সাজাহান দর্শক ও পাঠকের মনে স্থায়ী আসন লাভ করিয়াছে এবং স্থায়ী আসন লাভ করিবার সর্বপ্রকার যোগ্যতা উহার আছে।

সাজাহান নাটকের চরিত্র বিশ্লেষণ

সাজাহান

সাজাহান-চরিত্র স্নেহপ্রবণ হৃদয়ের সহিত আত্মাভিমান ও কর্তব্য-বুদ্ধির তীব্র দ্বন্দ্বের ও করুণ সমাধানের এক চমৎকার আলেখ্য—বিভক্ত আত্মার আত্মক্ষয়ের বেদনার এবং আত্মোদ্ধারের করুণ একটি চিত্র।

পিতা সাজাহান স্নেহময়। তাঁহার হৃদয় শুধু এক শাসন জানে, সে শুধু স্নেহের শাসন; তাঁহার কেবল একটি মাত্র যুক্তি আছে, সে যুক্তি স্নেহ; এ স্নেহ বুক ভরা। পুত্রদের অবাধ্যতায় বিদ্রোহের কথা শুনিয়া পিতা সাজাহান অনাগত বিদ্রোহের আশঙ্কায় ভাবিত হইয়া পড়িলেন। কারণ পিতার কাছে আর কি বড় দুঃসংবাদ হইতে পারে? জ্যেষ্ঠপুত্র দারা যখন বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য সৈন্য পাঠাইবার প্রস্তাব জানাইলেন, পিতা অস্থির ব্যাকুলতায় বলিয়া উঠিলেন—'না দারা কাজ নেই, আমি তাদের বুঝিয়ে বলবো। কাজ নেই। তাদের নির্বিরোধে রাজধানীতে আসতে দাও।" জাহানারা অবাধ্যতাকে বিদ্রোহ প্রমাণ করিয়া দেখাইলেন—"প্রজা রাজার উপরে খড়্গা তুলেছে।" কিন্তু পিতা সে প্রমাণ মানিতে পারিলেন না, পুত্রদের প্রজার কাঠগড়ায় দাঁড় করাইতে পারিলেন না,—পরম বিস্ময়ে বলিলেন "সে কি জাহানারা, তারা আমার পুত্র!" জাহানারা ভর্ৎসনা করিয়া সম্রাট-চেতনাকে জাগ্রত করিতে চেষ্টা করিলেন, স্মরণ করাইলেন—"স্নেহ কি কর্তব্যকে ছাপিয়ে উঠবে?" নিরুপায় সাজাহান তখন তাঁহার মুখখানি মেলিয়া ধরিয়া দেখাইলেন—যে পক্ষেরই পরাজয় হউক তাঁহার সমান ক্ষতি। দারা পরাজিত হইলে তাহার ম্লান মুখখানি দেখিতে হইবে, আর তাহারা পরাজিত হইয়া ফিরিয়া গেলে তাহাদের ম্লান মুখ কল্পনা করিতে হইবে।

পিতা কিছুতেই পুত্রদের হৃদয় হইতে দূরে সরাইতে পারিলেন না। কিন্তু এদিকে কন্যা জাহানারা যে 'উদ্ধত সুজা, স্বকল্পিত-সম্রাট মোরাদ, আর তার সহকারী ঔরংজীবকে' বিদ্রোহের নিশান উড়াইয়া, ডঙ্কা বাজাইয়া আগ্রায় প্রবেশ করিতে দিতে একান্তই অনিচ্ছুক এবং জ্যেষ্ঠপুত্র দারারও প্রার্থনা—"আমায় আজ্ঞা দিউন পিতা।" এ কি জটিল দ্বন্দ্ব! এ দ্বন্দ্ব তো কেবল সম্রাট সাজাহানের সহিত পিতা সাজাহানের দ্বন্দ্ব নহে—পিতা সাজাহানের দুইটি অংশও যে সম্রাটের পক্ষে যাইয়া যোগ দিল—দ্বন্দ্ব শুধু স্নেহের সহিত আত্মাভিমানের দ্বন্দ্ব থাকিল না, স্নেহের সহিত স্নেহেরও দ্বন্দ্ব হইয়া দেখা দিল। পিতা সাজাহানের বুক চিরিয়া নিরুপায় আর্তনাদ বাহির হইল—"ঈশ্বর! পিতাদের এই বুক ভরা স্নেহ দিয়েছিলে কেন? কেন তাদের হৃদয়কে লৌহ দিয়ে গড়নি। ওঃ—।" পিতা সাজাহানের কাছে আত্মসমর্পণ না করিয়া উপায় কি? এ দ্বন্দ্বের সমাধান কোথায়? এই ক্ষণেই জাহানারা মোগল সাম্রাজ্যের পরমায়ুর কথা তুলিয়া সম্রাট সাজাহানকে প্রকৃতিস্থ করিতে চেষ্টা করিলেন, আর দারা উপস্থিত করিলেন সমাধান—"আমি প্রতিজ্ঞা করছি, ভাইদের কাউকে পীড়ন বা বধ করব না, তাদের বেঁধে পিতার পদতলে এনে দেবো। পিতা তখন তাদের ইচ্ছা হয় ক্ষমা করবেন, তারা জানুক সম্রাট সাজাহান স্নেহশীল—কিন্তু দুর্বল নয়।" সত্যই তো ইহাপেক্ষা ভাল সমাধান আর কি হইতে পারে? এ সমাধানে পিতা রক্ষা করিবেন পুত্রদের প্রাণ, সম্রাট রক্ষা করিতে পারিবেন সম্রাটের মান! জাহানারার দাবী, দারার দাবী—মোগল সাম্রাজ্যেরই দাবী—সাজাহানকে সম্রাট হইতে হইবে। সম্রাট সাজাহান সাময়িক ভাবে পিতা সাজাহানকে পরাস্ত করিলেন; সাজাহান ঘোষণা করিলেন—"তারা জানুক যে সাজাহান শুধু পিতা নয় সাজাহান সম্রাট। ...বিদ্রোহীর শাস্তিবিধান কর" এবং দারাকে 'সমস্ত ক্ষমতা' ও 'পাঞ্জা' প্রদান করিলেন। কিন্তু পিতার কণ্ঠ কে রুদ্ধ করিবে? সম্রাট সাজাহানের উদ্যত দণ্ডের অর্দ্ধেকখানিই যে পিতার পৃষ্ঠে পড়িল! আত্মা

আত্মাকে পীড়ন করিয়া হাহাকার করিয়া উঠিল। বিজিত পিতা নিরুপায় বেদনা লইয়া প্রস্থান করিলেন বটে, কিন্তু নেপথ্যে যাইয়া আবার লুপ্ত শক্তি উদ্ধার করিলেন এবং সম্রাটকে পরাজিত করিয়া তাঁহার দেওয়া আদেশ ও 'পাঞ্জা' ফিরাইয়া লইতে ছুটিয়া আসিলেন। কিন্তু হায়! দারা যে তখন নাগালের বাহিরে। নিরুপায় সাজাহান ভ্রাতৃদ্বন্দ্বের তথা আত্মক্ষয়ের প্রবেশদ্বার নিজের হাতেই খুলিয়া দিলেন।

ঘটনা-চক্রকে সাজাহান ঘুরাইয়া দিতেই চক্র দ্রুতবেগে ঘুরিতে লাগিল। ধর্মাটের যুদ্ধ—সামুগড়ের যুদ্ধ ঘটিয়া গেল। শেষ যুদ্ধে দারাকে পরাজিত করিয়া ঔরংজীব আগ্রায় প্রবেশ করিলেন। স্নেহপ্রবণ পিতা উদ্ধত বিজয়ী পুত্রকে স্নেহে বশ করিবার ঐকান্তিক আগ্রহে ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। পিতা সাজাহানের কিছুতেই যেন বিশ্বাস হয় না—ঔরংজীব কপট, ধূর্ত, মিথ্যাবাদী এবং মনে হয় ঔরংজীব ঠিক বিদ্রোহী নহে—উদ্ধত। এই ঔদ্ধত্য পিতৃ-অভিমানকে পীড়ন করে, পিতা ইহার জন্য লজ্জিত না হইয়াও পারেন না; কিন্তু যে শৌর্য, যে বীর্য-বৈচক্ষণ্য সম্রাটের বিরাট সেনাবলকে পর্যুদস্ত করিয়াছে, সে শৌর্য ও বীর্য-বৈচক্ষণ্যর অধিকারী যে ঔরংজীব—তাঁহার নিজেরই পুত্র। পিতার বক্ষ পুত্রের বিজয়-গর্বে স্ফীত হইয়া উঠে! এখানেও সেই আত্মার সহিত আত্মারই দ্বন্দ্ব।

কিন্তু এত স্নেহের বিনিময়ে পিতা পুত্রের কাছে যাহা পাইলেন তাহা তাঁহার দুঃস্বপ্নেরও অগোচর—বন্দীদশা—the most unkindest cut of all. পিতা সাজাহান কৃতঘ্নতার আঘাতে বিক্ষুব্ধ আর্তনাদে ভাঙিয়া পড়িলেন; কিন্তু সম্রাট সাজাহান কিছুতেই ধারণা করিতে পারিতেছিলেন না যে, সম্রাট সাজাহানের পৌত্র তাঁহারই সম্মুখে তরবারি খুলিয়া তাঁহার মুক্তি-দ্বার বন্ধ করিয়া থাকিতে পারে। "একদিন যাঁর রোষকষায়িত চক্ষু দেখে ঔরংজীব ভয়ে অর্দ্ধেক মাটির মধ্যে সেঁধিয়ে যেত—তার—তার—পুত্রের হাতে—বন্দী" সম্রাট সাজাহান কিছুতেই ইহা বিশ্বাস ও সহ্য করিতে পারেন

নাই। সম্রাট-সত্তা মেরুদণ্ড সোজা করিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"আমি বৃদ্ধ সাজাহান বটে। কিন্তু আমি সাজাহান। এই, কে আছো! নিয়ে এস আমার বর্ম আর তরবারি!" কিন্তু কেহই আসিল না! মহম্মদ যখন বলিল যে সে তাঁহার দেহরক্ষীদের দুর্গ হইতে বাহির করিয়া দিয়াছে তখনও সম্রাট পূর্ণ অভিমানেই কৈফিয়ৎ তলব করিলেন—"কার আজ্ঞায়? তাঁহার বিনানুমতিতে এত বড একটা ব্যাপার ঘটিতে পারে সাজাহান কল্পনাও করিতে পারেন না, তারপর নিজেরই পৌত্র, সেদিনকার মহম্মদের এত বড স্পর্দ্ধা! ঔরংজীবও কি এত বড স্পর্দ্ধা দেখাইতে পারে?

নিদারুণ বাস্তবের সম্মুখীন হইতেই পিতা সাজাহান অভিমানে, ক্ষোভে, হতাশায় ভাঙ্গিয়া পডিলেন; সম্রাট সাজাহান বিগত মহিমার উপর ভরসা করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা উদ্ধারের আশায় মুক্তির জন্য মহম্মদের কাছে দীনের মত কাকুতি মিনতি করিতেও ইতস্ততঃ করিলেন না। কিন্তু মহম্মদ পিতার আজ্ঞা হইতে এক চুলও এদিক ওদিক সরিতে রাজি হইলেন না; সমস্ত অনুরোধকে—"ক্ষমা করবেন ঠাকুরদা—আমি তা পারবো না" বলিয়া নিষ্ফল করিয়া ফিরাইয়া দিলেন।

সম্রাট সাজাহান তবু হাল ছাডিলেন না। কপট ঔরংজীবকে একবার তাঁহাকে দেখিতেই হইবে—প্রতিদ্বন্দ্বী ঔরংজীবকে যে ভাবেই হউক, শায়েস্তা করিতেই হইবে। কিন্তু সম্মুখ-সংগ্রামের শক্তি তাঁহার কোথায়? তাই কাঁটা দিয়াই কাঁটা তুলিবার সঙ্কল্প করিলেন—অগত্যা মহম্মদকে রাজমুকুট দেওয়ার শপথ করিয়া ঔরংজীবকে জব্দ করিবার চেষ্টা করিলেন। প্রস্তাব করিলেন—"মহম্মদ! আমায় মুক্ত করে দাও। তুমি ভারতের অধীশ্বর হবে। আমি শপথ করছি মহম্মদ! শপথ করছি। আমি শুদ্ধ এই কপট ঔরংজীবকে একবার দেখবো! ......একদিকে তোমার পিতার আজ্ঞা, আর একদিকে ভারতের সাম্রাজ্য—বেছে নাও এই মুহূর্তে!" কিন্তু মহম্মদ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন—পৃথিবীর বিনিময়েও পিতার আজ্ঞায় অবাধ্য

হইতে পারিবেন না বলিয়া প্রস্থান করিলেন। সম্রাট সাজাহানের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইল—আত্মপ্রতিষ্ঠার সমস্ত সম্ভাবনা নিমেষে মিলাইয়া গেল। পিতা সাজাহানও সম্রাট সাজাহানের বেদনায় বেদনা মিশাইয়া তীব্র অনুশোচনায় আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন। সাজাহান আঘাতের উত্তেজনায় উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন—প্রতিহিংসার আগুনে আকাশখানা পুড়াইয়া তথা নিজেকে পুড়াইয়া মর্মজ্বালা নিবারণ করিতে চাহিলেন। আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস যেখানে আত্মবিনাশ না করা পর্যন্ত দুঃসহ অস্বস্তি ভোগ করিতে থাকে সে কী নিদারুণ শোচনীয় দ্বন্দ্ব-করুণ অবস্থা! সাজাহানের অবস্থা তাহারই শেষ মাত্রায় গিয়া দাঁড়াইল—এতবড় অন্তর্দ্বন্দ্ব আর এতখানি আত্মক্ষয়ের নিদর্শন সত্যই কম মিলে।

বন্দী সাজাহান—পুত্রের হস্তে বন্দী সাজাহানের দিন নিষ্ফল হাহাকারে, নির্বিষ আস্ফালনে একের পর এক কাটিয়া যায়—নিজের অবস্থার দিকে চাহিয়া ভারত সম্রাট সাজাহান হাহাকার করেন—"উঃ! ভারত-সম্রাট সাজাহানের আজ—একি অবস্থা!" সম্রাট সাজাহানের সত্তার শেষ অবশিষ্টটুকু ছিল তাঁহার 'সম্রাট' উপাধিটুকু। ঔরংজীব তাহাও ছিনাইয়া লইলেন—নিজে সম্রাট হইয়া দিল্লীর সিংহাসনে বসিলেন। জাহানারা এই সংবাদ দিলে সাজাহান বিশ্বাস করিতে চাহেন নাই বলিয়াই প্রথমে শুনিতে পাইলেন না। পুত্র পিতা-বর্তমানে সিংহাসনে বসিবে—বিবেকে বাধিবে না, চক্ষু-লজ্জায় বাধা দিবে না—ইহা সাজাহান এত ঘটনার পরেও বিশ্বাস করিতে চাহিলেন না--বিশ্বাস করা এবং সর্বহারা হওয়া যে একই কথা! সর্বহারা হইতে—আত্মবিলোপ করিতে কে চাহে! কিন্তু চাওয়ার মুখ চাহিয়া দুর্ঘটনা কবে নিরস্ত হইয়াছে! সাজাহান যখন বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইলেন তখনই শক্তি-ভক্তি সব দিক দিয়া সর্বহারা হইয়া গেলেন; তাঁহার সত্তার মূল্য একেবারে শূন্য হইয়া গেল। সাজাহানের চোখে আকাশ কালীবর্ণ হইয়া গেল, মনে হইল—সংসার একেবারেই উল্টিয়া গিয়াছে। এই মন লইয়াই

তিনি জাহানারাকে গদ্গদস্বরে যখন জিজ্ঞাসা করিলেন—'সংসার কি ঠিক সেই রকমই চল'ছে। জননী সন্তানকে স্তন দিচ্ছে? স্ত্রী স্বামীর ঘর করছে? ভৃত্য প্রভুর সেবা করছে? গৃহস্থ ভিখারীকে ভিক্ষা দিচ্ছে?·· মানুষ মানুষ খাচ্ছে না? দেখে এলি! দেখে এলি!" তখন শুধু তাঁহার উৎকেন্দ্রিক মনের চেহারাই দেখা গেল না, হৃদয়ের অসহ্য অপার ও অব্যক্ত বেদনাই যেন কিছু না ব'লিতে পা'রিয়াই কিছু একটা বলিয়া উঠিল। এক একটি প্রশ্ন এক একটি প্রচণ্ডতম আর্তনাদের আগ্নেয় উচ্ছ্বাস অপেক্ষাও অধিকতর উচ্ছ্বাসকে চাপিয়া প্রকাশ করিল এবং বেদনা-বাষ্পে সমগ্র আকাশকেই আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল—সাজাহানের মত এমন নিঃস্ব, এমন বিক্ষিপ্ত এবং এমন করুণ আর কে হইয়াছে?

সাজাহান শুধু সংসারের প্রতিই আস্থা হারাইলেন না—ঈশ্বরের প্রতিও ধিক্কার-মুখর হইয়া উঠিলেন। পৃথিবী-পোড়া ছাই ঈশ্বরের মুখে ছড়াইয়া দিয়াও তাঁহার প্রতিহিংসার জ্বালা, ধিক্কারের তৃষ্ণা মিটিতে চাহে না!

সাজাহান নিজে বন্দী—দারা বার বার পরাজিত হইয়া পলায়িত—সুজা বঙ্গ আরাকানের রাজার গৃহে সপরিবারে ভিক্ষুক—মোরাদ গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী, ইহাই তো পিতা সাজাহানের চরম দুঃখ-দুর্ভোগ। কিন্তু এখানেই তো শাস্তি নহে, দারা ধরা প'ড়িয়াছেন—এই দুঃসংবাদ নূতন আঘাত রূপে দেখা দিল। ঔরংজীব দারাকে লইয়া কি করিবে—ভা'বিতে যাইয়া সাজাহান শঙ্কা-নেত্রে দেখিলেন—"ভাই ভাইকে হত্যা করবে।" পিতা-সাজাহান শোকে আত্মহারা হইয়া গেলেন—নিষ্ক্রিয়তার অপরাধের তাড়নায় লাফ দিতে প্রস্তুত হইলেন, কারণ দারাকে তাঁহার বাঁচাইতেই হইবে। উন্মত্ত সাজাহান দারাকে বাঁচাইবার ঐকান্তিক কামনায় উন্মত্ততা দমন করিবার জন্য নিজের সহিত সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন—বার বার সঙ্কল্প করিতে লাগিলেন—'আমি পাগল হব না।' কিন্তু নিজের শক্তির উপর তাঁহার আস্থা টুটিয়া যায় বলিয়া ঈশ্বরের কাছে আকুল প্রার্থনা জানাইতে লাগিলেন।

আত্মার সহিত আত্মার দ্বন্দ্বের এত জটিল এবং এত করুণ রূপ আর কোথায় পাওয়া যায়? আহত মনের তীব্র প্রতিক্রিয়া করুণতম আবেদন লইয়া আত্মপ্রকাশ করিল—সাজাহান জাহানারাকে আশীর্বাদ করিলেন—"যেন তোর পুত্র না হয়, শত্রুরও যেন পুত্র না হয়।" এই প্রলাপ যে করুণ বিলাপের নিরুপায় প্রকাশ।

সাজাহান শুধু অপ্রকৃতিস্থই হইলেন না, বাস্তবের সংস্পর্শ হইতে দূরে সরিয়া ভ্রান্তির রাজ্যে চলিয়া গেলেন- সাজাহান দারাকে না বাঁচাইয়া বাঁচিতেই পারেন না, অথচ দারাকে বাঁচাইবার কোনও শক্তিই তাঁহার নাই, দারাকে বাঁচাইবার দাবীর যত চাপ শক্তিহীন সম্রাটে ততই আঘাত—ততই তাঁহার আত্মরক্ষার কৃত্রিম চেষ্টা—কল্পনালোকে আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস। ঐ ঘোরেই তিনি বলিলেন—কার সাধ্য দারাকে হত্যা করে? আমি সম্রাট সাজাহান, আমি স্বয়ং তাকে পাহারা দিচ্ছি!...আমি যদি বলি ঝড় উঠুক, ত ঝড় ওঠে; যদি বলি যে বাজ পড়ুক, ত বাজ পড়ে" সাজাহানের কী ভ্রান্তি! (hallucination!)

সম্রাট-সাজাহান রক্তলোলুপ শয়তানের দূতদের আসিতে দেখিয়া যুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। দারাকে তিনি রক্ষা করিবেনই। কাহারও কথায় তিনি নিরস্ত হইবেন না, কারণ তাঁহার ধারণা—তিনি সরিয়া দাঁড়াইলেই দারাকে তাহারা বধ করিবে। সাজাহান প্রাণপণে শাসাইলেন—"কাছে আসিস না খবর্দার—আর এক পা এগোস নে বলছি।" কিন্তু সাজাহানের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গেল—তিনি দেখিলেন কে যেন দারাকে হত্যা করিয়া ফেলিয়াছে। "কে কর্লে!—বলিয়া সাজাহান হাহাকার করিয়া উঠিলেন। ছুটিয়া দারার কল্পিত রক্তে হস্ত দুইখানি মাখিয়া দেখিলেন—রক্তে ঘর ভাসিয়া গিয়াছে—রক্তে তখনও গরম ধোঁয়া উঠিতেছে। সম্মুখেই দেখিলেন হত্যাকারী ঔরংজীব তাঁহার দিকে তাকাইয়া হাসিতেছে। সাজাহান—সম্রাট সাজাহান ঘাতককে শাস্তি দিতে উদ্যত হইলেন, আদেশ দিলেন—

"দাঁড়া ঘাতক। হাত জোর করে দাঁড়া।" সাজাহানের আদেশের বিরুদ্ধে ঔরংজীব ক্ষমা চাওয়া ছাড়া আর কি বলিতে পারে? সাজাহান সত্যই দেখিলেন—ঔরংজীব হাত জোড় করিয়া ক্ষমা চাহিতেছে। কিন্তু সাজাহান—সম্রাট সাজাহান কি ক্ষমা করিতে পারেন? কঠোরভাবে—দৃঢ়স্বরে বলিলেন—"ক্ষমা? ক্ষমা নাই।" দণ্ডাজ্ঞা ঘোষণা করিলেন—"তুষানলে দগ্ধ কর্বার আজ্ঞা দিলাম। যাও নিয়ে যাও" কিন্তু যে মমতাজ মরিয়া পিতা সাজাহানের বুকের মধ্যেই তাঁহার সমস্ত স্নেহ জমা রাখিয়া গিয়াছে সেই মমতাজ কি এখনও চুপ করিয়া থাকিতে পারে? সাজাহানের সম্মুখে সেই মমতাজ ঔরংজীবের জীবন ভিক্ষা করিতে, ক্ষমা চাহিতে দাঁড়াইলেন। সাজাহানের সম্মুখে ক্ষমাপ্রার্থিনী মমতাজ। সাজাহান নিরুপায় বেদনায় বলিলেন—"কি মমতাজ। তুমি ওর হয়ে ক্ষমা চাচ্ছ! না আমি ক্ষমা কর্বনা। বিচার করেছি। দারাকে মেরেছে।" জাহানারা ভ্রান্তির ঘোর ভাঙ্গিয়া দিয়া বলিলেন—না বাবা মারে নি।" সাজাহান হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। কিন্তু এত বড় দুঃস্বপ্ন—কেন? যদি সত্য হয়?—প্রশ্ন জাগিতেই দেখিলেন জহরৎ কাঁদিতেছে। সাজাহান দেখিলেন, সত্যই দুঃস্বপ্ন হইয়া দেখা দিয়াছে—ইহার চেয়ে মর্মভেদী আর কি হইতে পারে? সাজাহান আর্তনাদে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। আত্মার সহিত আত্মার নিরুপায় দ্বন্দ্বের তথা আত্মক্ষয়ের মর্মান্তিক জ্বালা—অন্তর্নিরুদ্ধ বাষ্প—প্রলাপে প্রলাপে উৎক্ষিপ্ত হইতে লাগিল।

সাজাহান উন্মত্ত।—উন্মত্ত আচরণে, প্রলাপ-বচনে তাঁহার অন্তরের বিরুদ্ধ-বেদনাই বাহির হইতে চেষ্টা করে। সাজাহান ধনরত্ন সব পরিয়া পরিয়া বেড়ান—পাছে ঔরংজীব চুরি করিয়া লইয়া যায়। জহরকে প্রশ্ন করেন—"আমাকে তোর বিয়ে করতে ইচ্ছে হচ্ছে না?" কিন্তু প্রশ্ন করিতেই মর্মাহত পিতার অভিমান হু হু করিয়া জ্বলিয়া উঠে। অপার স্নেহের বিনিময়ে যে পিতা পুত্রের হাতে শুধু বন্দীদশা ও লাঞ্ছনা পাইয়াছে এবং আঘাতের তীব্রতায় পাগল হইয়া গিয়াছে—সেই পিতা সহসা গম্ভীর হইয়া পড়িল, সতর্ক করিয়া দিল—

"খবর্দার বিয়ে করিস না।" নিম্নস্বরে—অতি ব্যথায়ই বলিল—"ছেলে হলে তোকে কয়েদ করে রেখে দেবে—তোর গহণা কেড়ে নেবে। বিয়ে করিস না।" জহরৎ সত্যই বলিয়াছে, "জগতে যত রকম করুণ দৃশ্য আছে, জ্ঞানী উন্মাদের মত করুণ দৃশ্য বুঝি আর নাই। একটা সুন্দর প্রতিমা যেন ভেঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে।—উঃ বড় করুণ।"

সাজাহান এইভাবে 'ছন্দে-বিলাপ' করিতেছিলেন। প্রবেশ করিলেন—ঔরংজীব। সাজাহান—সম্রাট ও পিতা উভয়েই নিঃস্বতার দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া অভিমানে ও দৈন্যে বলিলেন—"এ যে সম্রাট!" ঔরংজীব অগ্রসর হইলেন—পুত্রের দাবী লইয়া ডাকিলেন, "পিতা"। সম্রাট সাজাহান বিক্ষিপ্ত উত্তেজনায় মণিমুক্তা রক্ষা করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন—"দেব না দেব না" বলিয়া গমনোদ্যত হইতেই ঔরংজীব সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন—বলিলেন, না পিতা আমি মণিমুক্তা নিতে আসিনি।" জাহানারা ঔরংজীবের আগমন উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করিয়া যখন বলিলেন—"তবে বোধ হয় পিতাকে বধ করতে এসেছ।" সাজাহান—যে সাজাহানের কাছে আজ মৃত্যুর চেয়ে বড় বন্ধু আর কেহই নাই—যিনি মরিতে পারিলেই বাঁচিয়া যান—কষ্টের কথায় উৎসাহিত হইয়া বলিলেন—"বধ কর্বে? আমায় হত্যা কর্বে?" ঔরংজীব অপেক্ষা তাহা হইলে আর কে হিতকারী আছে? সাজাহান দীনের মত প্রার্থনা করিলেন—"কর ঔরংজীব। আমাকে হত্যা কর!" এমন হিতকারীকে অদেয় কিছুই থাকিতে পারে না।

যে মণি-মুক্তা লইয়া সাজাহান কিছুক্ষণ আগেই পলায়ন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, বধের তথা মুক্তির বিনিময়ে, তাহাই দিতে প্রস্তুত হইলেন। অধিকন্তু যে বধ মুক্তি দিতেই আসিবে, সে বধের মত অনুগ্রহ যিনি করিবেন, তাঁহাকে আশীর্বাদ করিতেও সাজাহান অগ্রসর হইলেন। সাজাহান ঔরংজীবের সম্মুখে লোল বক্ষ খুলিয়া দিয়া ছুরি বসাইয়া দিবার জন্য কাতর আবেদন করিলেন।

ঔরংজীব তাঁহার পিতার কাছে—'শীর্ণ দেহ, কোটরগত চক্ষু, শুষ্ক পাণ্ডুর মুখ' দেখাইতেই পিতা নিরীক্ষণ করিলেন—'শীর্ণ হয়ে গিয়েছে। সত্য শীর্ণ হয়ে গিয়েছে।' শীর্ণদেহ সন্তান জানু পাতিয়া 'পিতার মার্জনা' চাহে—পিতা অস্থির না হইয়া যে পারে না। তাঁহার হৃদয় যে গলিয়া যায়। পুত্র পা জড়াইয়া ক্ষমা চাহিতেই—এতদিনকার জমাট ক্রোধ গলিয়া জল হইয়া গেল। কিন্তু মার্জনা করিবেন—সে তো সহজ-সাধ্য ব্যাপার নহে। দারার পিতা, সুজার পিতা, মোরাদের পিতা ঔরংজীবকে ক্ষমা করিবেন কোন্ প্রাণে? পিতা সাজাহানের এক অংশের সহিত অন্যান্য অংশের অনিবার্য দ্বন্দ্ব আত্মপ্রকাশ করিল! পিতা সাজাহানের সম্মুখে শেষ সম্বল—ঔরংজীব। ঔরংজীব যত নিষ্ঠুরই হউক, আর যত কুচক্রীই হউক—পিতা সাজাহানের সে শেষ আশ্রয়। কিন্তু মার্জনা! তাহাকে ক্ষমা করিতে গেলে দারার হত্যাকারীকেই ক্ষমা করিতে হয়। "আর ঔরংজীব! – ঔরংজীব!"—অন্তর্দ্বন্দ্বে সাজাহানের বুক ভাঙিয়া যায়—প্রাণপণ মুখে যে কোন কথাই বাহির হইতে চাহে না। সাজাহান আত্মোদ্ধার করিতে চেষ্টা করিলেন—এক পক্ষকে—যাহাদের তিনি আর ফিরিয়া পাইবেন না, তাহাদের ত্যাগ না করিলেই যে নয়। সাজাহান দ্বন্দ্বের সমাধান করিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিলেন– সঙ্কল্প করিলেন—"না সে সব মনে কর্ব না।"—মুখে বলিলেন—"ঔরংজীব! তোমার সব অপরাধ ক্ষমা করলাম!" কিন্তু ক্ষমা কথাটি তাঁহার আত্মাকে বিদীর্ণ করিয়া দিল। এই আত্ম-বিদারণের বিনিময়ে যে ক্ষমা দেখা দিল, সে ক্ষমার বাহিরের চেহারা যাহাই হউক—করুণ মূর্ছনায় যে ক্ষমা পরিপূর্ণ, সে ক্ষমা করিতে সাজাহানের যে বুক ভাঙিয়া গিয়াছে—"চক্ষু ঢাকিয়া" সাজাহান সে আর্তনাদের টুঁটি চাপিয়া ধরিলেন।

ঔরংজীব

ঔরংজীব বাহুবলে অসাধারণ বলীয়ান। কিন্তু বুদ্ধিবলে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী—আশ্চর্য তাঁহার কৌশল। কৌশলেই তিনি নর্মদা যুদ্ধে জয়ী হইলেন– যশোবন্ত

সিংহের ৪০,০০০ মোগল সৈন্যকে ধর্মের দোহাই দিয়া বশ করিয়া যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন। অসামান্য বুদ্ধি-সমৃদ্ধি ছিল বলিয়াই তিনি কার্যসিদ্ধির জন্য শুদ্ধ একটা উপায়ের উপর নির্ভর করিতেন না, যত রকম উপায় আছে তাহা ভাবিয়া দেখিতেন এবং মনঃসমীক্ষণে ছিল তাঁহার অসাধারণ পারদর্শিতা. লোক-চরিত্র অধ্যয়নে কখনও তাঁহার ভুল হইত না। যশোবন্তকে তিনি আপাদ-মস্তক অনুবীক্ষণে দেখার মত দেখিয়াছিলেন বলিয়াই মহম্মদকে বলিয়াছিলেন—"না মহম্মদ! আমাদের সৈন্য-শিবির প্রদক্ষিণ করে যদি মহারাজের কিছু সান্ত্বনা হয় ত একবার কেন, তিনি দশবার প্রদক্ষিণ করুন না।" মনঃসমীক্ষণে আনু-বীক্ষণিক তীক্ষ্ণতা ছিল বলিয়াই তিনি রাজনৈতিক সঙ্কটের অষ্টপাশিক আক্রমণ হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। (দিল্লীর দরবার দৃশ্য দ্রষ্টব্য)। এই অসাধারণ দৈহিক ও মানসিক শক্তির সহিত অটুট আত্মপ্রত্যয় এবং ক্ষিপ্রকারিতার সহযোগ থাকায় ঔরংজীব দেহে-মনে অভেদ্য হইয়া উঠিয়াছিলেন।

তারপর রাজনীতিতে ঔরংজীবের কোন নীতির বালাই ছিল না। ছোট ভাই মোরাদকে অতি 'গুনহা'কর মদ খাওয়াইয়া ছলে বন্দী করিতে তথা বিশ্বাসঘাতকতা করিতে তিনি একটুও ইতস্ততঃ করেন নাই। একই মুখে সিংহাসন ও মক্কা চাহিতে তাঁহার যেমন বাধে নাই তেমনি নিজের সমস্ত পাপাচারকে খোদার ইচ্ছা বলিয়া চালাইতেও কুণ্ঠা আসে নাই। এ সব বিষয়ে তিনি দিলদার-বর্ণিত হংসবিশেষ—"সাঁতার দেয়, ডেঙ্গায় হাটে, আবার আকাশে উড়ে।" ধর্ম লইয়া ভেল্‌কি খেলিতে তাঁহার জোড়া নাই। মক্কার ধোঁকা দিয়া দুস্তর সঙ্কট পার হইতে তাঁহার মত কে কবে সক্ষম হইয়াছে?

জাহানারার ভাষায় ঔরংজীব—"সৌম্য সহাস্য মনোহর পাষণ্ড।" জহরতের চোখে ঔরংজীব—"ভিতরে এত ক্রূর বাইরে এত সরল, ভিতরে এত প্রবল বাইরে এত স্থির, ভিতরে এত বিষাক্ত আর বাইরে এত মধুর।" জাহানারার সহিত যে বিষয়ে সকলেই একমত তাহা এই—"যে মানুষ এমন

হাসতে পারে—আর সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঘ্রের লোলুপ চাহনি চাইতে পারে; এমন মৃদু কথা কইতে পারে—যখন সঙ্গে সঙ্গে অন্তরে বিদ্বেষের জ্বালায় জ্বলে যাচ্ছে; ঈশ্বরের কাছে এমন হাত যোড় করতে পারে—যখন ভিতরে নূতন শয়তানী মতলব কচ্ছে।" (দরবার দৃশ্য, দ্রষ্টব্য)। নিয়তির মত কঠিন, হিংসার মত অন্ধ এবং শয়তানের মত ক্রূর না হইতে পারিলে নাকি ঔরংজীবের সমকক্ষ হওয়া যায় না।

এ সবই সত্য—কিন্তু ইহাই সব সত্য নহে। ঔরংজীবের নিরেট শয়তানির এক কোণে বিবেকের ক্ষীণরেখা দেখা যায়; দারার দণ্ডাজ্ঞা হাতে করিয়া ঔরংজীব প্রশ্ন করেন—"বিচারকে কলুষিত কর্‌ব কেন?" কিন্তু এ প্রশ্ন ক্ষণিকের ক্ষণপ্রভা মাত্র। সিংহাসন-লোভী ঔরংজীব হত্যাকে বিচার নাম দিয়া আত্মদোষ স্খালনের চেষ্টা করিলেন। কিন্তু দিলদারের কাছে ঔরংজীব ধরা পড়িলেন। দিলদার প্রমাণ করিয়া দিলেন—"সত্য কথা—আপনি দারার মৃত্যু চান" এবং বুঝাইয়া দিলেন—"সংসার জানবে, ভবিষ্যৎ জানবে যে বিচারের ছল করে আপনি দারাকে হত্যা করিয়েছেন—আপনার সিংহাসনকে নিরাপদ করবার জন্য।" ধরা পড়া ঔরংজীব স্বীকার করিলেন—'দিলদার তুমি সত্য কথা বলেছো!" হঠাৎ-নৈতিকতায় বলিলেন—"দারা বাঁচুন। আমায় যদি তাঁর জন্য সিংহাসন দিতে হয় দেব। এতখানি পাপ- -যাক্, এ মৃত্যুদণ্ড ছিঁড়ে ফেলি।" এই মহত্ত্বটুকু তাঁহার আন্তরিক নহে কারণ ইহা লইয়া ব্যবসা কারবার প্রবৃত্তিও সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিল—শায়েস্তা খাঁর সম্মুখে মৃত্যুদণ্ড ছিঁড়িয়া মহত্ত্বটুকু কাজে লাগাইতে ভুলিলেন না। শায়েস্তা খাঁ সতর্ক করিয়া দিতে বলিলেন—"একটা মহা বিপদকে ঘাড়ে করে সমস্ত জীবন রাজ্যশাসন করতে হবে।" ঔরংজীব সবই বুঝিলেন তবু—"কিন্তু" তাহাকে পিছনে টানিতে লাগিল (বিবেক অপেক্ষা দিলদারের খোঁচাই বেশী কাজ করিয়াছে)।

কিন্তু যেই জিহন খাঁ পথের ইঙ্গিত করিল—ধর্মের মর্যাদা রাখিতে অনুরোধ

করিল, তখনই ঔরংজীব - আত্মরক্ষায় বদ্ধপরিকর ঔরংজীব—প্রজা-বিদ্রোহের ভয়ে ভীত ঔরংজীব—"হাঁ দারার মৃত্যুই তার যোগ্য দণ্ড" বলিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন এবং দস্তখৎ করিয়া শায়েস্তা খাঁর হাতে দণ্ডাজ্ঞা দিয়া দিলেন। কিন্তু ভ্রাতৃহত্যার আজ্ঞা ঔরংজীবকে বিচলিত না করিয়া পারিল না। দুইবার তিনি দণ্ডাজ্ঞা ফিরাইয়া লইয়া আবার প্রত্যর্পণ করিলেন। জিহন খাঁ চলিয়া যাইতেই ঔরংজীবকে আবার বিবেকে দংশন করিল। তিনি "জিহনের দিকে গেলেন, আবার ফিরিলেন, তারপরে ক্ষণেক ভাবিলেন, পরে কহিলেন— "না কাজ নেই।" জিহন খাঁকে ডাকিলেন কিন্তু জিহন খাঁ তখন নিষ্ক্রান্ত। ঔরংজীব বিচলিত ভাবে শায়েস্তা খাঁকে বলিলেন— 'কি করলাম!" শায়েস্তা খাঁ আবিষ্কার করিলেন যে ঔরংজীবের মত শয়তান লোকেরও একটা বিবেক আছে।

প্রকৃতই ঔরংজীব বিবেকহীন এ কথা বলিবার কাহারও উপায় নাই। কিন্তু সে বিবেকের শক্তি যে খুবই ক্ষীণ এ কথা জোর করিয়াই বলা যায়। ফলে ঔরংজীবের অন্তর্দ্বন্দ্ব খুব জোরালো হইয়া উঠে নাই—দারার মৃত্যুকে তিনি ধর্মনিষ্ঠার নিদর্শন করিতে কুণ্ঠিত হন নাই (পঞ্চম অঙ্ক প্রথম দৃশ্য দ্রষ্টব্য। দারার মৃত্যু তাঁহার মনে খুব একটা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিলে ঔরংজীব অত সহজে ঐরূপ করিতে পারিতেন না।

তবে প্রবৃত্তি প্রতিরোধ করে নাই এমন নহে। বিবেকের সহিত বুঝাপড়া করিতে হইয়াছে, কিন্তু আশ্চর্য, পরকে ধর্মের ধোঁকা দিয়া কার্যোদ্ধার করিয়াছিলেন, এইবার নিজেকেও সেই ধোঁকা দিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু চেষ্টা সফল হইল না। দারার ছিন্ন শির, সুজার রক্তাক্ত দেহ, মোরাদের কবন্ধ উত্তপ্ত চিন্তার প্রতিচ্ছবি হইয়া দেখা দিল। "পাপের প্রায়শ্চিত্ত" আরম্ভ হইল, কিন্তু তাহা দ্বন্দ্ব করুণ হইয়া উঠিতে পারিল না। তবে প্রায়শ্চিত্তের সাক্ষ্য পাওয়া যায় (শেষ দৃশ্যের) ঔরংজীবের শীর্ণ দেহে, কোটরগত চক্ষুতে এবং

শুষ্ক ও পাণ্ডুর মুখে—সর্বশেষে পিতার কাছে মার্জনা ভিক্ষায়। ঔরংজীব চরিত্রে গতি এখানেই শেষ।

[উপসংহারে একথা অবশ্যই বলিতে হইবে যে—ঔরংজীবের মধ্যকার নৈতিক সত্তাকে আমরা প্রথম দিকে একেবারেই পাই না এবং দারার দণ্ডাজ্ঞা দেওয়ার সময় উহার যৎসামান্যই প্রকাশ (প্রতিবাদ) দেখা যায়। বহু হত্যার প্রতিক্রিয়ার পরে উহার সক্রিয়তার নিদর্শন কিছুটা পাওয়া যায়—তবে তাহাও যথেষ্ট নহে। ঔরংজীব কারুণ্য উদ্রিক্ত করিতে পারেন না]।

দারা

দারা, পিতার শুধু জ্যেষ্ঠ পুত্রই নহেন, প্রিয় পুত্রও। তিনি সামান্য সাম্রাজ্যে প্রত্যাশী নহেন, উপনিষদ-দর্শনে বিরাট এক সাম্রাজ্য তিনি আবিষ্কার করিয়াছেন। "সমস্ত প্রজা, সৈন্য, দারার দিকে"—দারা সাজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র বলিয়াই নহে, দারার মধ্যে তাহারা নিশ্চয়ই এমন আন্তরিকতা পাইয়াছে যাহাতে—"দারার জন্য তারা বালকের মত কেঁদেছে।" সেই উদার দারাকে দেখিয়াই দিলদার বলিয়াছেন—"মহিমময় দৃশ্য! একটা পর্বত ভেঙ্গে রয়েছে, একটা সমুদ্র শুকিয়ে গিয়েছে, একটা সূর্য মলিন হয়ে গিয়েছে।"

দারা সাজাহানের হৃদয়টুকুর সুযোগ্য অধিকারী—সন্তান-বৎসলতায় এবং পত্নীপ্রেমে দারা সাজাহানের সহিত সুযোগ্য ভাবেই সমকক্ষতা করিতে পারেন। তবে সাজাহানের চেয়েও দারা এক বিষয়ে আগাইয়া গিয়াছেন—সাজাহান বন্দী অবস্থায় স্বাভাবিক মৃত্যুর মুখে পতিত হইয়াছেন—আর দারাকে বন্দী অবস্থায় হত্যা করা হইয়াছে। দারার শেষ জীবন অনির্বচনীয় ভাবে শোচনীয়!

সুজা

সোলেমানের মুখে আমরা শুনিতে পাই—"কাকা (সুজা) প্রকৃত যোদ্ধা।" পিয়ারা সুজাকে বলিয়াছেন—"বীর তুমি! সাম্রাজ্যের জন্য তুমি যদিও যুদ্ধ

না করতে, যুদ্ধ করবার জন্য তুমি যুদ্ধ করবে। তোমায় আমি বেশ চিনি—যুদ্ধের নামে তুমি নাচো।" কিন্তু এ কথা আমরা না বলিয়া পারি না যে সুজা অন্তঃপুর ও মন্ত্রণাগারকে এক করিয়া ফেলিয়াছেন, ফলে প্রকৃত যোদ্ধার গাম্ভীর্য রক্ষা করিতে পারেন নাই। অবশ্য একথাও বলিতে হইবে—যে স্বামী পত্নীগত প্রাণ এবং পিয়ারার মত প্রেমময়ীকে পত্নীরূপে লাভ করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে পত্নীর সহিত যুদ্ধ-মন্ত্রণা করা একেবারে অস্বাভাবিক নহে, অশোভনীয় নহে। সুজা কত বড় যোদ্ধা তাহা আমরা জানি না, কিন্তু প্রেমবীরত্বে সুজার মহত্ত্ব যে বিস্ময়কর এ বিষয়ে কোনও সন্দেহই থাকে না।

মোরাদ

এশিয়ার বিজ্ঞতম সুধী নিঃস্বার্থ—ওরফে দিলদার, মোরাদের চরিত্রের উপর যে আলোকপাত করিয়াছেন, তদপেক্ষা তীব্রতর আলোক আশা করা অন্যায়—সেই আলোকে আমরা দেখি "মোরাদ একদিকে যুদ্ধোন্মাদ, আর একদিকে সম্ভোগ মজ্জিত, মনোরাজ্য ওর কাছে একটা অনাবিষ্কৃত দেশ।" সুধী প্রবর মোরাদকে "মূর্খ" এবং "বর্বর" বলিতেও ইতস্তত করেন নাই। সত্যই, কেনই বা করিবেন? দিলদারের সূক্ষ্ম হাস্য পরিহাসকে মোরাদ অসংলগ্ন উক্তি মনে করিয়া হাসিয়া উড়ান—হস্তী-মূর্খ মোরাদ কোনও ইঙ্গিতই ধরিতে পারেন না। মস্তিষ্কের সম্পদের দিক দিয়া মোরাদ অতি দরিদ্র। তবে মস্তিষ্ক সম্পদের অভাবের ক্ষতি দৈহিক শক্তি ও মানসিক শৌর্য দ্বারা পূরণ করা হইয়াছে। ঔরংজীবের কথা যদি চাটুবাক্য না হয় তাহা হইলে মোরাদের শৌর্য "অদ্ভুত"। সাহস "অসাধারণ"। মৃত্যুকে মোরাদ একেবারেই ভয় করেন না।

সোলেমান

সোলেমান যোদ্ধা হিসাবে যে নগণ্য নহেন, তাহার বড় প্রমাণ—জয়সিংহের মত বিখ্যাত যোদ্ধার সহকর্মীরূপে সুজার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা।

রাজকুমারগণের পক্ষে অবশ্য ইহা কোনরূপ অসাধারণ ঘটনা নহে। সোলেমান পিতৃভক্ত—ইহার মধ্যেও অসাধারণত্ব বিশেষ নাই। কিন্তু এক বিষয়ে সোলেমান বাস্তবিকই অসাধারণ—সুন্দর ও যুবা হওয়া সত্ত্বেও ইন্দ্রিয়-সংযম তাঁহার আশ্চর্যকর। কাশ্মীরের প্রধানা নর্তকীর—রাজার প্রেয়সী গণিকার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিবার মত নৈতিক দৃঢ়তা ও আদর্শবাদ যাঁহার থাকে তাঁহাকে শুধু অসাধারণ বলিলেই যথেষ্ট বলা হয় না। মনে হয়—প্রেমের স্বরূপ উপলব্ধির ফলেই রূপজ মোহকে সোলেমান জয় করিতে সক্ষম হইয়াছেন—প্রাণসম্পদহীন শরীরকে উপেক্ষা করিবার শক্তি পাইয়াছেন। গণিকাকে 'মা' বলিয়া সম্বোধন করিয়া সোলেমান উচ্চ গ্রামের নৈতিক আদর্শবাদেরই পরিচয় দিয়াছেন—নারীর নিষ্কলঙ্ক রূপ তাহার মাতৃত্বকে প্রাপ্য সম্মান দিয়াছেন। সোলেমান সত্যই মহানুভব।

যে উচ্চকোটিক নৈতিক আদর্শবাদ থাকায় সোলেমান কামকে জয় করিয়াছেন, সেই আদর্শবাদেরই বিস্ময়কর অভিব্যক্তি দেখা যায় হত্যা-বিমুখতায়। জহরৎ ঔরংজীবকে গুলি করিতে উদ্যত হইলে সোলেমান তাহার হাত ধরিয়া ফেলিয়া বলিলেন "সে কি জহরৎ! ক্ষান্ত হও—হত্যার প্রতিশোধ হত্যা নয়। পাপে পুণ্যের প্রতিষ্ঠা হয় না। কিন্তু হত্যা—মহাপাপ।" সোলেমান এখানে দুর্নিরীক্ষ্য আদর্শলোকে পরিমণ্ডিত। সোলেমানের এই নৈতিক উচ্চ্রয়ে আকস্মিকতা আছে বটে, কিন্তু ইহা যে সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক এমন কথা জোর করিয়া বলিবার উপায় নাই, কারণ পূর্বেই দেখা গিয়াছে নীতি-নিষ্ঠায় সোলেমান অসাধারণ।

মহম্মদ

মহম্মদ চরিত্রের অবিস্মরণীয় আকর্ষণ তাঁহার অতুলনীয় পিতৃভক্তি। এই পিতৃভক্তিকে সাম্রাজ্যের, এমন কি পৃথিবী অধিকারের মোহিনী শক্তিও একটুও টলাইতে পারে নাই। সম্রাট সাজাহান কোরাণ স্পর্শ করিয়া শপথ করিয়া

বলিলেন—"আমায় মুক্ত করে দাও। তুমি ভারতের অধীশ্বর হবে।" মহম্মদ অবিচলিত কণ্ঠে শুধু মার্জনা ভিক্ষা করিলেন। সাজাহান মরিয়া হইয়া বলিলেন—"দেখ এক দিকে তোমার পিতার আজ্ঞা, আর একদিকে ভারতের সাম্রাজ্য—বেছে নাও এই মুহূর্তে।" মহম্মদ যাহা বাছিয়া লইলেন তাহাতে ভারতের সাম্রাজ্য হারাইলেন বটে, কিন্তু পিতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা দ্বারা আদর্শলোকে অক্ষয় প্রতিষ্ঠা অধিকার করিলেন। এই দিক দিয়া মহম্মদ দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ। মহম্মদের উক্তিটি—"আমি যদি পিতৃভক্ত না হতাম ত দিল্লীর সিংহাসনে আজ ঔরংজীব বসতো না, বসতো এই মহম্মদ"—এক বার নহে শত বার সত্য।

পিতৃভক্তি-নিষ্ঠাই মহম্মদের সবস্ব নহে। যে আদর্শবাদিতার এবং কর্তব্যের জন্য ভারত সাম্রাজ্যটা তিনি লোষ্ট্রখণ্ডের মত দূরে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন সেই আদর্শবাদিতারই প্রেরণায় তিনি পিতাকে বর্জন করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। পিতৃভক্তির আদর্শের উপরেও যে সনাতন ন্যায়ের আদর্শ আছে সে আদর্শের কাছে পিতা-মাতা-ভ্রাতা সব খর্ব হইয়া যায়, সেই সনাতন ন্যায়ের আদর্শও মহম্মদের মধ্যে বিলক্ষণ সক্রিয়। এই মহত্তর আদর্শের কাছে পারিবারিক আদর্শ হার মানিয়াছিল বলিয়াই মহম্মদ পিতাকে বলিতে পারিয়াছিলেন—"আপনি এই ভারত সাম্রাজ্য আজ পেয়েছেন বটে। কিন্তু তার চেয়েও বড় সাম্রাজ্য আজ হারালেন - আমার পিতৃভক্তি।"

পিতৃভক্তি দিয়া মহম্মদের মেরু-মজ্জা-প্রাণ গঠিত সত্য, কিন্তু মহম্মদের আত্মা হইল সনাতন ন্যায়নিষ্ঠা—আদর্শপরায়ণতা। পিতৃভক্তি হারাইয়া মহম্মদ নিঃস্বতার বেদনায় জর্জরিত হইয়াছিলেন—"আমার মত দরিদ্র কে।" বলিয়া অন্তর্দৈন্যে অবনত হইয়াও পড়িয়াছিলেন; কিন্তু সনাতন ন্যায়ের সাধক এবং বিবেকী মহম্মদ নিশ্চয়ই এই ক্ষতির বেদনার মধ্য দিয়াও তাঁহার উর্দ্ধতন সত্তায় পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন। আদর্শের জন্য, ধর্মের জন্য আত্মত্যাগ করিয়া মহম্মদ অক্ষয় মহিমার অধিকারী হইয়াছেন—এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

দিলদার

এশিয়ার বিজ্ঞতম সুধী নিয়ামৎ খাঁ হাজী রাজনীতি শিক্ষা করিবার জন্য দিলদারের ছদ্মনামে মোরাদের বিদূষক পদ প্রথমে গ্রহণ করেন। যখনই তিনি হাস্য পরিহাস করিতে গিয়াছেন তখনই তাহা ব্যঙ্গের ধূম হইয়া উঠিয়াছে। মোরাদ মূর্খ—মোরাদের কাছে 'মনোরাজ্য অনাবিষ্কৃত দেশ—ইহা ভালভাবে জানিয়াও সুধীপ্রধান নিয়ামৎ মোরাদের সহিত এমন ভাবে কথাবার্তা বলিতে পারেন নাই, যাহাতে মোরাদ নিজেকে সতর্ক করিতে পারেন। মোরাদের জন্য তাঁহার মাঝে মাঝে দুঃখ হইয়াছে, কিন্তু তাহা দুঃখের বিলাস মাত্রই! মোরাদের পক্ষ হইতে বলা যায় যে দিলদার 'দল'-এর কোনও পরিচয় দেন নাই। দিলদারের জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায় আরম্ভ ঔরংজীবের পারিষদ-পদ প্রাপ্তিতে। ঔরংজীবকে দিলদার সেলাম করিয়া "[illegible]" বলিতে ইতস্ততঃ করেন নাই ("আপনার শাঠ্যের রাজ্যেই বাস।") তবে দিলদার নিজেও বেশ খানিকটা ফলিত রাজনীতির চর্চা আরম্ভ করিলেন—যন্ত্র কৌশলে মহম্মদকে ভাগাইয়া আনিবার ষড়যন্ত্রে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিলেন।

কিন্তু দিলদার এশিয়ার বিজ্ঞতম সুধী হইলেও তাঁহার অন্তরতম প্রদেশে একটা দুঃসহ নিঃসঙ্গতা বাস করিত এবং এই নিঃসঙ্গ ও নিরাশ্রয় ব্যক্তিটি মৃত্যুর সুযোগ খুঁজিয়া ফিরিতেছিল—মরিতে সে বড় ভালবাসিত, মরণে তাঁহার বড় আনন্দ! কারাগার-আবদ্ধ দারার সহিত বেশ পরিবর্তন করিয়া মরণের সুযোগ করিয়া লইতে তাই দিলদার দারার কাছে উপস্থিত হইলেন। বিনা প্রয়োজনে দারার সহিত একবার দেখা করিতে আসিলেন। দারার দুরবস্থা দেখিয়া দিলদার চোখের জল সামলাইতে পারিলেন না—মরিবার এমন সুযোগ হাতছাড়া করিতে দিলদার একান্তই অনিচ্ছুক—শাহাজাদা দারার 'পদধারণ' করিয়া মৃত্যুর সুযোগ ভিক্ষা করিলেন। দারা সুযোগ দিলেন না—নিজেই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিলেন।

দিলদার ঔরংজীবকে নিজের বিবেকের সহিত মুখোমুখি করিয়া দিয়া আত্মপ্রকাশ করিলেন। বিদায় ঘোষণায় বিজ্ঞতম সুধী নিয়ামৎ খাঁ হাজী ঐশ্বর্যের মস্তকে পদাঘাত করিলেন। ঔরংজীবের কাতর আবেদনও তাঁহাকে ফিরাইতে পারিল না। দিলদার-চরিত্রে ব্যক্তের সহজ গতি অপেক্ষা অব্যক্তের অপথ্য-ক্রিয়াই বিলক্ষণ হইয়া উঠিয়াছে। দিলদার তাই—অস্পষ্ট—রহস্যাচ্ছন্ন।

জয়সিংহ

জয়সিংহ ভাগ্যের আকাশের তারা দেখিয়া কর্তব্যের গতি-পথ স্থির করেন—এ বিষয়ে তাঁহার কোন নৈতিক আদর্শ নাই। ভাগ্যের আকাশে ঔরংজীবের তারা উঠিতে দেখিয়া তিনি দারার পক্ষ ত্যাগ করিয়া ঔরংজীবের পক্ষ অবলম্বন করেন। এ বিষয়ে তিনি নির্মম—চোখের জল বা নতজানু তাঁহাকে একটুও টলাইতে পারে না। তাঁহার নিজেরই স্বীকৃতি—"আমি কোন উচ্চ প্রবৃত্তির ভাণ করি না। সংসার আমার কাছে একটা হাট। যেখানে কম দামে বেশী পাবো, সেখানেই যাবো।" বাস্তবিক জয়সিংহের মধ্যে কোনও উচ্চ প্রবৃত্তি দেখা যায় না। সঙ্কীর্ণ স্বার্থপরতার গণ্ডীর মধ্যেই তাঁহার বাস। স্বজাতি-প্রীতি তাঁহার নাই বলিলেই চলে।

জয়সিংহ এতবড হীন স্বার্থান্বেষী লোক যে স্বজাতির অভ্যুদয়ের বিনিময়ে হীন স্বার্থ ক্রয় করিতেও ইতস্ততঃ করেন নাই। এই নীচাশয়তারই নিম্নতর সোপানে দাঁড়াইয়া বলিয়াছেন—"ঔরংজীবের প্রভুত্ব মান্‌তে পারি, কিন্তু রাজসিংহের প্রভুত্ব স্বীকার করতে পারি না।" জয়সিংহ শৌর্যেই রাজপুত, ঔদার্যে অতি ছোট।

যশোবন্ত সিংহ

যশোবন্ত সিংহ সম্বন্ধে খোদ ঔরংজীব যে বলিয়াছেন—"কি অসমসাহসিক এই মহারাজ যশোবন্ত সিংহ!"—খুব অল্পে বলেন নাই। যশোবন্তকে

নাড়া দিতে যাইয়া দেখিয়াছেন যে যশোবন্ত সিংহ "জাহাপনার রক্তবর্ণ চক্ষু আর অগ্নিময় গোলাকে সমানই তুচ্ছ জ্ঞান করে।" ঔরংজীব বলিতে বাধ্য হইয়াছেন—"পূর্বে শুনেছিলাম, এখন দেখছি—আপনি নির্ভীক।" সত্যই—"যশোবন্ত সিংহ কাউকে ভয় করে না।"

এই নির্ভীকতা অন্য বিষয়েও যে নাই এমন নহে। বিশ্বাসকে আঘাত করিতেও তিনি ভয় পান নাই। দারার পক্ষ ত্যাগ করিয়া তিনি যে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিলেন তাঁহার ধর্মপত্নী মহামায়া তাহা ক্ষমা করিতে পারেন নাই—দুর্গদ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া তিনি স্বামীকে ধিক্কার দিয়াছিলেন। আর একবারই তিনি বিশ্বাসহন্তা হন নাই। দারাকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়াও, শেষ পর্যন্ত গুর্জর প্রদেশ পাইয়া, দারার সহিত কৃতঘ্নতা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। তাঁহার স্ত্রীর কথায়—"দারাকে আশা দিয়ে শেষে কাপুরুষের মত সরে" দাঁড়াইলেন। এই যুদ্ধ-পরাজিত, বিশ্বাসঘাতক এবং কৃতঘ্ন যশোবন্তকে মহামায়া ভক্তি করিতে পারেন নাই। এ কথা বলিতেই হইবে যে—যশোবন্তের অসম সাহস, কিন্তু আত্মসম্মানজ্ঞান তেমন প্রখর নহে। তবে এ কথাও না বলিয়া উপায় নাই যে, যশোবন্তের মধ্যে রাজপুত-অভিমানের ভগ্নাবশেষ তবু পাওয়া যায়, জয়সিংহের মধ্যে সেটুকুও নাই।

স্বজাতির প্রতিষ্ঠার কামনা, দেশের মুক্তির কল্পনা—তবুও তাঁহার মধ্যে উঁকি মারে। রাণা রাজসিংহের অধীনতা স্বীকার করিয়া যশোবন্ত হিন্দুসাম্রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিবার কল্পনাও করেন। কিন্তু সবই সাময়িক। জড়তায় সব কামনা, সব কল্পনা আচ্ছন্ন হইয়া যায়। আনুগত্যের আত্মনিবেদন আবার মুখর হইয়া পড়ে।

পিয়ারা

পিয়ারা 'এক হাস্যের ফোয়ারা—একটা অর্থশূন্য বাক্যের নদী।' কিন্তু কেন? পিয়ারা চরিত্র এই 'কেন'টিরই ক্রম-আবিষ্কার। সুজা জানেন,

বলেনও—"এই রকম করে সে আমাকে যুদ্ধের চিন্তা থেকে ভুলিয়ে রাখে।" পিয়ারাও বলেন—"আমি যত তোমায় ভুলিয়ে রাখতে চাই—তুমি ততই শিখ্‌পা তোলো।" পিয়ারা আপন মনে গান গান—হাস্য পরিহাসে গা ভাসাইয়া চলেন; কারণ, পিয়ারা মর্মে মর্ম বুঝিয়াছেন যে স্বামীর উদ্ধারের আর কোন উপায় নাই এবং বুঝিয়াই উদ্ধারের কোন চেষ্টাই আর করেন না। ইহা তাঁহার অভিমান নহে। ইহ ঐকান্তিক প্রেমের অকুণ্ঠ আত্মসমর্পণেরই পরিণ। পিয়ারা যে "কঠিন ঘটনার রাস্তা একবার ভুলেও এসে" নামিতে চাহে না, তার কারণ এ নহে যে পিয়ারা নির্মম মমতার আলিঙ্গনে স্বামীকে যতই তিনি নিবড়ভাবে আবদ্ধ করিয়াছেন, ততই তিনি স্বামীকে প্রফুল্ল রাখিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন। এই প্রাণপণ চেষ্টাই হাস্য-পরিহাসে ছড়াইয়া পড়িয়াছে—পিয়ারাকে 'হাস্যের ফোয়ারা'তে ও 'অর্থশূন্য বাক্যের নদী'তে পরিণত করিয়াছে। স্বামীর মর্মদাহ যখন তাঁহার মর্মকে পুড়াইয়া খাক্ করিয়া দেয়, তখনই পিয়ারা মর্মের ক্রন্দনকে—চোখের জলকে মুখের হাসি দিয়া ঢাকিতে চেষ্টা করেন অর্থহারা পরিহাসের দ্বারা হাহাকারকে চাপিয়া ধরিতে চেষ্টা করেন। এই কারণেই পিয়ারা দুর্বোধ্য, তাঁহার চরিত্র-গতি দুর্নিরীক্ষ্য।

পিয়ারার কথা যত লঘু, চরিত্র ততই গুরু পিয়ারার আপাত-বাস্তব-বিমুখতা শেষ পর্যন্ত কঠিন মর্যাদাবোধের পিছনে পড়িয়া যায়। পিয়ারা স্বামীকে বলেন—"এই চল্লিশ জন অশ্বারোহী নিয়েই এই রাজ্য আক্রমণ কর, ক'রে বীরের মত মর। আমি তোমার পাশে দাঁড়িয়ে মরব। আর পুত্র কন্যারা—তারা নিজের মর্যাদা নিজে রক্ষা করবে আশা করি!" মহামায়ার অত্যন্ত বীরাঙ্গনাত্বের পাশে পিয়ারার এই দৃপ্ত তেজস্বিতা হীনপ্রভ হইবে বলিয়া মনে হয় না। পিয়ারা মনে করাইয়া দেয় 'কুসুমের চেয়েও কোমল বজ্রের চেয়েও কঠোর' -প্রবাদটিকে! পিয়ারা প্রেমময়ী—পিয়ারা গীতিময়ী—পিয়ারা পরিহাসময়ী; কিন্তু পিয়ারা প্রয়োজন হইলে তেজোময়ীও হইতে

পারেন। মৃত্যুকে হাসিমুখে বরণ করিয়া যাহারা অমর হইয়াছে, পিয়ারা তাহাদের কাহারও অপেক্ষা হীন নহেন।

নাদিরা

নাদিরা সেই চিরন্তনী সেবাপরায়ণ "লক্ষ্মী সে কল্যাণী" নারী—সীতা সাবিত্রী দময়ন্তীরই সহোদরা ভগিনী। এই নারীই স্বামীকে বলে—"নাথ! তোমার দুঃখের সঙ্গিনী হওয়াই আমার পরম গৌরব।" এই গৌরবের স্মৃতি লইয়া পরলোকে যাইতে পারিলে ইহারা জীবন সার্থক মনে করে। স্বামীর কাছে থাকিলে—মৃত্যুর নিদারুণ যন্ত্রণাও স্বামীর স্নেহ দৃষ্টির অমৃতে গলিয়া যায়। এই নারীই, শুধু বক্ষের স্তন্য দ্বারাই সন্তানকে বাঁচায় না—বক্ষের রক্ত দিয়াও বাঁচাইতে চেষ্টা করে।

জাহানারা

জাহানারার প্রকৃতি শক্তি-সাধনার অভিমুখী, তাই কোন অবস্থাতেই শক্তির অবমাননা তাঁহার ধাতে সহে নাই। পিতা সন্তানকে স্নেহে বশ করিতে চাহেন- জাহানারা তাহাতে দুর্বলতা ছাড়া আর কিছুই দেখেন নাই সাজাহানের স্নেহ দৌর্বল্যকে যেমন তিনি অবিচলিত চিত্তে গ্রহণ করিতে পারেন নাই, তেমনি তাঁহার নিরুপায় হা-হুতাশকেও সহজভাবে মানিয়া লইতে পারেন নাই—বাবাকে বলিয়াছেন—"বাবা, এই কারাগারের কোণে বসে' অসহায় শিশুর মত ক্রন্দন করলে কিছু হবে না; পদাহত পশুর মত বসে' দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করে অভিশাপ দিলে কিছু হবে না; পাপী মুমূর্ষুর মত অন্তিমে একবার ঈশ্বরকে 'দয়াময়' বলে ডাকলে কিছু হবে না। উঠুন, দলিত ভুজঙ্গমের মত ফণা বিস্তার ক'রে উঠুন; হৃতশাবা ব্যাঘ্রীর মত প্রমত্ত বিক্রমে গর্জ্জে উঠুন, অত্যাচারে সিন্ধু জাতির মত জেগে উঠুন।' পিতাকে মুক্ত করিবার জন্য জাহানারা অনুনয় বিনয় করেন নাই—কাতর প্রার্থনাও

জানান নাই। দিল্লীর দরবারে উপস্থিত হইয়া মুখোমুখি দাঁড়াইয়া ঔরংজীবকে ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন—আমীর ওমরাহদের ঔরংজীবের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। বাক্‌শক্তির প্রশংসনীয় ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও জাহানারা ঔরংজীবের সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারেন নাই—তাঁহার ভণ্ডামির ব্যূহ ভেদ করিতে সক্ষম হন নাই, কিন্তু তবু, যে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা তেজস্বিনী বীরাঙ্গনাদের পক্ষেই সম্ভব। জাহানারা শুধু তেজস্বিনীই নহেন—মনস্বিনীও। দিল্লীর দরবার-কক্ষে তাঁহার তেজস্বিতা ও মনস্বিতার বিস্ময়কর নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে।

দিগ্বিজয়ী

নট-নাট্যকার যোগেশ চৌধুরী

নট-খ্যাতি এবং নাট্যকার খ্যাতি একাধারে দুর্লভ সমাবেশ, উভয়ের প্রতি—স্পর্দ্ধা আরো দুর্লভ এবং দুইটিই যেখানে সমান প্রতিদ্বন্দ্বী সেখানে তো সোনায় সোহাগা। দুর্লভ সমাবেশের দৃষ্টান্ত হিসাবে আমরা, অল্পের মধ্যে, আমাদের গিরিশচন্দ্রের নাম করিতে পারি। তাঁহার নাম করিতেই বোধ হয় এই প্রশ্নই বড় আকারে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায়—নট-গিরিশ বড়, না নাট্যকার-গিরিশ বড়? বলা বাহুল্য এ প্রশ্নের নির্ভুল উত্তর দেওয়া খুব সহজসাধ্য নহে। প্রতিভাসম্পন্ন প্রত্যেক নট-নাট্যকার সম্পর্কেই এইপ্রশ্ন বা সমস্যা কম-বেশী আছে। নট-নাট্যকার যোগেশচন্দ্র সম্পর্কেও এই প্রশ্ন স্বাভাবিক সুতরাং প্রাথমিকও বটে।

যোগেশচন্দ্র শক্তিমান নট এবং নাট্যকার এ কথাটি বলার সঙ্গে সঙ্গে এই কথাটিও বলা দরকার যে নাট্যকার-যোগেশচন্দ্র অপেক্ষা নট-যোগেশচন্দ্র অধিকতর সুখ্যাত। 'যোগেশ চৌধুরী' এই নামটি কানে পৌঁছিতেই দশের মনে প্রথমেই যিনি উপস্থিত হন তিনি "নট-যোগেশচন্দ্র"—বিশেষতঃ অতি স্বাভাবিক—অভিনয়ে-দক্ষ অভিনয় অভিমান—শূন্য, প্রথমশ্রেণীর অভিনেতা যোগেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়, এবং পরে আসেন বহু-অভিনীত 'সীতা' প্রভৃতি নাটকের নাট্যকার যোগেশচন্দ্র। যোগেশচন্দ্রে নট ও নাট্যকারের প্রতিদ্বন্দ্বিতায়, নাট্যকার অপেক্ষা নটেরই জয় অধিক ঘোষিত হইয়াছে। সংক্ষেপে বলা যায় নাট্যকার অপেক্ষা নটের খ্যাতি অধিক।

এই নট যোগেশচন্দ্র সম্পর্কে জনৈক নাট্যরসিক সমালোচক যাহা লিখিয়াছেন তাহা স্মরণীয়। তিনি লিখিয়াছেন—"যোগেশবাবু, মনোরঞ্জনবাবু এবং প্রভা তিনজনেই অল্পবিস্তর শিশিরবাবুর শিক্ষাধারায় প্রভাবান্বিত।

যোগেশবাবু সকলকে অতিক্রম করিয়া একেবারে স্বাভাবিক অভিনয়ের ধারায় আসিয়া পড়িয়াছেন। সামাজিক নাটকে এইরূপ স্বাভাবিক অভিনয়ই ছিল গিরিশচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য। যোগেশবাবুর যদি অন্ততঃ অপরেশবাবুর মতও জলদ-গম্ভীর স্বর থাকিত, তবে সামাজিক নাটকে দানীবাবুর পরেই তাঁহার নাম সোল্লাসে ঘোষিত হইত" (ভারতীয় নাট্যমঞ্চ)। সামাজিক নাটকে দানীবাবুর পরে যাঁহার নামই সোল্লাসে ঘোষিত হউক, শিশিরবাবুকে সম্মুখে রাখিয়াও বলা যাইতে পারে যে স্বাভাবিক অভিনয়-রীতি যোগেশচন্দ্রের মধ্যে পূর্ণতর সম্ভাবনার স্তরে প্রবেশ করিয়াছে। একথা অবশ্য স্বীকার্য যে শিশিরকুমারের অভিনয়ে নাটকীয়তার সহিত স্বাভাবিকতার এক চমৎকার সমন্বয় ঘটিয়াছে—বিশেষতঃ শিশিরকুমার যেন স্বাভাবিকতাকে নাটকীয়তার সহিত অন্তরঙ্গভাবে মিলাইয়া দিয়াছেন, কিন্তু একথাও সত্য শিশিরকুমারের অভিনয় একেবারে নাটকীয়তা—মুক্ত নয়, তাঁহার আঙ্গিক ও বাচনিক অভিনয়ে আভিনয়িকতার ছাপ সুস্পষ্ট। অন্যপক্ষে যোগেশচন্দ্র নাটকীয়তাকে স্বাভাবিকতার স্তরে নামাইয়া আনিয়াছেন; তাহাতে নাটকীয়তা ও স্বাভাবিকতা এমনভাবে মিশিয়া গিয়াছে যে যোগেশচন্দ্রের অভিনয় যেন নাটকীয়তাকে শুষিয়া লইয়া শুধু স্বাভাবিকতাকেই প্রতিফলিত করিতে থাকে। নাটক ও জীবনের ব্যবধান যোগেশচন্দ্রের অভিনয়ে প্রায় লোপ পাইয়াই গিয়াছে। স্বাভাবিক অভিনয়ে যোগেশচন্দ্র আরো এক ধাপ অগ্রসর যোগেশচন্দ্র এখানে 'সহজিয়া'।

এই নাট্য-রসিকতা যোগেশচন্দ্রের জীবনে আগন্তুক কোন ব্যাপার নহে। যোগেশচন্দ্রের পরিবেশ এবং সেই পরিবেশের সহিত তাঁহার যোগাযোগ বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলেই আমরা নাট্যরসিকতার ইতিহাস এবং সঙ্গে সঙ্গে যোগেশচন্দ্রের নাট্যকার-মানসের গঠনটিও মোটামুটি ধরিতে পারিব।

বংশ পরিচয়

'রূপমঞ্চ' পত্রিকায় ১৩৫৫-৫৬ চৈত্র-বৈশাখ সংখ্যায় যোগেশচন্দ্রের ভ্রাতা "শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থের সক্রিয় সহযোগিতায়

সংগৃহীত" তথ্য হইতে জানা যায়—"২৪ পরগণার বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত 'চারঘাট' নামক একটি গণ্ডগ্রামে আজ হইতে প্রায় ষাট বৎসর পূর্বে যোগেশচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা স্বর্গীয় বিরাজমোহন চৌধুরী, মাতা স্বর্গীয়া বীরেশ্বরী দেবী।" অতি শৈশবে পিতৃহীন হইলেও, পিতার প্রতিভা-সত্তাটি, মনে হয়, তাঁহার সম্মুখেই ছিল। পিতা বিরাজমোহন ছাত্রজীবনে শুধু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ খ্যাতনামাদের সান্নিধ্য ও সহযোগিতাই লাভ করেন নাই, ঈশ্বরচন্দ্রের প্রভাবে তিনি "বঙ্গ-বিধবা" নামক একখানি নাটিকাও রচনা করিয়াছিলেন এবং বন্ধু-বান্ধবে মিলিয়া বহরমপুরে অভিনয়ও করিয়াছিলেন। যোগেশচন্দ্রের নাট্যরসিকতা এই হিসাবে একরকম পৈতৃকই বলা যাইতে পারে। অভিনয়-রসের আস্বাদ তিনি কৈশোরেই পাইয়াছিলেন। জানা যায়—"যোগেশচন্দ্র যখন নবম শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন, তখন তাঁহার রচিত "সীতার বনবাস" নামক একখানি ক্ষুদ্র নাটিকা তাঁহার জননী ক্রোধে টুক্রা টুক্রা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছিলেন। যোগেশচন্দ্রের ভগিনীপতির চেষ্টায় গ্রামে ইতর ভদ্র মিলিয়া একটি যাত্রার দল গড়িয়া তুলিয়াছিল। যোগেশচন্দ্র যখন প্রবেশিকার ছাত্র, তখন হইতেই তিনি ইহার প্রতি অনুরাগী হইয়াছিলেন। কয়েকবার এই দলে তিনি তাঁহার ভগিনীপতির আগ্রহে অতি প্রশংসিতভাবে "জনার" চরিত্র অভিনয় করেন।" নট-নাট্যকারের পত্তন এখানেই।

শিক্ষা-দীক্ষা

গ্রাম্য পাঠশালার পাঠ শেষ করিয়া তিনি "টাকীর নিকটবর্তী বেগুনটি গ্রামে তাঁহার এক পিসিমাতার গৃহে অবস্থান করিয়া টাকী গভর্ণমেণ্ট স্কুলে অধ্যয়ন করেন।"—(প্রফুল্ল বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত "যোগেশচন্দ্র")।

১৯০৮ সালে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। কলিকাতায় আসিয়া বা থাকিয়া কলেজীয় শিক্ষা গ্রহণ করিবার মত তাঁহাদের আর্থিক সঙ্গতি ছিল না বটে, কিন্তু যাহা থাকিলে আর্থিক অসঙ্গতির বাধা অতিক্রম করা

যায় যোগেশচন্দ্রের তাহাই ছিল প্রচুর—ছিল অসাধারণ শিক্ষানুরাগ ও অধ্যবসায়। "নিজের চেষ্টায় কলিকাতায় আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করিয়া মেট্রোপলিটান কলেজে এফ. এ. পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকেন"—(সুরেশচন্দ্র)। কিন্তু, সাহিত্যের কামড়ই শুধু কচ্ছপের কামড় নহে, ব্যাঙক-মাত্রই কচ্ছপের কামড়—একবার ধরিলে সহসা ছাড়িতে চাহে না। যোগেশ-চন্দ্রের ছিল—নাট্য-বাতিক। "তখন বাংলার রঙ্গমঞ্চ একদিকে গিরিশচন্দ্রের ও অন্য দিকে দ্বিজেন্দ্রলাল—এই দুই মহারথীর প্রতিভায় দীপ্যমান।...ইহাদিগের সহিত [illegible] প্রতি রবিবারেই পড়াশুনার ক্ষতি করিয়াও তাঁহাদিগের সান্নিধ্যে কাটাইতেন। এজন্য গিরিশ পরিবারের সহিত তাঁহার পরবর্তী জীবনে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ঘটে" (সুরেশচন্দ্র)"। কিন্তু রঙ্গমঞ্চের সহিত ঘনিষ্ঠতা করিতে যাইয়া যোগেশচন্দ্র পরীক্ষা-পাশের দিক হইতে একটু দূরে সরিয়া গেলেন—এফ. এ. পরীক্ষায় অকৃতকার্য হইলেন এবং তখন—"সাংসারিক অসচ্ছলতার জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটান বিদ্যালয়ের বড়বাজার শাখায় শিক্ষকরূপে যোগদান করেন" (সুরেশচন্দ্র)।

শিক্ষক যোগেশচন্দ্রের নাট্য-রচনা

তবে কচ্ছপ ঠিক কামড়াইয়া ধরিয়াছিল, নাট্যরচনার ঝোঁক সমানই ছিল। "স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলালের অনুসরণে বাঙালীর নিদ্রাগত জাতীয়তাকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য যোগেশচন্দ্র "রাজস্থান" হইতে গল্পাংশ সংগ্রহ করিয়া কয়েকখানি নাটক রচনা করেন। আশা ছিল তাঁহার এই রচনাগুলি দ্বিজেন্দ্রবাবুর প্রভাবেই বাংলার রঙ্গমঞ্চে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারিবে। কিন্তু সে আশা তাঁহার সফল হয় নাই" (সুরেশচন্দ্র)।

তবে আশা ছাড়িবার পাত্র তিনি ছিলেন না। শরীর পাত করিয়াও তিনি মন্ত্রের সাধন করিতেছিলেন। তাঁহার নাট্যরচনার বিরাম ছিল না।

প্রবন্ধকার

ইতিমধ্যে যোগেশচন্দ্র গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটকের উপর প্রবন্ধ লিখিয়া "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ" হইতে শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধের জন্য স্বর্ণপদক লাভ করেন এবং 'বসিরহাট সাহিত্য সম্মেলন' হইতে সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধ লিখিয়া শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করিয়া, একশত টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হন। এইভাবে প্রবন্ধকার-খ্যাতি লাভ করিয়া, যোগেশচন্দ্র "তত্ত্ববোধিনী"-পত্রিকা গোষ্ঠীর সহিত পরিচিত হইলেন এবং "তত্ত্ববোধিনী" পত্রিকায় বহুদিন ধরিয়া যোগেশচন্দ্রের সাহিত্য-বিষয়ক নানা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।"

"এই সময় যোগেশচন্দ্র তাঁহার পুরাতন কর্মক্ষেত্র "মেট্রোপলিটান স্কুল" পরিত্যাগ করিয়া কর্পোরেশন ষ্ট্রীট হতে বর্তমান সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রোডে 'ওরিয়েন্টাল ট্রেনিং একাডেমিতে' বাংলা ভাষার প্রধান শিক্ষকের পদে যোগদান করেন। (সুরেশচন্দ্র)। এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন—তাঁহার অভিন্নহৃদয় বন্ধু শ্রীনগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। উভয়ে দীর্ঘকাল এক কক্ষে একত্র বাস করিয়াছিলেন। এবং একে অন্যের প্রেরণা-স্বরূপ ছিলেন। আগুনের পক্ষে যেমন বাতাস, লেখকের পক্ষে তেমনি সমঝদার শ্রোতা এবং উৎসাহদাতা। নগেন্দ্রনাথ যোগেশচন্দ্রের প্রতিভা-আগুনে উৎসাহ বাতাস অবিরাম যোগাইতেন।

"এইখানে থাকিয়াই তিনি তাঁহার শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক নাটক **"নাদিরসাহ"** রচনা করেন।

অসহযোগ আন্দোলন

কিন্তু সংসার তাহার কর আদায় করিবেই একচক্ষু হরিণ কখনই নিষ্কৃতি পায় নাই। পরিবার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দারিদ্র্যের চাপ যোগেশচন্দ্রের জীবনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিতে লাগিল—নৈরাশ্য ও অবসাদ যোগেশচন্দ্রের মনকে আষ্টেপৃষ্ঠে ঘিরিয়া ধরিল।

যোগেশচন্দ্র শিক্ষকতার বদলে জমিদারী সেরেস্তার কর্মচারীর শান্তিময় জীবন খুঁজিতেছিলেন। প্রাণের আগুন কি অত সামান্য শান্তিবারিতে শান্ত হয়? অসহযোগ আন্দোলনের ঢেউ আসিতেই যোগেশচন্দ্র তাহাতে ঝাঁপ দিলেন। "সংসারী যোগেশচন্দ্র অকস্মাৎ দুঃসাহসী বীরের মত চাকুরির পত্রচ্ছায়া পদদলিত করিয়া বৈচিত্র্যের আশায় অসহযোগী হইয়া সহর ছাড়িয়া তাঁহার জন্মভূমিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানে আসিয়া তিনি একদল মুসলমান কারিগরের সহায়তায় মোটা সূতার দেশী কাপড় তৈয়ারী করিতে মাতিয়া উঠিলেন।" বস্তুতঃ এই অসহযোগ তো শুধু ব্রিটিশের সহিত অসহযোগে সীমাবদ্ধ থাকিল না, সংসারেরও সহিত অসহযোগ হইয়া উঠিল। দারিদ্র্যের ক্লেশ অসহ্য ও শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইল। নাট্য রসিকের প্রাণ সুতা কাটিয়া বা বেচিয়া তৃপ্ত পাইবে —এ আশাই অন্যায়।

অধ্যাপক শিশির ভাদুড়ী মহাশয়ের আনুকূল্য

এই বিপন্ন প্রতিভাকে প্রকৃতিস্থ করিতে যিনি অগ্রসর হইলেন তিনি নিজেও অসাধারণ নট-প্রতিভার অধিকারী অধ্যাপক শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী এম, এ মহাশয়। কোন এক দূর আত্মীয়ের (সুধাবাবুর) গৃহে দুইজনের পরিচয় হইয়াছিল। অধ্যাপক থাকাকালেই শিশিরবাবু যোগেশচন্দ্রের নিজের মুখেই 'নাদিরসাহ' নাটকখানি শুনিয়াছিলেন এবং বোধ হয় তখনই যোগেশচন্দ্রের মধ্যে এক নট-নাট্যকারের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া প্রীত হইয়াছিলেন। তারপর ১৯২১ সালে—বেঙ্গল থিয়েট্রিকাল কোম্পানী'র (ম্যাডান থিয়েটার কোম্পানী'র বাঙ্গলা শাখা) মঞ্চে, ১০ই ডিসেম্বর নাট্য-রসিক শিশিরবাবু আলমগীরের ভূমিকায় প্রথম অবতীর্ণ হইয়া যে নবযুগের সূচনা করিলেন তাহারই উদার আকাশে যোগেশচন্দ্রের প্রতিভা আত্মবিকাশের সুযোগ লাভ করিল। শিশিরবাবু ম্যাডান কোম্পানী'র সহিত সম্পর্ক বেশী দিন রাখিতে পারেন নাই। ফলে "শিশিরকুমার তখন ম্যাডান কোম্পানীর চাকুরী ছাড়িয়া দিয়া তাজমহল

ফিল্ম কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা করিতে উদ্‌বুক্ত হইয়াছেন। এই সুযোগে খদ্দরের ব্যবসায়ে বিপন্ন যোগেশচন্দ্রকে তাঁহার পল্লীগৃহ হইতে আপনার পার্শ্বে আনয়ন করেন।"

'সীতা' নাটকের রচনা ও অভিনয়

যোগেশচন্দ্রের নট-জীবনে প্রথম পদক্ষেপ—শরৎচন্দ্রের "আঁধারে আলো"র নির্বাকচিত্রে দেওয়ানের একটি ক্ষুদ্র ভূমিকায়। তারপর যোগেশচন্দ্র রঙ্গমঞ্চের পাদপ্রদীপের সম্মুখে দাঁড়ান নাই। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে বড়দিনের প্রদর্শনীতে (ইডেন গার্ডেনে) শিশির ভাদুড়ী পরিচালিত দ্বিজেন্দ্রলালের "সীতা" অভিনয়ে তিনি অংশ গ্রহণ করেন নাই বটে, কিন্তু তিনি শিশির সম্প্রদায়ের একজন হিসাবে সঙ্গে সঙ্গেই ছিলেন। কে জানিত তখন যে এই 'সীতা'র পাশেই, শেষ পর্যন্ত তাঁহাকেই "সীতা" মূর্তি নির্মাণ করিয়া স্থাপনা করিতে হইবে। ঘটনা এমনি একটি ধারা ধরিয়াই অগ্রসর হইল। শিশিরবাবু মনোমোহন পাঁড়ের নিকট হইতে মনোমোহন থিয়েটার বাড়ী ভাড়া লইয়া 'মনোমোহন নাট্যমন্দিরে'র প্রতিষ্ঠা করিলেন। শেষে ও প্রযোজক শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী মহাশয় দ্বিজেন্দ্রলালের 'সীতা' লইয়া দর্শকদিগকে অভিবাদন করিতে সঙ্কল্পিত ছিলেন, কিন্তু প্রতিপক্ষের বাধায় সঙ্কল্পের পরিবর্তন করিতে হইল। নাট্যকার যোগেশচন্দ্রের স্বর্ণ সুযোগ বা পরীক্ষা উপস্থিত হইল। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই [সুরেশচন্দ্র বলেন ৭ দিনের মধ্যে, প্রফুল্ল বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন ১৫ দিনের মধ্যে] যোগেশচন্দ্রকে "সীতা" নাটক রচনা করিতে হইল। ৬ই আগষ্ট মনোমোহন নাট্যমন্দিরে সীতা অভিনীত হইল। শিশিরবাবুর "রাম"-এর ভূমিকায় অভিনয় যত স্মরণীয় হইল, তত সুখ্যাত হইলেন—সীতা নাটকের নাট্যকার যোগেশচন্দ্র চৌধুরী। বাঙ্গালীর কাছে সেইদিন হইতেই যোগেশ-চন্দ্রের অন্যতম পরিচয়—'সীতা'র নাট্যকার। সীতা নাটক আজও বাঙলা রঙ্গমঞ্চের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ—(বিশেষতঃ শিশিরবাবু যখন রামের ভূমিকায়)।

"সীতা'র সহিত বাঙলা রঙ্গমঞ্চের অনেক গৌরব-স্মৃতি যুক্ত হইয়া আছে— আসল 'সীতা'র পাতাল প্রবেশ এক অর্থে দুর্ভাগ্যেরই বিষয়, কিন্তু "সীতা"র আমেরিকার 'নিউইয়র্ক' মহানগরীতে আমন্ত্রণ ও পরিবেষণ (পাতাল প্রবেশ) এক মহাগৌরবের নিদর্শন। অন্য কোন সীতার বা নাটকের ভাগ্যে এ সৌভাগ্য ঘটে নাই। * [নাট্যকার শম্বুকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন]।

সীতার অভিনয় দীর্ঘকাল ধরিয়া চলিয়াছিল—অভিনয়ের তারিখ ৮ই আগষ্ট ১৯২৪ হইতে পরবর্তী নাটকের অভিনয় তারিখ- ১০ই ডিসেম্বর পর্যন্ত ৪ মাসের ব্যবধান। "সীতা"র পরে ধরা হইল দ্বিজেন্দ্রলালের "পাষাণী"। ১৯২৫ মনোমোহন নাট্যমন্দিরে নূতন নাটক অভিনীত হয়—"জনা" (৩রা জুন) * [বিদূষকের ভূমিকায় যোগেশচন্দ্র] এবং পুণ্ডরীক—৮ই আগষ্ট— **১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে—"নাট্যমন্দির" প্রতিষ্ঠিত হইল** এবং ২শে জুন রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' লইয়া উহার উদ্বোধন হইল। ১৫ই আগষ্ট 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' অভিনয়ে যোগেশচন্দ্র যুধিষ্ঠির হইলেন * ১লা ডিসেম্বর ক্ষিরোদ-প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের 'নরনারায়ণ" অভিনীত হইল—যুধিষ্ঠিরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইলেন যোগেশচন্দ্র। ১৯২৭ খৃ.—নাট্যমন্দিরে শরৎ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 'ষোড়শী'র' অভিনয়ে (৬ আগষ্ট) যোগেশচন্দ্র জনার্দন রায়ের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন "শেষরক্ষায়" (৭ই সেপ্টেম্বর) সাজিয়া-ছিলেন—'নিবারণ'।

'দিগ্বিজয়ী'র রচনা ও অভিনয়

'সীতা' হইতে দিগ্বিজয়ী—পুরো চার বছরের ব্যবধান। তবু এ পর্যন্ত নাদিরশাহের কোনগতি হয় নাই, অথচ সীতা রচনার অনেক আগে'নাদিরশাহ' রচিত। এই নাটকখানি, তাঁহার অভিন্নহৃদয় বন্ধু প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে একত্রে যখন ওরিয়েন্টাল ট্রেনিং একাডেমি শিক্ষাভবনে বাস করিতেছিলেন, তখনই রচনা করিয়াছিলেন। নগেন্দ্রনাথ বলেন—

যোগেশচন্দ্র একদিনে এক একটি দৃশ্য রাত্রি জাগিয়া লিখিতেন এবং তাঁহার শয্যাসঙ্গী বন্ধুটিকে অকালে জাগাইয়া না শুনাইলে তিনি খুশী হইতেন না। এইরূপে নাটকখানি সীতার বহু পূর্বেই যোগেশচন্দ্রের শিক্ষকতা জীবনে রচিত" (সুরেশচন্দ্র)। বলা বাহুল্য—দিগ্বিজয়ী 'নাদিরশাহ' নাটকেরই সুসংস্কৃত রূপ।

কিন্তু, দিগ্বিজয়ী নাটকের 'উৎসর্গ'-পত্রে, নাট্যকার—'নাট্যজগতে দিগ্বিজয়ী' বন্ধুবর শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী মহাশয়কে যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে একটু খট্‌কা লাগিতে পারে। লিখিয়াছেন—"শিশিরবাবু, এ নাটক আপনিই লিখতে ব'লেছিলেন , নামকরণেও আপনার ইঙ্গিত ছিল"। কথা শুনিয়া অবশ্যই মনে হইতে পারে যে শিশিরবাবু বলার পরেই যোগেশবাবু যেন নাটকখানি রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। 'দিগ্বিজয়ী' নামকরণেও শিশিরবাবুর নির্দেশ ছিল। নাদিরশাহ নাটক আমরা পাই নাই, সুতরাং উহার রূপ-রস সম্পর্কে কিছুই জানি না। তবে দিগ্বিজয়ীর রূপরস যে অনেক পরিমাণে শিশিরকুমারের পরিকল্পনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

তারপর নামটি 'নাদিরশাহ' না করিবার মূলে আর যে কারণই থাকুক—১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত, বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্ত—রচিত "নাদিরশাহ" নাটকখানির প্রতিক্রিয়াও একটু ছিল বলিয়া মনে হ[illegible] মনে হয়—নামকরণের মূলে আছে অধ্যাপক শিশিরকুমার ভাদুড়ী [illegible] সেই মননশীল মনটি, যে মনে 'নাদিরশাহ' কথাটি প্রবেশ করিতেই একটি ক্ষুদ্রদর্শনের ভাবাদর্শ, super-man-এর philosophy জাগিয়া [illegible] তৈমুরলঙ, জুলিয়াস সিজার, নেপোলিয়ন প্রভৃতি উচ্চাশয় দিগ্বিজয়ীদের "Vaultir amibition"-ও উহার আলোচনায় পরিণতির কথা উদিত হইয়াছিল।

দিগ্বিজয়ীর প্রথম অভিনয়—নাট্যমন্দিরে শুক্রবার, ২৮শে অগ্রহায়ণ ১৩৩৫, (ইংরেজী—১৪ ই ডিসেম্বর ১৯২৮)। শিশিরকুমারের অভিনয় স্পর্শে নাটকখানি তখনকার একটি শ্রেষ্ঠ আকর্ষণে পরিণত হইয়াছিল। নাট্যকারও অকপটে স্বীকার করিয়াছেন—"অভিনয়ের দিক দিয়া নাটকখানির (ঐতিহাসিক,

ব্যক্তিগত, জাতিগত এবং ভাবগত) সমগ্ররূপই শিশিরকুমারের পরিকল্পনা। অবাস্তবভাব অর্থাৎ Airy nothing-কে কি করিয়া রূপে-রসে-রঙে মূর্ত ও প্রাণবন্ত করিয়া তুলিতে হয়, তাহা তাঁহার চেয়ে বেশী কে জানে? তিনি তাঁহার পূর্ণ শক্তি ও প্রয়োগনৈপুণ্য দিয়া নাটকখানিকে জীবন্ত করিয়াছেন।" দিগ্বিজয়ীর অভিনয়, বিশেষত শিশিরকুমারের 'নাদির' অভিনয় এখনও অনেকের কাছেই সুখস্মৃতি হইয়া আছে।

যোগেশচন্দ্রের নাট্য রচনা ও অভিনয়ের ভূমিকা

১। সীতা—৬ই আগষ্ট ১৯২৪—ভূমিকা—(শম্বুক)

২। দিগ্বিজয়ী—৮ই ডিসেম্বর—১৯২৮—(আলি আকবর)

৩। বিষ্ণুপ্রিয়া—৮ই আগষ্ট ১৯৩১—অদ্বৈত আচার্য

*৪। মহানিশা—১১ই এপ্রিল ১৯৩৩—(রাধিকাপ্রসন্ন)
(উপন্যাসের নাট্য-রূপ)

৫। পূর্ণিমা মিলন—৭ই মার্চে ১৯৩৪

*৬। পতিব্রতা ৩১ মার্চ ১৯৩৪—(রাজেশ্বর)
(কুমার ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের "স্পর্শের প্রভাব" নাট্যীকৃত)

*৭। বাঙলার মেয়ে — ০শে সেপ্টেম্বর ১৯৩৩—(উপেন)
(প্রভাবতী দেবীর "পথের সাথী")

৮। রাবণ ১ ই ডিসেম্বর ১৯৩৩—বিভীষণ ভগ্নদূত

*৯। পথের সাথী—৯ই মে ১৯৩৫—(বসন্ত সেন)
(প্রভাবতী দেবীর উপন্যাস নাট্যীকৃত)

*১০। চরিত্রহীন (শরৎচন্দ্র নাট্যীকৃত) ২০শে ডিসেম্বর ১৯৩৫ (শিবপ্রসাদ)

১১। নন্দরাণীর সংসার—২০শে আগষ্ট ১৯৩৬—(পরেশ)
(রচনা—১৯৩১)

১২। মাকড়সার জাল—২০ মে ১৯৩৯

১৩। মহামায়ার চর—১লা ডিসেম্বর ১৯৩৯—(মৃত্যুঞ্জয়)

১৪। পরিণীতা (১৯৩৮)—•ই পৌষ, ১৩৩৭,—১৯৪• (শ্রীপতি)

মঞ্চ-অভিনেতা যোগেশচন্দ্র

('ভারতীয় নাট্যমঞ্চ' হইতে সংগৃহীত)

নাটক	ভূমিকা	সময়
সীতা	শম্বুক	১৯২৪
খনা	বিদূষক	১৯১৫
পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস	যুধিষ্ঠির	১৯২৬
নরনারায়ণ	যুধিষ্ঠির	১৯২৬
ষোড়শী	জনার্দন রায়	১৯২৭
শেষরক্ষা	নিবারণ	১৯১৭
দিগ্বিজয়ী	আলি আকবর	১৯২৮
তপতী	দেবদত্ত	১৯ ৯
পাণ্ডব কৌরব	কঞ্চুকী	১৯২৯
বিষ্ণুপ্রিয়া	অদ্বৈত আচার্য	১৯৩১
মহাপ্রস্থান	বসুদেব	১৯৩২
মহানিশা	রাধিকাপ্রসাদ	১৯৩৩
অশোক	উপগুপ্ত	১৯৩
পতিব্রতা	রাজেশ্বর	১৯ ৫
কাজরী	নিশিলাল	১৯৩৪
বাঙলার মেয়ে	উপেন	১৯৩৪
পথের সাথী	বসন্ত সেন	১৯·৫
চরিত্রহীন	শিবপ্রসাদ	১৯৩৪

নন্দরাণীর সংসার	পরেশ	১৯৩৬
মেঘমুক্ত	প্রফেসর ঘোষ	১৯৩৮
মহামায়ার চর	মৃত্যুঞ্জয়	১৯৩৯
পরিণীতা	শ্রীপতি	১৯৪১
দুই পুরুষ	শিবনারায়ণ	১৯৪২

*রূপমঞ্চের 'সুরেশচন্দ্রের স ক্রা সহযোগিতা সংগৃহীত তালিকা এইরূপ :

[আলমগীর—রাম সংহ, তপতী—দেবদত্ত, শাজাহান—দিলদার, সুজা, বিল্বমঙ্গল—সাধক, রমা— গোবিন্দ গাঙ্গুলী, বেণী, সধবার একাদশী—ঘটিরাম ডেপুটি, বলিদান—রূপচাঁদ, করুণাময়, প্রফুল্ল—যোগেশ,মদন ঘোষ, চন্দ্রগুপ্ত—কাত্যায়ন, বাচাল, ষোড়শী—এককড়ি, জনার্দন, মহামায়ার চর—মৃত্যুঞ্জয়; নন্দরাণীর সংসার—পরেশ চৌধুরী, মহিমারঞ্জন, প্রতাপাদিত্য—বিক্রমাদিত্য, বসন্ত রায়, মহানিশা—রাধিকাপ্রসন্ন, পরিণীতা—শ্রীপতি; মুক্তির উপায়—ফকিরচাঁদ, সীতা—শম্বুক, বাল্মীকি, চন্দ্রশেখর—শ্রীনাথ, দুই পুরুষ—শিব নারায়ণ, বাঙলার মেয়ে—উপেন্দ্রনাথ, পথের দাবী—বসন্ত সেন, মানময়ী গার্লস স্কুল—দামোদর, চরিত্রহীন শিবপ্রসাদ; দিগ্বিজয়ী—আলি আকবর, পথের শেষে—দুর্গাশংকর, মেঘমুক্তি— প্রো: ঘোষ, মাটির ঘর—সত্যপ্রসন্ন]

* আর একটি তালিকায় দুই চারখানি নাটকের নাম বেশী পাওয়া যায়।

[যেমন: রঘুবীর—সখারাম, সবহারা—শ্যামল; গৈরিক পতাকা—রামদাস স্বামী, কমলাকান্ত—কমলাকান্ত, স্বামী-স্ত্রী—মিঃ দাস; সরলা—গদাধর, চিরকুমার সভা—রসিক, কর্ণার্জুন—ভীষ্ম; গৃহলক্ষ্মী—উপেন্দ্র, শান্তি কি শান্তি—উপেন্দ্র, পোষ্যপুত্র—রজনীনাথ, মন্ত্রশক্তি—রমাবল্লভ, সাবিত্রী—অশ্বপতি, বিদ্রোহী বাঙালী—চিন্তাহরি, মেবার পতন—সগর সিংহ।

এ তালিকা সম্পূর্ণ বলিয়া দাবী করিবার স্পর্দ্ধা আমার নাই মঞ্চে ও পর্দায় যোগেশচন্দ্র বহু ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। ভূমিকার সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়ার মত তথ্য আমার হাতের কাছে না থাকায় দিতে পারিলাম না।]

যোগেশচন্দ্রের নাট্যকার প্রতিভা

ইচ্ছা, জ্ঞান ক্রিয়া বিনা না হয় সৃজন
তিনের তিন শক্তি মেলি প্রপঞ্চ রচন—(চৈতন্য চরিতামৃত)

প্রতিভা মানুষের স্বাভাবিক শক্তিরই বিশেষ বিকাশ— জ্ঞান কল্পনা ও কর্ম শক্তিরই বিশেষ সংযোগ ও অভিব্যক্তি। এমন কোন মানুষ নাই, থাকা-সম্ভবও নহে—যাহার মধ্যে জ্ঞানবৃত্তি, অনুভববৃত্তি, কল্পনাবৃত্তি এবং কর্মবৃত্তির ক্রিয়া একেবারেই অসৎ। প্রকাশের আবেগ জীবনের আবেগের সহিত এক হইয়া মিশিয়া আছে - যেখানে জীবন সেখানেই "কর্ম" (willing) সেখানেই —অনুভব (feeling) এবং সেখানেই জ্ঞান (knowing)। কিন্তু ইহা "সামান্য" সত্য। বিশেষ সত্য এই যে প্রত্যেক 'সামান্য'ই বহু বিশেষ লইয়া গঠিত এবং প্রত্যেক 'বিশেষ' একে অন্য হইতে স্বতন্ত্র প্রত্যেকেই বিশিষ্ট। প্রত্যেক মানুষ জগৎকে জানে, অনুভব করে এবং কর্মে প্রবৃত্ত হয়—ইহা সাধারণ সত্য, কিন্তু বিশেষ সত্য এই, প্রত্যেকের জ্ঞান অনুভব কর্মের শক্তি ও প্রকৃতি সমান নহে। কবি বা শিল্পী যাঁহারা, তাঁহারা এই জ্ঞান-প্রেম-কর্মের বিশেষ শক্তির অধিকারী তথা "নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধির" অধিকারী। তবে এখানেও পার্থক্য আছে। সব কবি-প্রতিভা সমান নহে। একের সহিত অন্যের যে শক্তি-গত পার্থক্য দেখা যায়, তাহার কারণ বা উৎস খুঁজিতে বাহির হইলে দেখা যাইবে একের সহিত অপরের যে পার্থক্য তাহা জ্ঞান-অনুভব-ইচ্ছা শক্তিরই ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার একটা পরিণতির—নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধি শক্তিরই তারতম্যের ফল। এই বুদ্ধি ব্যাপারটি খুবই জটিল। ইহার মধ্যে আছে "জ্ঞানের" অভিজ্ঞতা, স্মৃতির ধারণা, অনুভবের আবেগ ও কল্পনা এবং "ইচ্ছার" বাসনা—এই সমস্ত কিছুর সহায়তায়, নব নব উন্মেষে বুদ্ধি আপনাকে ব্যক্ত করিতে সক্ষম হয়। যাহাকে আমরা সাধারণত কবি-মানস বলিয়া থাকি তাহা কবি চিত্তের এই জ্ঞান-অনুভব ইচ্ছা শক্তির বিশেষ সংগঠন—প্রকাশ সম্ভাবনা। ইহা অবশ্য স্থায়ী কোনো কিছু নহে, পরিবর্তনশীল।

সাধারণতঃ ইচ্ছাশক্তি বাসনারূপে নিয়ন্ত্রিত করে বিষয়বস্তু নির্বাচন —ঘটনা বা চরিত্রের পরিণাম; আর জ্ঞান-অনুভবে প্রকাশ পায় জীবন-সমালোচনার এবং জীবনের সহিত জীবন যোগ করার সামর্থ্য। বস্তুত কবি প্রতিভার বিচার, শেষ পর্যন্ত কবির 'জীবন সমালোচনা'—বৈশিষ্ট্যের এবং 'জীবনের রূপ' সৃষ্টির সামর্থ্যের বিচার। বিষয়বস্তু নির্বাচনের মধ্যে শিল্পীর বাসনার বা অভিযোজন ভঙ্গীর প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়। এমন কি বাহ্য প্রেরণায় যদি যেখানে ভিন্ন বিষয়বস্তু নির্বাচন সাধ্য হয় সেখানেও কবির জীবন-সমালোচনার বৈশিষ্ট্য প্রকাশ না পাইয়া যায় না; এ কথা খুবই সত্য —"a writer is hardly likely to concern himself with a story or a character unless these have some meaning to him and seem important in his general experience of life. We do not pick our favourite stories of any kind, any more than we pick our favourite historical personages or our preoccupying abstractions, by chance. We pick them because they represent aspects of experience which, however submerged the connection, are relevant to our own experience." [Drama from Ibsen to Eliot— 1925) By Raymond Williams] অবশ্য শুধু বিষয়বস্তু নির্বাচনের মধ্যেই মনোভঙ্গীর সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় না; সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়...চরিত্রসৃষ্টির মধ্যে—বিশেষতঃ পরিণতির মধ্যে। তবে নাট্যকার-প্রতিভার ইহা একদিক মাত্র। প্রতিভার রূপদক্ষতার দিক—প্রকাশ পায় রূপায়ণ-শক্তির মধ্যে—সংগঠনে বা ঘটনা বিন্যাসে চরিত্র-সৃষ্টিতে—ভাবোদ্দীপকতায় বা রস-পরিণতিতে। নাট্যকার-প্রতিভা নির্ধারণ করিবার সময় এই কথাটি অবশ্যই মনে রাখা দরকার - নাটক জীবনেরই দৃশ্য কল্প-রূপ। সুতরাং জীবনের রূপ-রসের আস্বাদ সৃষ্টির ক্ষমতা যাঁহার যত বেশী তিনি তত বড় নাট্যকার;- যে নাটকে জীবনের রূপগত এবং রসগত মায়াঘোর (illusion) যত কম বা যত ব্যাহত, তাহা তত হেয় বা তত লঘু। কারণ সৌন্দর্য সেখানেই প্রমূর্ত, যেখানে ভাব ও রূপের মধ্যে বাগর্থের মত সম্পৃক্তি

বিরাজ করে।—[(beauty is the unity of the idea and the image, the complete merging of the idea with the image) Vischer —হেগেলপন্থী শিল্পবিজ্ঞানীর—উক্তি, এন্ জি চেরনিশেভস্কির Aesthetic Relation of Art to Reality হইতে উদ্ধৃত]।

স্রষ্টা যোগেশচন্দ্র

যোগেশচন্দ্রের নাট্যকার-প্রতিভার যা সৃষ্টির সংখ্যাগত হিসাবের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে—নাট্যকার—মোট ১৪ খানি নাটক রচনা করিয়াছেন এবং উহাদের মধ্যে ৯ খানি মৌলিক রচনা এবং ৫ খানি উপন্যাসের নাট্যরূপ। মৌলিক রচনা— ৯ খানি · ( ) সীতা, (২) দিগ্বিজয়ী (৩) বিষ্ণুপ্রিয়া (৪) পূর্ণিমামিলন (৫) রাবণ (৬) নন্দরাণীর সংসার (৭) মাকড়সার জাল (৮) মহামায়ার চর (৯) পরিণীতা। তবে এই মৌলিকদের মধ্যেও কয়েকখানি আবার বিদেশী নাটকের ছায়া-অবলম্বনে রচিত অর্থাৎ ভক্ত যেমন (ক) পূর্ণিমা মিলন—"সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী নাট্যকার মলিয়রের 'School for Husbands' নামক নাটক অবলম্বনে রচিত (খ) মহামায়ার চর—'নাটকখানির গল্পাংশ একখানি সুখ্যাত ইংরাজী নাটক হইতে গৃহীত" (নাট্যকার)। সুতরাং সীতা (রামায়ণ), দিগ্বিজয়ী (ইতিহাস), বিষ্ণুপ্রিয়া (চৈতন্য-জীবনী) রাবণ (রামায়ণ) বাদ দিলে খাঁটি মৌলিক থাকে (১) নন্দরানীর সংসার (২) মাকড়সার জাল (৩ পরিণীতা। যাহা হউক যোগেশচন্দ্রের নাট্যকার-প্রতিভা নির্দ্ধারণ করিবার সময় আমাদের উল্লিখিত নয়খানি নাটকই সম্মুখে রাখিয়া চলিতে হইবে। প্রথমতঃ যোগেশচন্দ্রের নাটকগুলির বিচারাত্মক সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাউক।

(১) সীতা। সীতা রচনার ইতিহাস আগেই উল্লেখ করা হইয়াছে। নাট্যকার নিজেও স্বীকার করিয়াছেন—"স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের সীতা আমার চোখের সামনে অনেকবার অভিনীত হ'য়েছিল। সে নাটকের

অনেকগুলি চিত্র ও চরিত্র আমার সমস্ত কল্পনাকে একেবারে আচ্ছন্ন করেছিল; সেজন্য আমার এই সীতা নাটকের কোন কোন জায়গায় স্বর্গীয় রায় মহাশয়ের নাটকের একটু আধটু ছায়া পড়তে পারে—তবে আমি দ্বিজেন্দ্রলালের প্রভাব অতিক্রম করার যথেষ্ট চেষ্টা পেয়েছি।"

বাহ্য প্রেরণায় তাঁহাকে নাট্যকার 'সীতা' কাহিনী অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু রূপায়ণের প্রকৃতি, তাঁহার অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর জীবনদর্শনের স্পর্শে, অনেক পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল। সীতা-নাটকে রামের জীবনকে সমাজ-সত্য ও ব্যক্তি-সত্যের জটিল এক দ্বন্দ্ব-ক্ষেত্রে পরিণত করা হইয়াছে। সমাজ সত্যের (General-will) সহিত দ্বন্দ্বে ব্যক্তি সত্তার (Individual-will) যে ট্র্যাজেডি, সেই ট্র্যাজেডিকেই রূপ দেওয়া হইয়াছে। নাট্যকার রাম চরিত্রের মাধ্যমে ধর্মকে শাস্ত্রবিধির আনুগত্য হইতে মুক্ত করিয়া "হৃদয়ের অনুশাসনে" পরিণত করিতে অর্থাৎ ব্যক্তিকেন্দ্রিক করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, সত্যের প্রমাণ শাস্ত্রে না খুঁজিয়া মর্মে খুঁজিয়া দেখিবার কথা বলিয়াছেন। নাটকে, সমাজবিধির সঙ্গে দ্বন্দ্বে রামের হৃদয়-ধর্মের পরাজয় দেখানো হইয়াছে, ফলে নাটকখানি বিয়োগান্ত নাটকে পরিণত হইয়াছে বটে কিন্তু যে পক্ষের পরাজয় ঘটিয়াছে, লোকচিত্তে সেই পক্ষই যেন যথার্থভাবে জয়-লাভ করিয়াছে। রাম অকুণ্ঠচিত্তে ঘোষণা করিয়াছেন— "হৃদয়ের ধর্ম ছাড়া, অন্য ধর্ম মানিতে নারিব, প্রভু।" ..."রাজ্য নাহি চাই, সহস্র সাম্রাজ্য হ'তে রাজার কর্তব্য হ'তে শ্রেষ্ঠতর জানকীর প্রেম।"

রামের সংশয়ী প্রশ্নে—"কে বলিবে?

শাস্ত্রের বচন সত্য—কিম্বা সত্য
এই মোর মর্মভাষা—
মর্মের কাহিনী।

বাল্মীকির উচ্চ ঘোষণা—"বৎস,

মর্মের কাহিনী।

মর্ম যারে সত্য বলি দেয়
দেখাইয়া সেই সত্য, অন্য সত্য নাই।"

ধর্মের সহিত ধর্মের দ্বন্দ্ব মর্মকেই বড় স্থান দিয়াছে রাম স্পষ্টভাবেই ঘোষণা করিয়াছেন "রাজধর্ম ডুবুক শতেক বারে—
হৃদয়ের ধর্ম সনে
যদি তার না হয় মিলন
হৃদয়ের স্পন্দন—
আর আমি সহিতে না পারি॥"

সীতা নাটকে নাট্যকার একটি বিশেষ সামাজিক সমস্যাকে পুরাতন একটি কাহিনীর সাহায্যে আলোচনা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন—যে বিধি বিধানের ফলে ব্যক্তি-হৃদয় দলিত মথিত হয়—হৃদয় শুকাইয়া মরে, সেই সমাজ-বিধির কাছে আত্মসমর্পণ করিলে সমাজ ধর্ম রক্ষা পায় বটে কিন্তু প্রকৃত ধর্ম রক্ষা পায় কি? ধর্ম বড় না লোকধর্ম বড়? সত্য কোথায়? শাস্ত্রে না মনে? যেখানে ধর্মের সঙ্গে ধর্মের এত বড় বিরোধ, সেখানে আত্মার চরম সঙ্কট—শ্রেয় প্রেয় উভয়কে হারানোর সঙ্কট নয় কি?—এই সব প্রশ্নেরই সমালোচনা করিয়াছেন। এই সঙ্কট দিয়াই রামের পরিস্থিতি গঠিত—এই দ্বন্দ্বের নিরুপায় ও নিষ্ফল সমাধান প্রচেষ্টায় রামের ট্র্যাজেডি। দ্বন্দ্বটি তথা ট্র্যাজেডিকে তীব্রতর করিবার অবকাশ অবশ্য, নাটকে আরো আছে রাজধর্ম ও হৃদয়ধর্মের দ্বন্দ্ব সর্বত্র সমান শক্তিমান হইয়া উঠিলে নাটকখানি আরো উৎকৃষ্ট সৃষ্টি হইয়া উঠিত।

বিশেষ লক্ষণীয় নাটকের উপন্যাসের রীতি॥ "নাট্যকার স্থান-ঐক্য" (unity of place) এর প্রতি খুব বেশী দৃষ্টি দিয়াছেন। এই প্রবণতার ফলে—বহু ঘটনাকে একত্র সংহত করিতে গিয়াছেন, ফলে, কিছু কিছু অসঙ্গতি দোষের স্পর্শ লাগিয়াছে। যথাসম্ভব নাট্যকার দৃশ্য-সংখ্যা কমাইতে এবং কোন কোন স্থলে লোপ করিতেও চেষ্টা করিয়াছেন।

(২) দিগ্বিজয়ী ঐতিহাসিক নাটক—নাদিরশাহের জীবন অবলম্বনে

অতিমানব চরিত রহস্য—তাঁহাদের বিস্ময়কর উত্থান এবং শোচনীয় পতন উপস্থাপনা করিবার চেষ্টা। এক হিসাবে নাটকখানি 'ঐতিহাসিক' বটে, কিন্তু অন্য হিসাবে একখানি তত্ত্ব-লক্ষ্য নাটক, কারণ নাট্যকার নিজেই লিখিয়াছেন —"ইহার মূল ভাব (Theme) চিন্তন" এবং সেই ভাবটি বোধ হয় এই— শাসন বেগের ভাষায় "পৃথিবীতে অনেক প্রতিভা পথহারা হয়ে নভঃস্খলিত জ্যোতিষ্কের মত কোথায় ঘূর্ণিপাকের অন্ধকারে ডুবে গেছে" এবং অতিমানবের নিয়তির মৃত্যুবাণ নিজেদের শক্তির মধ্যেই বহন করেন—শক্তির মাঝে শক্তির অপব্যবহার করিয়াই তাঁহারা শোচনীয় ভাগ্যবিপর্যয়ের সম্মুখীন হন। নাদিরশাহের উত্থান ও পতন এই তত্ত্বের সুন্দর দৃষ্টান্ত এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই; কিন্তু নাট্যকার নাদিরশাহে যে পরিমাণ অতিমানবতার রঙ মিশাইয়াছেন এবং চরিত্র-পরিকল্পনায়, শেষ দিকে যে ভাবে ইতিহাসনিরপেক্ষ স্বাধীন কল্পনার আশ্রয় লইয়াছেন, তাহাতে নাটকখানির বাস্তবিক গাম্ভীর্য তথা আত্মিক গুরুত্ব অনেক হ্রাস পাইয়া গিয়াছে। নাদির অভিনেয় চরিত্র হিসাবে প্রত্যেক অভিনেতারই বাঞ্ছিত, নাটকখানিও সুন্দর একখানি সংহত "Well-made-play" তারপর, নাটকে ভাব-বস্তুর প্রাচুর্যও কম নহে এবং স্থলে স্থলে রস-নিষ্পত্তির মাত্রাও (incidental success) উপেক্ষণীয় নহে, কিন্তু সামগ্রিক আবেদনের দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে দেখা যাইবে, নাটকখানিতে ট্র্যাজেডি সংবিদ্ (Tragic impression) তেমন অব্যাহতভাবে জমাট বাঁধিতে পারে নাই; অবাস্তব ঘটনা পরিকল্পনার জন্য ট্র্যাজেডি-যোগ্য গাম্ভীর্যের হানি হইয়াছে—"philosophy of Nadir" এবং "history of Nadir"-এর সংমিশ্রণে এক "hybrid production" হইয়া পড়িয়াছে। (আলোচনা দ্রষ্টব্য) অবশ্য ট্র্যাজেডির রূপ ও রস নাটকে না পাওয়া যায় এমন নহে; কিন্তু উচ্চাঙ্গের ঐতিহাসিক ট্র্যাজেডির জন্য যেরূপ বাস্তবিক পরিস্থিতি আবশ্যক, যেরূপ নিঃসংশয় কল্পনা ও অনিবার্য-ঘটনা-পরিণাম দেখান দরকার, তাহা এ নাটকে পাওয়া যায় না।

এই নাটকে উপস্থাপনা রীতি আরো সংহত হইয়াছে। প্রথম চারিটি অঙ্কে একের বেশী দৃশ্য নাই, পঞ্চম অঙ্কে—দৃশ্য সংখ্যা মাত্র দুই (৩) **বিষ্ণুপ্রিয়া—'ভাবরসাত্মক পঞ্চাঙ্ক নাটক'**।…"শ্রীগৌরাঙ্গের পারিবারিক জীবনের রস ও কারুণ্য আশ্রয় করিয়া তাঁহার সহধর্মিণী শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর নামে এই নাটক রচিত হইল।"……"বিরহের ভিতর দিয়াই যে মিলন সেই মিলনকেই বৈষ্ণব কবিগণ শ্রেষ্ঠ মিলন বলিয়া ইঙ্গিত করিয়াছেন। ভাবের দিক দিয়া এই নাটকে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের এবং শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর জীবনে সেই সাত্ত্বিক বিরহই একমাত্র অবলম্বন। ইহা মিলনের চেয়েও বড়। যে কথা বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী মুখে কোনদিন বলিতে পারেন নাই, অথচ যে অন্তর্গূঢ় বেদনা তাঁহার জীবনের ক্ষণিক মিলন ও দীর্ঘ বিরহকে এক সূত্রে বাঁধিয়া তাঁহার জীবনকে পবিত্র, শুভ্র ও সুন্দর করিয়া তাঁহার জগদ্বরেণ্য দেবতা স্বামীর পাশে তাঁহার যথাযোগ্য আসন নির্দেশ করিয়া দিয়াছে সেই কথা এবং সেই বেদনাই এই নাটকের প্রাণ" (নাট্যকার)। আপাতদৃষ্টিতে নাটকখানি করুণরসাত্মক মনে হইতে পারে বটে, কিন্তু আসলে ইহার পরিণতি ঠিক করুণ নহে—যে সাত্ত্বিক বিরহ মিলনের বড়, সেই বিরহই এখানে স্থায়ী। যেখানে বিষ্ণুপ্রিয়া চৈতন্যের সঙ্গে ভাব সম্মিলনে এক হইয়া আছেন সেখানে বিষ্ণুপ্রিয়ার বিরহ মিলনমাধুর্যে মণ্ডিত, এবং সেখানেই বিষ্ণুপ্রিয়া বলিতে পারেন—"কে বলে তিনি সন্ন্যাসী? আমি জানি তিনি সন্ন্যাসী নন। তিনি বিরহী, কৃষ্ণবিরহী—বিষ্ণুপ্রিয়াবিরহী" ভাব-সম্মিলনে বিষ্ণুপ্রিয়া দুঃখ বেদনার অতীত—চৈতন্যময়। "ভাব"-নাট্য হিসাবে নাটকখানি বাংলা নাট্য সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি।

৪। **পূর্ণিমামিলন**—একখানি "রঙ্গ-নাট্য" (Gay Comedy)। সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী নাট্যকার মলিয়েরের—School for Husbands নামক নাটক অবলম্বনে রচিত……তবে মূল নাটকের ভাবটি ব্যঙ্গ (satire), পূর্ণিমামিলন ব্যঙ্গ নয়, রঙ্গ। মূলে যাহা "স্কুল" ছিল তাহা আমি "রসিকসম্মেলনে" পরিণত করিবার চেষ্টা করিয়াছি" (নাট্যকার)।

৫। **রাবণ**—রাবণ চতুরঙ্ক একখানি পৌরাণিক বা রামায়ণ বিষয়ক নাটক। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে বাঙলার রঙ্গমঞ্চে রাবণ চরিত্র প্রদর্শনের একটি লক্ষণীয় প্রতিযোগিতা দেখা যায়। নাট্যনিকেতনে ১৫ই আগষ্ট শিবপ্রসাদ কর-প্রণীত "স্বর্ণলঙ্কা অভিনীত হয়—নির্মলেন্দু লাহিড়ী রাবণের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন; ২৭শে সেপ্টেম্বর নবনাট্যমন্দিরে—সুরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় - প্রণীত "সরমা" অভিনীত হয়—রাবণের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী মহাশয় —তারপর ১০ই ডিসেম্বর রংমহলে অভিনীত হয় যোগেশচন্দ্রের "রাবণ"— ভূমিকায় অভিনয় করেন—ভূমের রায়। (অভিনয় নাকি একটুও জমে না।)

রাবণ-চরিত্রে মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের যত সম্ভাবনা আছে, সেইগুলি প্রদর্শন করাইবার চেষ্টা সকলের মধ্যেই কমবেশী লক্ষ্য করা যায়। রাজা-রাবণ ভ্রাতৃবৎসল-রাবণ এবং ভক্ত-রাবণের পারস্পরিক দ্বন্দ্বর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় জটিল রাবণ-চরিত্র দেখাইবার প্রতিযোগিতা খুবই উপভোগ্য। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের রাবণ-চরিত্রটির সহিত যোগেশচন্দ্রের রাবণ চরিত্রের তুলনা সহজেই মনে আসিতে পারে এবং তুলনা করিলে দেখা যাইবে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের রাবণ দ্বন্দ্ব গভীরতার দিক দিয়া উন্নততর সৃষ্টি হইলেও যোগেশচন্দ্রের রাবণ নূতনতর ভাব কল্পনায় সমৃদ্ধ। যোগেশচন্দ্রের রাবণ অতিশয় আত্মসমীক্ষণপটু। রাবণের আসল দ্বন্দ্ব—আত্মার ও দেহের প্রবৃত্তির দ্বন্দ্ব। রাবণ আত্মায় ব্রাহ্মণ, দেহে রাক্ষস। সীতার প্রতি তাঁহার যে কামনা তাহা আত্মারই অংশের বিষ্ণু প্রীতির আবেগ। রাবণ নিজেই বলিয়াছে—

"পবিত্র ব্রাহ্মণ বংশে জনম আমার,
বিষ্ণু প্রীতি আত্মায় জড়িত—
বিষ্ণু হিংসা দীক্ষা কেবা দিল।
... ...
আত্মাধার একদিকে—
দেহ অন্য পথে।

রাক্ষসের কলুষ কামনা দিয়ে
ব্রাহ্মণের সংস্কার কাহারা করিল লোপ ?
আমার আত্মীয় আজ নাই এসংসারে।

আজ আমি ভাগ্যবান—
সীতার পেয়েছি দেখা। ..

সীতা আজ রাবণের কাছে পরম ইষ্ট ...সীতার কাছে আত্মদান করিয়া রাবণ ইষ্টের চরণে আত্মদানের আনন্দ পাইতে চাহেন। এই নাটকে রাবণ প্রকাশ্যভাবে ভক্তে পরিণত হইয়াছে—তাঁহার প্রার্থনা—

"আমার প্রার্থনা—

সীতারাম নামগান গাহি রসনায়,
চক্ষে হেরি রামসীতা যুগল-মিলন
কর্ণে শুনি সীতারাম প্রণব-ঝঙ্কার।"

যোগেশচন্দ্রের নাটকে অতিপ্রাকৃত প্রবণতা এবং ভক্তিরসের প্রাধান্য খুবই প্রকট। ইহা সত্ত্বেও অর্থাৎ রামকে পূর্ণব্রহ্ম রূপে এবং রাবণকে ভক্ত রূপে দেখাইয়াও, নাটকে করুণ-রসের তথা ট্র্যাজেডির পরিবেশ সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছেন। নাটকের পরিণতি বিশেষভাবে ... হইয়া আছে—নাট্যকারের ইহা বড় কৃতিত্বেরই প্রমাণ।

৬। "মধ্যবংশীর সংসার"—"করুণরসাত্মক ... নাটক" চতুরঙ্ক। এই নাটকে নাট্যকার বাঙলা সমাজের এক নিষ্ঠুর চিত্রকে ... রূপে ফুটাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। "এই নিষ্ঠুর চিত্র" কি তাহা তিনি নিজেই ভূমিকায় ব্যক্ত করিয়াছেন—"প্রাচীনের মধ্যে অনেক সদ্গুণ আছে, বর্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্যেও যথেষ্ট প্রাণশক্তি ও মহত্ত্ব আছে। তবু জানিনা কাহার দোষে—ঘরে বাইরে কোথাও আজ বাঙালীর সুখ নাই, আনন্দ নাই। প্রবীণে নবীনে যোগ নাই, প্রৌঢ়ের সঙ্গে তরুণের মিল নাই, বুদ্ধিমানের কাজ নাই—, স্বামী স্ত্রীর

মর্মকথা বুঝিতে পারে না, স্ত্রীও স্বামীর বৃহৎ অনুষ্ঠানের সহায় হয় না—ভাল করিতে গেলে মন্দ হয়। শিক্ষিত সহৃদয় যুবক মনে করেন—আঘাত দিয়া এই জাতিকে বাঁচাইব। কাছে গিয়া দেখেন যাহাকে আঘাত দিবেন—সে মুমূর্ষু! তাহার প্রাণশক্তি বুঝি নিঃশেষ হইয়াছে।" আঘাত-দেওয়ার মুখপাত্র-মতিলালের মুখেই নাট্যকার নিজের বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন "যে অসত্য আর কৃত্রিমতার মাঝখানে সারা বাংলা দেশের নরনারী বাস ক'রছে তা ম্যালেরিয়া-কলেরার জীবাণুর চেয়েও ঢের বেশী মারাত্মক। এ ভাবে এ রকম "ভাবের ঘরে চুরি" ক'রে একটা জাত বাঁচতে পারে না।" নাট্যকার অবশ্য জানেন না—'কি করা উচিত' তবু শুধু এই কথাই বলিতে চাহেন—"এ না—এ হ'তে পারে না।"

নাট্যকারের সাধ খুব প্রশংসনীয় বটে কিন্তু সাধ্যের নিদর্শন খুব অনবদ্য হইয়াছে এ কথা বলা যায় না। যুগের দ্বন্দ্ব জটিল জীবন সম্পর্কে নাট্যকারের ধারণা স্পষ্ট হইয়া উঠিলে, চরিত্র-কল্পনা আরো বাস্তবিক এবং নাটকের গতি পরিণতি আরো ট্র্যাজিক হইতে পারিত। কৌতূহল বহু ধারায় ছড়াইয়া পড়ায় রস-সংবেদনা দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে।

৭। মাকড়সার জাল—নাটকখানিকে "crimo-social" নাটক অপরাধ প্রবণ সামাজিক নাটক বলিয়া [illegible] জ্ঞাপন দেওয়ায় নাট্যকার "নিবেদন"-এ জানাইয়াছিলেন—"কেহ কেহ।" এই নাটকখানিকে crimo-social নাটক বা "অপরাধ প্রবণ সামাজিক" নাটক বলিয়া বিজ্ঞাপিত করা হইয়াছে। বিশিষ্ট দর্শকগণও নাট্যাভিনয় দেখিয়া নাটকখানিকে সাধারণ ডিটেকটিভ গল্পের নাট্যরূপ মনে করিয়াছেন"........ .... মূল নাটকের আখ্যান ভাগে অপরাধের কথা আছে সত্য। ডিটেকটিভ নাটক লেখা আমার উদ্দেশ্য ছিল না। মানব-চরিত্রের অন্তর্গূঢ় রূপ ও ভাব প্রকাশের জন্যই শিক্ষিত ভদ্র অপরাধীর জীবনের ঘটনা আশ্রয় করিয়াছি।" নাট্যকারের উদ্দেশ্য যাহাই হউক, নাটকখানি সৃষ্টি হিসাবে "মেলোড্রামা"র পর্যায় অতিক্রম করতে পারে নাই। নাটকের প্রধান চরিত্রে (সুরেন্দ্রনাথ) এমন কোন তীব্র দ্বন্দ্ব ফুটিয়া

উঠে নাই যাহাকে ঠিক "ট্র্যাজিক" বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। মাকড়সার জাল একখানি উচ্চাঙ্গের মেলো ড্রামা"। (মনে রাখা দরকার —মেলোড্রামাতেও উত্তম অধম বিচার প্রযোজ্য)।

৮। "মহামায়ার চর"—অলৌকিক রহস্যময় ঘটনা অবলম্বনে "করুণ রসাশ্রিত গার্হস্থ্য নাটক" নাটকখানির গল্পাংশ একখানি সুবিখ্যাত ইংরেজী নাটক হইতে গৃহীত .. নাটকে যে অলৌকিক রহস্য কাহিনী আছে, সেই কাহিনীটুকুই আমার ইংরেজী নাট্যকারের নাটক হইতে লওয়া। যাহা লৌকিক এবং সাংসারিক তাহা আমারই"। .....মহামায়ার চর আমাদের এই সংসার.... ইহার আদি আমাদের জানা নাই, অন্তও অজ্ঞাত—মাঝখানে কয়দিনের সুখদুঃখ, তাহাও নিরবচ্ছিন্ন নয়—সুখের সঙ্গে দুঃখ জড়ানো। দুঃখও নিরবচ্ছিন্ন নয়—সুখের সঙ্গে দুঃখ জড়ানো। দুঃখও চিরন্তন নয়। এই সুখদুঃখ মিশ্রিত আলোছায়ার খেলা জীবনচিত্র আঁকিবার চেষ্টা করিয়াছি।" নাট্যকার অলৌকিককে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার উদ্দেশ্য লইয়া এই নাটক রচনা করিয়াছেন। 'শচীন' নামক চরিত্রটির কথাই নাট্যকারের বক্তব্য বলিয়া আমরা ধরিতে পারি—"বিজ্ঞান অলৌকিক স্বীকার করতে চায় না—সামাজিক মানুষ অলৌকিক—বিশ্বাস করে না, হেসে উড়িয়ে দেয়, কিন্তু অলৌকিক আছে অলৌকিক সুন্দর। মানুষ মনে ও মহে অলৌকিক। জন্ম থেকে আরম্ভ করে তার দেহের মৃত্যু পর্যন্ত তার সমস্ত physiological development লৌকিক—শুধু কার্যকারণের শৃঙ্খলে, সীমাবদ্ধ, কিন্তু তার মন তো লৌকিক নয়—অসীম বিরাট আশ্চর্য মানব মন।" এই কথাটিকে প্রকাশ করিবার জন্য তিনি যে কাহিনী পরিকল্পনা করিয়াছেন চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন বিশেষতঃ মৃত্যুঞ্জয় এবং উমাবতীর চরিত্র—তাহা খুবই চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। এই নাটকে নাট্যকার উপস্থাপনা রীতিতে নূতন কৌশল যে জনা করিয়াছেন—চলচ্চিত্রে যেমন flash back করা হয় এখানেও সেই রীতি প্রয়োগ করিয়া অতীত ঘটনাকে উদ্ভাসিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

৯। **পরিণীতা—"সামাজিক নাটক"**—জমিদার ও ব্যবসায়ী দুই পরিবারের দ্বন্দ্বের পটভূমিকায় "কমেডি"। নাটকে যে ভাব-বস্তুকে প্রচার্য করা হইয়াছে তাহা জমিদার শ্রীপতির মুখেই প্রকাশ পাইয়াছে—সত্যকে স্বীকার করবার সাহস যার আছে সেই modern।......Modern হচ্ছে চির কিশোর সত্য। "নিবেদনেও" একই কথা বলা হইয়াছে—"নব যুগের বাণী যিনি শুনিতে পান, বলিতে পারেন—তিনিই modern।" নাট্যকারের স্বীকৃতি—আধুনিক বলিতে আমি যা বুঝি, এ নাটকে তাহাই দেখাইবার প্রয়াস পাইয়াছি।

এইবার **প্রতিভার গুণ মাত্রার দিকটি** আলোচনা করা যাইতে পারে। তবে গোড়াতেই এই কথাটা বলিয়া লওয়া ভাল—যে, প্রতিভার সম্যক পরিচয় দেওয়ার অবকাশ এখানে নাই এবং নাই বলিয়াই সামান্য লক্ষণটি নির্দেশ করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতে হইবে।

প্রথমে নাটকের সংজ্ঞা সম্পর্কে, যোগেশচন্দ্রেরই—(তিনটি) উক্তি (সতর্ক বাণী হিসাবে) স্মরণ করিয়া লওয়া যাউক। যোগেশচন্দ্রের মতে—বস্তু নাটক নয়। ঘটনা বাস্তব হউক অবাস্তব হউক, ঘটনা নাটক নয়। অর্থাৎ ভাব এবং রসই নাটকের প্রাণ"—(খ) লিখিত নাটক গানের স্বরলিপির মত নাট্যাভিনয়ের স্বরলিপি মাত্র। প্রকৃত রসিক নাট্যামোদী ছাড়া নাটকের সত্যকার পাঠক নাই। (গ) আধুনিক নাটক মানে আধুনিক—টেকনিকের নাটক। প্রাচীন ঘটনা লইয়াও আধুনিক নাটক লেখা যায়।"

রচনা-রীতি

প্রথমতঃ যোগেশচন্দ্র নাটকের গঠনে আধুনিক রীতি প্রয়োগ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং আধুনিক রীতি—তিনি যেটুকু প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা এই যে "স্থান-ঐক্য" (unity of space) বজায় রাখিবার দিকে তিনি খুব সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়াছেন। দিগ্বিজয়ীর ভূমিকাতে তিনি লিখিয়াছেন—"অভিনয় সম্পূর্ণরূপে নবযুগোপযোগী—করিবার নিমিত্ত আমি আধুনিক নাট্য-রচনা-রীতি

(Ibsenian Technique) অবলম্বন করিয়াছি ” দেখা যায় নাটকে—মোট পাঁচটি অঙ্ক, প্রথম চারি অঙ্কে একের বেশী দৃশ্য নাই এবং পঞ্চম অঙ্কে মাত্র দুইটি দৃশ্য। স্থান-ঐক্য লক্ষ্য হওয়ায় নাটকের অভিনয় একদিকে যেমন নবযুগোপযোগী হইয়াছে, অন্যদিকে এই [illegible] দিকে অধিকতর ঝোঁক পড়ায়, একস্থলে অনেকগুলি ঘটনা এবং পাত্রপাত্রীর সমাবেশ করিতে হইয়াছে, ফলে কয়েকস্থলে অনৌচিত্য-বোধের স্পর্শ এড়ানো সম্ভব হয় না।

অধিকন্তু নাট্যকার উন্নত অভিনয় রীতির-মঞ্চব্যবস্থা ও আলোক-সম্পাতাদির সুযোগে, ঘটনার “পশ্চাদ্‌বৃত্ত” (flash-back-রীতি)—ঘটাইয়া, নতুন রীতিতে নাটক রচনা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। মহামায়ার চর-দ্রষ্টব্য

দ্বিতীয়তঃ, নাট্যকার মনোবিজ্ঞানের নূতন জ্ঞান প্রয়োগ করিয়া, পুরাতন বিষয়বস্তুতে নূতন [illegible], যুগের [illegible] দৃষ্টিকোণ হইতে জীবন-সমালোচনার [illegible] চেষ্টা করিয়াছেন [illegible], শূদ্রক, [illegible], বিন্দুপ্রিয়া নাটিকার [illegible] সৃষ্টি।

[illegible]

তৃতীয়তঃ [illegible] এক নাটিকা [illegible] আন্তরিকতার পরিচয় [illegible], [illegible] না থাকায় ([illegible]) তাহা নাটকে বাস্তবিকতার মায়াঘোর তেমন জমাট বাঁধিতে পারে নাই। ‘নন্দরানীর সংসার’ বা ‘মাকড়সার জাল’ প্রভৃতি নাটকের উদ্দেশ্য খুবই প্রশংসনীয়, কিন্তু যে রূপ ও রসের উপায়ে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে তাহা উৎকর্ষের দিক দিয়া তত প্রশংসনীয় হইতে পারে নাই।

উপস্থাপনায় ভাবতান্ত্রিকতার প্রাধান্য

চতুর্থতঃ, কোন কোন চরিত্র সৃষ্টিতে, বিশেষতঃ দ্বন্দ্ব-রূপায়নে, নাট্যকারের গভীর সহৃদয়তার বা সহানুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়—একথা অবশ্যই স্বীকার্য,

তবে একথাও অনস্বীকার্য যে-সৃষ্টিতে রূপতান্ত্রিকের বাস্তব-রতি অপেক্ষা ভাবতান্ত্রিকের আত্মরতির আধিক্য বেশী দেখা যায়। এই কারণেই কোন কোন ক্ষেত্রে চরিত্র তাহার বাস্তব পরিবেশ হইতে যেন আলগা হইয়া পড়িয়াছে; এমন কি অনেক ক্ষেত্রে দূরে সরিয়া পড়িয়া, অনেক পরিমাণে গুরুত্ব হারাইয়া ফেলিয়াছে। নাদির-চরিত্রটি ইহার একটি দৃষ্টান্ত। শেষদিকে নাদির পরিবেশ হইতে এত বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে যে ঐতিহাসিক ব্যক্তি হিসাবে নাদিরকে প্রায় চেনাই যায় না, [illegible] আচরণে নাদির যে পরিমাণে বাস্তব হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছে, সেই পরিমাণে চরিত্রটি [illegible] হইয়া বসিয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে, পরিস্থিতির অবাস্তবতায় চরিত্রের আকর্ষণ হ্রাস পাইয়া গিয়াছে। ([illegible], [illegible], [illegible], প্রভৃতি দ্রষ্টব্য)।

যুগধর্ম [illegible] প্রগতিশীল

বস্তুতঃ, নাট্যকার [illegible] চেষ্টা [illegible] করিয়া [illegible] উচ্চকণ্ঠে প্রচার [illegible]

[illegible] শুধু,
দিয়াছি তাদের আমি সেই অধিকার
বিপ্রজাতি বঞ্চনা করেছে যাহা,—
মানবের ক্ষুদ্র স্বার্থনীতি তুচ্ছ করি
মানিয়াছি ঈশ্বরের বিধি।

যে বিধিতে ব্যক্তি-অধিকার সঙ্কুচিত—ব্যক্তির মর্ম আহত, সেই বিধিকে সত্যের বা ধর্মের মর্যাদা দিতে তিনি কুণ্ঠিত। বাল্মীকি এই সত্যের মুখপাত্র—"মর্ম যারে সত্য বলি দেয় দেখাইয়া, সেই সত্য,—অন্য সত্য নাই" রাম এই ধর্মের ধ্বজা ধারণ করিয়াছেন—"

"হৃদয়ের ধর্ম ছাড়া
অন্য ধর্ম মানিতে নারিব, প্রভু!
শুষ্ক শাস্ত্রের বচন
লোকাচার, সমাজ নিয়ম
যার চাপে নির্দোষীর বুক ভেঙ্গে যায়
তারে সত্য বলি মানিব না

বংশ-আভিজাত্যের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা নাদিরের মুখে উচ্চারিত হইয়াছে—"বংশ-পরিচয় অনাবশ্যক। আমি চাই, বংশের নয়, নিজের পরিচয়ে মানুষ দাঁড়াবে। আভিজাত্য যেন আজ এই সিরাজী বেগমের মত ক্রীত-দাসীকেও অভিবাদন করতে শেখে—" নাদিরের মুখে "সবার উপরে মানুষ সত্য"—এই মহিমাও প্রচারিত হইয়াছে—"যে আভিজাত্য মানুষকে তুচ্ছ করে, আমি তাকে ঘৃণা করি। আভিজাত্যের চেয়ে মানুষ শ্রেষ্ঠ, কেননা আভিজাত্য মানুষ সৃষ্টি করে না, মানুষই আভিজাত্যের স্রষ্টা।"

তারপর, রহমতের মুখে 'সাম্প্রদায়িক' ধর্মের সংকীর্ণতাকেও ধিক্কার দেওয়া হইয়াছে এবং সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের প্রতিষেধ করিতে সিতারার কণ্ঠে ঘোষণা করা হইয়াছে—"আমি সব ধর্মকেই সত্য বলে জানি, সেই জন্য কোন বিশেষ ধর্মের গণ্ডীর জন্য ব্যস্ত হইনি।" এই ভাবে ধর্মীয় সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে নাট্যকার সমালোচনা প্রকাশ করিয়াছেন। **যোগেশচন্দ্রের নাটকের influence value উল্লেখযোগ্য।**

অধ্যাত্মবাদী, অতিপ্রাকৃত—বিশ্বাসী

তবে নাট্যকার সংস্কারের দিক দিয়া মূলতঃ প্রাচীনপন্থী। দার্শনিক দৃষ্টিকোণ তাঁহার অধ্যাত্মবাদীরই দৃষ্টিকোণ। দৈব বিশ্বাস, অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস, দেহনিরপেক্ষ স্বতন্ত্র আত্মায় বিশ্বাস তাঁহার মজ্জাগত। তাঁহার ধারণা—"ভগবৎকৃপা না থাকিলে শুধু মানুষের চেষ্টায় কোন কার্যই সুসিদ্ধ হয় না"

শুধু তাহাই নহে। দেখা যায় "নন্দরানীর সংসার"-এ নাট্যকার পাশ্চাত্য শিক্ষিত, পুরুষকার-বিশ্বাসী এবং নাস্তিক মহিমারঞ্জনকে স্ত্রী নন্দরানীর দৈব বিশ্বাসে ফিরাইয়া লইয়া দ্বন্দ্বের সমাধান করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। মহিমা-রঞ্জনের শেষ উক্তি "কে জানে—হয়ত গোবিন্দদেব আছেন।"—খুবই সংকেতপূর্ণ।

উপসংহারে এ কথা অবশ্যই বলা যাইতে পারে যে—যোগেশচন্দ্রে সমর্থ রসস্রষ্টার শক্তি সামর্থ্যের মাত্রা প্রশংসনীয় পরিমাণেই আছে—অর্থাৎ কাহিনীকে সন্ধি বিভক্ত করিবার সন্ধির ঘটনাগুলিকে যথাসম্ভব একত্র সন্নিবেশিত করিবার শক্তি তাহার আছে। (খ) চরিত্রে ভাব-দ্বন্দ্ব পরিকল্পনা করিবার শক্তিও যথেষ্ট মাত্রায় পাওয়া যায় এবং অনুভাব-ব্যভিচারী ভাবের কল্পনায় সহৃদয়তার সদ্ভাবও অনেক ক্ষেত্রে উচ্চ প্রশংসারই যোগ্য, (গ) কল্পনা শক্তি এবং ভাবনা-শক্তি খুব দুর্বল নহে—সমাজকে অশান্তি, দ্বন্দ্ব ও অনাচার হইতে মুক্ত করিবার সাধনা তাঁহার ঐকান্তিক, কিন্তু যে মূল শক্তিটি উল্লিখিত শক্তিসমূহকে একটি সামবায়িক ঐক্য দান করিয়া মাধুর্য-ঐশ্বর্যের, রূপের ও ভাবের আনন্দ-সঙ্গতি সৃষ্টি করে, নাট্যকারের ব্যক্তিত্বে সেই শক্তির দুর্বলতা আছে। ভাবের কেন্দ্রাতিগ প্রবণতায়—উচ্ছ্বাসময়তায় এবং রূপের কেন্দ্রানুগ প্রবণতায়—বাস্তবকতায়, অনবদ্য সাহিত্য সৃষ্টি করিবার জন্য কবি-মানসে যেরূপ মাত্রা-স্পর্শকাতরতা থাকা দরকার, তাহার ঘাটতি আছে বলিয়াই প্রথম শ্রেণীর স্রষ্টার মধ্যে বাস্তবতার এবং গভীরতার যে সমন্বয় পাওয়া যায় তাঁহার রচনায় তাহা সম্ভব হয় নাই। অবশ্য এই জাতীয় প্রথম শ্রেণীর শিল্পী—শুধু দুর্লভই ন'ন সুদুর্লভ; আর তাহা শুধু আমাদের দেশের সম্বন্ধেই নহে—সকল দেশের সম্পর্কেই প্রযোজ্য।

আর একটি কথা বলিয়া এ প্রসঙ্গ শেষ করা যাক—যোগেশচন্দ্রের অভিনয়-রীতি ব্যক্তি-মানসের যে স্বাভাবিক প্রকাশ-রীতি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, চরিত্র সৃষ্টিতেও বিশেষতঃ সামাজিক চরিত্র-সৃষ্টিতে তাহার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

"রামের" কথা বাদ দিলে যোগেশচন্দ্রের ট্র্যাজিক চরিত্রগুলি নিরুদ্ধ আবেগকে উচ্ছ্বাসের মধ্য দিয়া ব্যক্ত না করিয়া কয়েকটি ব্যভিচারী ভাবের সাহায্যে সহজ অথচ অধিকতর তীব্রতার সহিত ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছে। যোগেশচন্দ্রের অভিনয়ে আবেগ যেমন অনুচ্ছ্বসিত, চরিত্র সৃষ্টিতেও—নিরুদ্ধ আবেগটি দু'একটি ভাবব্যঞ্জক কথা বা আঙ্গিক সংকেতে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। চরিত্র-সৃষ্টির এই রীতি খুবই প্রশংসনীয়। 'নাদির শা', মৃত্যুঞ্জয়, মহিমারঞ্জন, রাবণ, যে কোন চরিত্র বিশ্লেষণ করিলেই এই প্রসঙ্গ লক্ষ্য করা যাইবে। এ ক্ষেত্রে যোগেশচন্দ্র উচ্চপ্রশংসার অধিকারী। এ কথাও অবশ্য বলা যাইতে পারে যে—আবেগকে নিরুচ্ছ্বাস অভিব্যক্তি দেওয়ার ব্যাপারে যোগেশচন্দ্রের এই বৈশিষ্ট্যটুকু খুব কম নাট্যকারের মধ্যেই পাওয়া যায়। যোগেশচন্দ্র প্রথম শ্রেণীর "নাট্যকার-পতিভার" অধিকারী না হইলেও, বাঙলার শক্তিমান নট-নাট্যকারগণের মধ্যে অবশ্য বিশিষ্ট স্থান দাবী করিতে পারেন।

নাদিরশাহের ইতিহাস ও তাৎপর্য

'অগ্নি আখরে আকাশে যাহারা লিখেছে আপন নাম'—নাদির তাঁহাদেরই একজন এবং এমন একজন যাঁহার নাম শুধু নামবাচক একটি শব্দমাত্র নহে—অদ্ভুত এক ভাব-ব্যঞ্জনার ধ্বনি-সমষ্টি। বস্তুতঃ নাদির আজ আর শুধু একটি ব্যক্তির নাম নহে—অভিধা মাত্র নহে, "নাদির" শব্দটি একটি ব্যঞ্জনা - অবাধ অত্যাচার, নির্বিচার লুণ্ঠন, নির্মম নিষ্ঠুরতা—পৈশাচিক হত্যা প্রভৃতির সংকেতে পর্যবসিত। কিন্তু সাধারণে নাদির যে ভাবানুষঙ্গের (association) প্রতীক হউক না কেন, নাদিরের ঐতিহাসিক পরিচয় যাহারা জানেন তাহাদের কাছে "নাদির" শব্দটির ব্যঞ্জনা এত সংকীর্ণ নহে। নাদিরকে আমরা 'এশিয়ার সন্ত্রাস', 'বিধাতার মূর্তিমান অভিশাপ' প্রভৃতি যত কিছুই বলি না কেন এ কথাও ভুলিবার নহে যে তিনি পুরুষকারের এক বিস্ময়কর উৎক্ষেপ, আত্ম-প্রতিষ্ঠার এক ঐকান্তিক অন্ধ আবেগ, সামরিক শক্তির এক উদ্দাম ও

অপ্রতিহত গতি-বেগ। দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম মদায়ত্তন্তু পৌরুষম্—নাদির এই সত্যেরই যেন এক নূতন অবতার। অতি সাধারণের মধ্যেই অতি-অসাধারণ কিভাবে সম্ভাবনা রূপে বিরাজ করে এবং উপযুক্ত সুযোগ পাইয়া, কি ঐকান্তিক অধ্যবসায় দ্বারা সুযোগকে সে আত্মবিকাশের উপায় করিয়া লয়, অতি সাধারণ অবস্থার গুটি হইতে কিভাবে অতি অসাধারণ বিচিত্র-শক্তি ব্যক্তিত্বের প্রজাপতি বাহির হইয়া আসে তৈমুরলং, চেঙিস খাঁ, নাদির শাহ, নেপোলিয়ন প্রভৃতি তাহার উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। নাদির জ্ঞানের বিভূতি নহে সত্য, প্রেমের বিভূতি তাঁহাতে প্রকাশিত হয় নাই ইহাও সত্য; কিন্তু নাদিরে যে শক্তির বিভূতি প্রকাশিত হইয়াছে তাহা অবশ্যই বিস্ময়জনক। কত ছোট আরম্ভের কত বড় বিরাট পরিণতি।

নাদির শাহ খোরাসান প্রদেশে আফসার জাতির (tribe) "কিরিক্‌লু"—শাখার একটি নগণ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন— ৬৭৮ খ্রীষ্টাব্দের—২২শে নভেম্বর তারিখে (মীরজা মেহেদি-মতে)। তাঁহার পিতা ইমাম কুলি বেগ একজন মেষপালক। নাদিরের জন্ম হয় দুর্‌গাজ জিলার অন্তর্গত মোহাম্মদাবাদের নিকটবর্ত্তী একটি তাঁবুতে। কথিত আছে - [এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা—১৪ সংস্করণ] নাদিরের বয়স যখন ১৭ বৎসর তখন একদল উজবেকী তাঁহাকে এবং তাঁহার মাকে চুরি করিয়া লইয়া যায় এবং ক্রীতদাস-রূপে বিক্রয় করিয়া দেয়। চার বৎসর পরে নাদির পলাইয়া পারস্যে চলিয়া আসেন এবং দুর্‌গাজের শাসনকর্ত্তার অধীনে সৈন্যবিভাগে যোগদান করেন। ক্রমে কর্মকুশলতায় তিনি শাসনকর্ত্তার প্রিয়পাত্র হন এবং জামাতার পদও লাভ করেন। পরে শ্বশুরের মৃত্যুর পরে নাদির তাঁহার স্থলে অভিষিক্ত হন। Lokhart নামক জনৈক গবেষক ঐতিহাসিক "Nadir" নামক গবেষণা-গ্রন্থে এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—নাদির আফসার সর্দার এবং আবিবর্দের শাসনকর্তা বাবা আলি কুশা আহম্মদলুর অধীনে সৈনিকের কার্যে যোগদান করেন। ক্রমে তাঁহার দেহরক্ষী-বাহিনীর সেনাপতি এবং আরো ক্রমে

জামাতা হন। এই প্রথমা পত্নীর গর্ভে ১৭১৯ খৃঃ ১৫ই এপ্রিল রেজা কুলির জন্ম হয়। কয়েক বৎসর যাইতে না যাইতেই প্রথমা পত্নীর মৃত্যু ঘটে। নাদির অন্য পত্নী গ্রহণ করেন বটে কিন্তু শ্বশুর বদলান না—বাগ আলিরই অন্য এক কন্যাকে বিবাহ করেন। এই পত্নীর গর্ভে—নসরুল্লা ও ইমাম কুলি জন্মগ্রহণ করেন।

বাগ আলি বেগ ১৭২৩ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। (কেহ কেহ বলেন—নাদিরই শ্বশুরকে হত্যা করেন।) নাদির যে-কোন কারণেই হউক শ্বশুরের পদ লাভ করিতে পারেন না। অগত্যা তিনি মাসাদে উপস্থিত হন এবং মালিক মহম্মদ মামুদের অধীনে কার্যভার গ্রহণ করেন।

[তবে একটি কথা এখানেই বলিয়া রাখা ভাল—নাদিরের ইতিহাস আগাগোড়া 'প্রমাণ' দিয়া গাঁথিয়া তোলা সম্ভব হয় নাই। অনুমানের জোড়াতালি না দিয়া কেহই ইতিহাস দাঁড় করাইতে পারেন নাই। যেমন—নাদির কেন এবং কখন 'দস্যু-সর্দার' হন তাহা স্থির করা এক মহা সমস্যা হইয়াছে। এই সময়কার গতিবিধির ইতিহাস খুব স্পষ্ট নহে। এই সকল ক্ষেত্রে কিংবদন্তী ও ইতিহাস বাছিয়া লওয়া দুঃসাধ্য ব্যাপার এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।]

নাদিরের সময়ে পারস্যের অবস্থা নানাকারণে শোচনীয় হইয়া পড়ে। তখন সাফাভী বংশের রাজত্বকাল। ১৪৯৯ খৃঃ এই বংশের শাসনের আরম্ভ হয়, ১৭৩৬ খৃঃ নাদিরের অভ্যুত্থানে শাসনের অবসান। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে—শাহ হোসেনের শাসনকালে (১৬৯৪ খৃঃ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত) পারস্য ভীষণ এক সঙ্কটের সম্মুখীন হয়। নিম্নলিখিত কারণে এই বিশৃঙ্খলা বা সংকট দেখা দেয়। (ক) শাহ ও শাসকবর্গের নৈতিক ও চারিত্রিক দুর্বলতা, (খ) শাহ আব্বাসের নীতির ফলে—শাহজাদাদের ভীরুতা ও বিলাসপরায়ণতা (গ) সৈন্য-বিভাগের প্রতি উপেক্ষা ও অবহেলা * (ঘ) সিয়া-সুন্নীর উৎকট বিরোধ (ঙ) জাতিগুলির মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব (চ) পিটার দি গ্রেট-

শাসিত রাশিয়ার সম্প্রসারণ-চেষ্টা (ছ) তুরস্কের—আজর বাইজান জর্জিয়া ও শিরোয়াণে'র প্রতি লুব্ধ দৃষ্টি। পশ্চিমে তুরস্ক—উত্তর-পূর্বে রাশিয়া, পূর্বে আফগানিস্তান—এক কথায় চতুর্দিকে শত্রু বেষ্টনী। এই বেষ্টনী ভেদ করিতে বা আত্মরক্ষা করিতে হইলে চাই—অটুট ঐক্য এবং অদম্য সামরিক শক্তি অথচ সেখানেই পারস্যের চরম দৈন্য। সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বে, জাতিদ্বন্দ্বে সমগ্র পারস্য ছিন্নবিচ্ছিন্ন - বিলোপের বিপত্তির মুখে দণ্ডায়মান।

১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে নানাস্থানে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। শত্রুর পক্ষে এই বিশৃঙ্খলা মহাসুযোগ। ইতিমধ্যে আফগান মামুদ পারস্য আক্রমণ করেন। সুযোগ বুঝিয়া রাশিয়া ও তুরস্ক কতকগুলি প্রদেশ কুক্ষিগত করিতে চেষ্টা করে। ১৭২৪ খ্রীঃ তুরস্ক ও রাশিয়া পারস্যকে ভাগ বাঁটোয়ারা করিয়া লইবার জন্য চুক্তি করে। মামুদের আক্রমণের মুখে শাহ হোসেন আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হন। শাহজাদা তাহমাস্প রাজধানী ইস্পাহান হইতে পলাইয়া যান এবং শাহ উপাধি গ্রহণ করেন। মামুদের মৃত্যুর পরে তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র ইস্পাহান, সিরাজ এবং দক্ষিণ-পূর্ব পারস্যের উপর অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখেন। তাহমাস্প্ খোরাসানে গিয়া সৈন্য সংগ্রহের চেষ্টা করেন কিন্তু বিশেষ কৃতকার্য হন না।

জাতির এই মহা সঙ্কটের সময়ে—সমগ্র পারস্য যখন তুরস্ক রাশিয়া ও আফগানিস্থানের করলে, দস্যু-সর্দার নাদির তাঁহার দলবল লইয়া তাহমাস্পের সঙ্গে যোগ দেন। জাতির দুর্যোগের রূপে নাদিরের সম্মুখে শক্তি তথা ভাগ্য পরীক্ষার এক মহাসুযোগ উপস্থিত। শাহের সৈন্যাধ্যক্ষরূপে নাদির মাতৃভূমির মুক্তিসংগ্রামে আত্মশক্তি নিয়োগ করেন। ১৭৩০ খ্রীঃ তিনি প্রথম আফগান-শক্তিকে বিতাড়িত করেন এবং তুরস্কের বিরুদ্ধে অবিরাম (৩ বার) অভিযান চালাইয়া পারস্যের পশ্চিমাঞ্চলের প্রদেশসমূহ উদ্ধার করেন। রাশিয়া-অধিকৃত প্রদেশ উদ্ধার করিতেও বেশী বিলম্ব হয় না। তুরস্কের সহিত রাশিয়ার যুদ্ধ বাধিতেই নাদির রাশিয়ার উপর চাপ দেন এবং অধিকৃত প্রদেশ উদ্ধার

করিতে সমর্থ হন। এই সময়েই তুরস্কের সঙ্গে একটা চুক্তি করিতে গিয়া তাহমাস্প সিংহাসন হারান—নাদির তাহমাস্পকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তাহার শিশুপুত্রকে সিংহাসনে বসান করেন (১৭৩২)।

তাহমাস্পের শিশুপুত্র শাহ তৃতীয় আব্বাস ১৭৩৬ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হয় তখন অন্যের ক্রীড়নক পুতুল হইবার যন্ত্রণা এড়াইয়া যায়। নাদিরের উচ্চাকাঙ্ক্ষার পথে যে ছোট একখানি কাঁটা ছিল তাহাও অপসারিত হয়। এইভাবে ১ খ্রীষ্টাব্দে নাদির মেষপালক-পুত্র নাদির পারস্যের 'শাহ' হইয়া বসেন। প্রথমে নাকি তিনি শাহের মুকুট গ্রহণ করিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন, অবশ্য এই অসম্মতি কূটনৈতিক, তারপর শুধু সম্মতই হন না, সঙ্গে সঙ্গে দুইটি প্রতিশ্রুতিও আদায় করেন। এক নম্বর প্রতিশ্রুতি—সিংহাসন তাহার পুত্রদের বংশানুক্রমে ভোগ করিবে; দুই নম্বর—শিয়ারা সুন্নি মত গ্রহণ করিবে। প্রথমটিতে কেহই আপত্তি করিতে সাহস না পাইলেও, দ্বিতীয়টিতে মোল্লাবাসী প্রধান মোল্লা) আপত্তি জানান এবং প্রাণ দিয়া শহীদ হওয়া ছাড়া আর কোন ফলই পান না।

[এই দুইটি সত বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে—নাদিরের ভবিষ্যৎ আচরণের মূলে যে দুইটি প্রধান প্রবৃত্তি কাজ করিয়াছে তাহাই এখানে প্রকাশ পাইয়াছে। নাদির মেষপালক পুত্র, নিরক্ষর ও সংস্কৃতিবর্জিত। নাদিরের প্রতিপক্ষ সাফভীবংশীয়গণ অভিজাত বা সংস্কৃতিমান শিয়ামতাবলম্বী। অভিজাতদের বংশগৌরবের বিরুদ্ধে নাদিরের মধ্যে একটা প্রতিকূলতা থাকিবে ইহা খুবই স্বাভাবিক। এই অভিজাতদের গর্বের বিরুদ্ধে নাদিরের যে সংগ্রাম তাহাই নানারূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। শিয়-সুন্নিকে এক করার চেষ্টা—শিয়া সম্প্রদায়ের আভিজাত্য-গর্বের বিরুদ্ধে সংগ্রামেরই একটা রূপ। শিয়া সুন্নি এক হইলে যেমন সাম্প্রদায়িক বিরোধ থাকিবে না, তেমনি থাকিবে না সুন্নি নাদিরের বিরুদ্ধে শিয়া-সম্প্রদায়ের বিদ্বেষ—অভিজাতদের শিয়া ধর্ম চেতনায় অভিমান ও উন্নাসিকতা।]

পারস্যের সম্রাট হইবার পরে উচ্চাকাঙ্ক্ষার আগুনে নাদিরের রক্ত টগবগ করিয়া ফুটিতে থাকে। তৈমুরলঙের মত তিনিও দিগ্বিজয়ের স্বপ্ন দেখিতে থাকেন। মৃত পারস্যকে তিনি শুধু যে সঞ্জীবিতই করেন নাই, দুর্বল জাতকে তিনি এক অপরাজেয় যোদ্ধায় পরিণত করিয়াছেন। তিনি শুধু যে সমস্ত হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করিয়াছেন তাহা নহে, পারস্যকে এক বিরাট সাম্রাজ্যে পরিণত করিয়াছেন। নাদিরের দিকে আজ শত্রুরা বিস্মিত আতঙ্কে চাহিয়া আছে

শাহ নাদিরের প্রথম লক্ষ্য হয়—কান্দাহার। ৮০,০০০ সৈন্য লইয়া তিনি অভিযানে বহির্গত হন। এক বৎসর অবরোধের পর কান্দাহার আত্মসমর্পণ করে—আফগানিস্তান পারস্যের অধীন হয়। আফগান খিলজাইদের সহিত নাদির খুব বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করেন। এই খিলজাই সৈন্যরা আমৃত্যু নাদিরের প্রিয়পাত্র ও অনুগত থাকে।

ইহার পর আসে ভারতের পালা। ভারতের সিংহাসনে তখন ঔরংজীবের অপদার্থ বংশধর মহম্মদ শাহ। পলাতক আফগানদের আশ্রয় না দেওয়ার জন্য নাদির মহম্মদ শাহের কাছে পত্রে অনুরোধ জানান। মহম্মদ শাহ বিলাসে বেহুঁস। আমীর-ওমরাহরা নিজেদের স্বার্থের পুঁটলি বড় করিতেই ব্যস্ত। অযোধ্যার সাদৎ আলি এবং দাক্ষিণাত্যের নিজাম উল-মুল্ক ক্ষমতা অধিকার করিবার জন্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত এবং ষড়যন্ত্র-সূত্রে একতাবদ্ধ। সকলেই বিষকুম্ভ এবং পয়োমুখ। 'ঘর পুড়ুক ছাই খাই'- নীতি ছাড়া আর কোন নীতি ইহাদের নাই। শাহকে ঘিরিয়া আছেন এই সকল শকুনির দল। শাহ পত্রের উত্তরটি পর্যন্ত দেন না। ফলে নাদির ১৭৩৮ খ্রীঃ ভারতবর্ষ অভিযানে অগ্রসর হন। দিল্লীর ষাট মাইল উত্তরে কর্ণাল রণক্ষেত্রে নাদিরের সহিত মোগল সৈন্যের শক্তি পরীক্ষা হয়। পরীক্ষার ফল যাহা হইবার তাহাই হয়—বহু মোগল সৈন্যের প্রাণ হরণ করিয়া জয়লক্ষ্মী নাদিরের শিবিরে প্রবেশ করেন। সাদৎ আলি বন্দী হন। অগত্যা নিজাম উল-মুল্ককে নাদিরের

শিবিরে সন্ধির প্রস্তাব দিয়া প্রেরণা করা হয়। শেষ পর্যন্ত সম্রাটকেও দন্তে তৃণ করিয়া নাদিরের সম্মুখে উপস্থিত হইতে হয় এবং মুকুট অর্পণ করিয়া বশ্যতা স্বীকার করিতে হয়।

নাদির বাদশাহের বশ্যতাকে উদঘোষিত করিবার জন্য, বিশেষত দিল্লীর রাজকোষ হস্তগত করিবার জন্যই—সদর্পে দিল্লী পর্যন্ত অগ্রসর হন। বাদশাহ ভারতের ঐশ্বর্য নাদিরের পদে সমর্পণ করিয়া, সর্বতোভাবে সেবা করিয়া মুকুটটি রক্ষা করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু এই অবস্থাটি অনেকের মনঃপুত হয় না। ঘর না পুড়িলে ছাই খাওয়ার সুযোগ যাহাদের হইবে না তাহাদেরই কেহ নাদিরের মৃত্যু সংবাদ রটনা করিয়া দেয়: ফলে বাদশাহের সৈন্যদের এবং নাগরিকদের দ্বারা নাদিরের সৈন্য আক্রান্ত ও হতাহত হয়। নাদির প্রথমতঃ বিক্ষোভ দমন করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নির্বিচার হত্যার আদেশ দিয়া নিজে একাকী একটি মসজিদে গিয়া অবস্থান করেন। নাদির সৈন্যের নির্বিচার হত্যা-লীলায়, দেখিতে দেখিতে দিল্লী শব-পুরীতে পরিণত হয়। নিরুপায় মোগল সম্রাট নাদিরের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া যুক্তকরে দয়া ভিক্ষা করেন। নাদির সম্রাটের প্রার্থনা পূর্ণ করেন—হত্যালীলা বন্ধ করিবার আদেশ দেন। এইভাবে নাদির তাঁহার ভারত অভিযান শেষ করেন—প্রচুর ধন-রত্ন, ময়ূর-সিংহাসন এবং বাদশাহ-কন্যাকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করিয়া ধূমকেতু নাদির ভারতের আকাশ হইতে বিদায় গ্রহণ করেন।

ইহার পর, নাদির বোখারা-অভিযানে-ব্যাপৃত পুত্র রেজা কুলির সহিত মিলিত হন। (১৭৪০) রেজা কুলি পিতার সুযোগ্য পুত্র—পিতার মতই দুঃসাহসী এবং পিতার মতই যোদ্ধা। পিতা কিন্তু পুত্রের এই বীর্যবত্তাকে অকুণ্ঠচিত্তে অভিনন্দন জানাইতে পারেন না—পুত্রের প্রতি পিতার ঈর্ষা জন্মে। এই ঈর্ষা একটি ঘটনায় দাউ দাউ করিয়া জলিয়া উঠে এবং রেজার সুন্দর দুইটি চক্ষু পুড়াইয়া দেয়। নাদিরকে একবার কয়েকজন পাঠান গুলি করিয়া মারিবার চেষ্টা করে। গুলি নাদিরের কানের পাশ দিয়া চলিয়া যায় বটে কিন্তু সন্দেহের

ধোঁয়ায় তাঁহার মন কালো হইয়া যায় এবং ক্রোধের বারুদে আগুন লাগিয়া যায়।

তাহার মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয় -গুলির পিছনে রেজাকুলির অদৃশ্য হস্ত আছে। রেজাকে অন্ধ করিবার আদেশ দিয়া তিনি প্রতিবিধান করেন। ইহার জন্য পরে অবশ্য তিনি মনস্তাপ কম ভোগ করেন নাই বটে, কিন্তু গোড়াতেই পুত্র-বিদ্রোহের জড় মারিয়া রাখেন। রেজা বীরের মত পিতার শাস্তি মাথা পাতিয়া গ্রহণ করেন এবং বলেন "এই চক্ষু আমার নয় এ সমগ্র ইরাণ জাতির চক্ষু"।

"বোখারা" অভিযান সম্পন্ন করিয়া নাদির "খিবা" অধিকার করেন (১৭৪০) এবং পারস্যকে এক বিরাট সাম্রাজ্যে পরিণত করেন। এখানেই যদি নাদির তাঁহার অভিযানে পূর্ণচ্ছেদ টানিয়া দিতেন, তাহা হইলে নাদির ইতিহাসে স্বদেশ-ভক্তবীররূপে স্মরণীয় হইয়া থাকিতেন। কিন্তু তাহা না করিয়া তিনি "লেস্‌গাই" অভিযানে উদ্যত হন। দাঘিস্তানের এই লসগাই জাতিরা খুবই দুর্ধর্ষ। ইহাদের উপর নাদিরের আক্রোশও ছিল। কারণ নাদিরের দাদাকে ইহারা হত্যা করে। কিন্তু যিনিই এই জাতিকে পরাজিত করিতে গিয়াছেন, তিনিই নিজের বিনাশ ডাকিয়া আনিয়াছেন। নাদিরের জিদ—দমন না করিয়া ছাড়িবেন না—ভ্রাতৃ-হত্যার প্রতিশোধ না লইয়া ছাড়িবেন না। এদিকে প্রজাদের ধনপ্রাণের ক্ষতির অন্ত নাই। ভারত হইতে যে ধনসম্পত্তি আনিয়াছেন তাহাতে হাত না দিয়া নাদির নতুন করিয়া প্রজার ধন শোষণ করিতে থাকেন। ১৭৪১-৪২ এক বৎসর ধরিয়া এ. ব বার আক্রমণ করিতে গিয়া নাদির শুধু ধন-প্রাণই নষ্ট করেন, তেমন কোন কে ন কোন ফলই পান না। নাদিরের চাহিদা প্রজাদের সহ্যের সীমা ছাড়াইয়া যায়। তারপর তুরস্ক অভিযানের প্রস্তুতিতে এবং সেই যুদ্ধে ধনপ্রাণের ক্ষয়ক্ষতিতে প্রজাদের মধ্যে সক্রিয় প্রতিরোধের স্পৃহা জাগ্রত হয়। অনিবার্য অসন্তোষ এখানে ওখানে বিদ্রোহের আকারে উৎক্ষিপ্ত হয়।

নরবন্ধ ও তবরশরণ, শিরোশান, জর্জিয়া, দাগিস্তান, অস্ত্রাবাদ—চারিদিকে বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠে। তখন নাদির অনেকটা পাগলের মত। রক্ত দিয়া বিদ্রোহের আগুন নিভাইতেই তিনি অভ্যস্ত। অভ্যস্ত পথেই তিনি অগ্রসর হন। প্রতি দৃষ্টিতে তিনি হিংসা দেখেন—প্রতি আচরণে তিনি গোপন ষড়যন্ত্রের গন্ধ পান। হত্যার আদেশ ছাড়া নাদিরের মুখে কথা নাই—প্রত্যেকটি নাগরিকের প্রাণে আতঙ্ক, প্রত্যেকটি পরিচর সন্ত্রস্ত—কখন কাহার হত্যার আদেশ হয়। এমন দিন যায় না—যেদিন প্রাণদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয় না। [illegible]—প্রত্যেকের [illegible] রাজকে বেজমাৎ করিবার আদেশ, [illegible] আক্রমণ [illegible] আত্মীয়স্বজন কাহারও [illegible] নাই— [illegible] চক্ষু উপড়াইয়া লইবার আদেশ। ভ্রাতুষ্পুত্র [illegible] চাই।

[illegible] নাদিরের [illegible] [illegible] হইতে ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করেন। [illegible] দিগ্বিজয়ী জীবনের উপর যবনিকাপাত হয়।

নাদির সম্পর্কে ঐতিহাসিক তথ্য মোটামুটি এইটুকুই পাওয়া যায়। আর যাহা পাওয়া যায় তাহা কিংবদন্তী। [ঐতিহাসিক স্যার মর্টিমার ডুর‍্যাণ্ড ইতিহাস ও কিংবদন্তী মিলাইয়া নাদিরশাহের একখানি সুখপাঠ্য জীবনী লিখিয়াছেন"—এই জীবনীই নাট্যকারের সহায় হইয়াছে। (নাট্য-কাহিনী—ইতিহাস + কিংবদন্তী)]

এখন, ইতিহাস হইতে বিযুক্ত করিয়া না দেখিলে, নাদিরকে, সামন্ততান্ত্রিক

সমাজের মত একটি সমাজের একজন ব্যক্তি হিসাবে, উচ্চাকাঙ্ক্ষাসম্পন্ন দুঃসাহসী ও দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধা হিসাবে, রণ কুশল সৈন্যাধ্যক্ষ এবং স্বৈরাচারী একজন শাসক বা শাহ হিসাবেই দেখিতে হইবে, আর বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে হইবে নাদিরের এই বিস্ময়কর উত্থানের এবং শোচনীয় পতনের কারণগুলিকে। ঐতিহাসিক তাহার সমাজ বিজ্ঞানের জ্ঞান থাকে অবশ্যই নাদিরের মধ্যে কোন অলৌকিক শক্তির খেলা দেখিতে পাইবেন না, আবার [illegible] এই সামাজিক অবস্থাটি যাহাকে নাদিরের "পরিবেশ" [illegible] বলিবেন, —ব্যক্তি নাদিরের [illegible] বৈশিষ্ট্য এবং এই পরিবেশের [illegible] ব্যক্তির [illegible] করার ইতিহাসটুকু [illegible] দেখাইবেন, কেমন করিয়া নাদির [illegible] শক্তির অধিকারী হইয়াছেন, কেমন করিয়া [illegible] তিনি দেশবাসীর শ্রদ্ধাভক্তি, ভয়ের পাত্র হইয়া উঠিয়াছেন তথা [illegible] শক্তির পরিচয়কে [illegible] [illegible] আবার কেমন করিয়া [illegible] [illegible] [illegible] মধ্যে নাদিরের [illegible] [illegible] মানসিক প্রকৃতিতে যে পরিবর্তন ঘটিয়াছে, তাহা [illegible] উল্লেখ করিতে না পারেন এমন নয়। এক কথায় ঐতিহাসিক [illegible] নাদিরকে তৎকালীন নৈতিক অবস্থার মধ্যে রাখিয়াই দেখিতে বা বুঝাইতে চেষ্টা করিবেন।

তারপর মনস্তত্ত্ববিদের কাছে নাদিরের আচরণ 'manic depressive insanity"-র লক্ষণ বলিয়া প্রতিভাত হইতে পারে। নাদিরকে 'Self-elation'-এর 'exaltation'-এর এক উৎকট নিদর্শনও বলা যাইতে পারে। এক্ষেত্রেও দেখান যাইতে পারে—নাদির "displays an attitude of lofty superiority, an exaggerated belief in his own capacities, there is nothing he can not achieve, he feels and therefore believes

that physically and mentally he is a superman His excitement is an excitement of a particular kind ; it is not specifically amorous or fearful or curious or altruistic, it is the excitement of an intensified self assertion unbalanced, unchecked by any effective self criticism or by deference to any other person—" (Outline of Abnormal Psychology — 356)

সংক্ষেপে—মনঃসমীক্ষকের চোখে নাদির অহং-প্রতিষ্ঠার এক উৎকট বিকৃতি। নাদির নিজেকে অতিমানব মনে করিলেও এবং অতিমানব বলিয়া উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিলেও—তাহার অতিমানব-অভিমান মনের বিকৃতি মাত্র—বাস্তবিক কোন ব্যাপার নয়।

দিগ্বিজয়ী নাটকে নাদির

কিন্তু নাট্যকার পুরোপুরি ঐতিহাসিকের বা মনস্তাত্ত্বিকের মনোভঙ্গী লইয়া নাদির-চরিত্র উপস্থাপিত করিতে যান নাই। তিনি নাদিরের উপর "অতিমানব" দর্শনের দিব্য আলোক প্রক্ষেপ করিয়াছেন। নাদির তাঁহার কাছে "অতিমানব" —("Superman" না বলিয়া "Overman" বলাই সঙ্গত) নাদিরের জীবনের ইতিহাস এখানে গৌণ—উপায়, "নাদিরের জীবনের ·····তত্ত্বকথা" (philosophy) মুখ্য বা লক্ষ্য। নাট্যকারের নিজের স্বীকৃতিকেই সাক্ষ্য হিসাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে—"নাদিরের জীবনের যে তত্ত্বকথা (philosophy) আমি এই নাটকে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, তাহা ইতিহাস-বিরোধী নয়।" অবশ্য শুধু 'তত্ত্বকথা' হইলে বলিবার কিছুই থাকিত না, এখানে 'তত্ত্বকথা'য় নাট্যকার অতিমানব-রহস্যে মণ্ডিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

নাট্যকারের এই উক্তি অবশ্য স্বীকার্য —"নাটকের অনেক চরিত্র এবং দৃশ্য ঐতিহাসিক। কোন স্থলেই আমি ইচ্ছা করিয়া ইতিহাসের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করি নাই এবং নাটকের বাহিরের ঐতিহাসিক রূপটিকেও অবহেলা করি নাই"; ইহাও স্বীকার্য—স্বাধীন কল্পনায় নাট্যকারের এবং ঔপন্যাসিকের চিরন্তন

অধিকার আছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও অবশ্য স্বীকার্য যে ঐতিহাসিক চরিত্র অবলম্বনে নাটক রচনা করিতে গেলে বাহিরের ঐতিহাসিক রূপটি রক্ষা করাই বাস্তবতার পক্ষে যথেষ্ট নয়, বরং কল্পনার পাখায় ভর দিয়া উড়িবার স্বাধীনতা যতই থাক, স্বাধীনতাকে স্বেচ্ছাচারের বিশৃঙ্খলা বা অসঙ্গতি হইতে মুক্ত রাখিতে হইবে। বাহিরের ঐতিহাসিক রূপের কাঠামোতে ব্যক্তি চরিত্রের যে প্রতিমা স্থাপন করিতে হইবে তাহাকে [illegible] বাস্তবতা [illegible] আদর্শবাদের দিক দিয়া চরিত্রের [illegible] হইবে। অন্যথা বাহিরের রূপগত বাস্তবতা সত্ত্বেও, অন্তরের অসঙ্গতিতে, গভীর মহত্ত্ব (high seriousness) [illegible] এর [illegible] রূপ (Form) এবং [illegible] (Content) [illegible] কাটাইছেন [illegible] নাটকে [illegible] চেষ্টা [illegible] নাটকে [illegible] ঐতিহাসিক [illegible] নাটকের [illegible] মধ্যে পূর্ণ [illegible] থাকায় দোষাবহ ব্যাপার নহে—কিন্তু [illegible] মধ্যে [illegible] চরিত্রের 'ঐক্য' তথা জীবন চর্চা (criticism of life) [illegible] কামনা [illegible] অবশ্যই স্বীকার্য।

নাটককে পুরাণের [illegible] ট্র্যাজেডি রচনা করা চলে। [illegible] দেশবাসীর হস্তে, অন্তর্গত এবং বহিঃশত্রু [illegible] নহে। [illegible] পরিণামই বটে। আবার এই ট্র্যাজেডির নিয়তিকে বাহিরের ঘটনায় রাখিয়া, হৃদয়ের হাহাকারের মধ্যেও স্থাপন করা সম্ভব।—এই ট্র্যাজেডি নায়কের ব্যক্তি

সম্রাট ট্র্যাজেডি[illegible] এবং প্রমাদের আত্মক্ষয়ের ট্র্যাজেডি। আর এক ট্র্যাজেডিও কল্পনা করা যাইতে পারে—ইহা অতিমানব নাদিরের ট্র্যাজেডি—বিরাট আদর্শের অনুসরণের জন্য ধর্মাঘাতজনিত ট্র্যাজেডি—মহত্তম আদর্শের উন্মাদনায় অ[illegible] সংগ্রাম করিতে করিতে শোচনীয় ভাগ্য-বিপর্যয় [illegible] সাম্রাজ্য পাশে বাঁধিবার কল্পনা [illegible] অথবা মানব-সমাজকে মুক্ত করিবার জন্য সংগ্রাম [illegible] —ক্ষুদ্র মানবের শক্তির [illegible] ট্র্যাজেডি। খ্রীষ্টোফার মার্লো "ট্যাম্বারলেন দি গ্রেট" [illegible] তৈমুরলঙ্গের জীবনকে যেরূপ — tragic [illegible] রূপায়িত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন—তেমন অবশ্য এ ক্ষেত্রে [illegible] অবকাশ তেমন নাই। [illegible] [illegible] হওয়া সত্ত্বেও [illegible] — the scourge of god হওয়া সত্ত্বেও তাঁহাকে মৃত্যুর কাছে হার মানিতে হইবে। তাহার [illegible]—shall sickness prove me now to be a man that have been termed the terror of the world? না নাদিরের এই ট্র্যাজেডির স্বর সৃষ্টি করা একেবারে অসম্ভব না হইলেও ইতিহাস অসমর্থিত। যাহা হউক নাট্যকার ঐতিহাসিক-নাদির ব্যক্তি-নাদির এবং অতিমানব-নাদির এই তিন নাদিরের উপাদানে দিগ্বিজয়ী নাটক রচনা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং তিনের সমবায়ে যে একক ব্যক্তি-সত্তাটি সেই সত্তারই ট্র্যাজেডি উপস্থাপিত করিয়াছেন। তবে কতদূর কৃতকার্য হইয়াছেন—বিচার্য বিষয়। কিন্তু যে কথা আগেই বলা হইয়াছে—নাট্যকার History of Nadir এবং Philosophy of Nadir এর মধ্যে যাহাকে ঠিক অবিরোধ সমন্বয় বলে তাহা সৃষ্টি করিতে পারেন নাই এ কথা সত্য, নাদিরসাহের **ইতিহাসের বাহিরের রূপটি** নাটকে আছে—[ভারত-অভিযানের পরে—দেশে ফিরিয়া গিয়া (রাজনৈতিক আর্থনৈতিক কারণে) দেশবাসীরই উপর অত্যাচার—সেই অত্যাচারের প্রতিক্রিয়ার ফলে দেশবাসীর হস্তে অপমৃত্যু], কিন্তু এ কথা সত্য নহে যে— **ইতিহাসের**

পন্তিবিধি [illegible] ও [illegible] [illegible] উপর অত্যাচার [illegible] করে [illegible] অত্যাচারের মূলে যে কারণ আরোপ [illegible] তা [illegible] হয় নাই। স্বাধীন [illegible] একথা বলা [illegible] পারে—নাদিরের মুখে [illegible] এই [illegible] [illegible]) [illegible] অত্যাচারসমূহ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রকটিত হয় নাই। অতি মানবের বাহ্যলক্ষণ নাদিরে না আছে এমন নহে—"Energy intellect and pride these make the superman -এবং এগুলি নাদিরের আছে। নাদিরের নীতি —morality of masters (Herren moral) Heerden moral—(morality of herd) নয়।

নাদিরের কাছেও —'To be brave is good'— [illegible]) All that increases the feeling of power, the will to power, power itself in man What is bad? All that comes from weakness (Nietzsche) কিন্তু ইহা বাহ্য লক্ষণ মাত্র অতিমানবের সমস্ত শক্তি-

সাহস নিয়ন্ত্রিত হওয়া চাই একটি কেন্দ্রগত মহান্ উদ্দেশ্য দ্বারা—'ক great purpose "কারণ—"To have a purpose for which o- cifi- be hard upon others, but above all upon one's self, to[ha]ve a purpose for which one will do almost anything···tha[t i]s the final patent of nobility ; the last formula of the superman" মহান উদ্দেশ্য না থাকিলে এবং সঙ্কল্প ও কার্যে 'উদ্দেশ্য'-সাধনা ব্যক্ত না হইলে, শুধু শক্তির প্রকাশ মাত্রকেই অতিমানবত্ব বলা চলে না। নাদিরশাহের অতি-মানবীয় সংকল্প—'আমি সমগ্র পৃথিবীতে একচ্ছত্র মহম্মদীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে চাই।'—'আমি সমগ্র হিন্দুস্থানে নূতন শাসনতন্ত্র, নূতন ধর্ম-তন্ত্র প্রচার কর্তে চাই।" কিন্তু এই সকল সঙ্কল্পের সঙ্গে নাদিরের নিষ্ঠার যোগ নাই। ভারত জয় করিবার পরে নাদির ভারতে কোন নূতন শাসনতন্ত্র বা ধর্মতন্ত্র, কোনটিই প্রবর্তন করেন নাই বা করিতে চেষ্টা করেন নাই অথবা ভারত বিজয়ের পরে—চীনে বা অন্য কোন দেশে তিনি অভিযান করেন নাই। কখনও সে সঙ্কল্প ব্যক্তও করেন নাই। অতিমানবীয় আদর্শের প্রতি নাদিরের আন্তরিক কামনা বা নিষ্ঠা থাকিলে, আদর্শচ্যুতি-জনিত অস্থিরতা বা বেদনা অবশ্যই দেখা দিত। কিন্তু আক্ষেপেরই কথা—নাট্যকার নাদিরকে অন্য দ্বন্দ্বের আবর্তে জড়াইয়া লইয়া অতিমানবের মহান সঙ্কল্পটি একেবারেই ভুলাইয়া দিয়াছেন এবং আসক্তির জন্য অতিমানবের মধ্যে যে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া প্রত্যাশিত তাহা ব্যক্ত করেন নাই। এই কারণে নাদিরের সঙ্কল্প, মুখের কথা হইয়াই আছে নাদির চরিত্রের স্বাভাবিক সংস্কারে পরিণত হয় নাই! ফলে নাদির হইয়াছে 'ঘরেও নহে পারেও নহে যে জন আছে মাঝখানে' – এমনি ধরনের একটি চরিত্র।

অতিমানবীয় প্রেরণা বা চেতনা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া জৈবিক প্রেরণার অর্থাৎ হৃদয়ের সহজ কামনা-বাসনার দ্বন্দ্ব দেখাইতে পারিলে নাদিরশাহ চরিত্রটি বাস্তবতার দিক দিয়া আরো যুক্তিসঙ্গত হইতে পারিত। নাট্যকার নাদিরের

গতিবিধি নিয়ন্ত্রণের সময় যে পরিমাণে ইতিহাসকে অনুসরণ করিতে চেষ্টিত হইয়াছেন, সেই পরিমাণে ভাব-কল্পনার সহিত ঐতিহাসিক ঘটনা-ন্যাসের সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে, কার্যকারণ যোগ রক্ষা করিতে, সচেতন হ'ন নাই। একটু সচেতন হইলে, নাদিরের ভারত হইতে পারস্যে প্রত্যাবর্তন—রেজাকুলির প্রতি দণ্ডাদেশ—সিতারার প্রতি বন্দিত্বের আদেশ—দেশবাসীর উপর নির্মম অত্যাচার প্রভৃতি সমস্ত ঘটনা-পরম্পরাকেই অভিমানবের আদর্শের সহিত সঙ্গতি রাখিয়াই সাঙ্গ-সঙ্গত রূপ দিতে পারিতেন। সত্য বটে যে নাদিরের জীবনে যে ট্র্যাজেডি দেখানো হইয়াছে তাহা যৌগিক। দিগ্বিজয়ী নাদিরের ভিতরে বাহিরে শোচনীয় পরিণতি ঘটিয়াছে— ভিতরে পুত্র-বিয়োগ হইয়াছে, হারেম বিষাক্ত হইয়াছে এবং সেই বিষ-ক্রিয়ার প্রতিষেধ করিতে গিয়া প্রাণপ্রিয় পুত্রকে অন্ধ করিয়াছেন—প্রেমিকা সিতারাকে নির্বাসিত করিয়াছেন। ইহারই ফলে, স্নেহ ও প্রেমের তৃষ্ণায় তাঁহার হৃদয় বেদনায় ও অব্যক্ত হাহাকারে ভরিয়া গিয়াছে। আর বাহিরে অত্যাচারে অত্যাচারে দেশবাসীর সমস্ত শ্রদ্ধা ভক্তি আনুগত্য হারাইয়া বসিয়াছেন সমগ্র দেশকে শত্রু-শিবিরে পরিণত করিয়াছেন এবং শেষ পর্যন্ত গুপ্তঘাতকের আঘাতে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। ইতিহাসের পটভূমিতে, পারস্য সম্রাট ভারত-বিজয়ী বা দিগ্বিজয়ী নাদিরশাহের শক্তিমদমত্ত রাজনৈতিক জীবনের এবং পারিবারিক জীবনের ট্র্যাজেডি দেখাইবার অবকাশ নাদিরের ইতিহাসে প্রত্যক্ষ, কিন্তু অতিমানবত্বের আরোপ সহজ হইলেও অতিমানব-ধর্মাঘাত-জনিত ট্র্যাজেডি দেখানোর অবকাশ তেমন নাই। এই নাটকে রাজ-নাদির বা শাহ-নাদিরের ট্র্যাজেডির পরিকল্পনা যতটুকুই ব্যক্ত হউক না কেন অতিমানব-নাদিরের ট্র্যাজেডির ধ্যান নাট্যকারের মধ্যে স্পষ্ট আকার পায় নাই এবং পায় নাই বলিয়া নাদিরের পতনে অতিমানবের পতন-জনিত বিস্ময় বা বেদনা জাগে না।

নাট্যকার কিন্তু মূলতঃ অতিমানব-রূপেই নাদিরকে রূপ দিতে চেষ্টা

করিয়াছেন। মঙ্গলাচরণে তিনি নাদিরকে—'সকল জাতির বিধাতার যুগ অবতার বলিয়া বন্দনা করিয়া লইয়াছেন, রহমতের মুখে নাদিরকে তিনি প্রশ্ন করিয়াছেন—'সম্রাট, আপনার জীবন এমন বিচিত্র যে তার সামঞ্জস্যের সূত্র আমরা সন্ধান করতে পারি না, পারি না পীড়ন, ধ্বংস, সৃষ্টি, ইরাণের মুক্তি না ইরাণ সাম্রাজ্যকে দাসত্বে কঠিন নিগড়ে বন্ধন—আপনার কার্যের যথার্থ উদ্দেশ্য কি?' নাদিরের মুখে উত্তরও একটি দিয়াছেন—'আমি ঈশ্বরের প্রতিনিধি—জগতের শান্তিদাতা।...... যে মানুষের সামান্য ত্রুটিও ক্ষমা করে না, জাতির ত্রুটি ক্ষমা করে না—সেই ক্ষমাহীন দয়াহীন বিচারক ঈশ্বর আমায় পৃথিবীতে পাঠিয়েছে পাপী দণ্ড বিধান করতে।' নাট্যকার এই অভিমানব-নাদিরকেই রূপ দিতে ইচ্ছা করিয়াছেন কিন্তু যিনি বিধাতার যুগাবতার—ঈশ্বরের প্রতিনিধি—দেশ ধর্মনীতি যাঁহার স্বরূপে বিকাশ, যিনি নীৎসের ভাষায় বলি—"Beyond good and evil—' তাঁহার ট্র্যাজেডির যোগ্য রূপ এখানে ব্যক্ত হয় নাই। উদ্দেশ্য যাহাই হউক, এখানে কল্পিত হইয়াছে এক শক্তিমান দিগ্বিজয়ী ব্যক্তির ট্র্যাজেডি—শক্তির মাদকতায় যিনি নিজের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে নষ্ট করিয়াছেন ঘরে বাহিরে—শত্রু সৃষ্টি করিয়া জীবনকে জটিল আবর্তের মধ্যে নিমজ্জিত করিয়াছেন এবং তথা শোচনীয় পরিণতি ঘটাইয়াছেন। অতিমানবের ট্র্যাজেডিকে নাট্যকার শেষ পর্যন্ত—ব্যক্তি-নাদিরের স্নেহের ও প্রেমের অবলম্বন হারাইবার ট্র্যাজেডি—পরিকল্পনার সংকীর্ণক্ষেত্রে গুটাইয়া আনিয়াছেন। বিচার করিয়া দেখা যাউক—সেই পরিকল্পনা কতদূর কার্যে পরিণত হইয়াছে।

দিগ্বিজয়ী নাটকের জাতি পরিচয়

When men grow insolent with prosperity and trample on the prayers of the weak, then into their palaces into their inmost souls, there comes, says Homer, the dark figure of

Ate. Who is Ate? Ate is human infatuation, the blindness that darkens those who sin through pride. And she does not only blind; She drives her victims to compass their own doom. 'God maddens first the man he would destroy.'

[Literature And Psychology"

—F L. Lucas]

নাট্যকার নাটকের 'নিবেদন'-অংশে লিখিয়াছেন—"'দিগ্বিজয়ী' নাটকখানি ঐতিহাসিক হইলেও ইহার মূল ভাবটি চিরন্তন, সেইজন্য ইহার কোন ঐতিহাসিক নাম (অর্থাৎ 'নাদিরশাহ' এই নাম) দিলাম না ...... এই সকল **অতিমানবের** জীবন কথা সঙ্গে সঙ্গে অনেক বা ও দেশ ও জাতির মর্ম কথা আসিয়া পড়ে এবং নাটকখানি বিনা আয়াসে "ঐতিহাসিক নাটক" হইয়া উঠে। সে হিসাবে "দিগ্বিজয়ী" ঐতিহাসিক নাটক; কিন্তু এ কথাটা বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে, নাদিরের জীবনের যে তত্ত্বকথা (Philosophy) আমি এই নাটকে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, তাহা ইতিহাস-বিরোধী নহে।" এই 'নিবেদন' হইতে অনায়াসেই নাট্যকারের উদ্দেশ্য আবিষ্কার করা যায় এবং সিদ্ধান্তও করা যায় যে 'কাহিনীর উৎস' ভিত্তিতে নাটকখানি ঐতিহাসিক বটে, কিন্তু উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে নাটকখানি "তত্ত্ব-মুখ্য", কারণ নাটকে "নাদিরের জীবনের তত্ত্বকথা"কেই মুখ্য উপস্থাপ্য করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বলাবাহুল্য, তত্ত্বমুখ্য নাটকে চরিত্র-চিত্রণ বা রস-সৃষ্টি অনাবশ্যক নহে।

তারপর প্রশ্ন—দিগ্বিজয়ী নাটককে ট্র্যাজেডি বলা যাইবে কি না? মার্লো যেমন তাহার 'ট্যামারলেন দি গ্রেট" নাটকের 'প্রোলোগ'-এ লিখিয়াছেন —"View but his picture in this tragic glass ···" আমাদের নাট্যকার 'নিবেদন'-এ তেমন কোন কথা লেখেন নাই, সুতরাং নাটকখানি তাঁহার মতে কি তাহা জানিবার সুযোগ আমাদের নাই। অবশ্য এই সুযোগ

না দিয়া একদিক দিয়া তিনি উপকারই করিয়াছেন—তিনি সমালোচকের বুদ্ধি বিচারকে প্রভাবিত করিতে চেষ্টা করেন নাই—নাটকখানিকে নিজের শৈল্পিক মূল্যেই আত্মপরিচয় দিতে দিয়াছেন।

তবে নাট্যকার না বলিয়া দিলেও, নাটকখানি আপাতদৃষ্টিতে অবশ্যই ট্র্যাজেডি বলিয়া প্রতিভাত হইবে। নাদিরশাহের মত একজন দিগ্বিজয়ী সম্রাটের পতন যাহা এ নাটকে অঙ্কিত হইয়াছে, সেখানে "fall of a great monarch"-এর সূত্র প্রয়োগ করিয়া, এক রকম চক্ষু বুজিয়াই বলিয়া দেওয়া যাইতে পারে—নিশ্চয়ই নাটকখানি ঐতিহাসিক ট্র্যাজেডি। নাট্যকার অন্যান্য নাটকের মধ্যে কোন কোন পাত্রের মুখে নাদিরের ট্র্যাজিকত্বের তথা নাটকখানির ট্র্যাজিকত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সাকী বেগ—যেখানে বলেন—'দুনিয়াতে অনেক প্রতিভা পথহারা হ'য়ে পথভ্রষ্ট জ্যোতিষ্কের মত কালের ঘূর্ণিপাকের অন্ধকারে ডুবে গেছে, না হয় আর একটা যাবে" (৫ম অঙ্ক) সেখানে নাট্যকার নাদিরের ট্র্যাজেডির প্রকৃতির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়াছেন। আবার পঞ্চম অঙ্কেও সালেহ বেগের মুখে ট্র্যাজেডির কারণটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন—'ঈশ্বর তাকে শক্তি দিয়েছিলেন অনন্ত কিন্তু সে-শক্তির সদ্ব্যবহার সে করেনি" প্রথম অঙ্কে জ্যোতির্বিদের মুখে নাদিরের পতনের তথা ট্র্যাজেডির কারণ প্রকাশ করিয়াছেন "আপনি নিজে যদি আপনার শত্রুতা না করেন—জগতে কোন শত্রু আপনার কিছুই করতে পারবে না"। তৃতীয় অঙ্কের শেষাংশে জনৈকা "রমণী"র অভিশাপের মধ্য দিয়া নাট্যকার নাদিরের জীবনের ট্র্যাজেডির স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"স্ত্রীপুত্র কন্যা, পারিবারিক জীবন বিষাক্ত হবে—নিখিল সংসার বিষাক্ত হবে……..তোমার সিংহাসন বিষাক্ত হবে—প্রজা বিষাক্ত হবে—হারেম বিষাক্ত হবে…"। এই সকল উক্তি সাজাইয়া গুছাইয়া আমরা নাট্যকারের পরিকল্পনাটি এইভাবে ব্যক্ত করিতে পারি—নাদির একটি প্রতিভা—অনন্তশক্তি দিয়া বিধাতা তাঁহাকে পাঠাইয়াছেন।

কিন্তু এই শক্তির অপব্যয় করিয়া তিনি দিশাহারা হন—স্ত্রী-পুত্র-কন্যা বিশ্বসংসারকে শত্রু করিয়া তুলেন ফলে শোচনীয় পরিণতিতে তাঁহার জীবনের শেষ হয়।

দেখা যাক, নাট্যকার কিভাবে এই পরিকল্পনাকে কাযে পরিণত করিয়াছেন।

নাদির পারস্যদেশকে তুর্কী, রুশ, আফগান, আরমনী, উরাবেগী দস্যুর হাত থেকে উদ্ধার করেছেন। সমগ্র পারস্যজাতি এক হয়ে ....নরসিংহের মাথায় মুকুট। পারস্যের রাজমুকুট পারে ... অর্থাৎ নাদির শুধু এক জন অনন্যসাধারণ উচ্চাশী বীর্যবান পুরুষ নহেন—দেশের মুক্তিদাতা। নাদির অনন্ত সমৃদ্ধি ... ও উদাম নীতি নিয়ে জন সমাজের সংখ্যা হতে এই মহত্ত্বের উদয় করেছেন" ... অদ্ভুত তাহার সাহস, সূক্ষ্মগ্রাহী প্রতিভা, বুদ্ধি, বিস্ময়কর তাহার আত্মপ্রত্যয়—সংযমময় আচরণ—'পঞ্চাশ কাজ এক সঙ্গে করে—কোনটার উপর যে তার আকর্ষণ সহজে ধরা যায় না।'

অধিকন্তু আছে পৃথিবী জয়ের উচ্চাকাঙ্ক্ষা। তবে শুধু জয়ের জন্যই জয় নহে, কারণ নাদির তো "তৈমুরলঙ্গ কি চেঙ্গিস খাঁর মত শুধু দিগ্বিজয়ী দস্যু" নন। নাট্যকারের কাছে, নাদির একজন অভিমানব—সমগ্র পৃথিবীতে তিনি একচ্ছত্র মহম্মদীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে চাহেন, এক ধর্ম রাজ্য পাশে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত পৃথিবীকে বন্ধন করিতে চাহেন। তাঁহার ভারত অভিযানের উদ্দেশ্য অর্থসংগ্রহ নহে, ভারতবর্ষে নূতন শাসনতন্ত্র নূতন নীতিতন্ত্র প্রচার করা, সহস্র অরাজকতার হাত হইতে ভারতবর্ষকে উদ্ধার করা। নাদিরের কাছে—'মুসলমান নামটি একটি বৃহৎ কল্পনা—"অনেক ক্ষুদ্র জাতি আর ধর্মকে এক করে বাঁচবার জন্য ও নামের সৃষ্টি হয়েছে"—এই উদার অনুপ্রেরণায়, এই অভিমানবীয় মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া নাদির দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়াছেন—তাঁহার কাছে—বংশ-পরিচয় অনাবশ্যক—নিজের পরিচয়ে মানুষ দাঁড়াবে,—এই পুরুষকারই তিনি চাহেন। আভিজাত্যকে এবং দীনতাকে তিনি সমান মাত্রায় ঘৃণা করেন। কিন্তু নাদির তো শুধু সামান্য উচ্চাকাঙ্ক্ষা

সম্পন্ন ব্যক্তি নহেন—তিনি যে অতিমানব—বিশ্বনিধাতারই মত "ইচ্ছায় বিচিত্র শক্তির লীলা" দেখাইতেও চাহেন। [এই পালার প্রথম অভিনয় হয় "পথের সুন্দরী" রাজপুত রমণী "সিতারা"-কে প্রধানা মহিষী-পদে অভিষিক্ত করায় এবং অভিজাত-কন্যা নিরাজকে তাহারই পদতলে বসাইয়া অভিবাদন করতে বাধ্য করায়—দ্বিতীয় অভিনয় হয়—দিল্লীতে নিষ্ঠুর হত্যা-লীলা—(শক্তির প্রকাশ মাত্র নহতের লীলা?) দেখাইবার পরে, অত্যাচার প্রপীড়িতদের ক্ষত্র অর্থের প্রলেপ দিয়া বেদনা আরোগ্য করিবার অহঙ্কারের মধ্যে—"এই জীবন। এই শক্তি এই আমি! আমি হত্যা ও উৎসবকে যুগল অশ্বের মত একরশি দিয়ে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছি"]

এই অতিমানব 'সর্বশক্তিমান নাদির শাহ দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়া ভারত অধিকার করিয়াছেন, ভারতের অপারমেয় ধনরত্নের সঙ্গে একটি রমণী রত্ন লাভ করিয়াছেন। এই রমণী সিতারা—"পথের সুন্দরী"। এই সুকণ্ঠি সুন্দরীর নয়নের অরুণ আভায় নাদিরের দৃষ্টি প্রসন্ন। সামান্য ক্রীতদাসীকে নাদির "প্রধানা বেগম"-এর আসন দান করিয়াছেন। এই হিন্দুস্থানের বালিকা সত্যই নাকি তাঁহার অন্তর স্পর্শ করিয়াছে এবং সেই স্পর্শে তিনি নূতন করিয়া যৌবন ফিরিয়া পাইয়াছেন।

কিন্তু নাদিরের পূর্ব প্রণয়িনী নিরাজ সিতারার এ সৌভাগ্যে স্বভাবতই ঈর্ষাপরায়ণা—ভ্রাতা আলির সাহায্যে সে পথের কাঁটা সিতারাকে অপসারিত করিতে চেষ্টিত আলির এবং অন্যান্যদের ষড়যন্ত্রে দিল্লীতে বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে নাদির—'নির্বিচার হত্যার' আদেশ দেন—দিল্লী শ্মশানে পরিণত—হয়—বাদশাহের কাতর প্রার্থনায় "জগজ্জয়ী" সম্রাট ক্রোধ সংবরণ করেন। এখানে এই 'শক্তির মাদকতা'য় নাকি নাদিরের পতনের আরম্ভ। এই হত্যার আদেশ দিয়া নাদির তাঁহার—সালে বেগের মতে—অতীতকে হত্যা করিয়াছেন এবং ভবিষ্যতকেও হত্যা করিয়াছেন, নিজের সর্বনাশ করিয়াছেন, পারস্য সাম্রাজ্যের সর্বনাশ করিয়াছেন—জগতের সর্বনাশ করিয়াছেন। সালে বেগের

মতে—মানব-চির-প্রীতির মানব জাতির মুক্তির বৃহৎ আদর্শ হইতে বঞ্চিত ; ভ্রষ্ট হইয়াছেন সাধারণ 'দস্যু'তে পরিণত হইয়াছেন। সালে বেগের ভাষায়—নাদির চান প্রভুত্ব, চান পূজা, চান 'মানবের রক্তে স্নান করতে'"

মানব জাতির মুক্তির কথা সালে বেগের মুখে শুনিয়া নাদির বলেন—"মানবের মুক্তির স্বপ্ন দেখ গে যাও। মানবের মুক্তি। ঈশা মুক্তি দিতে পারেন নি, মহম্মদ বুদ্ধ দিতে পারেন নি শত শত পয়গম্বর কত না বিফল মনোরথ হয়ে পরাজিত হয়েছে— সেই মুক্তি দেবে তুমি। * [হায়! এই কি সেই অতিমানব যিনি যুগাবতার। উদ্দেশ্যে যাহার মঙ্গলাচরণ বন্দনা রচিত হইয়াছে—

যুগে যুগে তুমি প্রকট নূতন রূপে
দেশ ধর্ম নীতি ভাষার স্বরূপ
বোধ অতীত তব পরম-অনুভূতি
জাতি-মঙ্গল, মানব-চির প্রীতি ...

এই কথা অবশ্যই উঠিবে যে নাদির যদি অতিমানবই হন তাহা হইলে নাদিরের আচরণকে প্রচলিত নীতিসূত্র দ্বারা মাপিতে যাওয়া ঠিক নহে, আর দিল্লীর হত্যা-লীলাকেও পতনের কারণ হিসাবে কল্পনা করা চলে না—কারণ অতিমানবের আচরণ সাধারণের বোধ-অগম্য।—ধর্মনীতি তাহার স্বরূপেই বিকাশ। যে সালে বেগ এই হত্যা-লীলার জন্য নাদিরকে অভিযুক্ত করিয়াছেন—হত্যালীলার মধ্যে নাদিরের পতনের বীজ আবিষ্কার করিয়াছেন, তিনিই শেষ মুহূর্তে ঘোষণা করিয়াছেন- "বন্ধু। তোমার কথাই সত্য। তুমি আমার কল্পনার চেয়ে সত্যই বৃহৎ।" সালে বেগের কল্পনার চেয়ে বৃহৎ হওয়ার তাৎপর্য এই যে নাদির যে-সব নিষ্ঠুর আচরণ করিয়াছেন তাহা আপাতদৃষ্টিতে অন্যায় মনে হইলেও অন্যায় নহে—অতিমানবীয় উদ্দেশ্যেরই অঙ্গ। অথচ নাট্যকার এই হত্যা-লীলাকেই নাদিরের ট্র্যাজেডির প্রধান কারণ রূপে দেখাইতে চাহিয়াছেন। বাস্তবিক যে কার্যে অতীত ও ভবিষ্যৎ উভয়ই নষ্ট হইয়া যায় তদপেক্ষা গুরুতর

কারণ আর কি হইতে পারে। কিন্তু এই হত্যালীলা নাদিরের পরবর্তী জীবনকে এমন কোনভাবেই প্রভাবিত করে নাই যাহার জন্য তাহাকে কারণ বলা চলে। বস্তুত হত্যার আদেশ, নাদিরের মনোবিকৃতিরূপ—কারণেরই কার্য অর্থাৎ নাদিরের ট্র্যাজেডির কারণ আরো গভীরে। মনোবিকারের মধ্যে নিহিত।

যদি বলা যায় নাদিরের পতনের কারণ 'নিছক 'শক্তির মাদকতা' তাহা হইলে নাদিরের অতিমানবত্ব অবশ্যই ক্ষুণ্ণ হইতে বাধ্য। বৃহৎ বা মহৎ উদ্দেশ্য হইতে যিনি বিযুক্ত, অর্থাৎ—বৃহৎ বা মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য যাঁহার আন্তরিক অভীপ্সাটুকুও প্রকাশ পায় না তিনি আর যাহাই হউন, নিশ্চয়ই অতিমানব নহেন। 'নাদির' অতিমানব—এই কল্পনা না করিয়া 'নাদিরের মধ্যে অতি-মানবীয় শক্তির সম্ভাবনা ছিল কিন্তু তাহা মতি-বিকৃতির জন্য, প্রবৃত্তির অতিরেকের জন্য কাজে পরিণত হইতে পারে নাই' এই পরিকল্পনা করিলেই, বর্তমান অসামঞ্জস্য এড়ানো সম্ভব। কিন্তু নাট্যকারের অতিমানব—দৈব ইচ্ছারই অভিব্যক্তি এ কথা ভুলিলে চলিবে না।]

দিল্লীর হত্যালীলার পরে জনৈক ভারতরমণীর মুখে দৈববাণীর মত এক দীপ্ত অভিশাপ উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে। এই অভিশাপটিকে (পুত্র বিষাক্ত হবে, হারেম বিষাক্ত হবে, প্রজা বিষাক্ত হবে) নাট্যকার ট্র্যাজেডির অন্যতম কারণের মতই পরিকল্পিত করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, অভিশাপকে ট্র্যাজেডির কারণ হিসাবে দাঁড় করানো ঐতিহাসিক নাটকে খুবই অবাঞ্ছিত (irrational) ব্যাপার। আসলে, কি দিল্লীর হত্যা ব্যাপার, কি—এই অভিশাপ, কোনটিকেই নাদিরের ট্র্যাজেডির "কারণ" বলা চলে না, কারণ—পুত্র বিষাক্ত হওয়ার সহিত এবং প্রজা বিষাক্ত হওয়ার সহিত দিল্লীর হত্যাকাণ্ডের কোন কার্যকারণ-যোগ স্থাপিত হয় নাই। হত্যাকাণ্ডের প্রতিক্রিয়ার ফলেই যে নাদিরের ভবিষ্যৎ নষ্ট হইয়াছে—ইহা নাটকে প্রমাণিত হয় নাই। (অভিশাপের সঙ্গে তৃতীয় অঙ্ক শেষ হইয়াছে)।

দেখা যাইতেছে—নাট্যকার, "পুত্র", "হারেম" ও "প্রজা" এই তিনটি

'অবলম্বন' বিষাক্ত ক'রে, নাদিরের জীবনকে ট্র্যাজিক ক'রবার চেষ্টা করিয়াছেন। পরিকল্পনা হিসাবে ইহা প্রশংসনীয়—কারণ ইহাতে ট্র্যাজেডিকে বাহিরের ঘটনার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রাখিয়া অন্তর্বেদনার মধ্যে—অন্তরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা প্রকাশ পাইতেছে। কিন্তু এই পরিকল্পনা কাযে পরিণত করিতে হইলে যেরূপ প্রস্তুতি আবশ্যক তাহা এখানে যথেষ্ট মাত্রায় আছে কি না তাহা অবশ্যই বিচার করিয়া দেখা দরকার।

পুত্রের বিষাক্ত হওয়া, নাদিরের পক্ষে তখনই ট্র্যাজিক হইতে পারে যখন নাদিরের পুত্রবাৎসল্য ঐকান্তিক। রেজাকুলিকে নাদির কত স্নেহ করেন বিচারের আগে সে সম্বন্ধে কোন আভাস পাওয়া যায় না। তবে চতুর্থ অঙ্কে বিচারের দৃশ্যে, নাদিরের নিজের মুখে পাওয়া যায়—"কিন্তু তোমার সমস্ত অপরাধের পাত্র পূর্ণ আচ্ছন্ন ক'রে আছে তোমার প্রতি আমার অন্ধ অনিবার পবিত্র, স্বাধীন স্নেহ, তুমি আমার জ্যেষ্ঠ সন্তান, এক দিন তুমি আমার সর্বস্বেরও অধিক ছিলে। সে দিনের স্মৃতি এখনো ম্রিয়মান হয়নি। আমি তোমার পিতা, বাইরে আমি কঠোর হ'তে পারি, কিন্তু তোমার কাছে স্নেহশূন্য নই"। সিতারার উক্তিতে উপরোক্ত সাক্ষ্য পাওয়া যাইতে পারে—'আমি জানি জাঁহাপনা কি মনোবেদনায় দিন কাটাচ্ছেন। তাঁর আহার নাই, নিদ্রা নাই, চিত্তের শান্তি একেবারে হারিয়ে ফেলেছেন। আমার আশঙ্কা হচ্ছে, এতদিনে বুঝি ভারতবর্ষের অভিশাপ ফলতে আরম্ভ হ'য়েছে। নাদিরের উক্তি হইতেও সাক্ষ্য সংগ্রহ করা যাইতে পারে "আজকের রাত্রি। আমার জীবনের বড় সঙ্কটাপন্ন রাত্রি!" অধিকন্তু এখানে তাঁর একটু অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে স্নেহপরায়ণতার সুন্দর অভিব্যক্তি আছে—"ঈশ্বর, ঈশ্বর, ঈশ্বর—যদি তুমি কেবল মাত্র ভাবুকের কল্পনা আর ধর্মব্যবসায়ীর পণ্য না হও, যদি মানুষের নিজের কৃতকর্মের ফলাফলের উপরেও তোমার কোনো কর্তৃত্ব থাকে, এই যন্ত্রণাই সৈনিক-পুরুষের বাক্য 'নিয়ন্ত্রিত কর—রেজাকুলী খাঁর বাক্য নিয়ন্ত্রিত কর।—(কাযদ্বারা কারণ অতি সুন্দরমাত্রায় উদ্ভাসিত হইয়াছে)। তারপর, নাদিরের

অন্তর্বিক্ষোভ "পুত্র বিষাক্ত হবে। সেই সন্ধ্যা—জীবনের প্রথম-স্বর্ণরশ্মি। তখন কোথায় ছিল পারস্য-সাম্রাজ্য, কোথায় ছিল হিন্দুস্থানের ঐশ্বর্য, কোথায় ছিল ময়ূর-সিংহাসন, কোথায় ছিল—কোহিনুর-রত্ন, কোথায় ছিল ভারত নারীর প্রেম, কোথায় [illegible] নারীর অভিশাপ।" নাদিরের বাৎসল্যকেই প্রমাণ করে [illegible] অঙ্ক। অবশ্য গ্রন্থ—"তারপর, উদ্দাম [illegible] কে" [illegible] প্রমাণ আগে [illegible] গেলেও কার্যক্ষেত্রে নাদিরের প্রতিক্রিয়া এবং [illegible] মধ্যে বাৎসল্যের পরিচয় যথেষ্ট [illegible] টাজিক-সংবেদনা [illegible] আয়োজন যথেষ্টই হইয়াছে। কিন্তু আয়োজনের মত যথেষ্ট বলিয়াই আমরা মনে করি না কেন ট্র্যাজিক [illegible] খুব তীব্র হইয়াছে [illegible] করা চলে না। রেজাকুলীকে দণ্ড দেওয়ার পরে পিতৃ হৃদয়ে যে বেদনা বিক্ষোভ স্বাভাবিক, তাহার কিছুই দেখা যায় না, ইতিহাসের-নাদির পুত্রের জন্য যেটুকু অনুতাপ ভোগ করিয়াছিলেন সেটুকুও এখানে পাওয়া যায় না। আর একটা কথাও মনে করা দরকার—দণ্ডাদেশের ঠিক পরেই এখানে দেখি—নাদির-চরিত্রের ভাষ্যকার, যে সকল কথার অবতারণা করিয়াছেন তাহাতে রসের অপগম বা বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। নাদিরের মধ্যে বাৎসল্যের উদ্বোধন করিবার ঠিক পরেই,—তাহার সম্বন্ধে "পুত্র, পরিবার, স্বদেশ, কিছুই তার আপনার নয়"—এই ধরনের উক্তিযোজনা করায়—নাদির 'একা' তাহার কোন "আত্মীয়" নাই—এই সব কথা বলায়, 'রসের পরিপন্থী প্রযোজনা হইয়াছে। কারণ পুত্র যদি নাদিরের "আপনার"ই না হয় তাহা হইলে পুত্র বিচ্ছেদের বেদনাও তীব্র হইতে পারে না—পুত্র-বিষাক্ত-হওয়া তেমন শোচনীয় ঘটনাও হইতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ—'**হারেম**' **বিষাক্ত হওয়ার ঘটনা বিচার** করা যাউক। "হারেম" অর্থে এখানে বিশেষতঃ 'সিতারা' (সিরাজী নয়)। সিতারা রাজপুত রমণী কিন্তু "পথের সুন্দরী"। নাদির সিতারার রূপ-যৌবন দেখিয়া প্রথমে আকৃষ্ট

হন এবং শেষপর্যন্ত তাহাকে বিবাহও করেন। এই বিবাহের মূলে — যাহাকে ঠিক "প্রেম" বলা হয়, তাহা নাই। সে তারাকে নাদির বিবাহ করেন—"ইচ্ছার বিরুদ্ধে [illegible] খেয়াল মিটাইবার জন্য, [illegible] মোহের জন্যও [illegible] "[illegible] তাহার [illegible] মন্দ নয়।" — [illegible] দ্বিতীয় অংকে সিতারার কথার মধ্য দিয়া অবশ্য নাদিরের [illegible] হইয়াছে — "[illegible] দিন থেকে সে [illegible] [illegible] না।" এই অঙ্কেই [illegible] — "তোমার কথা [illegible] আমার [illegible] ফিরে পেয়েছি। তুমি [illegible] ছিলে [illegible] আমার [illegible] না। [illegible] নাই। "[illegible] মার্জনা করবেন — আপন [illegible] চলিতে পারেনি", তাই সাতদিন আপনার দেখা পায়নি"—এই ঘটনাটি অমুক পাপের ফল [illegible] কি? তারপর [illegible] সাহও [illegible] প্রেমের তেমন কোন উল্লেখযোগ্য পরিচয় ফুটিয়া উঠে নাই — [illegible]। ভালবাসা বলিতে যাহা বুঝায় তেমন ভালবাসার অভিব্যক্তি নাদিরের মধ্যে দেখা যায় না। প্রেমিকের স্বভাব এবং প্রেমের আর্তি নাদিরের মধ্যে এমন-কোন মাত্রায় দেখানো হয় নাই যাহার জন্য আমরা নাদিরের প্রেমিক-সত্তার ব্যথায় ব্যথিত হইতে পারি।

চতুর্থ অঙ্কে, অতি-নাটকীয় আকস্মিকতার সহিত, নাট্যকার নাদিরের প্রেমাতুর রূপটি অঙ্কন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। নাদির নিজের মুখেই নিজের জীবনভাষ্য রচনা করিয়াছেন—"তোমার কাছে আমার এই প্রার্থনা, এ বিশ্বাস যেন না ভাঙ্গে। যদি কোনদিন ভাঙ্গে সিতারা—জানবে, সেই মুহূর্তে আমার পতন আরম্ভ হবে- কারণ বাঁচবার মত আর কোনো অবলম্বন তখন

থাকবে না।" প্রশ্ন উঠিতে পারে—সিতারার প্রতি যে বিশ্বাস সেই বিশ্বাস হারানোই কি তার পতনের কারণ? সিতারার প্রেমের মধ্যেই কি নাদিরের শক্তির মূল এবং পতনের বীজ নিহিত? এখানে দিগ্বিজয়ী এবং "অতিমানব" নাদিরের মধ্যে অতিমানবীয় আদর্শ-আবেগ একেবারেই আচ্ছন্ন—প্রেমই সর্বস্ব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নাদির স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন—"ধর্মের চেয়েও পৃথিবীতে ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ দান প্রেম। সে প্রেম যার জীবনে অসম্মানিত হয়, তার চেয়ে দুর্ভাগা পৃথিবীতে নাই। ঈশ্বর জানেন সিতারা, আমি তোমায় ভালবাসি।" অতিমানবে 'প্রেমিক-সত্তা' থাকিতে পারে না—এ কথা বলা উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু এ কথা অবশ্য স্বীকার্য যে সত্তাই কল্পনা করা হউক তাহাকে ঐকান্তিকভাবে ব্যক্ত করা চাই এবং সমগ্র সত্তার সঙ্গে তাহাকে মিলাইয়া দেওয়া চাই। "Tragic impression"—সৃষ্টি করিবার জন্য ভাবের যেরূপ ঐকান্তিকতা (seriousness) ও আন্তরিকতা থাকা দরকার, তাহা এখানে কমই আছে।

ঈশ্বরের দোহাই দেওয়া সত্ত্বেও, যাহারা নাদিরকে চিনিয়াছেন তাঁহারা জানেন (অবশ্য নাটক হইতেই চিনেন এবং জানেন) যে নাদিরের প্রাণ কেহই স্পর্শ করিতে পারে নাই এবং কি প্রেমে, কি স্নেহে নাদির কখনও ঐকান্তিক নহেন। নাদিরের কাছে—"পুত্র, পরিবার, স্বদেশ কিছুই তো আপনার নয়।"

মার্লো'র 'ট্যাম্বারলেন দি গ্রেট' নাটকে 'জেনোক্রাটের জন্য ট্যাম্বারলেনের যে ঐকান্তিক আবেগ দেখান হইয়াছে ঐ ধরনের ঐকান্তিকতা এখানে দেখাইতে পারিলেই—সিতারা বিচ্ছেদকে ট্র্যাজেডির উপযুক্ত 'উদ্দীপকে' পরিণত করা সম্ভব হইত। তাহা করা হয় নাই বলিয়া এবং নাদিরকে অতিমানবরূপে দেখাইবার মূল পরিকল্পনা করায় এবং স্নেহ-প্রেমের, পাপ-পুণ্যের লৌকিক সীমার ঊর্দ্ধে তাঁহার ব্যক্তিত্বকে স্থাপন করার চেষ্টা থাকায়,—'সিতারা-বিচ্ছেদ' বা হারেম-বিষাক্ত হওয়ার বেদনা তীব্র 'ট্র্যাজিক সংবিদ' জাগাইতে পারে না।

সত্য, সিতারার প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গেই—'ঈশ্বর, ঈশ্বর, সম্ভবতঃ তুমি নাই—যদি থাক, তুমি শুধু জগতের শাস্তিদাতা'—এই আর্তনাদটুকু নাদিরের গভীর বিক্ষোভ তথা সিতারা-আসক্তির নিদর্শন। তারপর পঞ্চম অঙ্কে, নাদিরের "ধীরে ধীরে প্রবেশ করিয়া কয়েকবার পরিক্রমণপূর্বক বাহিরের আকাশের দিকে" চাহিয়া থাকা, সিতারার স্মৃতির মধ্যে মগ্ন হইয়া যাওয়া এবং আক্ষেপের সঙ্গে বলা—"সে একদিন বলেছিল, ধরা দিলেই ধরতে পারে, নইলে ধরে সাধ্য কার! সমস্ত ইরাণী সাম্রাজ্যে তার চিহ্ন নাই। সম্ভবতঃ সে পলাতকাকে আর পাওয়া যাবে না!" সিতারার প্রতি আসক্তির লক্ষণ বলা চলে, কিন্তু নাদিরের শোচনীয় পতনের বা পরিণামের সহিত সিতারা বিতাড়নের কোন কার্যকারণ-যোগ স্থাপিত হয় নাই। নাদির 'নিষ্ঠুর', 'ভয়াল মূর্তি', 'সংহার মূর্তি' লইয়া জনসাধারণের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছেন, তাহার কারণ যে সিতারা-বিচ্ছেদ জনিত জ্বালা বা বিক্ষোভ তাহার কোন অভিব্যক্তি নাটকে নাই। নাদিরের নিষ্ঠুর আচরণের কারণ—নাটকের পাত্রপাত্রীরা সকলেই উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু কেহই পারে নাই—নাদির নিজে শেষে ব্যক্ত করিয়াছেন এবং যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন তাহাতে এইটুকু প্রকাশিত হইয়াছে—"একটু একটু করে শাস্তির মাত্রা দিন দিন বাড়িয়ে চলি এই আশায়, যদি সেই শাস্তির ফলে সমস্ত ইরাণ জাতির সজীব মূর্তির একবার দেখা পাই"—অর্থাৎ নাদিরের 'শাস্তিদানের তত্ত্বকথা'—ইহাই, অন্তত "ঠিক এই না হ'লেও অনেকটা এই বটে"। নাদির অত্যাচার করিয়াছেন নিজের মৃত্যু এড়াইবার জন্য নহে অথবা শুধু অভিজাতদের ষড়যন্ত্র সমূলে বিনাশ করিবার জন্যও নহে—পুত্র বা হারেম বিষাক্ত হওয়ার জ্বালা জুড়াইবার নিষ্ফল চেষ্টার জন্যও নহে, তাঁহার অত্যাচারের উৎস—প্রধানতঃ দেশপ্রীতি- ইরাণ-জাতির সজীব মূর্তি দেখার নিগূঢ় বাসনা! এই বাসনা নিশ্চয়ই মহৎ এবং মহৎ বলিয়াই নাদিরের নিষ্ঠুরতাকে অভিমানবীয় প্রবৃত্তিরই একপ্রকার অভিব্যক্তি বলিতে হইবে। সুতরাং নাদিরের নিষ্ঠুর আচরণে আর যাহাই প্রকাশ পাক, শোচনীয়তা প্রকাশ পায় না; ফলে ঐ

নিষ্ঠুরতাকে পতনের লক্ষণ হিসাবেও গণ্য করা চলে না। পুত্র ও হারেম বিষাক্ত হওয়ার জন্যই যদি নাদির অপ্রকৃতিস্থ হইতেন এবং অন্তর্দাহ মিটাইবার জন্য, অত্যাচারের পর অত্যাচার করিয়া যাইতেন তাহা হইলেই স্নেহ-প্রেম-হারানো ব্যাপার শোচনীয় tragic হইবার মর্যাদা লাভ করিতে পারিত। 'শান্তিদানের তত্ত্বকথার' মধ্যে অতিমানবীয় প্রবৃত্তি আরোপ করায়, পূর্ববর্তী সংবেদনার ধারায় (impression ব্যাঘাত-সৃষ্টি হইয়াছে—ছেদ পড়িয়া গিয়াছে—পুত্র বা হারেম বিষাক্ত হওয়ার ট্র্যাজিক তাৎপর্য পরিস্ফুট হইতে পারে নাই।

তৃতীয়তঃ—প্রজা বিষাক্ত হওয়ার ব্যাপার। যে নাদির একদিন পারস্যবাসীর কাছে মুক্তিদাতা ছিলেন, সেই নাদিরেরই বিরুদ্ধে প্রজারা আজ বিক্ষুব্ধ! শোচনীয় ঘটনাই বটে! কিন্তু নাট্যকার প্রজা-বিষাক্ত-হওয়ার যে কারণ দেখাইয়াছেন তাহা যথেষ্ট নহে—যথাযথভাবে ইতিহাসসম্মতও নহে। রেজাকুলিকে অভিজাতরা ভালবাসেন—সেই জন্যই নাদির অভিজাতদের উপর ইরাণের উপর অত্যাচার করিয়াছেন—ইহা আংশিক সত্য। আসল সত্য এই যে অর্থনৈতিক শোষণের চাপেই, যুদ্ধ-ব্যয়ের চাপেই প্রজারা বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে। আবার অভিজাতদের প্রতি বিদ্বেষই, নিষ্ঠুর আচরণের মূল কারণ তাহাও জোর করিয়া বলা যায় না, কারণ—শান্তিদানের তত্ত্ব-কথা যাহা শোনানো হইয়াছে তাহাতে দেখা যায়—ইরাণের সজীব মূর্তি দেখার বাসনাই "অনেকটা" কারণ এ কথা বলিতেই হইবে প্রজা-বিষাক্ত-হওয়ার রূপটি নাটকে তেমন প্রত্যক্ষভাবে ঐকান্তিকভাবে এবং ইতিহাসসম্মতভাবে উপস্থাপিত হয় নাই। এই কারণেই—প্রজা-বিষাক্ত-হওয়ার ব্যাপারটিতে—ট্র্যাজেডি-যোগ্য-শোচনীয়তা ব্যক্ত হয় নাই।

উল্লিখিত-আলোচনা সম্মুখে রাখিয়া সিদ্ধান্ত করিতে গেলে (১) **প্রথমতঃ** এই কথাটিই মনে হয় যে নাট্যকার নাদিরকে "অতিমানব" করিতে গিয়াই—(অবশ্য মঙ্গলাচরণে, অতিমানবের যে ধারণা প্রকাশ পাইয়াছে সেই অর্থে

অতিমানব) চরিত্রটিকে ইতিহাসের বাস্তব-পরিবেশ হইতে বেশ খানিকটা বিযুক্ত ও অলৌকিক করিয়া ফেলিয়াছেন, তথা চরিত্রটির 'high seriousness'-এর সম্ভাবনাকে ব্যাহত করিয়াছেন। এক কথায় বলা যায়—নাদিরের চরিত্রে অতিমানবের ট্র্যাজেডি ফুটিয়া উঠে নাই। নাদির মুখেই অতিমানব, তাঁহার কার্যে অতিমানব-আদর্শ নিষ্ঠা ব্যক্ত হয় নাই। ফলে, মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে যে নাট্যকার সমর্থ হন নাই এ কথা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। তারপর যদি মঙ্গলাচরণ বর্ণিত অতিমানব হিসাবে না দেখিয়া, যদি লৌকিক প্রতিভা হিসাবেই নাদিরকে দেখা হয়—অর্থাৎ দেখা হয়, সামরিক প্রতিভা হিসাবে বা রাজনৈতিক প্রতিভা হিসাবে—শক্তি-সাহস-অধ্যবসায়ের বিস্ময়কর ব্যক্তি-বিগ্রহ হিসাবে—এক অদ্ভুত ব্যক্তি হিসাবে, তাহা হইলেও, এ কথা বলিতে হইবে যে নাট্যকার নাদিরের জীবনকে যে ভাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন তাহাতে উচ্চাঙ্গ ট্র্যাজেডির গাঢ় রস নিষ্পন্ন হয় নাই। নাদিরের জীবনের ঘটনায় 'awe and grandeur'' না আছে এমন নয়, কিন্তু উচ্চাঙ্গের ট্র্যাজেডির জন্য শুধু 'awe and grandeur'-ই যথেষ্ট নহে—উহার জন্য চাই জীবন লীলার ঐকান্তিক বাস্তবতা- high seriousness দিগ্বিজয়ী নাটকে আর সবই আছে, নাই এই high seriousness—জীবনের ঐকান্তিক বাস্তব প্রকাশ, একটি একলব্য-লক্ষ্য। মনে করা যাউক, নাদিরের সমগ্র ব্যক্তিটি—নাদিরের ভিতর এবং বাহিরের সত্তা সমূহ লইয়া গঠিত। তাঁহার ভিতরে আছে—আত্মপ্রতিষ্ঠাকামী 'অহং'—সত্তাটি (will to live and assert) আছে আত্মপ্রজনন কামনার আবেগ—অর্থাৎ "প্রেম", আছে স্নেহ.. আছে বন্ধু-বাৎসল্য প্রভৃতি বৃত্তি, আর বাহিরে আছে—অহঙ্কারের বাস্তব অধিকার—বিরাট সাম্রাজ্য—অর্থাৎ সম্রাট-সত্তা। মোটামুটি ভাবে বলা যায়--নাদিরের 'অহং' স্নেহ-ধারায় পুত্র পৌত্রের সঙ্গে যুক্ত, প্রেম-ধারায় সিতারেরা সঙ্গে যুক্ত এবং আত্ম-প্রতিষ্ঠাকামনা-ধারায়—প্রজার সঙ্গে যুক্ত। দেখা যাইতেছে নাদিরের মধ্যে রাজনৈতিক বাসনা আছে, জৈবিক বাসনা আছে—(স্নেহ-প্রেম)

যাহা নাই তাহা হইতেছে নৈতিক এবং সামাজিক আবেগ (শান্তিদানের মধ্যে যে ইরাণ-প্রীতি তাহাকে সামাজিক আবেগ বলিলে অবশ্য ভিন্ন কথা)।

নাট্যকার উক্ত তিনটি যোগ হইতে—স্নেহ-যোগ, প্রেমযোগ এবং প্রতিষ্ঠা-যোগ হইতে—নাদিরকে বিযুক্ত করিয়া, সমগ্র ব্যক্তি-সত্তার মধ্যে বিয়োগ-জনিত নিঃস্বতা ও মর্মদাহ এবং শেষ পর্যন্ত মৃত্যু দ্বারা শোকাবহ পরিণাম ঘটাইয়া ট্র্যাজেডি-সংবেদনা (tragic impression) সৃষ্টির পরিকল্পনা করিয়াছেন। পরিকল্পনা হিসাবে যে ইহা খুবই প্রশংসনীয় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু পরিকল্পনাকে রূপ দিতে গিয়া, নাট্যকার বিয়োগজনিত বেদনা বা বিক্ষোভকে এমন মাত্রায় ব্যক্ত করিতে পারেন নাই, সংবেদনার পক্ষে যাহাকে যথেষ্ট বলা যায়। রসের ধারাটি অনুসরণ করিলেই ইহা উপলব্ধি করা যাইবে যে একটি ভাবের অভিব্যক্তি বা উদয় হইতে না হইতেই অন্য একটি ভাব—পরিপন্থী ভাব আসিয়া উহাকে প্রশমিত করিয়া ফেলিয়াছে। সংস্কৃত রসশাস্ত্রের পরিভাষায় বলিলে বলা যায়—অকাণ্ডে রসচ্ছেদ ঘটানো হইয়াছে, "পরিপন্থিরসাঙ্গস্য বিভাবাদেঃ পরিগ্রহঃ"—দোষ ঘটিয়াছে এবং শেষ পর্যন্ত "প্রকৃতিবিপর্যয়ঃ")—দোষও (নায়কাদীনাং তৎস্বভাবানাঞ্চ বিপর্যয়ঃ) দেখা দিয়াছে। [সাহিত্য-দর্পণের সপ্তম পরিচ্ছেদে রসদোষ-বিচার দ্রষ্টব্য] ইহার ফলে—যাহাকে ট্র্যাজিক ইম্প্রেশন বলা হয়, তাহা ঠিক জমাট বাঁধিতে পারে নাই। বাস্তবিকই পুত্র বিচ্ছেদ বা পত্নী বিচ্ছেদ, নাদিরের মধ্যে তেমন কোন মর্মস্পর্শী বেদনা-বিক্ষোভ সৃষ্টি করে নাই অথবা তাঁহার পতনকেও ত্বরান্বিত করিবার হেতু হইয়া উঠে নাই—আসল কথা পুত্র-বিচ্ছেদ বা পত্নী-বিচ্ছেদ নাদিরের সত্তাকে যে খুব মর্মান্তিক ভাবে স্পর্শ করিয়াছে তাহার প্রমাণ নাদিরের আচরণে স্পষ্টাকারে ব্যক্ত হয় নাই। নাদির পুত্র ও পত্নী হারাইয়াই যে বেশী অত্যাচারী ও নিষ্ঠুর হইয়াছেন—ভিতরের জ্বালা বাহিরের উত্তেজনা দ্বারা প্রশমিত করিতে চেষ্টিত হইয়াছেন, অভিজাতরাই পুত্র-বিচ্ছেদের জন্য দায়ী—এই মনোভাব লইয়া পুত্র-বিচ্ছেদের জ্বালা মিটাইবার জন্যই অত্যাচার করিতে উন্মত্ত হইয়া

উঠিয়াছেন—এই সব ভাব নাদির-চরিত্রে প্রত্যক্ষ পরিস্ফুট রূপ পায় নাই। বরং, যেখানে উল্লিখিত ভাব-সমূহ ব্যক্ত করাই উচিত কাজ ছিল সেখানে নাট্যকার পরিপন্থীভাব উদ্দীপিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। নাদিরের নিষ্ঠুরতা—অমানুষিক অত্যাচার সেই পর্যন্তই ট্র্যাজেডি-সংবেদনা সৃষ্টির উপযোগী যে পর্যন্ত উহারা নাদি রর পতনের লক্ষণ হিসাবে, পুত্র-পত্নী বিচ্ছেদের প্রতিক্রিয়া হিসাবে প্রতিভাত হইবে। বাস্তবিক, নাদিরের উন্মত্ত নিষ্ঠুরতা যদি শোচনীয় পতনেরই লক্ষণ না হয়, তাহা হইলে নাদিরের ভিত্তসন্ধান ট্র্যাজেডি কোথায়? কিন্তু নাট্যকার নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচারের প্রধান কারণটি এমন একটি মহৎ প্রেরণার মধ্যে স্থাপনা করিয়াছেন যাহা পূর্ববর্তী পরিকল্পনার পরিপন্থী এবং যাহা পূর্বোদিত ট্র্যাজেডি-সংবেদনাকে প্রায় নিঃশেষে ব্যাহত তথা প্রশমিত করিয়া ফেলে। যে অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতাকে পাঠকরা নাদিরের বিকৃতি বলিয়া মনে করিতে প্রস্তুত হন এবং নাদিরের জন্য শোচনা করিতে মনকে প্রস্তুত করেন, সেই অত্যাচার এবং নিষ্ঠুরতা, হঠাৎ দেশপ্রীতির—জাতি-প্রীতির অর্থাৎ অতি-মানবীয় একটি মহৎ প্রেরণার নিদর্শনরূপে দেখা দেয়। শাস্তিদানের তত্ত্বকথা শুনিবার পরে দর্শকের চোখে—অত্যাচারী ও নিষ্ঠুর নাদির অতিমানব-নাদিরের রহস্যালোকে উদ্ভাসিত তথা দুনিরীক্ষ্য হইয়া উঠেন। ফলে—দর্শকের চিত্তের পূর্বজাগ্রত ভাব-প্রবাহে সহসা ছেদ পড়িয়া যায়। রহমতের মতই দর্শকরা নাদিরের আচরণে সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পান না (রহমতের মুখে নাট্যকারের কথাই ব্যক্ত হইয়াছে—'সম্রাট আপনার জীবন এমন বিচিত্র যে তার সামঞ্জস্যের সূত্র আমরা সন্ধান করতে পারিনি।') দর্শকরা আর এ কথা মনে করিতে পারেন না যে নাদির, আত্মরক্ষার অন্ধ আবেগে—নিজের মৃত্যু এড়াইবার জন্যই, অত্যাচার ও নিষ্ঠুর আচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; অথবা অত্যাচারে-উন্মত্ত নাদির আসলে একজন বিকৃত-চিত্ত (nuerotic) ব্যক্তি, যিনি অবচেতন মনে পাপের প্রায়শ্চিত্ত কামনা তথা শাস্তি কামনা করেন এবং তাহা করেন বলিয়াই অত্যাচারের পর অত্যাচার করিয়া নিজের মৃত্যু ঘনাইয়া আনিতে তথা

আত্মহত্যা করিতে চাহেন—নাদিরের সমস্ত নিষ্ঠুর আচরণের মূলে আছে—'a secret impulse to seek punishment and so expiate the crime'—(Literature And Psychology, Lucas- 80 page) এ কথা মিথ্যা নহে যে নাদির শত্রু অন্বেষণ করিয়াছেন, কিন্তু এ কথা সত্য নহে যে এই শত্রু অন্বেষণের মূল প্রেরণা আত্মহত্যার গোপন আবেগ অর্থাৎ আত্মিক দ্বন্দ্বের পরিণাম হইতে আসিয়াছে। নাট্যকার এই মনস্তত্ত্বসম্মত ব্যাখ্যার পথ নিজের হাতেই বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। 'শাস্তিদানের তত্ত্বকথা' জানাইয়া দিয়া, নাট্যকার নাদিরকে যে পরিমাণে দেশপ্রেমিক—জাতি-প্রেমিক করিতে সমর্থ হইয়াছেন সেই পরিমাণেই নিষ্ঠুর-অত্যাচারের ট্র্যাজেডি-সম্ভাবনা হ্রাস করিয়া দিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে 'পুত্র-বিচ্ছেদ' 'পত্নী-বিচ্ছেদ' প্রভৃতি ঘটনাগুলিকে প্রতিক্রিয়া-বিহীন করিয়া তুলিয়াছেন। বাস্তবিক, নিষ্ঠুর অত্যাচারের প্রধান কারণ যদি পুত্র-পত্নী বিচ্ছেদ-জনিত মর্মজ্বালার মধ্যেই নিহিত না হয়, তাহা হইলে পুত্র-বিচ্ছেদ, পত্নী-বিচ্ছেদ প্রভৃতি ঘটনাকে এত ঘটা করিয়া দেখাইবার কোন প্রয়োজনই দেখা যায় না। পুত্র-বিচ্ছেদের, পত্নী-বিচ্ছেদের ক্ষোভ, নাদিরের মধ্যে একটা ক্ষণিকের উত্তেজনায় পর্যবসিত হইয়াছে—অন্তর্দাহের ফল্গুধারা হইয়া উঠিতে পারে নাই। শেষ পর্যন্ত নাদির-চরিত্রে ইহাই ফুটিয়া উঠিয়াছে যে নাদির ঠিক কক্ষচ্যুত নহেন—তাঁহার "ভয়ালরূপ"-এর মূলে আছে জাতি-প্রীতির প্রেরণা, দেশবাসী এই গোপন বাসনাকে ভুল বুঝিয়াছে—নাদিরের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হইয়াছে এবং শেষ পর্যন্ত নাদিরকে হত্যা করিয়াছে। তবে নাদিরের এই গোপন বাসনার দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে দেখা যায়—হত্যা-ব্যাপারটি নাদিরের পক্ষে ট্র্যাজেডি নহে, কারণ হত্যা, এই হিসাবে বাসনা-পরিপূরণ ছাড়া আর কিছুই নহে। তাইতো দেখা যায়—হত্যাকামী সালেবেগ প্রবেশ করিতেই নাদির সোৎসাহে বলেন—"সিরাজী, সিরাজী—এসেছে এসেছে সত্যিকার খোরাসানী—সবাই একসঙ্গে এসেছে, এক সঙ্গে এসেছে—।

কিন্তু যে প্রশ্নটি এখানে না উঠিয়া পারে না, তাহা এই যে এইরূপ বিপরীত উপায়ে—sadist-রীতিতে, দেশ-প্রীতি দেখাইবার এমন কোন্ অনিবার্য রাজনৈতিক পরিস্থিতি দেখা দিয়াছে? কোন বৈদেশিক আক্রমণের আশঙ্কায় মুখে, দেশবাসী অসাড় ও নিষ্ক্রিয় জীবন যাপন করিলে এবং অন্যভাবে সেই অসাড়তা ও নিষ্ক্রিয়তা ভঙ্গ করিতে না পারিলে নাদির এইভাবে অদ্ভুত দেশপ্রীতি দেখাইতে পারিতেন আর কোনভাবে সেই চেষ্টা সমর্থন করিলেও করা যাইতে পারিত; কিন্তু কী অনাবশ্যক এবং অদ্ভুত এই জাতি-প্রীতি। অতিনাটকীয় আজগুবি ছাড়া ইহাকে আর-কিছু বলা চলে না। ইহা যদি অতিমানবীয় হয় তবে অবশ্য অতিনাটকীয় ও আকস্মিকও বটে। এই পরিকল্পনার ফলে নাদির-চরিত্রটি যে পরিমাণে কাল্পনিক হইয়াছে সেই পরিমাণে তাহার ঐতিহাসিক গুরুত্ব হারাইয়া বসিয়াছে—ঐতিহাসিক পরিবেশ হইতে বেশ-খানিকটা অসংলগ্ন হইয়া পড়িয়াছে তথা চরিত্রের বাস্তবতার মায়াঘোরটুকু এবং high seriousness অনেক পরিমাণে নষ্ট হইয়াছে। উচ্চাঙ্গের ট্র্যাজেডির পক্ষে এই ধরনের লঘু কল্পনা বর্জনীয়, কারণ ইহা গাম্ভীর্যের পরিপন্থী, 'seriousness of purpose'-এর পরিপন্থী। এইসব কারণেই নাদিরের ব্যক্তিত্ব যে পরিমাণে 'dramatic' হইয়াছে, সেই পরিমাণে 'tragic' হইতে পারে নাই। নায়কের ব্যক্তিত্ব ও আচরণের বাস্তবতা তথা গুরুত্ব সম্বন্ধে যেখানে প্রশ্ন উঠে, সেখানে আর যাহাই হউক রসনিষ্পত্তি সম্পূর্ণ হইতে পারে না।

এইরূপ অবস্থায় নাদির ট্র্যাজিক চরিত্র কি না তথা দিগ্বিজয়ী ট্র্যাজেডি হইয়াছে কি না,—এ প্রশ্ন সোজাসুজি আমাদের সম্মুখে আসিয়া উত্তর দাবী করিবে। উত্তর কিন্তু সহজসাধ্য নহে। আমরা দেখিয়াছি—(ক) নাদির-চরিত্রে অতিমানবীয় আদর্শনিষ্ঠার ঐকান্তিকতা ও সেই আদর্শে পৌঁছিতে না পারার জন্য যে ট্র্যাজেডি—গভীর মর্মবেদনা, সেইরূপ কোন অতিমানবীয় ট্র্যাজেডির রস ফুটিয়া উঠে নাই (খ) দ্বিতীয়ত: নাদির-চরিত্রে

গভীর কোন আত্মিক বা নৈতিক দ্বন্দ্ব—অন্তরতম সত্তার (ego-ideal) মধ্যে পাপাচরণের জন্য কোন তীব্র বিক্ষোভ দেখা দেয় নাই, (গ) তাঁহার চরিত্রে পিতার, প্রেমিকের এবং দেশ-প্রেমিকের ট্র্যাজেডিও তেমন ঐকান্তিকভাবে ব্যক্ত হয় নাই। অতিমানব-নাদির, পিতা-নাদির, প্রেমিক-নাদির, দেশপ্রেমিক-নাদির—কোন সত্তারই ট্র্যাজেডি যথেষ্টরূপে ব্যক্ত হয় নাই। (যথেষ্টরূপে কথাটি মনে রাখা দরকার) এই হিসাবে বলা যায়—**নাদির চরিত্রে এইরূপ ট্র্যাজেডির পরিকল্পনা আছে কিন্তু সুষ্ঠু সম্পাদনা নাই।**

কেহ হয়ত বলিতে পারেন যে নাট্যকার এখানে একজন ব্যক্তির ট্র্যাজেডি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যাঁহার জীবনের ট্র্যাজেডি বিশেষ কোন একটি কারণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে—একাধিক কারণের সংঘট্টে, নানা সত্তার বিপর্যয়ে, ব্যক্তির জীবনটিতে শোচনীয় পরিণতি দেখা দিয়াছে। নাদিরের জীবনে অতিমানবীয় শক্তি ও প্রতিভার সম্ভাবনা আছে নাদির সেই দিক দিয়া অতিমানবীয় গুণের অধিকারী; কিন্তু নাদির তো শুধু অতিমানব নহেন—মানবও বটে সেখানে তিনি পিতা, প্রেমিক এবং দেশপ্রেমিক। এই সকল সত্তার সংযোগেই নাদির-ব্যক্তিত্বের সমগ্রতা। **এই নাটকে সমগ্রভাবেই নাদির-ব্যক্তিত্বের শোচনীয় পরিণাম দেখানো উদ্দেশ্য হইয়াছে—অতিমানব-ব্যক্তিত্ব সাধনা মাঝপথেই ভ্রষ্ট বা আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে, পিতার স্নেহের অবলম্বন, প্রেমিকের প্রেমের অবলম্বন বিষাক্ত হইয়াছে এবং শেষ পর্যন্ত একদা দেশের মুক্তিদাতা দেশবাসীর ভক্তি-শ্রদ্ধা হারাইয়াছেন—আবাল্য বন্ধুর হাতে প্রাণ দিয়াছেন।**

নাদির একদিকে দিগ্বিজয়ীবেশে—যখন (দ্বিতীয় রিচার্ডের মতে) "he is gone to save far off. (তখন) Whilst others come to make him lose at home, অন্যদিকে পুত্র, স্ত্রী, প্রজা সবকিছু বিষাক্ত হইয়া গিয়াছে।

এত বড় একটি শক্তিমান ও প্রতিভাবান ব্যক্তি যেখানে ভিতরে বাহিরে এইভাবে আহত হইয়াছেন -অকালে, অপমৃত্যুর মুখে পড়িয়া জীবন শেষ করিয়াছেন, সেখানে নাটক অবশ্যই ট্র্যাজেডি এবং নায়ক অবশ্যই ট্র্যাজিক। নাট্যকারের উদ্দেশ্য --যে শক্তির প্রাচুর্য নাদিরকে বড় করিয়াছে, সেই শক্তিরই মাদকতায় নাদিরের জীবনে শোচনীয় পরিণতি ঘটিয়াছে ইহাই উপস্থাপনা করা। তিনি দেখাইতে চাহিয়াছেন --"There is always a weak side to the character of a great man, there is always something wrong, or criminal, in the actions of a great man. This weakness misdemeanour, crime causes his downfall. But they necessarily lie deeply embedded in his character, so that the great man perishes from the very thing that is the source of his greatness"—চরনিশেভস্কির—এস্থেটিক রিলেশন অফ আর্ট টু রিয়েলিটি"—প্রবন্ধে উদ্ধৃত—ভিসেশেরের উক্তি। কিন্তু এই কথার উত্তরে বড় কথা এখানে এই যে এই সব তত্ত্ব নাটকে পরিস্ফুট আকারে রূপ পায় নাই --পরিকল্পনা, রূপ-রসে সার্থক সৃষ্টিতে পরিণত হয় নাই।—এই পর্যন্ত সত্য যে-- নাটকে উক্ত ট্র্যাজেডির রূপ ও রসের পরিকল্পনা আছে; কিন্তু কল্পনা ও আভাসই যেখা যথেষ্ট নহে। সার্থক সৃষ্টির জন্য চাই—সুসমঞ্জস রূপ এবং সু-অভিব্যক্ত রস। এই রূপের সঙ্গতি ও রসের অভিব্যক্তির দিক দিয়া নাটকখানি নির্দোষ হইতে পারে নাই। এ কথা সত্য এবং স্বীকার্য যে নাদিরের অবস্থিতি, গতি এবং পরিণতির মধ্য দিয়া একটি বিরাট ব্যক্তির অভ্যুদয় ও পতনের রূপ আভাসিত হইয়াছে এবং এই রূপের মধ্যে ট্র্যাজেডির বহিরঙ্গলক্ষণও আভাসিত হইয়াছে। কিন্তু বহিরঙ্গলক্ষণই যথেষ্ট নহে। উচ্চাঙ্গের সৃষ্টির পক্ষে বহিরঙ্গলক্ষণ-সঙ্গতিই যথেষ্ট নহে—অত্যাবশ্যক অন্তরঙ্গ-লক্ষণ-সঙ্গতি। বিশেষতঃ সমগ্র ব্যক্তিত্বের ট্র্যাজেডি দেখাইতে হইলে, ব্যক্তি-সত্তাদের যে পরিমাণে লক্ষণীয় ও ঐকান্তিক করিয়া তোলা দরকার-- তাহা

এখানে করা হয় নাই। ব্যক্তির আচরণের মধ্য দিয়া জীবনের ঐকান্তিক বাস্তবতা তথা গুরুত্ব ও গভীরতা ব্যক্ত না হইলে, ব্যক্তি-চরিত্র হিসাবে, অগভীর হইয়া পড়ে এবং তাঁহার বেদনা, বিক্ষোভের ও পরিণতির ট্র্যাজিকত্বও তেমন গভীর আন্দোলন সৃষ্টি করিতে পারে না। যে-সকল ব্যক্তিত্ব দিয়া নাদিরের ট্র্যাজেডি-সৃষ্টি করার চেষ্টা হইয়াছে তাহা পরিস্ফুট রূপ পায় নাই।

এই আলোচনার সূত্র ধরিয়াই কেহ আবার বলিতে পারেন "দিগ্বিজয়ী" নাটকে নাদিরশাহের "চরিত্র"—বিশেষতঃ চরিত্রে সামঞ্জস্যের অভাব দেখানোই নাট্যকারের অন্যতম উদ্দেশ্য হইয়াছে। রহমতের মুখে নাট্যকারেরই যেন কণ্ঠ শোনা যায়— "সম্রাট, আপনার জীবন এমন বিচিত্র যে তার সামঞ্জস্যের সূত্র আমরা সন্ধান করতে পারিনি"। নাট্যকার নাদিরের এই বিচিত্র ও সামঞ্জস্য-সূত্রহীন জীবনের রূপটিই নাটকে বিশেষভাবে ফুটাইতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং তাহাতেই নাদির-চরিত্রে অতিনাটকীয় খেয়ালপনা, প্রদর্শন প্রবণতা (exibitionism)—তথা অবাস্তবিকতা ফুটিয়া উঠিয়াছে। সামঞ্জস্য-হীনতার জন্য নাদির চরিত্রের গুরুত্ব কমিয়া গিয়াছে—এ কথা বলা অযুক্তিযুক্ত হইবে না।

এই পূর্বপক্ষীয় বক্তব্য উপেক্ষণীয় নয় বটে কিন্তু এ ক্ষেত্রে গ্রহণীয়ও নয়। কারণ, অসামঞ্জস্যকে যদি উপস্থাপ্য বস্তু হিসাবে গণ্য করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে স্রষ্টার কাছে অবশ্যই আমরা দাবা করিব—রীতিমত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াই অসাঞ্জস্যকে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। অকারণে কোন কাজই হয় না। নাদির-চরিত্র দর্শের কাছে অসামঞ্জস্যপূর্ণ বলিয়া যদি মনে হয়, বুঝিতে হইবে নাদির-চরিত্রের অন্তরতম প্রদেশে ব্যক্তিত্বের যে নানামুখী আবেগ আছে, তাহার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার রূপটি দর্শের কাছে স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয় নাই। সেই অবস্থায় নাট্যকারের দায়িত্ব—নাদিরের ব্যক্তিত্বের গভীর সংজ্ঞান-আসংজ্ঞান-নির্জ্ঞান আবেগ ও উহাদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার রূপগুলি সৃষ্ট

নিয়মশৃঙ্খলার মধ্য দিয়া উপস্থাপিত করা। ভাবাবেগের আকস্মিক প্রশম বা উদয় এবং গতি পরিবর্তনের মূলে হয় যথেষ্ট কারণ সন্নিবেশ করিতে হইবে, না-হয় এমন কোন সার্থক ইঙ্গিত দিতে হইবে যাহাতে কারণটি সহজেই স্বীকৃত হয়। এই নাটকে ব্যক্তিত্বের গভীর ও ঐকান্তিক আবেগ যথেষ্টমাত্রায় ব্যক্ত হয় নাই বলিয়াই নাদির-চরিত্রের অসামঞ্জস্য অতিনাটকীয় আকস্মিকতায় বা কৃত্রিমতায় পর্যবসিত হইয়াছে।

সুতরাং সোজাসুজি প্রশ্ন—(ক) নাটকখানিকে কি ট্র্যাজেডি বলা যায়?

(খ) উচ্চাঙ্গের ট্র্যাজেডি না হইলেও ট্র্যাজেডির তালিকায় স্থান পাইবে কি?

(গ) ট্র্যাজেডি না বলিয়া মেলোড্রামা বলিতে হইবে কি?

এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে অন্য একটি পক্ষের বক্তব্য সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলিয়া লওয়া যাইতে পারে। এই অন্য পক্ষের বক্তব্য এইরূপ হইতে পারে—'দিগ্বিজয়ী-নাটকে ট্র্যাজেডি-রস খুঁজিতে যাওয়ার কোন দরকার নাই; কারণ, নাটকখানি আসলে—ইতিহাস-নাট্য (Historyplay) অর্থাৎ নাদিরশাহের জীবনের নাট্যরূপ এবং ট্র্যাজেডির বা কমেডির রস সৃষ্টি করা অপেক্ষা ইতিহাসকে নাট্যের আধারে রূপ দেওয়াই এই নাটকের উদ্দেশ্য। এখন, এই ধরনের নাটক রচিত হইতে পারে কি পারে না তাহা লইয়া তর্কের যথেষ্ট অবকাশ থাকিলেও এখানে সে অবকাশ নাই। তবে এখানে যে নাট্যকারের মুখ্য উদ্দেশ্য—নাদিরের জীবনের ট্র্যাজেডিকেই উপস্থাপিত করা, তাহার প্রমাণ নাটকের মধ্যে সুস্পষ্টরূপেই পাওয়া যায়। সুতরাং "দিগ্বিজয়ী"কে "ইতিহাস-নাট্য" হিসাবে না দেখিয়া, 'ঐতিহাসিক ট্র্যাজেডি' হিসাবেই বিচার করিতে হইবে। সুতরাং ঐ প্রশ্ন—দিগ্বিজয়ী ট্র্যাজেডি কিনা—উত্তর দাবী করিবেই। একথা আগেই বলা হইয়াছে যে 'দিগ্বিজয়ী' নাটক নাদিরের ট্র্যাজেডি দেখাইবার উদ্দেশ্যেই রচিত। তারপর নাদিরের জীবনে এবং

নাটকেও ট্র্যাজেডির উপকরণ-আয়োজন কম নাই। কিন্তু নাটকের যিনি নায়ক, সেই নাদিরশাহের মতি-গতিতে ঐকান্তিকতা বাস্তবিকতা ও গম্ভীরতা অপেক্ষা, অতিনাটকীয় অস্থিরতা, ভঙ্গী-সর্বস্বত' এবং কৌতূহলজনক-প্রবণতা—এক কথায় কৃত্রিমতা ফুটিয়া উঠায়, ট্র্যাজিক-চরিত্র হিসাবে তাহার গাম্ভীর্য ব্যাহত হইয়া গিয়াছে; অধ্যাপক নিকলের ভাষায় বলা যাইতে পারে—নাটকের "grandeur of temper and aim" ব্যাহত হইয়া পড়িয়াছে। ফলে—দিগ্বিজয়ী নাটকখানিকে উচ্চাঙ্গের ট্র্যাজেডি বলা যাইতে পারে না। তবে, উচ্চাঙ্গের ট্র্যাজেডি না হইলেই যে নাটককে মেলোড্রামা বলিতে হইবে এমন কোন কথাও নাই। গঠনে সঙ্গতির পারিপাট্য এবং নায়কে অন্তর্দ্বন্দ্বের গভীরতা এবং তীব্রতা সব ক্ষেত্রেই অনবদ্য হইবে এমন আশা করা অন্যায়। সুতরাং যেখানে ট্র্যাজেডি-বোধের 'tragic impression) উদ্বোধ ঘটে এবং সঙ্গে সঙ্গে, উদ্দেশ্যের ঐকান্তিকতা এবং চরিত্রের বাস্তবিকতা সম্বন্ধে তেমন কোন সন্দেহ না জাগে, সেখানে নাটককে ট্র্যাজেডি বলিয়াই স্বীকার করা উচিত। দিগ্বিজয়ীর ক্ষেত্রে, আপাতদৃষ্টিতে ট্র্যাজেডি বোধের উন্মেষ না ঘটে এমন নয়। বিশেষতঃ নায়ক নাদিরশাহ একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি এবং এমন ঐতিহাসিক ব্যক্তি যাঁহার সম্বন্ধে ইতিহাসের মস্ত প্রামাণিক গ্রন্থে (এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা) লেখা আছে—He has been designated—robber chief, but his antecedents, like those of many others who have filled the position have redeeming points of melodramatic interest. নাদিরের জীবনটাই একটু মেলোড্রামাটিক। ইতিহাসে নাদির অনেকটা অতিমানুষ বা অমানুষরূপেই চিত্রিত। সুতরাং 'নাদিরশাহ' বলিতেই বিশেষ একটি স্মৃতি-চক্র বা ভাবানুষঙ্গ উপস্থিত হয়। এই কারণেই নাদির চরিত্রে বাহ্য ঐতিহাসিকতার যে মাত্রা আছে তাহা একধারে নাদিরকে মেলোড্রামাটিক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়ার মস্ত বাধা অন্যধারে, নাদির-চরিত্রের অতিনাটকীয়—এলোমেলো আচরণের

মাত্রা চরিত্রটিকে ট্র্যাজিক-নায়ক বলিবার পক্ষেও তেমনি বাধা। তবে এ কথাও স্বীকার্য যে কোন কোন স্থলে চরিত্র-সৃষ্টিতে "a penetrating and illuminating power of characterization যে না আছে এমন নহে এবং নাটকের মধ্যে সব কিছুর মধ্য দিয়া—"an insistence upon something deeper and more profound than more outward events"-ও লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু এ কথাও অনস্বীকার্য—ঐ সকল থাকা সত্ত্বেও নাদির চরিত্র শেষ দিকে এত মেলোড্রামাধর্মী হইয়া পড়িয়াছে—যে নায়কের গুরুত্বের অভাবে নাটকখানি ট্র্যাজেডির কেন্দ্র হইতে বিচ্যুত হইয়া মেলোড্রামার সীমান্তের দিকে সরিয়া গিয়াছে। এক কথায় বলিতে হইলে বলা যায়—**দিগ্বিজয়ী ট্র্যাজেডি ও মেলোড্রামার সীমানার উপর দাঁড়াইয়া আছে।** অবশ্য মেলোড্রামা অপেক্ষা ট্র্যাজেডির লক্ষণই যে নাটকে অধিক পাওয়া যায় সে বিষয়েও কোন সন্দেহ নাই।

সমালোচনা

(গঠন)

দিগ্বিজয়ী নাটকের গঠন সম্বন্ধে নাট্যকার "নিবেদন'—অংশে লিখিয়াছেন—"নাটক এবং উহার অভিনয় সম্পূর্ণরূপে নবযুগোপযোগী করিবার নিমিত্ত আমি আধুনিক নাট্য-রচনা রীতি (Ibsenian Technique) অবলম্বন করিয়াছি, কতদূর কৃতকার্য হইয়াছি, তাহার বিচারের ভার—সহৃদয় পাঠক এবং দর্শকের উপর।" সুতরাং "Ibsenian Technique" বলিতে কি বুঝায় তাহাই আগে পরিষ্কার করিয়া লওয়া দরকার এবং তারপর দেখা দরকার—নাট্যকার কি পরিমাণে ইবসেনীয় রীতি অবলম্বন করিয়াছেন।

ইবসেনীয়ান টেক্‌নিক্

'The Technical novelty in Ibsen's plays'—এবং What is the new element in the Norwegian School নামক প্রবন্ধে নাট্যকার-

সমালোচক সুবিখ্যাত বার্ণাড শ মহাশয় "ইবসেনীয় রীতি" নির্দ্ধারণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন—ঐ দুইটি প্রবন্ধ হইতে আমরা সারাংশ সংগ্রহ করিয়া দিতেছি—

(১)—"Discussion"—"আলোচনা"। [আগে ছিল—(ক) exposition (খ) situation (গ) unravelling ; এখন—(ক) exposition (খ) situation (গ) discussion] Now an interesting play cannot in the nature of things mean anything but a play in which problems of conduct and character of personal importance to the audience are raised and suggestively discussed)—137. page—"Major Critical Essays.")

( ) প্রচলিত অর্থে—"There are no villains and no heroes"

(৩) "The more familiar the situation, the more interesting the play.

আমাদের নাট্যকার 'ইবসেনীয় রীতি" বলিতে এখানে 'আলোচনা' প্রভৃতির কথা বলিতেছেন না, কারণ যোগেশচন্দ্রের নাটকের বড় বৈশিষ্ট্য—'আলোচনা' নয়—নাটকীয় কৌতূহল "a conflict of unsettled ideals" এর মধ্যে নিহিত নহে। "ইবসেনীয় রীতি বলিতে" নাট্যকার বোধ হয় এখানে দৃশ্য বর্জিত "অঙ্ক" বিভাগ বুঝাইতে চাহিয়াছেন; 'স্থান-ঐক্যের' প্রতি, দৃশ্য-সংক্ষেপের প্রতি অধিকতর লক্ষ্য রাখার রীতির কথা বলিতে চাহিয়াছেন। দিগ্বিজয়ী নাটকে মোট পাঁচটি অঙ্ক—প্রথম অঙ্কে, দ্বিতীয় অঙ্কে, তৃতীয় অঙ্কে ও চতুর্থ অঙ্কে দৃশ্যান্তর কল্পনা নাই ; শুধু পঞ্চম অঙ্কে—একটি বাড়তি দৃশ্য আছে—দৃশ্য সংখ্যা মোট দুইটি। সুতরাং, স্থান-ঐক্যের দিকে নাট্যকার যে খুব সতর্ক দৃষ্টি দিয়াছেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

দিগ্বিজয়ী-নাটকে সন্ধি ও অঙ্ক-বিভাগ

দিগ্বিজয়ী নাটকে—'কর্ণাল যুদ্ধের পরদিবস—রাত্রিকাল' হইতে নাদিরের অপঘাত-মৃত্যুর কাল পর্যন্ত (অর্থাৎ ১৭৩৯ হইতে ১৭৪৭ পর্যন্ত)—মোট আট বৎসরের ঘটনা উপস্থাপিত হইয়াছে। মেষপালকের পুত্র কিভাবে পারস্যের শাহ' হন এবং সিংহাসনে আরোহণ করেন (১৭৩৬) তাহা নেপথ্য ঘটনা। নাটকের আরম্ভ—'কর্ণাল যুদ্ধের পরদিবস রাত্রিকাল'—কর্ণালযুদ্ধে জয়ী নাদিরের বন্দী নবাব সাদাৎ আলি খাঁ'র সহিত কথোপকথনে, নাটকের শেষ নাদিরের হত্যার পরে, সাহেবেগের নাদির-প্রশস্তিতে।

কর্ণাল বা ভারত বিজয়ের পরেই নাদিরশাহের জীবনের ট্র্যাজেডি আরম্ভ হয়—ইহা ঐতিহাসিক সত্য। দিল্লীর হত্যাকাণ্ড, অমানুষিক নিষ্ঠুরতার নিদর্শন হিসাবেই ইতিহাসে লিখিত আছে বটে কিন্তু এই হত্যাকাণ্ডের মধ্যে আর একটা সত্যও আছে এবং সেই সত্য এই যে, যে শক্তি নাদিরকে বড় করিয়াছে, দেশের মুক্তিদাতারূপে পরিণত করিয়াছে—দিগ্বিজয়ীর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, সেই শক্তির মদই নাদিরের মধ্যে মত্ততা সৃষ্টি করিয়াছে। দিল্লীর হত্যাকাণ্ডই যে নাদিরের ট্র্যাজেডির মূল কারণ এ কথা অবশ্য বলা যায় না। ইহার পরে নাদিরের জীবনে যে সব শোচনীয় ঘটনা ঘটে তাহাদের মধ্যে, একটি—পুত্রের (রেজার) প্রতি অবিশ্বাস এবং সেই অবিশ্বাসের উত্তেজনায় পুত্রকে অন্ধ করিয়া দেওয়া, পরে মনস্তাপভোগ করা, অন্যটি—প্রজা পালনের দিকে দৃষ্টি না দিয়া দিগ্বিজয়ে মত্ত হইয়া উঠা—লেসজাই-অভিযানে, তুরস্ক অভিযানে দেশের ধনবল জনবলের নিরর্থক অপচয় করা—প্রজার নিকট হইতে করের উপর কর আদায় করিয়া যুদ্ধব্যয় নির্বাহ করার চেষ্টা করা—নিষ্ঠুরতম দণ্ড দিয়া দিয়া প্রজাকে বশীভূত করার ব্যর্থ চেষ্টা করা এবং শেষ পর্যন্ত অত্যাচারের প্রতিক্রিয়ার ফলে একদা-বিশ্বস্ত অনুচরের হস্তেই প্রাণ দেওয়া। ইতিহাসেই নাদিরের এই ভিতরের এবং বাহিরের ট্র্যাজেডির কারণ উল্লিখিত

আছে। পুত্রকে অন্ধ করিয়া নাদির যে মনস্তাপে দগ্ধ হইয়াছিলেন তাহাকে আমরা ভিতরকার ট্র্যাজেডি এবং প্রজা বিদ্রোহের ফলে বিশ্বস্ত অনুগামীদেরই হস্তে তাহার শোচনীয় পতন ঘটে -তাহাকে বাহিরের ট্র্যাজেডি বলিয়া মনে করিতে পারি॥

নাট্যকার—ভিতরকার ট্র্যাজেডি-কল্পনায় আর একটি ধারা যোগ করিয়াছেন—ইহাকে আমরা বলিতে পারি 'প্রেমের ধারা'। "সিতারা"কে দিয়া, প্রেমের ট্র্যাজেডি দিয়া নাট্যকার নাদিরের হৃদয়ের ট্র্যাজেডিকে সম্পূর্ণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। (সিতারা 'ভারতনারী'—'পথের সুন্দরী')

এই যোজনা অবশ্যই প্রশংসনীয়। যেভাবে যোজনা করা হইয়াছে তাহার সম্বন্ধে হয়ত কথা থাকিতে পারে কিন্তু যে কারণে যোগ করা হইয়াছে তাহা খুবই উল্লেখযোগ্য। ব্যক্তি নানা বৃত্তির যোগে জগতের সহিত যুক্ত হইয়া আছে। ব্যক্তির অহং-সত্তায় আত্মরক্ষার ও আত্মপ্রতিষ্ঠার কামনা যেমন মৌলিক তেমনি মৌলিক আত্মপ্রজননের বাসনা। এই বাসনা হইতেই ব্যক্তির প্রেম বৃত্তির, স্নেহ-বৃত্তির জন্ম। আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রতিষ্ঠা কামনায় ব্যক্তি সমাজের সহিত যুক্ত; আত্মপ্রজননের কামনায় ব্যক্তি—প্রেমের জন্য, স্নেহের জন্য লালায়িত—প্রেমাস্পদের সহিত, স্নেহাস্পদের সহিত যুক্ত। এই সব যোগ হারাইলেই, ব্যক্তি অন্তরে নিঃস্ব হইয়া পড়ে, মর্মপীড়া ভোগ করিতে বাধ্য হয়। ইতিহাসে নাদিরের বাহিরের যে ট্র্যাজেডি দেখান হইয়াছে তাহাতে পুত্র-যোগ এবং প্রজা-যোগ হারাইবার শোচনীয়তাই নির্দেশিত হইয়াছে। কিন্তু অন্তরের ট্র্যাজেডির সম্পূর্ণতার জন্য আরো অনেক কিছু চাই। ব্যক্তির আধ্যাত্মিক বা নৈতিক চেতনা মারাত্মকভাবে সঙ্কুচিত হইলে তথা আহত হইলে ব্যক্তির মধ্যে, জৈবিক অপেক্ষা গভীরতর কোন সত্তার—অর্থাৎ আত্মিক ট্র্যাজেডি ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে। নাট্যকার নাদিরের মধ্যে "আধ্যাত্মিক বা নৈতিক সত্তা" কল্পনা করেন নাই, "জৈবিক সত্তা"র মধ্যেই তাহাকে সীমাবদ্ধ করিয়াছেন। তবে অবশ্য জৈবিক সত্তাটির সমগ্র প্রবণতা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন

—না দরকে স্নেহের যোগ এবং প্রেমের যোগ হইতে বিযুক্ত করিয়াছেন। সিতারার যোজনা নাদিরের "প্রেমিক সত্তার" ট্র্যাজেডি দেখাইবার জন্যই করা হইয়াছে। অবশ্য এক ঢিলে নাট্যকার অনেক পাখী মারিয়াছেন—"সিতারা" নাদিরের—(নাট্যকারেরও) "আভিজাত্য" বিরোধী প্রচারের এবং সাম্প্রদায়িকধর্ম-বিরোধী প্রচারের নিমিত্ত হইয়া উঠিয়াছে—অর্থাৎ সিতারা শুধু ট্র্যাজেডিতেই অংশ গ্রহণ করে নাই, নাটকের ভাববস্তুরও নিমিত্তকারণ হইয়াছে।

দিগ্বিজয়ী-নাটকের অঙ্ক-বিভাগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায়—নাট্যকার নাদির-কাহিনীকে নিম্নলিখিত সন্ধিতে ভাগ করিয়া লইয়াছেন :—প্রথম অঙ্কে "মুখ সন্ধিতে (exposition) কর্ণাল যুদ্ধজয়ের পটভূমিতে, দিগ্বিজয়ী নাদিরের অতীত শৌর্য বীর্যের বিবরণ এবং নাদিরের অতিমানবীয় কামনা ও চারিত্রবৈশিষ্ট্য দিয়া, নাদির-ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা প্রদর্শন করা হইয়াছে সঙ্গে সঙ্গে—হারেম-বিষাক্ত হওয়ার বীজ "সিতারা"কেও স্থাপনা করা হইয়াছে এবং নাদিরের বিরুদ্ধে সিরাজী-আলিআকবরের মধ্যে যে ষড়যন্ত্র হইয়াছে—যে ষড়যন্ত্রের ফলে দিল্লীতে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে তথা নাদিরের 'কেন্দ্রচ্যুতি' ঘটিয়াছে, এবং পারস্যে প্রজা বিদ্রোহ ঘটিয়াছে,—সেই ষড়যন্ত্রের উদ্দীপক কারণটিকেও দেখানো হইয়াছে—সিরাজীকে দিয়া সিতারাকে অভিবাদন করানো হইয়াছে। দ্বিতীয় অঙ্কে—প্রতিমুখ সন্ধিতে (rising action), প্রথমতঃ—নাদিরের 'হারেম' বিষাক্ত করিবার জন্য সিরাজী-আকবরের ষড়যন্ত্র (সিরাজীর চক্রান্তের লক্ষ্য—"সিতারা" যে নাদিরের চোখে বিষ করিয়া দেওয়া, আকবরের মাথায়—রাজনৈতিক চক্রান্ত- নাদিরের পতন ঘটাইবার চক্রান্ত), দ্বিতীয়তঃ—সিতারা নাদিরের সম্পর্কটিও পরোক্ষভাবে দেখান হইয়াছে—বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছে—দেখানো হইয়াছে—সিতারার প্রেমের অমৃত স্পর্শে নাদির নূতন করিয়া যৌবন ফিরিয়া পাইয়াছেন—সিতারা নাদিরের অন্তর স্পর্শ করিয়াছে। তৃতীয়তঃ—

আলি আকবরের ষড়যন্ত্র কার্যরূপ গ্রহণ করিয়াছে। (১) দিল্লীর হত্যাকাণ্ডের উদ্যোগ-পর্ব রচনা করা হইয়াছে—নাদিরের মৃত্যুসংবাদ রচনা করা হইয়াছে, (২) আহম্মদ আবদালির সঙ্গে রেজাকুলির গোপন ষড়যন্ত্রের নিদর্শন বলা যায় এমন একখানি পত্র আলিআকবর নাদিরের হাতে পৌঁছাইয়া গিয়াছে তথা রেজাকুলি ও আহম্মদ আবদালীর প্রতি অবিশ্বাসের বীজ বপন করা হইয়াছে এবং চতুর্থতঃ—নাদিরের মধ্যে যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা বা আবেগ জন্মিয়াছে।

তৃতীয় অঙ্ক গর্ভসন্ধি (Climax)। এই অঙ্কে নাট্যকার নাদিরের শক্তি-মদমত্ততার বিকার তথা কেন্দ্রচ্যুতি দেখাইয়াছেন। দিল্লীর নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড দ্বারা নাদির তাঁহার অতীত ও ভবিষ্যৎকে হত্যা করিয়াছেন—অতিমানব কর্মযোগী নাদির "দস্যু" নাদিরে পরিণত হইয়াছেন—বিরাট প্রতিভা পথহারা হইয়া পড়িয়াছে; নাদিরের শক্তি মঙ্গল হইতে বিচ্যুত হইয়াছে তথা অশুভ উৎপাতে পরিণত হইয়াছে। নাদিরের উপর অভিশাপ বর্ষিত হইয়াছে "সিংহাসন বিষাক্ত হবে- প্রজা বিষাক্ত হবে—হারেম বিষাক্ত হবে—স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, পারিবারিক জীবন বিষাক্ত হবে।"

চতুর্থ অঙ্কে—**বিমর্ষ সন্ধি** (Falling Action)। নাদিরের ট্র্যাজেডি আরম্ভ হইয়াছে। পরোক্ষভাবে উপস্থাপিত হইয়াছে—মনোবেদনায় তিনি দিন কাটাইতেছেন; 'তাঁহার আহার নাই, নিদ্রা নাই, চিত্তের শান্তি তিনি হারাইয়া ফেলিয়াছেন।' এই মনোবেদনার কারণ—রেজাকুলি খাঁর (নাদিরের প্রিয় পুত্রের) আচরণ—রেজাকুলি খাঁর বিচার। তারপর দেখান হইয়াছে—খাজার স্বীকৃতি আদায় করিবার জন্য নাদিরের চেষ্টা—অন্যদিকে চলে সিতারাকে ষড়যন্ত্র জালে আবদ্ধ করিবার জন্য সিরাজীর চেষ্টা—প্রথমবার আবদ্ধ করা সত্ত্বেও ফাঁসিয়া যায়, নাদির সিতারার আচরণে উত্তেজিত হন বটে কিন্তু বিশ্বাস হারান না। সিরাজী অবশ্য ক্ষান্ত হন না—রেজাকুলির-মা সুলতানা বেগমের সাহায্যে আর একবার জাল বিস্তার করেন

—রেজাকুলির প্রাণরক্ষার জন্য সিতারাকে দিয়া সম্রাটকে অনুরোধ করিতে বলেন। এদিকে রেজার বিচার সঙ্কটের দিকেই অগ্রসর হইতে থাকে—শুধু যে পিতা-পুত্রের মধ্যে নিদারুণ বিচ্ছেদ ঘনাইয়া আসে তাহা নহে, রেজার জীবনেরই আশঙ্কা দেখা দেয়। এই সময় সুলতানার অনুরোধে সিতারা রেজাকে রক্ষা করিবার জন্য নাদিরকে অনুরোধ করে এবং পরিস্থিতিকে আরও খারাপ করিয়া ফেলে। নাদির সিতারার চরিত্রে সন্দিহান হইয়া উঠেন এবং ক্ষিপ্তের মত সঙ্গে সঙ্গে রেজাকুলি খাঁকে অন্ধ করিবার আদেশ দেন এবং সিতারাকেও বিতাড়িত করেন। এইভাবে—পুত্র ও হারেম দুই-ই বিষাক্ত হইয়া যায়। নাদিরের চোখে ঈশ্বর শুধু জগতের শাস্তিদাতা-রূপেই প্রতিভাত হন।

পঞ্চম অঙ্কে—উপসংহৃতি (Catastrophe)। নাদিরের 'নিষ্ঠুর—নিষ্ঠুর—নিষ্ঠুর…ভয়াল মূর্তি—সংহার মূর্তি।' গ্রামে জনপদে, নগরে, পথে, প্রান্তরে …সর্বত্র তাহার সংহার-লীলার নিদর্শন। একমাত্র শাস্তি মৃত্যু—অতিযন্ত্রণা-দায়ক মৃত্যু। সমস্ত প্রজা বিষাক্ত। নাদির অত্যাচারের পর অত্যাচারের মাত্রা বাড়াইয়া দেন -ইরাণের সজীব মূর্তি দেখার বাসনা তাঁহার ঐকান্তিক। আদর্শবাদী অহিংস রহমৎ অকালে প্রাণ দেয় কিন্তু নাদিরের হিংসার গতিরোধ করিতে পারে না। সালেহ বেগের তরবারি অতর্কিত আক্রমণে "হিংসার-উন্মত্ত" নাদিরের জীবনের (নাটকেরও) উপসংহার ঘটায়।

অঙ্ক বিভাগের মধ্য দিয়া, যেমন কাহিনীর সন্ধি-বিভাগের তেমনি ট্র্যাজেডি-পরিকল্পনার রূপটিকেও পাওয়া যাইতেছে। দিল্লীর হত্যাকাণ্ডকে নাট্যকার ট্র্যাজেডির সূচনা, বলা চলে—ট্র্যাজেডির "মূল কারণ" হিসাবেই দেখাইতে চাহিয়াছেন। ভারত-নারীর অভিশাপ তাহারই সংকেত। কিন্তু যে কথাটি আগেই অন্যভাবে বলা হইয়াছে এবং এখানেও বলা দরকার তাহা এই যে নাট্যকার কাহিনী-গঠনে বিশেষতঃ সন্ধি-যোজনায়—ঘটনার ক্রমপরিণতির মধ্যে যাহাকে 'অনিবার্য পরিণাম' বলে ঠিক তাহা সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। দিল্লী

হইতে প্রত্যাবর্তন—নিতান্তই 'এপিসোডিক' হইয়া পড়িয়াছে। দিগ্বিজয়ে বহির্গত নাদির—অতিমানব নাদির কেন দিগ্বিজয়ের সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া অতিমানবীয় আদর্শ বিস্মৃত হইয়া পারস্যে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন তাহার কারণ স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয় নাই, বরং সম্পূর্ণই অনুমানগম্য করিয়া রাখা হইয়াছে। রেজাকুলি খাঁর প্রতি অবিশ্বাস জন্মাইয়া, রেজাকুলির খাঁর বিচারের সহিত 'প্রত্যাবর্তন' ঘটনাটিকে সংযুক্ত করিবার পথে কোন বাধাই নাই। রেজাকুলির বিচারের উদ্দেশ্যেই যে নাদির দিগ্বিজয় ও অতিমানবীয় আদর্শকে অসমাপ্ত রাখিয়া পারস্যে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন ইহা দেখাইতে পারিলে—'গর্ভ-সন্ধি'র সহিত 'বিমর্ষ-সন্ধি'র গ্রন্থিতে ক্রমপরিণতির যোগ স্থাপিত হইত। দুই সন্ধির মধ্যে এইরূপ অসংলগ্নতাকে গঠন-গত ত্রুটি ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না। তারপর—বিমর্ষ ও উপসংহৃতির মধ্যে সংযোগ রক্ষা করায় যে চেষ্টা করা হইয়াছে, তাহাতেও ক্রমপরিণতির রূপ পরিস্ফুট হয় নাই। পুত্র এবং হারেম বিষাক্ত হওয়ার পরে নাদিরের যে বিকৃতি ও প্রতিক্রিয়া প্রত্যাশিত, তাহা প্রত্যক্ষভাবে না করিয়া পরোক্ষভাবে উপস্থাপিত করা হইয়াছে; ফলে প্রজা বিষাক্ত হওয়ার রূপটিতেও যতখানি প্রত্যক্ষ উপস্থাপনা বাঞ্ছনীয় ততখানি প্রত্যক্ষতা পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ—নাদিরের বিকৃতিকে নাট্যকার ট্র্যাজেডি-সংবিদের উদ্দীপক-অনুভাব হিসাবে প্রয়োগ করিতে সমর্থ হন নাই; পরিপন্থী ভাবের সংযোজনায় ট্র্যাজেডির ধারা ব্যাহত হইয়া গিয়াছে। কাহিনীর বাঁধুনিতে এবং পরিস্থিতি-রচনায়, ঘটনার ও রসের ক্রমপরিণামে অনিবার্য গতি সৃষ্টি করিতে না পারায় নাটকখানির গঠন নির্দোষ হইতে পারে নাই।

কাহিনী পরিকল্পনা ও চরিত্র-যোজনা

দিগ্বিজয়ী নাটকের মূল উপস্থাপ্য—দিগ্বিজয়ী নাদিরের, অতিমানবীয়-আদর্শে—উদ্বুদ্ধ নাদিরের শোচনীয় পরিণাম ও পতন। এই পরিণাম ও পতন দেখাইবার জন্য, বলা বাহুল্য, নাদিরের অন্তরে-বাহিরে শোচনীয় অবস্থা সৃষ্টি করা আবশ্যক। নাট্যকার অন্তরের ট্র্যাজেডি সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে পরোক্ষতঃ প্রজা-বিক্ষোভ এবং প্রত্যক্ষতঃ অন্তরঙ্গ বন্ধুর (সালেবেগের) হস্তে মৃত্যু, কল্পনা করিয়াছেন। নাদিরের ট্র্যাজেডির পরিকল্পনা সংক্ষেপে, (ক) পুত্র-বিষাক্ত, (খ) হারেম বিষাক্ত (গ) প্রজা বিষাক্ত—সিংহাসন বিষাক্ত করা। এই ট্র্যাজেডি দেখাইতে হইলে অবশ্যই নায়কের মধ্যে পুত্র-স্নেহ, হারেম-প্রেম এবং 'প্রজা-প্রীতি, দেশপ্রীতি দেখান আবশ্যক এবং সঙ্গে সঙ্গে দেখানো আবশ্যক নায়কের অতিমানব ব্যক্তিত্বটির বৈশিষ্ট্য। নাট্যকার নাদির-চরিত্রে ব্যক্তিত্ব কল্পনা করিয়াছেন এইরূপ :—(ক) নাদির একটি অতিমানবীয় প্রতিভা লইয়া আবির্ভূত; এই অতিমানবীয় আদর্শের প্রেরণাবশেই নাদির পৃথিবী জয় করিতে চাহেন—সমগ্র পৃথিবীকে এক 'মোসলেম' (পবিত্র) সাম্রাজ্যে পরিণত করিতে চাহেন—এক ধর্মরাজ্য-পাশে খণ্ডছিন্ন বিক্ষিপ্ত ধারাকে বাঁধিতে চাহেন; মানুষের-গড়া সাম্প্রদায়িক ধর্মের গণ্ডী ভাঙ্গিয়া দিয়া, আভিজাত্যের বংশগত অহঙ্কার ভাঙ্গিয়া, পৌরুষের বা গুণের পরিচয়কেই ব্যক্তির একমাত্র পরিচয়ে পরিণত করিতে চাহেন। এই পরিকল্পনাকে কার্যে পরিণত করিতে হইলে একদিকে চাই আভিজাত্য-বিদ্বেষ ও তদনুরূপ আচরণ, অন্যদিকে চাই সাম্প্রদায়িক ধর্মের প্রতি ঘৃণা বা উপেক্ষা এবং সমগ্র মানব সমাজে এক ধর্মসূত্র প্রবর্তন করিবার আকাঙ্ক্ষা।

নাট্যকার নাদির-চরিত্রের এই দুইটি বৈশিষ্ট্যকে প্রদর্শন করিবার জন্য—একদিকে রাখিয়াছেন সিরাজী ও আলি আকবরকে, অন্যদিকে আনিয়াছেন—

মির্জা—মেহেদীকে। "সিতারা"-চরিত্র কল্পনার মধ্যেও নাট্যকার এই দুই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার অবকাশ সৃষ্টি করিয়াছেন। সিতারা "পথের-সুন্দরী"; সুতরাং বংশগত আভিজাত্যের প্রশ্নই আসে না; অধিকন্তু কোন বিশেষ ধর্মের সংস্কারে তাহার চেতনা আচ্ছন্ন নয়। সিতারাকে মহিষীপদে স্থাপন করিয়া এবং সিরাজীকে সিতারার পদতলে বসাইয়া অভিবাদন করিতে বাধ্য করিয়া, নাদির শুধু আভিজাত্যকেই (ক্রীতদাসীর) পদানত করেন নাই—সাম্প্রদায়িক ধর্মের সংকীর্ণতাকেও পথের-সুন্দরীর পদতলে পদদলিত করিয়াছেন। বলা যাইতে পারে, 'সিতারা'-পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য—'হারেম-বিষাক্ত করা'। কিন্তু সিতারা শুধু এই উদ্দেশ্যই সিদ্ধ করে নাই, নাদির-চরিত্রের মূল বৈশিষ্ট্যকে যেমন প্রতিফলিত করিয়াছে, তেমনি পুত্রের বিষাক্ত হওয়া'রও অন্যতম নিমিত্ত কারণ হইয়াছে। অধিকন্তু নাদিরের বিরুদ্ধে অভিজাতদের—(সিরাজীর এবং আলিআকবরের) যে ষড়যন্ত্র—তাহারও অন্যতম নিমিত্ত-কারণ হইয়াছে। মনে রাখা দরকার—নাদিরের বিরুদ্ধে সিরাজী যে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছে তাহার মূল কারণ আভিজাত্য-গর্ব নহে, সিতারার প্রতি ঈর্ষা; আভিজাত্যের অবমাননা অপেক্ষা নাদিরের উপেক্ষাই সিরাজীকে বেশী আঘাত দিয়াছে। তারপর আলি আকবর সিরাজীর প্রেরণাতেই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছে যদিও তাহার ষড়যন্ত্রের প্রকৃতি—রাজনৈতিক। (অভিজাত—বিদ্বেষী নাদিরকে অপসারিত করার ষড়যন্ত্র।) তারপর এই আভিজাত্য-প্রতিকূলতাও শুধু চরিত্র-বৈশিষ্ট্য হিসাবেই বিচ্ছিন্নভাবে উপস্থাপিত হয় নাই; 'পুত্রের বিষাক্ত হওয়া' এবং প্রজার বিষাক্ত হওয়ার সহিত উহাকে কার্যকারণ-যোগে—যুক্ত করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। সুতরাং এ কথা অবশ্য স্বীকার্য যে উপধারা সংযোজনায় নাট্যকার প্রশংসনীয় সংগঠন শক্তিরই পরিচয় দিয়াছেন—যদিও অতিমানব-সত্তা এবং দেশপ্রেমিক-সত্তার প্রযোজনা সুসঙ্গত রূপ পায় নাই।

কাহিনীর মুখ-সন্ধিতে নাট্যকার দিগ্বিজয়ী নাদিরকে পারস্যের মুক্তিদাতা

এবং তাঁহার অতিমানব-প্রকৃতিকে দেখাইবার জন্য পরিকল্পনা করিয়াছেন। এই পরিকল্পনাকে রূপ দেওয়ার জন্য—প্রথমতঃ আবশ্যক হইয়াছে—(ক) ভারত-সম্রাটের পক্ষ—(১) **সাদৎ খাঁ** (অযোধ্যার নবাব-উজীর) (২) **আসফজা** (ভারতেশ্বর উজীর) (৩) **মহম্মদশাহ** (ভারতের মোগল সম্রাট), (খ) দ্বিতীয়তঃ আবশ্যক হইয়াছে—**সালেবেগ** নাদিরের অতিমানব-প্রতিভার ভাষ্যকার—নাদিরের অতীত কীর্তির এবং ভবিষ্যৎ সঙ্কল্পের বিবৃতিকার ; (গ) তৃতীয়তঃ নাদিরের উদ্দাম উচ্চাকাঙ্ক্ষা (vaulting ambition) দেখাইবার জন্য—জনৈক **হিন্দু জ্যোতিষী'র** (ঘ) চতুর্থতঃ সাম্প্রদায়িক ধর্মের প্রতি (শিয়া-সম্প্রদায়ের প্রতি) নাদিরের ঘৃণা দেখাইবার প্রয়োজনে—আবশ্যক হইয়াছে **মির্জা মেহেদী** (ঙ) পঞ্চমতঃ হারেম-বিষাক্ত করার আয়োজন হিসাবে আসিয়াছে **"সিতারা"** এবং আসিয়া অন্যান্য প্রয়োজনও সাধন করিয়াছে—নাদিরের 'আভিজাত্য-বিদ্বেষ', 'অতিমানবীয় খেয়ালিপনা,' 'সাম্প্রদায়িক-ধর্ম'-বিতৃষ্ণা—প্রকাশের নিমিত্তও হইয়াছে। তারপর আভিজাত্য-বিদ্বেষের লক্ষ্য হিসাবে—(হারেম বিষাক্ত করার ষড়যন্ত্রকারী হিসাবেও বটে)—আসিয়াছে—**সিরাজী,** আর তাহার ভ্রাতা **আলি আকবর।** [আলি আকবরের রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র, ট্র্যাজেডির পরিণতি বা উদ্দীপনা-বিভাব সৃষ্টি করিয়াছে—(ক) মিথ্যা রটনা করিয়া গণ্ডগোল সৃষ্টি করিয়াছে তথা নাদিরকে উত্তেজিত করিয়া, নাদিরের পশু-সত্তাকে জাগ্রত করিয়াছে (খ) পুত্রের প্রতি অবিশ্বাস উৎপাদনের চেষ্টা করিয়াছে গ) পারস্যে প্রজা-বিক্ষোভ ঘটাইয়াছে]

দ্বিতীয় অঙ্কে (প্রতিমুখ-সন্ধিতে)—(১) নাদিরের চোখে সিতারাকে বিষাক্ত করিবার জন্য সিরাজীর, এবং ভারতবাসীর চোখে নাদিরকে বিষাক্ত করিবার জন্য আলি আকবরের—ষড়যন্ত্র দানা বাঁধিয়াছে। (২) সিতারার সহিত নাদিরের প্রেমের সম্পর্ক দেখান হইয়াছে (৩) রাজধানীর এক পত্রে (জালপত্রে) **রেজা কুলির** সহিত **আহম্মদ আবদালীর** গোপন ষড়যন্ত্র

নাদিরের গোচরীভূত করা হইয়াছে—তথা পুত্র রেজা কুলির প্রতি অবিশ্বাসের বীজ বপন করা হইয়াছে। তৃতীয় অঙ্কে—(গর্ভ সন্ধিতে)—ষড়যন্ত্রের ফল ফলে—রাজধানীতে নাদিরের মৃত্যুসংবাদ প্রচারিত হওয়ায় হাঙ্গামা বাধিয়া যায়। উত্তেজনা সত্ত্বেও নাদির সংযম হারান না—আদেশ থাকে—"নিরীহ নগরবাসীদের গায়ে তোমরা হস্তক্ষেপ করবে না"। কিন্তু "সহসা একটি গুলি নাদিরের কানের পাশ দিয়া চলিয়া" যাইতেই নাদির ক্ষিপ্ত হইয়া উঠেন, সংযম হারাইয়া ফেলিয়া—নির্বিচার হত্যার আদেশ দেন। এই আদেশের ফলে, একদা-কর্মযোগী নাদির সামান্য একজন দস্যুর পর্যায়ে নামিয়া আসেন। সালেবেগ নাদিরের আদর্শেরই যেন মানবী মূর্তি—নাদিরকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। 'সর্বমানবতার অভিশাপময় নারীমূর্তি'—"ভারতরমণী"- বেশে প্রবেশ করে এবং নাদির-জীবনের ভাবী ট্র্যাজেডির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে।

এই অঙ্কটিতে দুইটি ঔচিত্য-বাধক (irrational) ঘটনা আছে। একটিতে ঘটনার কাল গত ঔচিত্য সম্বন্ধে প্রশ্ন, অন্যটিতে—চরিত্রের বাস্তবতার সম্বন্ধে প্রশ্ন। প্রথমটি এই—নাদির হত্যার আদেশ দিয়া 'প্রস্থান' করেন, মসজিদের সম্মুখে রাস্তায় উন্মত্ত সৈন্যদলের চীৎকার উঠে এবং সকলে প্রস্থান করে। তারপর—"ক্রমে ক্রমে অন্ধকার হইয়া গেল এবং পরে পুনরায় ক্রমশঃ আলোকিত হইল"—নাদির প্রবেশ করেন এবং ৪১ পংক্তির একটি স্বগতোক্তি আবৃত্তি করেন—আবৃত্তি-শেষে—ভারতসম্রাট মহম্মদশাহ প্রবেশ করিয়া নিষ্ঠুর হত্যার বর্ণনা দেন। দেখা যাইতেছে—'আদেশ' ও কার্যের মধ্যে, বেশী হইলেও মাত্রা ১০ মিনিটের ব্যবধান। নাট্যকার সংকেত দ্বারা মঞ্চ অন্ধকার করিয়া দিয়া এবং ক্রমশঃ আলোকিত করিয়া কালের গতি দেখাইতে চেষ্টা না করিয়াছেন এমন নহে। কিন্তু হত্যাকাণ্ডের জন্য যে কালমাত্রা দরকার, তাহা সৃষ্টি করা সম্ভব হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। দ্বিতীয়টি—ভারতনারী। এই চরিত্রটি সম্পূর্ণ সাংকেতিক ও অবাস্তব হইয়া পড়িয়াছে। ঐতিহাসিক নাটকে এই ধরনের অবাস্তব চরিত্রের সংযোজনা, গঠন-পারিপাট্যের পরিপন্থী।

চতুর্থ অঙ্কে (১) নাদিরের ট্র্যাজেডি সংকেতিত হইয়াছে—"আহার নাই, নিদ্রা নাই, চিত্তের শান্তি তিনি একেবারে হারিয়ে ফেলেছেন।" (২) এই সুযোগে সিরাজী সিতারাকে ষড়যন্ত্রজালে জড়াইতে চেষ্টা করিয়াছে—নাদিরের অজ্ঞাতসারে সিতারাকে 'ক্রেস্তান সাধু'র কাছে পাঠাইয়া, নাদিরের কাছে বিশ্বাসহন্তী প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছে। (৩) রেজার স্বীকৃতি আদায়ের জন্য নাদির চেষ্টা করিয়াছেন (৪) সিতারার আচরণে নাদির উত্তেজিত হইয়াছেন, কিন্তু বিশ্বাস হারান নাই, ফলে সিরাজীর চক্রান্ত ব্যর্থ হইয়াছে (৫) রেজাকুলির মাতা 'সুলতানা' বেগমের আবশ্যক হইয়াছে—হারেম বিষাক্ত করিবার আয়োজন-হিসাবেই। সিরাজীর প্রথম চক্রান্ত ব্যর্থ হইলেও সিরাজী সিতারাকে আবার জালে জড়াইবার উদ্দেশ্যে সুলতানা-বেগমের পক্ষ গ্রহণ করে—সুলতানা-বেগমকে, "সিতারা"কে দিয়া নাদিরকে অনুরোধ করিবার জন্য পরামর্শ দেন। সুলতানার কাতর অনুরোধ রক্ষা করিতে গিয়াই 'সিতারা' শেষ পর্যন্ত বিতাড়িত হন। (৬) রেজাকুলির বিচারের প্রয়োজনে—নেককদম আবশ্যক হইয়াছে। (৭) নাদির পুত্রকে অন্ধ করেন—সিতারার চরিত্রে অন্যায় সন্দেহ করিয়া বিতাড়িত করেন। [পুত্র ও হারেম একসঙ্গে বিষাক্ত হয়]

[এই সমস্ত ঘটনার দৃশ্য—"হারেমের কক্ষ"; স্থান ঐক্য বজায় রাখিতে গিয়া—'হারেমের কক্ষ'টির আবরু রক্ষা পায় নাই। হারেমে রেজার প্রবেশ অশোভন ঘটনা না হইতে পারে, কিন্তু 'নেককদম' প্রভৃতির বিচারের জন্য "হারেমের কক্ষ" উপযুক্ত স্থান নহে। এইভাবে দ্বিতীয় অঙ্কের বেগম মহলে-ও সকলের অবাধ গমনাগমন দেখা গিয়াছে। স্থান-ঐক্য রক্ষার বিনিময়ে ঔচিত্য-দোষ কিছু পরিমাণে স্বীকার করিয়া লইতে হইয়াছে]

পঞ্চম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে—(১) সিতারার আক্ষেপোক্তির মধ্যে নাদিরের বিকৃত রূপটি প্রতিফলিত করা হইয়াছে (২) সালেবেগ ও রহমতের কথোপ-কথনের সাহায্যে—ইরাণের ও নাদিরের অবস্থা উপস্থাপিত হইয়াছে—হিংসার —পশুশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রয়োজনে 'সুফি কবির ভক্ত' অহিংসা ধর্মাবলম্বী

রহমৎ-চরিত্রটি আবশ্যক হইয়াছে। (৩) সালেবেগের ও তাহার পিতার গ্রেপ্তারি পরোয়ানায় নাদিরের অত্যাচারী রূপটি—'আরো প্রকট করা হইয়াছে। (৪) রহমৎ অহিংস প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে নাদিরের মুখোমুখি দাঁড়াইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে (৫) সালেবেগ নাদিরের সঙ্গে শেষ বুঝাপড়া করিবার জন্য পিস্তল লইয়া রহমতের অনুসরণ করিয়াছে। দ্বিতীয় দৃশ্যে—(১) নাদির হত্যার ষড়যন্ত্র, আলি আকবরের চেষ্টায়—ফলপ্রসূ হইবার মুখে (আলির কথা—'আজ রাত্রিই সম্রাটের শেষ রাত্রি')। (২) সিরাজী নাদিরের প্রাণ বাঁচাইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে—স্বখাত সলিলেই সিরাজী ডুবিয়াছে। (৩) নাদির প্রবেশ করেন—ধীরে ধীরে (ক) সিতারার জন্য দীর্ঘশ্বাসের মত একটু সাক্ষেপ চিন্তা মনে আসে (খ) পৌত্র মির্জা রুখকে কাছে ডাকিয়া—দূরবর্তী নিজের পল্লীগ্রামটিকে দেখান এবং দেখাইতে দেখাইতে গভীর চিন্তায় ডুবিয়া যান। খোরাসান প্রদেশ নিষ্প্রাণ দেখিয়া দেশপ্রীতি উদ্দীপিত হয়। আহমেদের—আপনি শত্রু অন্বেষণ করছেন সম্রাট? এই প্রশ্নের উত্তরে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন—"নিশ্চয়ই"। এবং সঙ্গে শাস্তিদানের তত্ত্বকথা বা কারণও জানাইয়া দেন—(যদি সেই শাস্তির ফলে সমস্ত ইরাণ জাতির সজীব মূর্তির একবার দেখা পাই!) (৪) সিরাজী নাদিরের কাছে সব দোষ স্বীকার এবং শাস্তি প্রার্থনা করে, কিন্তু নাদির সিরাজীকে উপেক্ষা ছাড়া আর কিছুই দেখান না। (৫) মৌলানা রহমৎ খাঁর নাদিরের সহিত সাক্ষাৎকার এবং শেষ পর্যন্ত—রহমতের- "অভিভূতের মত অগ্রসর হইয়া নাদিরের অস্ত্রের উপর গিয়া"—পতন। (৬) সালেবেগকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া নাদিরের উল্লাস, কিন্তু সালেবেগ—'মনুষ্যত্ব আবরণকারী গর্বী পশুকে হত্যা' করিবার জন্য নাদিরকে অস্ত্রাঘাত করেন—নাদির বড় বড় কথা বলিতে বলিতে 'সিতারার কোলে ঢলিয়া' পড়েন।

পঞ্চম অঙ্কের—ঘটনা-বিন্যাস সম্পর্কে—প্রথম বক্তব্য এই যে নিষ্ঠুর-নাদিরের রূপটি পরোক্ষভাবে উপস্থাপিত হইয়াছে। প্রজা বিযাক্ত হওয়ার রূপটি আরো প্রত্যক্ষ উপস্থাপনা দাবী করিতে পারে। দ্বিতীয় বক্তব্য এই--নাদিরের 'শত্রু

অন্বেষণের প্রবৃত্তি কোন গভীর নৈতিক দ্বন্দ্ব হইতে দেখা দেয় নাই এবং তাঁহার মধ্যে যে অবসাদ দেখানো হইয়াছে তাহাতে waste-এর বাহ্য রূপটিই আছে—ট্র্যাজেডির আত্মিক ক্ষয় ফুটিয়া উঠে নাই। তৃতীয় বক্তব্য এই যে 'শাস্তিদানের তত্ত্ব-কথা" ট্র্যাজেডি-সংবিদের সংস্কারকে ব্যাহত ও বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছে; চতুর্থ বক্তব্য এই রহমৎ ভাবের বাহন হিসাবে যতই মূল্যবান হউক, বাস্তবিক চরিত্র হিসাবে খুবই হীন হইয়া পড়িয়াছে। রহমতের মৃত্যু নিছক অতিনাটকীয় ঘটনা যেমন অতিনাটকীয় হইয়াছে শাস্তি দিয়া 'ইরাণের সজীব মূর্তি দেখার বাসনা।' পঞ্চম অঙ্কে, ঘটনায় ও চরিত্র পরিকল্পনার এই ত্রুটি অমার্জনীয়, কারণ এই সকল ত্রুটির জন্যই নাটকখানি প্রশংসনীয় ও উল্লেখযোগ্য একখানি ট্র্যাজেডিতে পরিণত হইতে পারে নাই।

রস বিচার

দিগ্বিজয়ী-নাটকখানি সূক্ষ্ম বিচারে সার্থক ট্র্যাজেডির মর্যাদা না পাইলেও, নাট্যকারের উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা যে ট্র্যাজেডি সৃষ্টি করা এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং **প্রধান রসের প্রশ্ন—ট্র্যাজেডি-রসেরই প্রশ্ন।** এখন, 'ট্র্যাজেডি রস' বলিয়া কোন রস আছে—এ কথা স্বীকার করিলে, রস তত্ত্বানুসারে, উহার 'স্থায়িভাব'-এ নির্দেশ করিতে হইবে। ট্র্যাজেডি-রসের 'স্থায়িভাব' সম্বন্ধে আলোচনা যথেষ্টই হইয়াছে বটে কিন্তু অবিসংবাদিত সিদ্ধান্তে পৌছান সম্ভব হয় নাই। এরিস্টটল হইতে আরম্ভ করিয়া অধ্যাপক এলারডাইস নিকল পর্যন্ত, অনেকেই অনেক কথা বলিয়াছেন এবং কেহই এক কথায় 'স্থায়িভাব'টি নির্দেশ করিতে পারেন নাই। ট্র্যাজেডি serious action"-এর রূপায়ণ এবং ট্র্যাজেডি-নায়ক—এমন একজন যিনি—who acts and suffers something terrible—এই ধরনের সাধারণ কথাগুলি আমরা অনেকেই জানি, কোন্ ধরনের ক্রিয়া-বিক্রিয়া ও ভাগ্য-বিপর্যয়কে আমরা

ঠিক ট্র্যাজিক, বলিব, সে সম্বন্ধে খুব স্পষ্ট চিন্তা অনেকেরই কম। আমরা জানি ট্র্যাজেডির প্রথম ধারণা গ্রীক নাট্যে ও নাট্য সমালোচনায় প্রকাশিত হইয়াছে। ট্র্যাজেডির মূল ধারণাটি, গ্রীক নাট্যকার এইস্কিলাসের 'দি পারসিয়ানস্' নাটকখানির মধ্যে এইভাবে ব্যক্ত হইয়াছে :—মানুষের মধ্যে যখন "hubris" অদম্য 'মদ-মত্ততা' ও দুর্বার "দুরাশা" জন্মে, তখন দেবতার রোষ অভিশাপের মত নামিয়া আসে এবং মানুষের জীবনে শোচনীয় দুর্বিপাক ঘটায়।

"......when rashness drives
Impetuous on, the scourge of Heaven upraised
La-hes the Fury forward,......"

সফোক্লিসের নাটকেও প্রায় একই ধারণা, তবে অন্যরূপে পাওয়া যায়। মানুষ প্রবৃত্তির উদগ্রতায় মাত্রা ছাড়াইয়া যায়—সামাজিক বিধি-নিষেধের ও দৈববিধানের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয় এবং নিজের কার্য দ্বারাই জীবনে শোচনীয় দুর্দশা ও পরিণতি টানিয়া আনে। সমালোচক এরিস্টটল, এইস্কিলাস, সফোক্লিস, ইউরিপিদিসের নাটক পর্যালোচনা করিয়া—ট্র্যাজেডির যে লক্ষণ নিরূপণ করিয়াছেন তাহাতে—ট্র্যাজেডিকে সাধারণভাবে—"incidents arousing pity and fear"-এর উপস্থাপনা বলা যায়। প্রশ্ন উঠিতে পারে ট্র্যাজেডি একাধারেই ভয়ানক ও করুণ রসের নাটক অথবা ট্র্যাজেডি শুধু ভয়ানক অথবা শুধু করুণ রসের নাটক? "Pity and fear" এবং "Pity or fear"-এর মধ্যে কোনটি এরিস্টটলের অভিপ্রেত, গবেষণার বিষয় বটে কিন্তু গ্রীক ট্র্যাজেডিগুলি এবং "পোয়েটিক্স" মনোযোগ দিয়া পাঠ করিলে—দেখা যাইবে ট্র্যাজেডির পক্ষে "Pity"—অপরিহার্য। নায়কের সহিত সহানুভূতির যোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইলে—আর যে রসেরই নাটক হউক "ট্র্যাজেডি"-রসের নাটক হয় না। তবে এ কথা সত্য—ট্র্যাজেডিতে "Pity" অন্যান্য রসের সঙ্গে নানা মাত্রায় মিশিতে পারে। বীররস, ভয়ানক রস, রৌদ্ররস, অদ্ভুত-রস

হিসাবে ট্র্যাজেডিতে কি মাত্রায় থাকিবে তাহা অবশ্য ঠিক করিয়া বাঁধিয়া দেওয়া সম্ভব নহে। সাধারণভাবে বলা যায়—ট্র্যাজেডির একদিকে আছে—'প্যাথেটিক ট্র্যাজেডি', যাহাতে প্রধানভাবে করুণ-রস সৃষ্টি করাই উদ্দেশ্য, অন্যদিকে আছে —'Perfect Tragedy'—যাহাতে 'element of wonder'-এর মাত্রা বেশী। একে 'pity'—"pathos"-এ পরিণত হয়; অন্যে—"pity", fear বা 'wonder'-এর সংযোগের মাত্রা বেশী হওয়ায়, অপ্রধানভাবে বিরাজ করে। 'World Drama" গ্রন্থে অধ্যাপক নিকল, নাট্যকার ইউরিপিডিস্ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে—তিনি লিখিয়াছেন—"Pathos is one of Euripides' main devices; if he does not know how to express that hardness of temper so characteristic of Aeschylus, he is adept at causing tears to flow".—(72 page) মোটামুটি ট্র্যাজেডিকে আমরা দুইভাগে ভাগ করিয়া লইতে পারি —Tragedy of action এবং Tragedy of suffering. রসের পরিভাষায় প্রয়োগ করিয়া বলা যায়—কোন ট্র্যাজেডি বীর-করুণ, কোন ট্র্যাজেডি রৌদ্র করুণ, কোন ট্র্যাজেডি ভয়ানক-করুণ, কোন ট্র্যাজেডি অদ্ভুত-করুণ, আবার কোন ট্র্যাজেডি বা শান্ত করুণ, কোন ট্র্যাজেডি শুধু করুণ। আমরা দেখিয়াছি—ট্র্যাজেডি-রসের স্থায়িভাব—এরিস্টটলের মত অনুসারে—**"ভয় এবং শোচনা"**। ইহাই প্রচলিত মত। এই মতটি অধ্যাপক নিকল সর্বাংশে গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার ধারণা—'Tragedy, after all, is not a thing of tears. Pathos stands upon a lower plane of dramatic art···pathos is closely connected with pity and neither is generally indulged in by the great dramatist as the main tragic motif' [ইউরিপিডিস নিশ্চই অন্যতম শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডি-লেখক; পূর্বেই বলা হইয়াছে—Pathos is one of Euripides' main devices·····] অধ্যাপক নিকলের সিদ্ধান্ত—Tragedy, then, we may say, has for its aim not the

arousing of pity but the conjuring up of a feeling of awe allied to lofty grandeur" —'The Theory of Drama)—ট্র্যাজেডির স্থায়িভাব—শোচনা (pity) নহে স্থায়িভাব—বিস্ময়, উদাত্ত মহিমা। তবে ভয়ঙ্কর বা বিস্ময়কর ঘটনা মাত্রই যে ট্র্যাজেডি-পদবাচ্য নহে তাহা অবশ্য অধ্যাপক নিকল স্বীকার করিয়াছেন এবং এ কথাও স্বীকার না করিয়া পারেন নাই যে শেক্‌সপীয়রের ট্র্যাজেডিতে "pathos" আছে। সুতরাং যে "pathos" ইউরিপিডিসের নাটকের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য, শেকসপীয়রের "কীং লিয়র" নাটকের মত ট্র্যাজেডিতেও যে "pathos" অপাংক্তেয় নহে সেই "প্যাথোস"কে ট্র্যাজেডি-রসের পরিপন্থী মনে করিবার মত কোন যুক্তি নাই। এই কথাই সত্য—'pathos' মাত্রই যেমন ট্রাজিক নহে, তেমনি ট্র্যাজিক ও প্যাথেটিক একে অন্যের বিপরীত নহে। আর একটি কথাও স্মরণীয়—ট্র্যাজেডিতে বিস্ময়, ভয়, উৎসাহ, ক্রোধ যে ভাবই প্রাধান্য লাভ করুক ট্র্যাজেডির বিলক্ষণ ভাব—শোচনা (pity)—tragic feeling মানুষের নিদারুণ পরিণামের জন্য মানুষের সমবেদন-বোধ। অমৃতের আস্বাদ লইবার জন্য জীবন মন্থন করিতে গিয়া মানুষ অমৃতের বদলে বাসনা-বাসুকীর বিষ পান করিয়া জ্বালায় ছটফট করিতে করিতে জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটায়—ট্র্যাজেডি এই বিষজর্জরিত মানুষের শোচনীয় পরিণতির জন্য মানুষের গভীর সমবেদনা। **যেখানে বেদনা-বোধ নাই সেখানে ট্র্যাজেডিও নাই।** এখানে "De profundis"-এ ওসকার ওয়াইলড মহাশয় যাহা বলিয়াছেন তাহা স্মরণ করা যাইতে পারে —I now see that sorrow, being the supreme emotion of which man is capable is at once the type and test of all great art·········

*but sorrow is the ultimate type both in life and art. ট্র্যাজেডির জন্ম—ভগ্নমনোরথ, ভাগ্য-বিপর্যস্ত এবং নিরুপায় মর্ত্য মানুষের প্রতি সহজ সমবেদনা হইতে। 'awe,' grandeur সব কিছুর মধ্য দিয়া pity জাগ্রত

করাই ট্র্যাজেডির প্রধান উদ্দেশ্য।

দিগ্বিজয়ী নাটকেও এই উদ্দেশ্য ব্যক্ত হইয়াছে। স্বীকার করিতেই হইবে—দিগ্বিজয়ী-নাটকে নাদিরের প্রতি ট্র্যাজেডির বিলক্ষণ ভাব—"pity" জাগ্রত করার চেষ্টা কম হয় নাই; তবে, এ কথা যেমন সত্য—নাদির-চরিত্রের আত্মিক গাম্ভীর্যের অভাবে এবং অন্তর্দ্বন্দ্বের উদ্দীপনা যথেষ্ট না থাকায় দর্শকের চিত্তে "pity" যথেষ্টমাত্রায় উদ্রিক্ত হইতে পারে না, তেমনি ইহাও সত্য নাদির-চরিত্রে 'প্যাথেটিক ট্র্যাজেডি সৃষ্টির অবকাশ নাই। নাদির বল-বীর। বীরের মেরুমজ্জা শক্ত স্নায়ু দ্বারা গঠিত। বীরের অন্তর্দাহ করুণ বিলাপ হইয়া প্রকাশ পায় না। তাহার শোক—বীরের শোক—ভিতরের দাহে, বীরত্বের, ক্রোধের আকস্মিক উৎক্ষেপে—নিঃশব্দ নিবেদে, দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ে, বিষণ্ণ জীবন-সমালোচনায় প্রকাশ পায়। নাদির চরিত্রে আমরা এই "বীর-করুণ রসের আলম্বনই দেখিতে পাই। দিগ্বিজয়ী করুণ রসের (pathetic) ট্র্যাজেডি নহে! ইহাতে দীপ্ত—বিশুদ্ধ করুণ রস সৃষ্টির চেষ্টাই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। তবে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে—বিশেষ কারণে রসনিষ্পত্তি সন্তোষজনক মাত্রায় পৌঁছিতে পারে নাই; পারিলে দিগ্বিজয়ী উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক ট্র্যাজেডির তালিকায় অবশ্যই উচ্চস্থান অধিকার করিতে পারিত।

নাদির ছাড়া অন্য কয়েকটি চরিত্রকেও করুণ-রসের আলম্বন করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে নাদিরের জ্যেষ্ঠ পুত্র "রেজাকুলি", সিতারা এবং সিরাজী উল্লেখযোগ্য। রেজাকুলির পরিণাম খুবই শোকাবহ। সিতারার পরিণামও কম শোচনীয় নহে। সিরাজী তো নাটকের দ্বিতীয় ট্র্যাজিক চরিত্র। সে স্বখাত সলিলে ডুবিয়া মরিয়াছে—স্বামীকে আপনার করিতে গিয়া, স্বামীর প্রাণনাশের কারণ হইয়া পড়িয়াছে।

এই নাটকে চিত্তের বিরামের জন্য (relief) 'হাস্য-রস-সৃষ্টির আয়োজনও মন্দ করা হয় নাই। প্রধানতঃ মির্জা মেহেদী ও মোল্লাবাসী আলি আকবর এবং কোন কোন স্থলে সিরাজীও এই রসের আলম্বন হইয়াছে। মির্জা মেহেদীও

মোল্লাবাসীর ধর্মীয় আবেগের আতিশয্য—শিয়া সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিবার জন্য মির্জা মেহেদীর বাহ্যজ্ঞানশূন্য ঐকান্তিকতা—তিন বছর ধরিয়া নানা দেশ ঘুরিয়া ঘুরিয়া "পঁচিশজন ইয়াহুদী, পঁচিশজন আরবী মোল্লা, পঁচিশজন তুর্কী মোল্লা আর পাঁচশজন পাদরী এই একশো জ্ঞানী লোক আর সঙ্গে এক গাড়ী আরবী কিতাব, এক গাড়ী তুর্কী কিতাব আর এক গাড়ী ইয়াহুদীদের পুরানো কিতাব, এই তিন গাড়ী কিতাব নিয়ে"—তিনি নাদিরশাহের সঙ্গে তর্ক করার জন্য উপস্থিত। আকবর ঠিকই বলে "যদি তিন গাড়ী কিতাব আর একশো মোল্লা নিয়ে সম্রাটের সঙ্গে তর্ক করতে যান, তা হলে বোধ হয় আপনাকে আর সেখান থেকে ফিরে আসতে হবে না।" নিজের যথাসর্বস্ব খরচ করিয়া কিতাব আর মোল্লা সংগ্রহ করার এবং সম্রাটকে অকাট্য যুক্তি শোনাইয়া শিয়া মতে আনার অধ্যবসায় অর্থাৎ উৎকট ব্যক্তিত্ব খুবই হাস্যোদ্দীপক। তারপর, আলি আকবরকে এবং সিরাজীকে নাদির যে-সকল ব্যঙ্গোক্তির খোঁচা দিয়াছেন তাহাতে আকবর বা সিরাজী আহত হইলেও দর্শকরা আমোদই পান। নাদির যখন সিরাজীকে রহস্য করিয়া বলেন—"প্রাণ কি সত্যই ভেঙ্গে গেছে সিরাজী? কেমন করে ভাঙলো? অমন টেঁকসই পাথুরে প্রাণ কিসের আঘাতে ভাঙ্‌লো?"—তখন হাস্যরসেই উদ্দীপনা ঘটে। আলি আকবরকে যে ব্যাজস্তুতি-মূলক পরিহাসের খোঁচাটি দিয়াছেন তাহাও জোরালো—"আলি, তোমার এই গুণেই তোমাকে এত ভালবাসি, অমন তোষামদ জগতে আর কেউ করতে পারবে না।" দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম অংশে আলি আকবর নিজেই রসিকতা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সিরাজীর ঈর্ষা-উত্তেজনার পটভূমিকায় আলি আকবরের রসিকতা বেশ উপভোগ্য ও হাস্যোদ্দীপক হইয়াছে। "মদ্য পান করেই তোমার এ অধঃপতন হয়েছে"—সিরাজীর এই অভিযোগের উত্তরে আকবর যখন বলে—" "যে মাটীতে পড়ে লোক তাই ধরে' তুমি যা বলছ, ধর তাই যদি সত্য হয়, অর্থাৎ সত্যই যদি আমার অধঃপতন হ'য়ে থাকে—তা' হ'লে যা থেকে

অধঃপতন হয়েছে সেই পদার্থকে ধরেই আমাকে আবার উঠতে হ'বে"—তখন যথার্থই হাস্যরসের সমর্থ আলম্বন হইয়া উঠিয়াছে। ভাব ও ভাষাকে বাঁকাইয়া রসিকতা করিবার শক্তিতে আলি বিশেষ দুর্বল নন।

[পূর্বেই বলা হইয়াছে যে অঙ্গীরস অর্থাৎ ট্র্যাজেডি-রস, সুষ্ঠুভাবে নিষ্পন্ন হয় নাই। নাদিরের মধ্যে অনুভাব-সঞ্চারিভাবের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এমন যথেষ্ট বা সন্তোষজনক রূপ পায় নাই যাহাতে ট্র্যাজেডি-সংবিদ্‌টি বোধে ও রসে তীব্র হইয়া উঠিতে পারে। অঙ্গী-রসের এই দুর্বলতা কিছুতেই উপেক্ষা করা চলে না।]

চরিত্র

দিগ্বিজয়ী নাটকে কেন্দ্রীয় এবং প্রধান চরিত্র—নাদিরশাহ। নাদির চরিত্র ট্র্যাজিক তথা দিগ্বিজয়ী নাটক ট্র্যাজেডি হইয়াছে কি না, এই সব প্রশ্নের আলোচনাকালে নাদির-চরিত্রটি তন্ন তন্ন করিয়া বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। অঙ্গী ব্যক্তি-সত্তাটিতে কোন্ কোন্ অঙ্গ-সত্তা কল্পনা করা হইয়াছে, অঙ্গ-সত্তাগুলি সুসমঞ্জস এবং সমুচিতভাবে ক্রমাভিব্যক্তির ও পরিণতির দিকে অগ্রসর হইয়াছে কি না, চরিত্রের গতি-বিধি কোথায় অস্পষ্ট হইয়াছে, রস-ধারা কোথায় প্রতিপন্থী ভাবের উদয়ে ব্যাহত হইয়াছে তাহা সবিস্তারে আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এখানে অতি সংক্ষেপে আমরা নাদির চরিত্র পর্যালোচনা করিতেছি।

নাদির "তৈমুরলঙ্গ কি চেঙ্গিসখাঁর মত শুধু বিজয়ী দস্যু" নহেন—তিনি "নরসিংহ,"- অতিমানব। তাঁহার দিগ্বিজয়ের উদ্দেশ্য—'সমগ্র পৃথিবীতে একচ্ছত্র মহম্মদীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা,—ভারতজয় ঐ বৃহত্তর উদ্দেশ্যেরই অন্তর্গত—ভারতবর্ষে তিনি "নূতন শাসনতন্ত্র', নূতন ধর্ম-তন্ত্র প্রচার কর্তে"

চাহেন—ভারতবর্ষকে সহস্ররাজাতার হাত হইতে উদ্ধার করিতে তিনি প্রতিশ্রুত। তবে মাঝে মাঝে তিনি নাকি তাঁহার উদ্দেশ্য ভুলিয়া যান। সালেবেগের ভাষায়—'প্রতিভা ও উদারনীতি নিয়ে জনসমাজের হৃৎপদ্ম হ'তে এই মহাবীর উদ্ভূত হয়েছেন……তিনি জগতে এক বিপুল মোসলেম সাম্রাজ্য স্থাপন করবেন।"……তাহার রাষ্ট্রনীতির অর্থ অনেক বেশী। নাদিরের কাছে —"মুসলমান নামটি একটি বৃহৎ কল্পনা—অনেক ক্ষুদ্র জাতি আর ধর্মকে এক করে বাঁধবার জন্য ও নামের সৃষ্টি হয়েছে।"

নাদিরের শক্তি অপরিমিত—অনন্ত। 'নিজের বাহু আর মস্তিষ্কের শক্তির উপরই তাঁর একমাত্র বিশ্বাস'। তাই -'মাঝে মাঝে মনে হয় দাম্ভিক'। সাদা ঠিকই ধরিয়াছেন—'মানুষটা একটু বেয়াড়া রকমের। পঞ্চাশ রকমের কাজ এক সঙ্গে করে—কোনটার উপর যে তার আকর্ষণ সহজে ধরা যায় না।' তবে শক্তিধর নাদির জীবনের প্রভাতে শক্তিকে অকাজে লাগান নাই—পারস্যের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে তিনি যে স্বদেশপ্রীতি ও সামরিক প্রতিভা দেখাইয়াছেন, তাহা খুবই বিস্ময়কর। "ইনি পারস্যদেশকে তুর্কী, রুশ, আফগান, আরমানী, উজবেগী দস্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছেন"—শুধু তাহাই নহে। নাদির পারস্যের সীমা 'কাস্পিয়ান সাগর-তীরবর্তী ককেশাস পর্বতমালার তলদেশ হ'তে ভারতের…… সিন্ধুনদ-তীর পর্যন্ত" সম্প্রসারিত করিয়াছেন। তাই বলিয়া নাদির ক্ষমতালোভী নন। তামাস্ তুর্কীদের সহিত জাতির অপমানকর সন্ধি না করিলে নাদির সিংহাসনেই বসিতেন না।—"ত্রিবিশ দিন ধ'রে প্রত্যহ সমস্ত জাতি তাকে অনুরোধ করে সিংহাসন গ্রহণ" করাইতে পারে নাই। শুধু জাতির অনুরোধেই—জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করিতেই তিনি শাহ-পদ গ্রহণ করেন।

নাদির নিজে পুরুষকারের বিগ্রহ। সুতরাং পুরুষকারই তাঁহার কাছে বড় গুণ। তিনি বলেন—'বংশের নয়, নিজের পরিচয়ে মানুষ দাঁড়াবে'। এই কারণেই আভিজাত্য-অভিমানকে তিনি ঘৃণা করেন, ঘৃণা করেন আভি-

জাত্যভিমানী শিয়া-সম্প্রদায়কে, আর তেমনি ঘৃণা করেন—জন-সমাজকেও। নাদির নিজেই বলেন—"আভিজাত্যকে ঘৃণা করি—তার কৃতঘ্নতা, বিলাসিতা আর ভীরুতার জন্য, আর জনসমাজকে ঘৃণা করি তার ফেরুপালের মত আচরণের জন্য, গড্ডালিকা-প্রবাহের মত তার বুদ্ধিহীনতার জন্য"। তাহার ধারণা—শিয়া-সুন্নি বিরোধ অভিজাতদের কারসাজি এবং ধর্ম লইয়া এই অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে জাতি দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। নাদির কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম লইয়া মাতামাতি করতে অনিচ্ছুক। আলি আকবর মিথ্যা বলে না "শুধু বলুন আর সুন্নিই বলুন, কোনো সম্প্রদায়ের মতামতের উপরই সম্রাটের বিশেষ কোন শ্রদ্ধা নেই। আসলে এক-রকম নাস্তিক ব'ল্লেই হয়"। তাই দেখা যায়—সিতারার মত পথের সুন্দরী'কে মহিষী করিতে তাঁহার বাধে না।

তবু, নাদির হৃদয়হীন ন'ন। পুত্র রেজাকুলির প্রতি তাহার স্নেহ অদম্য সালেহবেগের কথা বিশ্বাস না করিয়া উপায় নাই—"উদ্দাম পিতৃস্নেহ... কি ভালই সে বাসতো ঐ রেজাকে!

সুলতানা বা শিরাজী নাদিরের অন্তর স্পর্শ করিতে তথা প্রেমতৃষ্ণা মিটাইতে পারে নাই বটে; কিন্তু 'পথের সুন্দরী' ভারতনারী সিতারা নাদিরের অন্তর স্পর্শ করিয়াছিল শিরাজী যেখানে দিয়াছে মত্ততা, সেখানে সিতারা দিয়াছে—অমৃত।

কিন্তু নাদিরের মত যাহারা অতিমানবীয় পৌরুষ-প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করেন তাঁহাদের কাছে আত্ম-পৌরুষ ছাড়া আর কিছুই তত আপনার নয়। তাঁহারা অন্তরে অন্তরে—একা। আসলে তাঁহাদের কোন সঙ্গী নাই--আত্মীয় নাই। প্রয়োজন হইলে ছিন্নমস্তার মত, তাঁহারা নিজের হাতেই নিজের মস্তক ছেদন করিয়া নিজের রক্ত নিজে পান করিতে পারেন—স্নেহ, প্রেম, ধর্ম·· নীতি সব কিছু উপড়াইয়া ফেলিয়া বিরাট হাহাকার জীবন শেষ করিতে পারেন।

যত উচ্চ শিখর তত গভীর ভয়ঙ্কর পতনের সম্ভাবনা। যত প্রচণ্ড শক্তি, তত বিকট বিকৃতির সম্ভাবনা। নাদির অনন্ত শক্তির অধিকারী বটে, কিন্তু যে

শক্তি একদিন তাঁহার অভ্যুদয়ের প্রধান কারণ ছিল, সেই শক্তিরই বিকৃতি তাঁহার পতনের কারণ হইয়াছে। শক্তির মদ নাদিরকে মত্ত ও অন্ধ করিয়াছে, আদর্শবাদী নাদিরকে উচ্ছৃঙ্খল ও নিষ্ঠুর দস্যু-নাদিরে পরিণত করিয়াছে—সব মহৎ আদর্শ ভুলাইয়া নাদিরকে শুধু 'শক্তির লীলা' দেখাইবার জন্য প্রয়োচনা যোগাইয়াছে—তাহাকে সর্বনাশের আবর্তে ঠেলিয়া দিয়াছে। মদান্ধ নাদিরের পুত্র বিষাক্ত হইয়াছে, হারেম বিষাক্ত হইয়াছে, প্রজা বিষাক্ত হইয়াছে এবং শেষপর্যন্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু সালেবেগেরই হাতে অপঘাত মৃত্যু ঘটিয়াছে। একদিন পারস্যবাসীরা যাঁহাকে পূজা করিতে পারিলে ধন্য মনে করিয়াছে, আর একদিন তাঁহাকেই হত্যা করিতে পারিয়া কৃতকৃতার্থ মনে করিয়াছে। ট্র্যাজেডিই বটে।

*[স্বষ্ট চরিত্র হিসাবে নাদিরের দোষ-গুণ আগেই আলোচিত হইয়াছে। দিগ্বিজয়ী ট্র্যাজেডি কি না—এই প্রশ্নের আলোচনা দ্রষ্টব্য।]

(২) **সালেবেগ**। সালেবেগ নাদিরের যুদ্ধসচিব'—'খোরাসানী পল্লীবাসী', নাদিরের বাল্যবন্ধু—আদর্শবাদী। সালেবেগ নিজের মুখেই নিজের সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন—"তার চোখে ছিল স্বপ্নের ঘোর, কল্পনায় ছিল বিরাট মোসলেম সাম্রাজ্য"। সালেবেগ যেন নাদিরেরই আদর্শবাদী সত্তা "মানবের মুক্তি"র স্বপ্ন তাহার চোখে। সেই স্বপ্নের কথা তিনি নিজ মুখেই ব্যক্ত করিয়াছেন "আমি চাই মানব-জাতির মুক্তি।"

তাই, যে নাদির প্রভুত্ব চাহিয়াছেন, পূজা চাহিয়াছেন, মানবের রক্তে স্নান করিতে চাহিয়াছেন তাঁহার এবং সালেবেগের পথ এক হইতে পারে না। সালেবেগ—সঙ্গে সঙ্গে নাদিরের আদর্শবাদী সত্তাও, বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। নাদিরের মুখের উপর স্পষ্ট কথা বলিবার সৎসাহস এক সালেবেগের মত আদর্শপরায়ণদের পক্ষেই সম্ভব।

এই আদর্শের সৎসাহসেই সালেবেগ,—জন্মভূমির কাছে শেষ হিসাব নিকাশ করিবার জন্য যে নাদির ভয়াল মূর্তিতে উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইতে এবং তাঁহার গায়ে তরবারির আঘাত করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। পশুবলই

যে জগতে একমাত্র বল নয় এবং মানুষের সমাজে পশুর পূজাও অবাধগতি চলিতে পারে না, সালেবেগ গর্বী পশু-নাদিরকে হত্যা করিয়া তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। সালেবেগের কাছে বন্ধুত্ব বড় বটে কিন্তু দেশের মুক্তির, মানব-জাতির মুক্তির আদর্শ আরো বড়। নাদিরের হত্যার মধ্যে মুক্তির আদর্শ—মানবতার আদর্শই জয়ী হইয়াছে। আদর্শ-বীর চরিত্র হিসাবে, বন্ধুত্বের উপর আদর্শকে স্থান দেওয়ার দিক দিয়া, সালেবেগের সহিত ব্রুটাসের (জুলিয়াস সীজর-নাটকের) বেশ ঐক্য আছে।

(৩) রেজাকুলি খাঁ। নাদিরের জ্যেষ্ঠ পুত্র —(সুলতানা বেগমের গর্ভে রেজার জন্ম) নাদিরেরই 'প্রতিকৃতি'—"সুন্দর যুবক, মহান, উদার, বীর!" পিতাকে সে যেমন ভক্তি করে তেমনি ভয়ও করে কিন্তু সত্যের খাতিরে, ন্যায়ের খাতিরে পিতার মুখের উপরেই যে সে স্পষ্ট কথা বলিতে পারে বিচার-দৃশ্যে তাহার প্রমাণ আছে। রেজা পিতৃভক্ত সন্তান—পিতার তুষ্টির জন্য সে বিনাবাক্যব্যয়ে তাহার দেহ দিতে পারে। কিন্তু তাহার জীবনের বড় ট্র্যাজেডি এই যে সে সেই পিতারই সন্দেহভাজন। রেজার স্বীকারোক্তি সত্য বলিয়াই আমরা গ্রহণ করিতে পারি—আপনি আমার পিতা আমার প্রভু আমি হজরৎ আলির মত আপনাকে শ্রদ্ধা করি, ভক্তি করি। সেই শ্রদ্ধার আসন যখন টলেছে, আমার ইহজীবনের সর্বস্ব আজ যখন আমার প্রতি ঘৃণিত সন্দেহ পোষণ করেন, তখন এ জীবনে আমার কোন প্রয়োজন নেই"। রেজার অপরাধ ? পিতার বিরুদ্ধে সচেতন কোন অনিষ্টচিন্তা বা ষড়যন্ত্র সে করে নাই ; রেজার অপরাধ মনের গহনে—অবচেতন বাসনার মধ্যে, যে কামনার উপর মানুষের কোন হাত নাই সেই কামনার মধ্যে। নাদির রেজার মন সমীক্ষণ করিয়া বলিয়াছেন—"তুমি শক্তির শোণিত-স্বাদ পেয়েছ—তামাসকে হত্যা করে শক্তির মাদকতা অনুভব করেছ। আশ্চর্য নয়, পরিপূর্ণ শক্তিলাভের জন্য তোমার অন্তর অধীর আগ্রহে উন্মত্ত হয়ে উঠবে"। রেজাও অস্বীকার করিতে পারে নাই —"রেজাকুলি উত্তর দিতে না পারিয়া নীরব রহিল। অন্তর মহাসাগরের

তরঙ্গের নীচে কি কামনা লুকাইয়াছিল তাহা দেখিয়া সে সভয়ে শিহরিয়া উঠিল"। এই অবচেতন মনের কামনার অপরাধে রেজার নয়ন হইতে, চিরদিনের জন্য আলোক মুছিয়া দেওয়া হইল। অপরাধের কোন কায না করিয়াও রেজা অপরাধীর মত বিচারের সম্মুখে দাড়াইয়াছে এবং নিরুপায়-ভাবে অথচ বীরের দৃঢ়তা লইয়া দণ্ডাদেশ মাথা পাতিয়া নিয়াছে। রেজার পরিণাম ট্র্যাজেডির মহিমায় মণ্ডিত।

(৪) **রহমৎ খাঁ**। রহমৎ খোরাসানের পল্লীযুবক—আদর্শবাদী সালেবেগের ছাত্র এবং আতযোগ্য ছাত্র। আলি আকবরের মুখে জানা যায়, মৌলানা রহমৎ—"একনিষ্ঠ, ধর্মপরায়ণ, স্বদেশসেবক"। শুধু এইটুকু বলাই যথেষ্ট নয়। রহমৎ মানবতার পূজারী। তাহার ঘোষণা—"মানুষ পশু হয়ে গেছে এ কথায় বিশ্বাস করার চেয়ে বোধ হয় মরাও ভাল"। এত ঐকান্তিক তাহার মানবতা পূজার নিষ্ঠা—এত জাগ্রত তাহার অন্তরাত্মা! রহমৎ নিজেই বলিয়াছেন—"মানুষকে অবিশ্বাস করতে আমার ধর্ম আমায় নিষেধ করে"……"কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম আমার নেই—আমি সুফি কবির-ভক্ত। এই ধর্ম রহমৎকে অভয়মন্ত্রে দীক্ষা দিয়াছে। তাই নাদিরকে তিনি ভয় করেন না—অমানুষ ভাবিতে পারেন না। নাদিরের জন্য তাঁহার দুঃখ হয়! কারণ—তাহার দৃঢ় বিশ্বাস—"এ কখনো হতে পারে না!" তাহার ক্ষোভ—"এতবড় প্রাণ কোন মরুভূমিতে এসে তার ধারা হারিয়ে ফেলেছে। সালেবেগের কথার উত্তরে তিনি তাই বলিতে পারেন—"আমি তাঁকে সিংহ মনে করি না—ঠিক আমার মত অতি ক্ষুদ্র মানুষ বলেই মনে করি! সম্ভবতঃ আমার চেয়েও দুঃখী, আমার চেয়েও দুর্ভাগা।" নাদিরের 'প্রকৃত অন্তরতম মানুষটিকে উদ্ধার করিতে গিয়া রহমৎ অহিংসের স্বাভাবিক পরিণামই লাভ করেন। রহমতের কথাই ঠিক—মৃত্যুর রহস্য যে জানতে চায় তাকে মৃত্যুর সামনে উপস্থিত হতে হয়"।

রহমতের মত মানবতা-প্রেমিক ও অহিংসাব্রতী এইভাবেই প্রাণ দেয় এবং প্রাণকে মৃত্যুহীন করিয়া তুলে। প্রাণহীনের মধ্যে প্রাণ জাগাইতে গিয়া ইহারা

অপঘাতের মুখেই প্রাণ দেয় বটে কিন্তু রহমতের মৃত্যুর মত আত্মনাটকীয় মৃত্যু খুব কমই ঘটে। আদর্শবাদিতা মিথ্যা কোন ব্যাপার নয়— জীবনে আদর্শবাদিতা কম-বেশী আছে, সুতরাং সাহিত্যেও আদর্শবাদিতার স্থান আছে—তবে সেই আদর্শবাদিতাকে বাস্তবিক অর্থাৎ বিশ্বাস্য করিয়া তুলিতে পারাই বড় কথা।

(৫) **আলি আকবর।** যাঁহাদের কাছে প্রাণের মর্যাদা অপেক্ষা প্রাণের মায়াটুকুই বড়, আলি আকবর তাঁহাদেরই একজন। হুগলীর অভিজাত বংশে তাঁহার জন্ম—তিনি সম্পর্কে নাদিরের শ্যালক (সিরাজীর দাদা), পদগৌরবে 'রাজস্ব-সচিব'। অভিজাতদের যে সকল বৈশিষ্ট্য—[illegible], বিলাস-ব্যসন প্রভৃতি তাহার আছে এবং তিনি যে অভিজাত নন 'মসীজীবী' তথা বুদ্ধিজীবী এজন্য তিনি গর্বিত। [illegible] এবং বাঁচা শিক্ষাভিমান। [illegible] এবং সেখানেই নাদিরের উপর তাহার আনুগত্য—এর মনের অভিমানও একটু আছে। আলি, একেবারে অধঃপতিত। কায়স্থ অর্থাৎ কেরাণীর জীবন দর্শনেই তাঁহার বিশ্বাস—"মান-অপমানের খুব বেশী তোয়াক্কা আমি রাখিনে, আমি চাই কাজ। দুটো মিষ্টি কথা বললে যদি কাজ পাওয়া যায় তাতে ক্ষতি কি?" সিরাজীর কথায় তাঁহার বর্তমান অবস্থাটি সুন্দর ব্যক্ত হইয়াছে "তোষামোদ করে আর অপমান সয়ে তোমার গায়ের চামড়া এত পুরু হয়ে গেছে যে কোনো অপমানই চামড়া ভেদ করে অন্তরে গিয়ে পৌঁছয় না।" নাদির একদিকে বংশ-আভিজাত্য লইয়া উপহাস-পরিহাস ও অপমান করিয়া চলিয়াছেন, আলি আকবর আর-একদিকে "সমস্ত রাত্রি মদ্যপান করে নিজের আনন্দে বিভোর"...। কোন অপমানই তাহার গায়ে লাগে না।

কিন্তু তাই বলিয়া, আলি একেবারে অন্ধ নন। নাদিরকে শ্রদ্ধার চোখে তো দেখেনই না অধিকন্তু তাঁহাকে তিনি ঘৃণা করেন। আর তাহাতেই শেষ নয়। সিরাজীর একদিনের উত্তেজনায় আলি আকবরের নিশ্চিন্ত অসাড়তা কাটিয়া যায়। তিনি নাদিরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন এবং কোন কাজ অর্দ্ধেক

পর্যন্ত করে ছেড়ে দেওয়া স্বভাব নয় বলিয়া, শেষ পর্যন্ত না দেখিয়া ক্ষান্ত হন না। তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন "তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ সিরাজী। তুমি যদি উত্তেজিত না করতে তা হলে এই রকম লাথি জুতো আর কানমলা খেয়ে আমি বোধ হয় বরাবরই বেঁচে থাকতাম।"

আলি মর্যাদার জন্য, বৃদ্ধিতে যাহা কুলায় তাহার সবই করিতে প্রস্তুত—অবশ্য প্রাণ বাঁচাইয়া। সম্মুখ সংগ্রাম করিতে পারে দুঃসাহসী অসিজীবীরা আর পারে রহমতের মত নির্ভীক আদর্শবাদীরা। আলি চালনা করিতে পারেন মসী, বুদ্ধি ও জিহ্বা। তাঁহার না আছে অসি-চালনার শক্তি, না আছে প্রাণের মায়া তুচ্ছ করিবার শক্তি। অগত্যা, আলি বিদায় গ্রহণ করেন এবং করিবার সময় তাহার স্বভাবের স্বরূপ ব্যক্ত করিয়া যান—"প্রাণের মায়া আমায় কখনো ছাড়েনি। আজও সেই প্রাণের মায়া নিয়েই চল্লাম"।

(৩) **সিরাজী**। স্বখাত সলিলে যাঁহারা ডুবিয়া মরেন তাঁহাদের মৃত্যুর জন্য স্বাভাবিকভাবেই একটু শোচনা জাগে। সিরাজী একেবারে না মরিলেও স্বখাত সলিলে যে ডুবিয়াছেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

সিরাজী অভিজাত বংশের কন্যা, ভাগ্যগুণে বা দোষে আভিজাত্যহীন নাদিরের পত্নী। নাদির তাঁহাকে ভালবাসিয়া বিবাহ করেন নাই, বিবাহ করিয়াছিলেন রূপ-যৌবনের মোহে। রূপযৌবনের জোয়ার যতদিন ছিল ততদিন নাদিরকে তিনি আকর্ষণ করিয়াছেন, নাদিরের প্রাণে মত্ততা সৃষ্টি করিয়াছেন কিন্তু নাদিরের অন্তর স্পর্শ করিতে পারেন নাই। তাই রূপ-যৌবনে ভাটা পড়িতেই নাদিরের মোহ কাটিয়া গিয়াছে। নাদির তাঁহার মনোভাব ব্যক্তও করিয়াছেন—'ভেবেছিলাম তোমাকে বেগমের দল থেকে বরখাস্ত করে বাঁদীর দলের সর্দারণী করে দেব'। (বড় পীরিতিই বটে!)

এই সময়েই, ভারতবর্ষে আসিয়া নাদির 'সিতারা'র প্রতি আসক্ত হন এবং সিতারা নাকি তাঁহার অন্তর স্পর্শ করিতে তথা অমৃত দান করিতে সক্ষম হন—এই ব্যাপারে সিরাজী নারীসুলভ ঈর্ষায় ক্ষুব্ধ হইয়া উঠেন। বিশেষতঃ "পথের

সুন্দরী" সিতারাকে মহিষী করায় এবং তাহারই পদতলে বসিয়া কুর্ণিশ করিতে বাধ্য হওয়ায়, সিরাজীর অপমানের একশেষ হয়। সিরাজী আলি আকবরকে উত্তেজিত করিয়া অপমানের প্রতিশোধ লইতে চাহেন—অবশ্য তাঁহার প্রতিশোধ লওয়ার অর্থ—"দেখতে চাই—হিন্দুস্থানের হারামজাদীকে কাল সকালে কুত্তা দিয়ে খাওয়ানো হচ্ছে।" আলি উত্তেজিত হয় বটে কিন্তু তাহার উত্তেজনা রাজনৈতিক চক্রান্তের রূপ গ্রহণ করে অর্থাৎ সিরাজীর আসল স্বার্থের প্রতিকূল হইয়া দাঁড়ায়। সিরাজীর আসল স্বার্থ—নাদিরকে সিতারার গ্রাস হইতে উদ্ধার করা এবং বিনা প্রতিযোগিতায় নাদিরের হারেমে মহিষী হইয়া থাকা। নাদির সিরাজীকে যত উপেক্ষা, যত অপমান দিয়াই আঘাত করুন না কেন সিরাজী কিন্তু নাদিরকে একটু আধটু নয় দস্তুরমত ভালবাসিয়াছে আলি আকবরের কথা ফেলা যায় না—"মাঝে মাঝে তোমায় মনে হ'তো বুঝিবা তুমি কুলি খাঁকে একটু ভালবাস। এখন দেখছি দস্তুরমত ভালবাস—চাই কি তোমায় পতিব্রতা বলা চলে।" তবে অপমানের ও ঈর্ষার জ্বালায় পতিব্রতা এমন করিয়া আলি আকবরের প্রতিহিংসাকে জাগাইয়া তুলিয়াছে যে, আলি আকবরের ষড়যন্ত্রের ফলে পতিকেই হারাইয়াছে সিরাজী নিজেই নিজের ট্র্যাজেডি ব্যক্ত করিয়াছে—"আমিই আমার স্বার্থসিদ্ধির জন্য আলিকে প্রশ্রয় দিচ্ছি। তার অন্তর খুঁড়ে তার সুপ্ত প্রতিহিংসার সরীসৃপকে জাগিয়ে দিচ্ছি। এখন সে আমার বশের অতীত।" সিরাজী মনে করিয়াছিলেন যে, যে নাগিনী (সিতারা) নাদিরকে বেষ্টন করিয়া আছে, আলিকে দিয়া শুধু তাহাকেই তিনি মারিবেন এবং নাদিরকে মুক্ত করিয়া ভোগ করিবেন। কিন্তু আলি যে নাদিরকেই মারিবার আয়োজন করিবে তাহা তিনি মনেও করিতে পারেন নাই। যত বড় ভুল, তত বড় প্রায়শ্চিত্তই কি তিনি করেন নাই? ঈর্ষান্ধের ট্র্যাজেডিই সিরাজীর ট্র্যাজেডি।

(৭) **সিতারা।** সিতারার সংক্ষিপ্ত পরিচয় সে নিজেই দিয়াছে—"আমি হিন্দু—রাজপুত নারী"……"আমার পিতা ও স্বজাতির কাছ থেকে মোগলরা

আমায় অপহরণ করে। তারপর, একজন কাপুরুষ মোগল বংশী লম্পটের সঙ্গে এক মোল্লা এসে আমার বিবাহ দেয়।"......"বিবাহের রাত্রে লম্পট আমার অঙ্গ স্পর্শ ক'রতে আসে। আমি তাকে বধ করি"......"আমি নিশীথ অন্ধকারে পুরী ত্যাগ করি।"......দেশে ফিরে গিয়ে শুনলাম, বাপ-মা মারা গেছেন। দেশে কেউ আমায় স্থান দিলে না......শেষে......কণ্ঠকে......পাথেয় ক'রে বেরিয়ে পড়লাম"......

সিতারা জাতিতে হিন্দু, রাজপুত এবং রাজপুত-নারীর মতই সে বীর পূজারী—বীরাঙ্গনা। কিন্তু দুর্ভাগ্য তাহার, মোগল দুর্বৃত্তের পাপ আচরণে—সমাজের বা ঘরের আচ্ছাদন হইতে সে বঞ্চিত, সমাজের সংকীর্ণতায় নিষ্পাপ হওয়া সত্ত্বেও "পথের সুন্দরী"-তে পরিণত। পথে পথেই সে একাকী বেড়াইয়াছে। সেদিন—উজীর সাহেবের অনুচর জাঁহাপনাকে উপহার দেবার জন্য ক্রীতদাসী খুঁজতে বেরিয়েছিল"......তাহাকে...মোগল সম্রাটের শিবিরে নিয়ে এল'...তারপর ভাল পোষাক পরাইয়া নাদিরের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছে। যে বীরাঙ্গনা সিতারা লম্পট মোগল স্বামীর বুকে ছুরিকা বসাইয়াছে, সে কি ভাবিয়া অনুচরদের কথামত মোগল সম্রাটের শিবিরে আসিয়াছে এবং শেষ পর্যন্ত নাদির শাহের সম্মুখে আসিয়াছে তাহা অবশ্য বুঝা যায় না। যাহা হউক সিতারা আসে এবং আসিয়াই নাদিরের মন জয় করে। * নাদিরের মনের মানুষের আদর্শের সহিত সিতারার অধিক সাদৃশ্য—নাদির আভিজাত্যবিদ্বেষী, সিতারা অনভিজাত—পথের সুন্দরী; নাদির পৌরুষ-প্রিয়, সিতারা তেজস্বিনী, বীরাঙ্গনা, নাদির ধর্মের কোন সাম্প্রদায়িক গণ্ডীতে আবদ্ধ নন, সিতারাও কোন বিশেষ ধর্মের গণ্ডীতে আবদ্ধ নয়। নাদির সিতারার বীরত্ব, রূপ-যৌবন এবং বুদ্ধি দেখিয়া মুগ্ধ হন এবং তাহাকে প্রধানা মাহষীর পদ দান করেন। সিতারা গররাজি হয় না; কারণ "একভাবে তো কাটাতে হবে"। শুধু যে রাজিই হয় তাহা নয়, পৌরুষের-দেবতার নাদিরকে ভালও বাসে। নাদিরেরও সিতারার প্রেমে-অমৃতের তৃষ্ণা মেটে। তিনি নবযৌবন লাভ করেন।

যেখানে অনুরাগ প্রেমে পরিণত, সেখানেই প্রেমাস্পদের জন্য আত্মত্যাগের প্রবণতা সহজ হইয়া উঠে। সেতারার মুখেই শোনা যায়—সে নাদিরকে অভিশাপ মুক্ত করিবার জন্য মৃত্যু পর্যন্ত বরণ করিতে প্রস্তুত। সেরাজী চক্রান্তের

* [সিতারা-চরিত্র অসাধারণ কিন্তু মধুর। এই চরিত্রের গান্ধর্ব অসাধারণের বাস্তবিকত। এই বাস্তবিকতার মায়া আবরণ কোন কোন ক্ষেত্রে শিথিল হইয়া পড়িয়াছে।

যাদ পাইবার জন্য প্রথম সিতারার এক আত্মত্যাগের উপায় গ্রহণ করে। কিন্তু সিতারার প্রতি অবিশ্বাস জন্মাইবার চেষ্টা সফল হয় না—ফাঁদ ফাঁসিয়া যায়। শেষ পর্যন্ত সিরাজীর চক্রান্তে, সুলতানা অনুরোধে রেজাকুলির প্রাণ বাঁচাইতে গিয়া নাদিরের বুৎসিত সন্দেহের আঘাতে মর্মাহত এবং নাদিরেরই আদেশে বিতাড়িত হয়। পথের সুন্দরী আবার পথে গিয়া দাঁড়ায়। কিন্তু নাদিরের স্মৃতি এবং চরিত্র বিরহ তাহাকে পীড়া দিতে থাকে। গানে গানে সে হৃদয়ের গোপন ব্যথা জানায়—স্মৃতির দাহন, স্মৃতির বাঁধন ভুলিতে চায় কিন্তু ভুলিতে পারা কি সহজ, না সম্ভব? ঘুরিতে ঘুরিতে সে খোরাসানে এবং কথোপকথনরত সালেবেগ রহমতের দৃষ্টি-পথবর্তী হইয়া আসে। কিন্তু সালেবেগের দৃষ্টি এড়াইবার জন্য সে কেন যেন পলায়ন করে আবার সেইখানেই আসিয়া রহমতের সঙ্গে আলাপ করে—সম্রাটের শিবির কোথায় তাহা জানিয়া লয়। শেষ পর্যন্ত, সম্রাট-শিবিরে সম্রাটের আলিঙ্গনে আবদ্ধ থাকিয়া একই সঙ্গে নিহত হয়। সিতারা জীবনের যাত্রাপথে দেশ, জাতি ধর্ম সব হারাইয়াছে—পাওয়ার মধ্যে পাইয়াছে, নাদিরের ভালবাসা, নাদিরকে ভালবাসার আনন্দ আবার প্রেমাস্পদেরই দেওয়া চরম আঘাত। তবু প্রেম পরাভব মানে নাই। প্রেমাস্পদকে বাঁচাইবার জন্য তাহার বুকেই ফিরিয়া আসিয়াছে।

ভাব মূল্য

সাহিত্য-শিল্পের মূল্যকে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে—এক **আনন্দ মূল্য** (Pleasure value), দুই—**প্রভাব-মূল্য** (Influence value)। অবশ্য এ কথাও মনে রাখা দরকার যে—শিল্পে তত্ত্ব বা প্রচারকে রসের উপাদান হিসাবে স্থান গ্রহণ করিতে হইবে। রস-সাহিত্যের বিশেষ লক্ষ্য—রস এবং সেখানেই শাস্ত্রসাহিত্যের সঙ্গে উহার পার্থক্য। তবে এ কথাও সত্য—"though there can be art without purpose, there cannot be art without result. Everything that moves men, moves them in some direction, up or down, for better or worse" আনন্দমূল্য সাহিত্যের বড় মূল্য বটে, কিন্তু উহাদের বিচারেই মূল্য—বিচার শেষ হয় না—ফলশ্রুতি বা 'প্রভাব-মূল্য'-বিচারও চাই।

'প্রভাব-মূল্য প্রকাশ পায় মোটামুটি দুইভাবে এক, "ভাব-বস্তু"—প্রচারে ; দুই চরিত্রের পরিণতি অঙ্কনে। দিগ্বিজয়ী নাটকে নাট্যকার নিম্নলিখিত "ভাব" প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন—(সংক্ষিপ্ত তালিকাকারে)

(ক) নাটকের মূল ভাব—(নাদিরের ট্র্যাজেডি আলোচনায় আলোচিত)

খ) 'বংশের নয়, নিজের পরিচয়ে মানুষ দাঁড়াবে।'—"আভিজাত্যের চেয়ে মানুষ শ্রেষ্ঠ, কেননা আভিজাত্য মানুষ সৃষ্টি করে না, মানুষই আভিজাত্যে স্রষ্টা।"

(গ) সাম্প্রদায়িক ধর্মই সংকীর্ণ গণ্ডী রচনা করিয়া রাখিয়াছে—মানুষে মানুষে ঘৃণা-বিদ্বেষ জীয়াইয়া রাখিয়াছে যিনি এই গণ্ডী অতিক্রম করিতে পারেন, তিনিই সিতারার মত বলিতে পারেন—"আমি সব ধর্মকেই সত্য বলে জানি, সেই জন্য কোন বিশেষ ধর্মের গণ্ডীর জন্য ব্যস্ত হ'ইনি।" রহমতের মতই তিনি বলিতে পারেন—"কোনো সাম্প্রদায়িক ধর্ম আমার নেই" (পরমত-সহিষ্ণুতা, পরধর্মসহিষ্ণুতা—প্রচার)

(ঘ) **মানবতার মহিমা :**—রহমতের মুখে মানবতার মহিমা-কেতন

উড্ডীন রহিয়াছে। কণ্ঠে তাহার উদাত্ত বিশ্বাস-বাণী—"মানুষ পশু হ'য়ে গেছে এ কথায় বিশ্বাস করার চেয়ে বোধ হয় মরাও ভাল।

(ঙ) **আত্মিক শক্তির মৃত্যুঞ্জয় প্রতিষ্ঠা** :—পশুবল সাময়িক ভাবে মানব-মহিমার আলোক আচ্ছাদিত করিতে পারে, সত্য, কিন্তু পশু-বলের পরাজয় অনিবার্য। রহমতের মত অহিংসা-নীতিবাদীরা, আদর্শবাদীরা প্রাণ দিয়া এবং সালেবেগের মত আদর্শবাদীরা নিষ্ঠা দিয়া পশুর পতন ঘটাইবেই।

(চ) **অহিংসা ও প্রেমেই মানব জীবনের মহত্তম বিকাশ**। "ধর্মের চেয়ে পৃথিবীতে ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ দান প্রেম। সে প্রেম যার জীবনে অসম্মানিত হয় তার চেয়ে দুর্ভাগ্য পৃথিবীতে আর নাই"। প্রেমই বিধাতার শুভঙ্করী ইচ্ছার রূপ—প্রেমই জগতের মিলনী শক্তি। (সিতারার মত অশিব শক্তিকে প্রকৃতিস্থ করিবার জন্য প্রেম বা শিব-শক্তির আত্মদান)।

(ছ) **জীবন দর্শন** :—মানবতার মহিমা, আত্মিক শক্তির মহিমা অহিংসা ও প্রেমের মহিমা—অসাম্প্রদায়িক ধর্মের মহিমা উদ্‌ঘোষিত হইলেও এই নাটকে নাদিরের মুখে মানুষের স্বরূপ সম্বন্ধে যে দর্শন ব্যক্ত হইয়াছে তাহা ভারতীয় সংস্কারের বিরোধী। "পাপই মানুষের প্রকৃতি, পাপেই তার আনন্দ, সে পাপাত্মা পাপ-সম্ভব। কোন ধর্মের কোনো ঈশ্বর তাকে এ পাপ থেকে মুক্ত দিতে পারেনি—পারবে না।"—লোকত্তর পুরুষ নাদিরের এই উক্তি "অমৃতের সন্তান" মানুষকে ছোটই করিয়াছে।—"মানবের মুক্তি—জগতে সাম্য-বিধান" —প্রভৃতি বিষয়ে নাদিরের যে অনাস্থা প্রকাশ পাইয়াছে, বিকৃত প্রতিভার উক্তি হইলেও, উহার প্রভাব অনস্বীকার্য। কারণ, সালেবেগের মত ভাষ্যকারের কল্পনা যাহার নাগাল পায়না, যাহার কাছে রহমৎ ও সালেবেগ নিজেদের খুব ছোট মনে করিয়াছেন, তাঁহার সিদ্ধান্তের প্রতি সাধারণ লোকের আস্থা হইবে —ইহা খুবই স্বাভাবিক।

নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের ট্র্যাজেডি-চেতনা

ট্র্যাজেডি-চেতনাকে সংক্ষেপে বিশেষ এক প্রকারের রসবোধ—বিশেষ একটি মানসিক ভঙ্গী নিয়ে যে দৃষ্টিকোণ থেকে জীবনকে দেখা বা দেখানোর অভিপ্রায় বলা চলে। এই মানসিক ভঙ্গীটি শুধু মাত্র বোধসর্বস্ব অথবা শুধু মাত্র আবেগসর্বস্ব কোন অবস্থা নয়, বোধ ও অনুভবের বিশেষ সংশ্লেষে তা' গঠিত এবং গঠিত ব'লেই ট্র্যাজেডি রসদৃষ্টিতে জীবনকে দেখতে যাওয়ার অর্থ—জীবনকে বিশেষ ধরনের বোধের (আইডিয়া) অধীন ক'রে এবং বিশেষ ধরনের অনুভবে উপলব্ধি করা। প্রাচীনকাল থেকে অতি আধুনিক কাল পর্যন্ত, প্রত্যেক ট্র্যাজেডিরস রসিক শিল্পী তাঁর সৃষ্টিতে বোধ-অনুভবের সংশ্লেষে-গড়া ঐ ট্র্যাজেডি সংবিদকেই (ট্র্যাজিক ইম্প্রেশান) সৃষ্টি করবার চেষ্টা ক'রে আসছেন, তাঁদের একের সঙ্গে অন্যের যে পার্থক্য তা' নিহিত রয়েছে, জীবনের বিভিন্ন উপাদানের সাহায্যে ট্র্যাজেডি-সংবেদ-উদ্দীপক বিশেষ বিশেষ বৃত্ত রচনা করার শক্তির তারতম্যের মধ্যেই—ঘটনা তথা বৃত্ত পরিকল্পনার ভিতর দিয়ে অভীষ্ট বোধ ও অনুভব জাগানোর শক্তির মধ্যেই। এইস্কিলাস-সফোক্লিস-ইউরিপিডিস বা শেক্সপীয়র-কর্ণেই-রাসিন বা ইবসেন স্ট্রিণ্ডবার্গ প্রভৃতি যে বিশ্ববিখ্যাত ট্র্যাজেডি-শিল্পী ব'লে বন্দিত হচ্ছেন, তার কারণ আর কিছুই নয়, কারণ এই যে তাঁরা তাঁদের রচনার মধ্যে কল্পিত বৃত্তের মাধ্যমে ট্র্যাজেডি-সংবিদ অর্থাৎ ট্র্যাজেডির অভীষ্ট বোধ ও অনুভবকে যথেষ্ট মাত্রায় ব্যক্ত করতে পেরেছেন। সে যুগের যে জীবন উপাদানকেই এঁরা গ্রহণ করুন না কেন, উপাদানের সাহায্যে এঁরা এমন সুন্দর সমর্থ বৃত্ত রচনা করতে পেরেছেন যা' আমাদের মনে যুগপৎ গভীর বোধ ও আবেগ জাগিয়ে দিয়ে থাকে,

ট্র্যাজেডিরস আস্বাদন করিয়ে আমাদের মনে পরিতৃপ্তির উল্লাস সৃষ্টি করে থাকে।

কিন্তু যে মূল প্রশ্নের উত্তরের উপরে সব কিছু দাঁড়িয়ে আছে সে এই—কী ঐ বিশেষ বোধ ও অনুভব যাদের সংশ্লেষের ফলে ট্র্যাজেডি-সংবিদ সৃষ্টি হয়? বলা বাহুল্য, এই প্রশ্নের উত্তর দিতে যাওয়া এবং ট্র্যাজেডি-রসের স্বরূপ আলোচনা করা একই ব্যাপার। এই ব্যাপার থেকে সম্পূর্ণ প্রতিনিবৃত্ত হয়ে কোনও গ্রন্থের ট্র্যাজেডি চেতনা পরিমাপ করা চলে না। অতএব দ্বিজেন্দ্রলালের ট্র্যাজেডি চেতনা সম্বন্ধে আলোচনা করার আগে ট্র্যাজেডি-সংবিদ সম্বন্ধে একটি কথা বলে নেওয়া আবশ্যক। এ সম্বন্ধে প্রথম যিনি আলোচনা করেছিলেন এবং যাঁর আলোচনার ভিত্তির উপরেই ট্র্যাজেডি তত্ত্বের আলোচনার প্রাসাদ গড়ে উঠেছে, সেই মহামনীষী এরিস্টটল তাঁর পোয়েটিকস্ গ্রন্থে, ট্র্যাজেডি সংবিদের স্বরূপ নির্দেশ করতে যেয়ে যেসব কথা বলেছেন তার সার কথা এই যে—ট্র্যাজেডি আমাদের মনে 'unmerited misfortune'-এর বোধ অথবা আমাদেরই মতো একটি ব্যক্তির জীবনে দুর্বিপাক ঘটেছে—এই বোধ জাগে এবং সঙ্গে সঙ্গে "pity and fear" এই দুটি অনুভূতি জাগ্রত করে। ট্র্যাজেডি মানব জীবনের মহত্তা বিনষ্টির-শোচনীয় ভাগ্যবিপর্যয়ের দুঃখ দুর্দশার কাহিনী, যেসব মানুষ অদৃষ্ট শক্তির ইচ্ছায় অথবা প্রবৃত্তির তাড়নায় ভয়ংকর গহিত কোন কাজ করে বসে এবং সেই কাজের দ্বারা নিজের ভিতরের বা বাইরের শক্তিকে প্রতিকূল করে তুলে ব্রতী দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয় এবং শোচনীয়-দুঃখদুর্দশা ভোগ করে করে জীবন শেষ করে, একদিকে ট্র্যাজেডি সেই সব—those who have done something terrible জাতীয় লোকের শোচনীয় পরিণামের কাহিনী অন্যদিকে যে সব মানুষ প্রতিকূল অদৃষ্ট শক্তির প্রভাবে বা প্রতিকূল পরিস্থিতির আবর্তে পড়ে নিরুপায়ভাবে দুঃখদুর্দশা ভোগ করে এবং শোচনীয় পরিণামের আবর্তের তলে তলিয়ে যায়, সেই সব 'those who have—suffered something terrible' জাতীয় লোকের কাহিনী (বস্তুত

ট্র্যাজেডী সেই "মিষ্ট মিস্‌ফরচুন'-এরই কাহিনী—সাফারিং কেলামিটি এবং ক্যাটাসট্রাফির কাহিনী যা সামাজিক মানুষের মনে শোচনা ও ভয়ের উদ্রেক করে, যে মিসফরচুন দেখে মানুষ মনে করে যতখানি দুঃখদুর্দশা মানুষটি ভোগ করল, যেমন শোচনীয়ভাবে তার জীবনের যবনিকাপাত ঘটল, তার তাহা প্রাপ্য নয়—এতখানি শাস্তি বা দুর্ভোগ তার জীবনে ঘটা উচিত হয় নি। এরিষ্টটল মোটামুটি দুই শ্রেণীর ট্র্যাজেডি চরিত্র প্রত্যক্ষ করেছেন, এক—those who have done···something terrible দুই···those who have... suffered, something terrible.'···অর্থাৎ এক শ্রেণী নিজ কৃতকার্যের দ্বারা শোচনীয় পরিণাম সৃষ্টি করে, অন্যশ্রেণী, অপরের কাছ থেকে মর্মান্তিক আঘাত পায় অথবা ভাগ্যবিপর্যয়ের জন্য মর্মান্তিক দুঃখ দুর্দশা ভোগ করে।

কিন্তু এত কথার পরেও মূলপ্রশ্নের আসল উত্তর এখনও পাওয়া যায় নি। কারণ unmerited misfortune ঘটেছে, এই বোধটি এবং এই বোধের শোচনা ও ভয় জাগানো ট্র্যাজেডির সাধারণ ধর্ম বটে, কিন্তু ঐ বোধটি কি কি বা কত রকম পরিস্থিতিতে জাগে সে সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত না পাওয়া পর্যন্ত ঐ বোধের স্বরূপ বিশেষভাবে জানা সম্ভব নয়। পরিস্থিতিগুলির পরিসংখ্যানের চেষ্টা এরিষ্টটল যা' করেছেন তা' অতি সামান্যই। অতি-ট্র্যাজিক পরিস্থিতির বিবরণ দিতে যেয়ে তিনি বলেছেন—যে পরিস্থিতিতে পিতা সন্তানকে, সন্তান পিতাকে, মাতা সন্তানকে, সন্তান মাতাকে, ভাই ভাইকে, বন্ধু বন্ধুকে হত্যা করতে ষড়যন্ত্র করে বা হত্যা করে, সেই পরিস্থিতি সবচেয়ে শোচনীয়। অতি নিকট সম্পর্কের মধ্যে যখন এমনি ধরনের ঘটনা ঘটে, তখনই অতি-ট্র্যাজিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, এই কথা বলার তাৎপর্য কি তা' ব্যাখ্যা না করলেও, এরিষ্টটলের অভিপ্রায় বুঝতে কষ্ট করতে হয় না। তিনি যেন বলতে চেয়েছেন ঐ ধরনের ঘটনায় মানবিক-মূল্যগুলি—স্নেহ প্রেম ভক্তি প্রীতি প্রভৃতি যা মানুষের জীবনকে মধুময়, মহিমময় করে সেই সব হৃদয়ের সম্পদ, বিপর্যস্ত হয়ে যায় এবং যেখানে মানবতা নিঃস্ব হয়ে যায় তার চেয়ে বড় ট্র্যাজেডি মানুষের

আর কি হতে পারে? তাঁর মতে স্বাভাবিক সম্পর্কের তথা নীতির বিপর্যয়ের এবং সত্যের ও ন্যায়ের বিপর্যয়ের মধ্যেই মানুষের বড় ট্র্যাজেডি নিহিত রয়েছে অর্থাৎ মানুষ যে সব সম্পর্ককে পবিত্রতম বলে স্বীকার করেছে, যে সব সিদ্ধান্ত বা সত্যকে পরমার্থ বলে গ্রহণ করেছে, সেই সম্পর্কের মধ্যে যখন বিপর্যয় ঘটে, স্বাভাবিক প্রত্যাশার বিপরীত কিছু ঘটে, যখন মানুষ আপন সত্যকে হারিয়ে ফেলে মানবতাকে রিক্ত করে তোলে, নিজের জীবনকে শূন্য, সমস্ত সত্তাকে নিরর্থক করে তোলে, তার চেয়ে বড় ভাগ্যবিপর্যয় আর কিছুই নেই। যদিও এরিষ্টটল ট্রাজেডির সাধারণ সূত্র করতে যেয়ে বলেছেন যে ট্র্যাজেডিতে আমরা মানুষের ভাগ্যবিপর্যয়ের ঘটনা—ভালো ভাগ্য থেকে মন্দ ভাগ্যে পতনের দৃশ্য দেখে থাকি অর্থাৎ যেখানেই কোন মানুষ- আমাদেরই মতো না অতি-ভালো না-অতি-মন্দ মানুষ—সৌভাগ্য থেকে দুঃখদুর্দশায় পতিত হয় সেখানেই আমরা ঐ মানুষের পরিণামের জন্য শোচনা বোধ করি, তার শোচনীয় পরিণাম আমাদের কাছে ট্র্যাজিক বলে মনে হয়, তা এরিষ্টটলের বিশেষ বক্তব্য ব্যক্ত হয়েছে ঐ আগের সন্ধানের মধ্যে যেখানে তিনি বলতে চেয়েছেন—বড় ট্র্যাজেডির মধ্যে বড় নৈতিক সমস্যার কথা থাকে, বড় মানবিক মূল্যের প্রতি অনুরাগ ব্যক্ত হয়। মানুষের জীবনে misfortune যতোরকম কারণেই আসুক এবং যতো রূপেই আসুক যে misfortune-এর সঙ্গে নৈতিক সমস্যা যতো জড়িত, মানবিক মূল্যের প্রশ্ন যতো সম্পৃক্ত সেই misfortune ততো ট্র্যাজিক। এই মূল সূত্রকে ভিত্তি করে আমরা মানুষের মিস্‌ফরচুনকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করে নিতে পারি এবং সেই শ্রেণীবিভাগের পরিপ্রেক্ষিতে শিল্পীর ট্র্যাজেডি চেতনার বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করার চেষ্টা করতে পারি।

মানুষের 'মিস্‌ফরচুন'-এর কারণ এবং তার বিচিত্র রূপের নিরূপণ করতে গিয়ে যে-কথাটা প্রথমেই মনে আসে এবং যে-কথাটির চেয়ে সহজ আর কিছুই হতে পারে না সে এই যে মানুষের ভিতরে এবং বাইরে এতো বহু শক্তি এতো বিচিত্র গতিবিধি নিয়ে বিরাজ করছে যে প্রত্যেকটি ব্যক্তিজীবন বহুব্যক্তির এক

ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াক্ষেত্র এবং ঐ সব শক্তির উপরে ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছার প্রভাব অতিসামান্যই বা নেই বললেই চলে। এই শক্তিগুলির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্যে যতক্ষণ সামঞ্জস্য বা ভারসাম্য থাকে ততক্ষণই ব্যক্তিজীবন সুস্থ বা প্রকৃতিস্থ থাকে এবং যখনই ভিতরের বা বাইরের শক্তির চাপে ব্যক্তি ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে, তখনই তাঁর জীবনে 'বিসুফরচুনের' সূচনা হয়। জীবনে ভাগ্যবিপর্যয় ঘটে। ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে আমরা যদি কয়েকটি পরিবেষ্টনী বৃত্ত আঁকতে চাই, তা' হলে আমরা ব্যক্তির প্রথম পরিবেষ্টনী হিসেবে ধরতে পারি—পারবারকে, দ্বিতীয় পরিবেষ্টনী ধরতে পারি—সমাজকে, তৃতীয় বৃত্ত ধরতে পারি—প্রকৃতিকে এবং চতুর্থ বৃত্তে স্থান দিতে পারি বিশ্ববিধান বা অতিপ্রাকৃত কোন দৈবসত্তাকে। যে-কোন ব্যক্তিজীবনই এই কয়েকটি পরিবেষ্টনীর মধ্যে বাস করে। পরিবেষ্টনীগুলিকে সংক্ষেপে বলা চলে—সামাজিক, প্রাকৃতিক এবং অতিপ্রাকৃতিক। এই তিন শক্তির সঙ্গে বুঝাপড়া করার নামই জীবনসংগ্রাম অবশ্য যাঁরা অতিপ্রাকৃত কোন দৈবসত্তা স্বীকার করবেন না তাঁদের মতে ব্যক্তিজীবনের পরিবেষ্টনী মাত্র দুটি—এক প্রাকৃতিক, দুই সামাজিক—ব্যক্তি একদিকে বিশ্ববিধানের অধীন, অন্যদিকে সমাজবিধানের অধীন। কিন্তু যাঁরা মনে করেন অতিপ্রাকৃত এক বিধাতা পুরুষই বিশ্বের সব কিছুর সৃষ্টি স্থিতি লয়কে নিয়ন্ত্রিত করছেন, তাঁর ইচ্ছাতেই ব্যক্তিজীবনের শুভাশুভ পরিণাম সংঘটিত হচ্ছে, তাঁর প্রসাদেই ব্যক্তি সুখসমৃদ্ধি ভোগ করে এবং তাঁর বিরাগে বা অভিশাপেই ব্যক্তিজীবন দুঃখদুর্দশার কবলে পতিত হয়—তাঁর ইচ্ছাই নিয়তির নাম ধরে ব্যক্তিকে পরিচালিত করে এবং ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছাকে পরাভূত করে শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়, তাঁদের কাছে ব্যক্তিজীবনের পরিবেষ্টনী প্রকৃতির স্তর অতিক্রম করে অতিপ্রাকৃত দৈবের বা নিয়তির স্তর পর্যন্ত প্রসারিত। এঁদের মতে মানুষের শোচনীয় ভাগ্যবিপর্যয়ের মূলে থাকে দৈব ইচ্ছা বা নিয়তির অমোঘবিধান এবং ট্র্যাজেডিতে থাকে রহস্যময় দৈবশক্তির বা বিধানের—সঙ্গে ব্যক্তির

স্বাধীন ইচ্ছার বা পুরুষকারের সংগ্রাম এবং শেষ পর্যন্ত দৈব বিধানের কাছে ব্যক্তির আত্মসমর্পণ। ট্র্যাজেডি-সংবিদ এদের মতে—দৈব নিয়ন্ত্রিত পুরুষকারের ব্যর্থ সংগ্রাম এবং দুঃখদুর্দশা ও বিপত্তির জন্য শোচনা। এই সংবিদে একদিকে থাকে দৈববিধানের রহস্যের উপলব্ধি এবং অন্যদিকে থাকে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার মহিমা। দৈবের বিরুদ্ধে পুরুষকারের ব্যর্থ সংগ্রামের ফলে যে "মিস্‌ফরচুন" ঘটে, সেই মিস্‌ফরচুনের বোধের বৈশিষ্ট্য এই যে তার সঙ্গে অতিপ্রাকৃত দৈবরহস্য-চেতনা অবিচ্ছেদ্যভাবে মিশে থাকে।

এই জাতীয় ট্র্যাজেডিতে দেবতারা কখনও প্রত্যক্ষ ষড়যন্ত্র ক'রে কখনও প্রাকৃতিক শক্তির সাহায্য নিয়ে, কখনও বা মানুষের প্রকৃতিকে বিকৃত ক'রে, মানুষকে শাস্তি দিয়ে থাকেন, তথা দৈব ইচ্ছাকে পূরণ করে থাকেন। তবে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির সত্তাকে অতিক্রম করে দৈবরহস্যের চেতনাই প্রধান স্থান অধিকার করে—যদিও ট্র্যাজেডি-সংবিদ জাগানোর জন্য মানুষের যতখানি প্রতিস্পর্ধী মহিমা দেখানো দরকার তা দেখানো হ'য়ে থাকে। অন্যপক্ষে যাঁরা দৈববিধান ব'লে কোন বিধান স্বীকার করেন না, প্রকৃতির ঊর্ধ্বে কোন অতিপ্রাকৃত সত্তা স্বীকার করেন না তাঁদের কাছে মানুষের 'মিস্‌ফরচুনে'র হেতু তিনটি। এক প্রকৃতি, দুই অন্য ব্যক্তির ইচ্ছা বা সমাজ, তিন ব্যক্তির নিজের প্রবৃত্তি। দৈববাদীদের ব্যক্তিরূপা দৈবইচ্ছারূপিনী নিয়তিকে অস্বীকার করে বাদ দিলেও প্রাকৃতিক নিয়মরূপিনী নিয়তির হাত মানুষ এড়াতে পারে না, প্রাকৃতিকনিয়মরূপিনী নিয়তিকে স্বীকার করতেই হবে। মানুষ যে বিশ্ববিধানের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছে এবং বিশ্ববিধানের অংশরূপেই আপন অস্তিত্ব নিয়ে বিরাজ করছে, সেই বিশ্বপ্রকৃতি তার কাছে কম রহস্যময় নয়, তার নিয়মও এক অদৃষ্ট মহাশক্তির মতো মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করছে, সেও এক অজ্ঞাত মহাশক্তি যা মানুষের বোধের অতীত না হলেও, মানুষের ইচ্ছা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়—যার কাছে মানুষ নিরুপায় ভাবেই আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষ

প্রকৃতিকে জয় করবার চেষ্টা করছে একথা যত সত্য ততো সত্য এই কথাটিও যে মানুষ প্রকৃতির অমোঘ নিয়মের ঊর্ধ্বে এখনও যেতে পারেনি। জড় প্রকৃতির মধ্যে সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণের যে নিয়ম কাজ করছে, জীবপ্রকৃতিতে যা জন্ম ও মৃত্যুরূপে কাজ করেছে, সেই মহানিয়মের ব্যতিক্রম ঘটাতে আজও মানুষ সফল হয়নি, কবে হবে বা আদৌ হবে কিনা—কেউ বলতে পারে না।

জীবনের ঐকান্তিক কামনা— 'মরিতে চাহি না আমি এই সুন্দর ভুবনে ···' বাঁচতে চাই বাঁচতে চাই কিন্তু মরতে চাই নে' বলে আর্তনাদ করতে করতেই জীবনকে মৃত্যুর মুখে প্রবেশ করতে হয়। এই তো জীবনের সবচেয়ে প্রথম ট্র্যাজেডি। মৃত্যুই জীবনের প্রথম 'মিস্‌ফরচুন' এবং মৃত্যুর আশংকা ও যন্ত্রণার সহযোগেই জীবনের বেদনাবন্ধ গড়ে উঠেছে ব'লে মৃত্যুই জীবনের পরম বেদনা হয়ে রয়েছে। মৃত্যুর হাতে জীবনের পরাজয় সার্বজনীন ঘটনা বলেই সাধারণ মৃত্যুকে আমরা ট্র্যাজেডি বলে মনে করি নে, সাধারণ মৃত্যু আমাদের চোখে সূর্যোদয়, সূর্যাস্তের মতোই একটি প্রাকৃতিক ঘটনা বলে মনে হয়। কিন্তু অতি সাধারণ একটি মৃত্যুকেও জীবন ও মৃত্যুর দ্বন্দ্বের পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থাপিত ক'রে যে বড় ট্র্যাজেডি লেখা যেতে পারে তার নিদর্শন খুব বেশী পাওয়া যায় না, গেলেও একেবারে পাওয়া যায় না এমন নয় এবং সেই ট্র্যাজেডিতে রহস্যের পরিমণ্ডলটি নিয়তি রহস্যময় ট্র্যাজেডির রহস্য পরিমণ্ডলের চেয়ে কোন অংশেই ছোট নয়। কিন্তু তাই বলে একথা সত্য নয় যে মৃত্যুর দৃশ্য দেখালেই এই রহস্যের পরিমণ্ডল সৃষ্টি হয় এবং unmerited misfortune-এর বোধ জেগে যায়। যেখানে প্রাকৃতিক দুর্যোগে আকস্মিক মৃত্যু বা ব্যাধির প্রকোপে মৃত্যু ঘটে সেখানে 'মিসফরচুন' বোধ সামান্য থাকলেও আনমেরিটেড মিস্‌ফরচুন বোধ থাকে না এবং থাকে না বলেই 'ট্র্যাজিক' বলে বিবেচিত হয় না। 'আনমেরিটেড মিস্‌ফরচুন' বোধ থাকে সেখানেই যেখানে, ব্যক্তির জীবনে অবস্থান্তর ঘটে, ভালো অবস্থা থেকে মন্দ অবস্থায় পতন এবং শোচনীয় দুঃখদুর্দশা ও বিপত্তি ঘটে। কিন্তু মানুষের জীবনে তো শুধু নিয়তি

বা প্রকৃতির প্রভাবই কাজ করে না। মানুষ সামাজিক জীব বলে সমাজও মানুষকে পরিবেষ্টন করে আছে, সমাজশক্তির সঙ্গেও মানুষকে অবিরাম বুঝাপড়া করতে হয়। সুতরাং মানুষের জীবনে শুধু দৈব বা নিয়তির সঙ্গে অথবা প্রকৃতির সঙ্গেই দ্বন্দ্বের সম্ভাবনা নেই, সমাজের সঙ্গেও দ্বন্দ্বের সম্ভাবনা আছে। একদিকে দশের ইচ্ছা অন্যদিকে ব্যক্তির একের ইচ্ছা। এই দুই ইচ্ছার বিরোধ ও সংঘাতেও ব্যক্তিজীবনে শোচনীয় পরিণাম নেমে আসতে পারে। তবে দৈবের বা নিয়তির আক্রোশে অথবা প্রাকৃতিক উপপ্লবে মানুষের জীবনে যে শোচনীয় পরিণাম ঘটে, তার সঙ্গে যেমন নৈতিক সমস্যার যোগ খুব কমই থাকে, অনেকক্ষেত্রে থাকেও না, তেমনি যখন আকস্মিক সামাজিক বিপ্লবে ব্যক্তির জীবনে দুঃখ দুর্দশা-বিপত্তি ঘটে তখনও সেই শোচনীয় ভাগ্য-বিপর্যয় বা বিড়ম্বনার সঙ্গে নৈতিক সমস্যার তেমন যোগ থাকে না। কিন্তু সামাজিক মানুষের একাংশের সঙ্গে অন্য অংশের দ্বন্দ্ব যেখানে ঘটে, সেখানে নীতির সমস্যা বেশীকম থাকেই। সামাজিক ট্র্যাজেডিগুলির মধ্যে আমরা প্রধানতঃ সমাজশক্তির ও ব্যক্তিশক্তির দ্বন্দ্বের এবং ব্যক্তির শোচনীয় পরিণতির দৃশ্যই দেখে থাকি। এই পর্যন্ত আমরা দেখলাম যে ব্যক্তিজীবনে দৈব বা নিয়তির কাছ থেকে, প্রকৃতির কাছ থেকে এবং সমাজের কাছ থেকে বাধা ও আঘাত আসতে পারে এবং ঐ তিন শক্তির প্রতিকূলতায় ব্যক্তিজীবনে 'মিস্‌ফরচুন' ঘটতে পারে। কিন্তু ব্যক্তির প্রতিকূল শক্তি শুধু বাইরেই নেই, ব্যক্তির ভিতরেও রয়েছে। ব্যক্তির নিজের প্রবৃত্তি উদগ্র হ'য়ে উঠে ব্যক্তির জীবনকে বিপর্যস্ত করে দিতে পারে। ব্যক্তির নিজের মধ্যেই এমন সব শক্তি রয়েছে যারা ব্যক্তির ইচ্ছার নিয়ন্ত্রণ মানে না, ব্যক্তি-ইচ্ছাকে উপেক্ষা করে জীবনের ভারসাম্য নষ্ট করে দিতে পারে। ব্যক্তির নিজের স্বভাবের মধ্যেই তার 'মিস্‌ফরচুন'-এর বীজ নিহিত রয়েছে। তার মধ্যে অবিরাম বিভিন্ন বৃত্তির ক্রিয়া-প্রক্রিয়া চলছে—প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির দ্বন্দ্ব চলছে। একদিকে রয়েছে জৈবিক বাসনা, কামনা বা প্রবৃত্তিগুলি, অন্যদিকে রয়েছে মানবিক-মূল্য-নিষ্ঠা বা

নিবৃত্তিগুলি—সেন্টিমেন্টের ভাবাবেগগুলি। এই সমস্ত প্রবৃত্তি ও বৃত্তির জটিল ও দুর্বার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় ব্যক্তি-জীবন এক নিত্য কুরুক্ষেত্র। যতক্ষণ ব্যক্তিজীবনে এই শক্তিগুলির ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার সামঞ্জস্য থাকে—ততক্ষণ ব্যক্তি চরিত্র স্বাভাবিক থাকে। ভারসাম্য রক্ষা করে চলতে পারে, কিন্তু যখনই অবস্থাচক্রে প্রমাথী কোন প্রবৃত্তির বশীভূত হয়ে গর্হিত কর্মে লিপ্ত হয়, মানবধর্মকে আঘাত করে অথবা কোন হৃদয়বৃত্তি বা মানবিক মূল্যকে পারমার্থিক মনে করে তাকে রক্ষা করার জন্য আর সব কিছুকে পরিহার করে স্বভাবের সমগ্রতাকে ক্ষুণ্ণ করে তখনই ব্যক্তিজীবনের ভারসাম্য বা সামঞ্জস্য নষ্ট হয়ে যায়, বহির্দ্বন্দ্বে ও অন্তর্দ্বন্দ্বে ব্যক্তিসত্তা নিজেকে ক্ষয় করতে করতে শোচনীয় পরিণামের মুখে এগিয়ে যায়।

সুতরাং পটভূমির ভিত্তিতে মানবজীবনের ট্র্যাজেডিকে আমরা মোটামুটি-ভাবে দৈব বা নিয়তিপটভূমিক, প্রকৃতি-পটভূমিক এই চার ভাগে ভাগ করতে পারি।

ট্র্যাজেডি-চেতনার বৈশিষ্ট্য বিচারে এই পটভূমির হিসাব যেমন অপরিহার্য তেমনি অপরিহার্য—দ্বন্দ্বের ও ভাগ্যবিপর্যয়ের প্রকৃতিটির হিসাব- দ্বন্দ্বের এবং দুঃখদুর্দশার মধ্যে কতখানি দৈহিক উপাদান এবং মানসিক বা আত্মিক উপাদান রয়েছে অর্থাৎ কি পরিমাণে নৈতিক সমস্যা নিহিত রয়েছে তার হিসাব। সুতরাং যে ট্র্যাজেডিতে দৈহিক পীড়ন ও ক্লেশের মধ্যেই দুঃখদুর্দশা সীমাবদ্ধ থাকে এবং যেখানে দ্বন্দ্বের মূলে দুই বিরোধী ব্যক্তির সংকীর্ণ ইচ্ছা বা স্বার্থ কারণরূপে কাজ করে, ঐ ইচ্ছা বা স্বার্থের সঙ্গে কোন নৈতিক আদর্শ বা মহত্তর মূল্যবোধের যোগ থাকে না, সেই জাতীয় নাটককে আমরা ট্র্যাজেডির অধম শ্রেণীরূপে গণ্য করতে পারি এবং সঙ্গে সঙ্গে এ সিদ্ধান্ত করতে পারি যে দ্বন্দ্বের সঙ্গে যতো নৈতিক আধ্যাত্মিক মূল্যের যোগ থাকে এবং দুঃখ দুর্দশা ও বিপত্তি দৈহিক স্তর অতিক্রম করে যে পরিমাণে আত্মিক স্তরে প্রবেশ করে সেই পরিমাণে ট্র্যাজেডি উৎকর্ষ লাভ করে— উত্তম ট্র্যাজেডির পংক্তিতে স্থান

পায়। তাহলে দেখা যাচ্ছে—জীবনের ট্র্যাজেডিকে দৈব বা নিয়তির পটভূমিতে, প্রকৃতির পটভূমিতে, সমাজের পটভূমিতে এবং ব্যক্তি-স্বভাবের পটভূমিতে স্থাপন করা যেতে পারে এবং জীবনের দ্বন্দ্ব ও শোচনীয় দুঃখ দুর্দশাকে দেহের স্তরে অথবা আত্মার স্তরে রেখে দেখানো যেতে পারে। সুতরাং এ সিদ্ধান্ত অনায়াসে কোন ট্র্যাজেডি-শিল্পীর ট্র্যাজেডি চেতনার বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করতে উল্লিখিত দু'টি বিষয়ের দিকেই বিশেষভাবে দৃষ্টিপাত করতে হবে এবং প্রকৃত প্রস্তাবে অর্থাৎ নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের ট্র্যাজেডি-চেতনার বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করতে, আমরা তাই-ই করবো।

প্রাচীন গ্রীক নাটকের মধ্যে ট্র্যাজেডির যে যে আদর্শ ব্যক্ত হয়েছে অথবা সেক্সপীয়রের ট্র্যাজেডিতে যে যে আদর্শ ফুটে উঠেছে তার বিচার বিশ্লেষণ করার অবকাশ এখানে না থাকলেও তাদের সংক্ষেপে এ সব আদর্শের উল্লেখ একটু করতেই হবে এবং হবে এই কারণেই যে গ্রীক ট্র্যাজেডির আদর্শের সঙ্গে সেক্সপীয়রের ট্র্যাজেডির আদর্শের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের ট্র্যাজেডির আদর্শের ঐক্য ও পার্থক্য বিচার যতো সম্পূর্ণ হবে ততই আমরা দ্বিজেন্দ্রলালের ট্র্যাজেডি চেতনার বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হব। গ্রীক ট্র্যাজেডির আদর্শ পর্যালোচনা করলে প্রথমেই এই কথাটি মনে জাগে যে গ্রীক ট্র্যাজেডির নিমিত্ত কারণ কোন কোন ক্ষেত্রে নিয়তি বটে, কিন্তু সব ক্ষেত্রে নিয়তি নয় এবং যে ক্ষেত্রে নিয়তি মূল নিমিত্ত কারণ, সেখানেও চরিত্রের ট্র্যাজেডিতে চরিত্রেরই ব্যক্তিত্বের অনেকখানি অংশ বা দায়িত্ব থাকে। 'রাজা ইডিপাস' নাটকে নিয়তির প্রত্যক্ষতা যত বেশী, অন্যান্য নিয়তি-পটভূমিক নাটকে নিয়তি তত প্রত্যক্ষ নয়, অতি দূরবর্তী দিগন্তরেখার মতো নিয়তি সেখানে অতিব্যবহিত। দ্বিতীয়ত এমন ট্র্যাজেডিও রয়েছে যেখানে নিয়তির ষড়যন্ত্র বা হস্তক্ষেপ আদৌ নেই—ট্র্যাজেডি ঘটেছে ব্যক্তির স্বভাবগত বৈশিষ্ট্যের জন্য ব্যক্তির হৃদয়বৃত্তির অমোঘ প্রবর্তনায়—অথবা রিপুর তাড়নায়। অবশ্য এ কথাটি স্মরণে রাখতেই হবে যে গ্রীক-শিল্পীরা মানুষের সুখ-দুঃখ পরিণামকে

জীবনযাত্রাকে দেবতা নিরপেক্ষ ঘটনা বলে মনে করতে পারেন নি। তৃতীয়তঃ এমন ট্র্যাজেডিও আছে যেখানে ট্র্যাজেডির নিমিত্তকারণ দৈব বা নিয়তি নয় অথবা ব্যক্তির কোন উদগ্র কামনা বা বৃত্তিও নয়, নিমিত্ত কারণ—সমাজ অর্থাৎ সামাজিক উপপ্লব। চতুর্থতঃ এমন ট্র্যাজেডিও আছে যেখানে ব্যক্তির ঐকান্তিক কামনা ব্যাহত হয়ে ব্যক্তিকে অপ্রকৃতিস্থ করে তুলেছে ব্যক্তিকে ছিন্নমস্তার মতো আত্মঘাতী করে তুলে শোচনীয় পরিণাম সৃষ্টি করছে। গ্রীক নাট্যকারের দৃষ্টিতে, নিয়তির চক্রান্তেই হোক অথবা ব্যক্তির উদগ্র প্রবৃত্তির তাড়ানায়ই হোক অথবা প্রতিকূল পরিবেশের চাপে বা আক্রমণের ফলেই হোক, যেখানেই ব্যক্তির জীবনে শোচনীয় পরিণাম নেমে আসে, সেখানেই ট্র্যাজেডির সৃষ্টি হয়।

শেক্সপীয়রের ট্র্যাজেডিতে গ্রীক ট্র্যাজেডির মতো দৈববিধানের রহস্যের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ থাকলেও নিয়তির বা দৈব অভিশাপের কোন প্রত্যক্ষ প্রভাব দেখা যায় না। শেক্সপীয়রের ট্র্যাজেডিতে আমরা পারিবারিক দ্বন্দ্বের পটভূমিতে দু'টি ঐকান্তিক প্রেমের (রোমিও-জুলিয়েটের) শোচনীয় পরিণাম দেখেছি, ঈর্ষাদগ্ধ প্রেমিকের (ওথেলো) অন্তর্দাহ ও আত্মহননের বিপত্তি দেখেছি, দিদোর মতো ক্লিওপেট্রাকে বিরহ অসহিষ্ণুতায় প্রেমের বেদীতে আত্মবিসর্জন করতে দেখেছি, দুর্নিবার উচ্চাকাঙ্ক্ষার আবেগে ম্যাকবেথকে একাধিক গর্হিত ও নিষ্ঠুর কার্য ক'রে পাপের আবর্তে তলিয়ে যেতে এবং শোচনীয় পরিণাম লাভ করতে দেখেছি, বুকভরা স্নেহের বিনিময়ে কন্যাদের কাছ থেকে কৃতঘ্নতার মর্মান্তিক আঘাত পেয়ে কিঙ্‌লীয়রের বক্ষ বিদীর্ণ হ'তে দেখেছি; জুলিয়াস সিজারের মতো শক্তিধর বিরাট পুরুষকে অন্তরঙ্গ বন্ধু ব্রুটাসের ছোরার আঘাতে নিহত হ'তে দেখেছি—সেই সঙ্গে ব্রুটাসের মত দার্শনিক উদার ও আদর্শনিষ্ঠ সজ্জনকে আদর্শ ও বন্ধুপ্রীতির দ্বন্দ্বে আদর্শরক্ষার জন্য বন্ধুকে হত্যা করতে এবং যাদের হিতের জন্য ব্রুটাস বন্ধুকে হত্যা করতে বাধ্য হয়েছেন তাদেরই

তীব্র প্রতিকূলতায় ব্রুটাসকে আত্মহত্যা করতে দেখেছি এবং পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে সঙ্কল্প করেও গভীর নৈতিক সংস্কারের বাধায় প্রতিশোধ গ্রহণ করতে না পারায়, হ্যামলেটকে অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হতে এবং শেষ পর্যন্ত অকালে প্রাণ বিসর্জন দিতে দেখেছি। শেকস্‌পীয়রের এই সব ট্র্যাজেডিতে দৈব বা নিয়তির প্রত্যক্ষ ভূমিকা না থাকলেও, দৈব-বিধানের উল্লেখ অনেকক্ষেত্রেই পাওয়া যায়। আর বিশেষভাবে যা' পাওয়া যায় (সুবিখ্যাত ট্র্যাজেডিতে) সে হচ্ছে চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও আত্মসমীক্ষা। যা হোক, সেক্‌স্‌পীয়রের ট্র্যাজেডি-চেতনার সংক্ষিপ্ততম পরিচয় দিতে গিয়ে শুধু এইটুকুই বলা যায় যে যেখানেই শেক্‌সপীয়র দুটি অকৃত্রিম অনুরাগের মিলনাবেগ ব্যর্থকাম হতে দেখেছেন, জীবনের রিক্ততার বেদনা দেখেছেন, সেখানেই তার মনে ট্র্যাজেডি বোধ জেগেছে, যেখানেই তিনি দেখেছেন—মানুষ অদম্য প্রবৃত্তির তাড়নায় মোহে ও উন্মত্ততায় মানবিক মূল্য ধ্বংস করে আত্মবিনাশের আবর্তে তলিয়ে গেছে, সেখানেই তা তাঁর চোখে ট্র্যাজিক বলে প্রতিভাত হয়েছে। যেখানেই তিনি পিতা মাতা ও সন্তানের স্বাভাবিক সম্পর্কের মধ্যে বিপর্যয় এবং বিপর্যয়ের ফলে পিতামাতাকে বা সন্তানকে মর্মান্তিক অন্তদাহে দগ্ধ হতে দেখেছেন সেখানেই তাঁর মনে ট্র্যাজেডি-বোধ জেগেছে এবং যেখানেই মানবিক মূল্যবিনাশের বেদনা সহ্য করতে না পেরে মানুষ অতিস্পর্শকাতর চিত্ত নিয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সংকল্প করেছে অথচ সাধ ও সাধ্যের মধ্যে সমন্বয় ঘটাতে পারে নি বলে অন্তর্দাহে দগ্ধ হয়েছে সেখানেই তিনি ট্র্যাজেডি উপলব্ধি করেছেন।

এবার গ্রীক ট্র্যাজেডির ও শেক্‌স্‌পীয়রের ট্র্যাজেডির উল্লিখিত আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের ট্র্যাজেডি পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য বিচার করে দেখা যাক্‌। একথা সকলেই জানেন যে দ্বিজেন্দ্রলাল উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন, ইংরেজী সাহিত্যের এবং ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে ইয়োরোপীয় সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ পরিচয় ঘটেছিল। সংক্ষেপে বলা চলে তিনি

গ্রীকট্র্যাজেডির ও শেকস্‌পীয়রের ট্র্যাজেডির আদর্শের বা ধরনের সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন। কিন্তু প্রশংসার কথা এই যে তিনি গ্রীক-ট্র্যাজেডির বা শেকস্‌পীয়রের ট্র্যাজেডির অন্ধ অনুকরণ করে নিজেকে হাস্যাস্পদ করেন নি। তিনি ট্র্যাজেডির সম্পূর্ণ নূতন আদর্শ উদ্ভাবন না করলেও, একথা মিথ্যে নয় যে তাঁর পরিকল্পনার মধ্যে লক্ষণীয় নতুনত্ব আছে, বেশ একটু পার্থক্য আছে। সাজাহান, মেবারপতন, দুর্গাদাস, রাণাপ্রতাপ, নূরজাহান, চন্দ্রগুপ্ত, সীতা, প্রভৃতি ট্র্যাজেডি-আদর্শে পরিকল্পিত নাটকগুলো নিয়ে আলোচনা করলেই আমার উক্তির যাথার্থ্য উপলব্ধি করা যাবে। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকগুলির মধ্যে যদি কোন নাটকে শেকস্‌পীয়রের ট্র্যাজেডির আদর্শের প্রভাব বেশী পড়ে থাকে, তবে তা সাজাহান'। কিং লীয়রের সঙ্গে 'সাজাহানের' তুলনা সহজেই মনে আসে। দুই নাটকেই সন্তানের কৃতঘ্নতায় স্নেহপ্রবণ পিতৃ-হৃদয়ের মর্মন্তুদ আর্তনাদ শুনতে পাওয়া যায়, দুই নাটকেই বৃদ্ধ পিতা কৃতঘ্ন সন্তানের আচরণে উন্মাদ হয়ে যায়। কিন্তু এই বাহ্য সাদৃশ্য সত্ত্বেও দুই নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্রের পরিকল্পনায় বেশ খানিকটা পার্থক্য রয়েছে। কিংলীয়রে আসল ট্র্যাজেডি সন্তানের হাত থেকে বৃদ্ধের আঘাত পাওয়ার ট্র্যাজেডি—প্রকৃত পিতৃভক্ত সন্তানকে ভুল বুঝে দূরে সরিয়ে দেওয়ার এবং তার মৃত্যুর কারণ হওয়ার ট্র্যাজেডি। কিন্তু সাজাহানের ট্র্যাজেডি একাধারে স্নেহপ্রবণ বৃদ্ধ পিতার পুত্রের হাতে বন্দী হওয়ার তথা মর্মান্তিক আঘাত পাওয়ার ট্র্যাজেডি, একে একে পুত্র পৌত্র হারানোর অসহ্য শোকের আঘাত পাওয়ার ট্র্যাজেডি এবং বিশেষতঃ পিতৃহৃদয়ের ট্র্যাজেডি—ঔরঙ্গজীবের মতো কৃতঘ্ন কুসন্তানকেও ক্ষমা করার জন্য পিতৃ-হৃদয়ের সহজ ব্যাকুলতার ট্র্যাজেডি। সাজাহান নাটকে পিতৃহৃদয়ের রহস্যের দিকে যত বেশী ক'রে আলোকপাত করা হয়েছে, কিং লীয়ার নাটকে ততখানি করা হয়নি এ কথা বললে অত্যুক্তি করা হয় বলে আমি মনে করি নে। আর এ কথাও অত্যুক্তি হবে না যে, যদিও দুই

নাটকে "The initial act of the hero is his only act, the remainder is passion"—সাজাহান-চরিত্রে সে-পরিমাণ অন্তর্দ্বন্দ্ব আছে, কিঙ লীয়রে সেই পরিমাণ অন্তর্দ্বন্দ্ব নেই। সাজাহানে পিতৃসত্তা ও সম্রাট-সত্তার যে দ্বন্দ্ব দেখা যায় কিং লীয়রে সে দ্বন্দ্ব প্রকট হয় না। এই সব কারণে, সাজাহান কিং লীয়রের আদর্শে লিখিত হলেও সর্বতোভাবে এক নয়।

রাণা প্রতাপসিংহ এবং দুর্গাদাস ট্র্যাজেডি আদর্শ-নাটকের মত বটে, কিন্তু রাণা প্রতাপে বা দুর্গাদাসে ট্র্যাজেডি-রস [illegible] নিষ্পন্ন হয়েছে। তারা যে পরিমাণে চরিত্রধর্মী হয়েছে সে পরিমাণে ট্র্যাজেডি রসাশ্রিত হতে পারে নি। রাণা প্রতাপ সিংহের ট্র্যাজেডি একটি দেশপ্রাণ মানুষের ব্যক্তি-গৌরব, দেশগৌরব রক্ষার জন্য একক সংগ্রামে নানা দুর্দশা ভোগের ট্র্যাজেডি। দুর্গাদাসের ট্র্যাজেডি বহু ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হিন্দু শক্তিকে সংহত করে নতুন হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা না করতে পারার ট্র্যাজেডি—সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেও জাতিকে টেনে তুলতে না পারার ট্র্যাজেডি। মেবার পতনে রাণাপ্রতাপের দেশ ও বংশ পতনের—হিন্দু শক্তির শেষ [illegible]। সংঘর্ষমহৎ ট্র্যাজেডি—হিন্দু গৌরবের শেষ ভরসাস্থলটির পরাধীনতার নাগপাশে নিমজ্জিত হওয়ার ট্র্যাজেডি। উক্ত তিনটি নাটকে দেশপ্রেম-বীরত্বের ট্র্যাজেডি উপস্থাপিত করার চেষ্টা হয়েছে। প্রথম দুটি নাটকে রাণা প্রতাপসিংহের ও দুর্গাদাসের নায়কত্ব আশ্রয় করে দেশপ্রেম বীরত্বের ট্র্যাজেডি দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে এবং তৃতীয় নাটকে অর্থাৎ মেবার পতনে বহু বছরের ঐতিহ্যমণ্ডিত এবং স্বাধীনতার প্রতীক মেবারভূমিকেই ব্যক্তিমর্যাদায় উন্নীত করে তার পতনের মাধ্যমে মহৎ মূল্যের অপঘাত বিনাশের, একটা বিরাট ঐতিহ্যের শোচনীয় রিক্ততার ট্র্যাজেডি ব্যক্ত করা হয়েছে। রাণা প্রতাপসিংহ বা দুর্গাদাস নাটকের পরিকল্পনার মধ্যে নতুনত্ব এইটুকুই আছে যে এই নাটকে দেশপ্রেমকে, বা জাত্যাভিমানকে মূল ভাব করে ট্র্যাজেডি-রস সৃষ্টির পরিকল্পনা করা হয়েছে, কিন্তু 'মেবারপতনের' পরিকল্পনায়

মধ্যে অভিনবত্ব আছে। এই নাটকে কোন ব্যক্তি বিশেষের ট্র্যাজেডির উপরে আলোক সম্পাত করা হয় নি—রাণা প্রতাপসিংহের পুত্র রাণা অমরসিংহের ট্র্যাজেডি দেখানো মুখ্য উদ্দেশ্য হয় নি, এখানে একটা ঐতিহ্য মণ্ডিত দেশকে ট্র্যাজেডি নায়কের মর্যাদায় উন্নীত করার চেষ্টা করা হয়েছে। রাণা অমরসিংহের পরাজয় তথা পরিণাম শোচনীয় হ'য়েছে এই কারণেই যে তার পরাজয়ে মেবারের শোচনীয় পতন ঘটেছে—অপরাজিত মেবারকে, উন্নতশির মেবারকে পরাজয় স্বীকার করতে, বৈদেশিক শক্তির কাছে শির নত করতে হ'য়েছে, স্বাধীনতার প্রতীক মেবারের অপমৃত্যু ঘটেছে। অমর সিংহের পরাজয়ের বেদনা নয়, মেবারের পতনের বেদনা সঞ্চার করাই নাট্যকারের মুখ্য উদ্দেশ্য হ'য়েছে।

ঐতিহাসিক কাহিনী-আশ্রয়ে ট্র্যাজেডি-রস সৃষ্টির প্রচেষ্টা সাজাহান নাটকে উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করেছে—আগেই সে কথা বলা হ'য়েছে। নূরজাহান নাটকে ঐ প্রচেষ্টা আরো সফল হ'য়েছে এবং সে সাফল্যের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই নাটকে যে ট্র্যাজেডি-চেতনা ব্যক্ত হয়েছে তা' গ্রীক নাটকে বা শেক্‌স্‌পীয়রের কোন নাটকে ব্যক্ত হয় নি। গ্রীক নাটকের এবং শেক্‌স্‌পীয়রের নাটকে যতগুলি "She-Tragedy" এবং 'He-Tragedy' আছে, তাদের কোন নায়ক-নায়িকার সঙ্গে নূরজাহানের তুলনা করা যায় না। নূরজাহানের ট্র্যাজেডি-পরিকল্পনায় ট্র্যাজেডি চেতনার একটা নতুন পর্যায় লক্ষ্য করা যায়। বহু ব্যক্তিত্বময় ব্যক্তিত্বগুলি একে একে রিক্ত হয়ে যেয়ে ব্যক্তির মধ্যে যে মহাশূন্যতার সৃষ্টি করে—সর্বরিক্ততার যে আর্তনাদ জাগিয়ে তোলে তার বড় ঘাড় ট্র্যাজেডি ব্যক্তির জীবনে আর কিছুই হতে পারে না। নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল নূরজাহান কাহিনী আশ্রয়ে প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়ে সেই ব্যক্তিত্ব হারানোর তথা সর্বরিক্ততার ট্র্যাজেডি দেখাতে চেষ্টা করেছেন। আমরা দেখি, 'বধূ-মেহের', 'মাতা মেহের' 'মহিষী-মেহের' (নূরজাহান) এই সমস্ত ব্যক্তিত্ব হারিয়ে মেহের

আপন সত্তার সবকিছুই হারিয়ে সম্পূর্ণ নিঃস্ব ও রিক্ত হয়ে শোচনীয় পরিণাম লাভ করেছে। বহু ব্যক্তিত্বময় ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিলোপের, নিরাশ্রয় 'অহং'-এর মহাশূন্যতার ট্র্যাজেডি, গ্রীক বা শেকসপীয়রের কোন ট্র্যাজেডির আদর্শে পাওয়া যায় না। আদর্শ হিসাবে নূরজাহান-ট্র্যাজেডির আদর্শকে আমরা মৌলিক বলেই গণ্য করতে পারি এবং সেই মৌলিক পরিকল্পনার জন্য নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভাকে বারবার ধন্যবাদ দিতে পারি। একথাও এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে শূন্য হৃদয়ের ট্র্যাজেডি, স্বভাবকে ফাঁকি দেওয়ার ফাঁকি যেদিন ধরা পড়ে সেদিন আত্মা রিক্ততার জন্য যে আর্তনাদ করে সেই আর্তনাদের ট্র্যাজেডি এবং নিজের উপর যে প্রতিশোধ নেয় সেই প্রতিশোধের ট্র্যাজেডি, এক কথায় আত্মার সামঞ্জস্য হারিয়ে ফেলার ট্র্যাজেডি, নাট্যকার রবীন্দ্রনাথের নাটকে ব্যক্ত হয়েছে বটে, কিন্তু নূরজাহানে ট্র্যাজেডির যে পরিকল্পনা করা হয়েছে তা রবীন্দ্রনাথের নাটকে পাওয়া যায় না। এই প্রসঙ্গেই 'চন্দ্রগুপ্ত' নামক ঐতিহাসিক কমেডির চাণক্য চরিত্রটির কথা মনে জাগা খুবই স্বাভাবিক। চাণক্যকে আমরা পুরোদস্তুর ট্র্যাজেডি চরিত্র বলে গণ্য করতে পারিনে একথা ঠিক, কারণ আত্রেয়ীর হাত ধরে মনুষ্যত্বস্বর্গ-ভ্রষ্ট চাণক্য শেষ পর্যন্ত স্বর্গে ফিরে গেছেন, কুঞ্জবনে সামস্তোত্র শুনেছেন, আত্মার নষ্ট সামঞ্জস্য ফিরে পেয়েছেন। তবে একথাও মিথ্যে নয় যে চাণক্য-চরিত্রে আরম্ভ থেকে উপসংহারের অব্যবহিত পূর্ব পর্যন্ত ট্র্যাজিক চরিত্রের লক্ষণই বেশী করে ফুটে উঠেছে। ঈশ্বর গৃহলক্ষ্মী কেড়ে নেওয়ায়, রাজা সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করায় এবং দস্যু কন্যা অপহরণ করায়, আঘাতে আঘাতে চাণক্য বীভৎসের উপাসক হয়েছেন—হৃদয়হীন বুদ্ধিসর্বস্ব প্রতিহিংসা-পরায়ণ কুটিল চাণক্যে পরিণত হয়েছেন। তাঁর ধারণা হয়েছে—ঈশ্বর নেই, বিবেক একটা কুসংস্কার। তাঁর বুদ্ধিকৌটিল্য বিস্ময়কর. বুদ্ধিবলে তিনি ভারতের অধীশ্বরের অধীশ্বর কিন্তু হৃদয় তাঁর শুষ্ক মরুভূমি, সেখানে এককণা করুণা নেই, স্নেহ নেই, মমতা নেই, হৃদয়ে তাঁর অবিরাম হাহাকার, তাঁর

হৃদয় কম্পিত আগ্রহে কাকে যেন দুহাতে আলিঙ্গন করতে চায়, কিন্তু সেই ব্যগ্র আলিঙ্গন বক্ষে চেপে ধরে তাঁর নিজেরই উষ্ণ নিঃশ্বাস। চাণক্যকে ঈশ্বরের অক্ষয় সৌন্দর্য অবিরাম বিদ্ধ করে, কিন্তু সেই স্বর্গরাজ্য থেকে তিনি নির্বাসিত; রিক্ত আত্মার আর্তনাদে তাঁর অন্তর বিদীর্ণ। অন্তর্দ্বন্দ্বে চাণক্য ক্ষতবিক্ষত। একদিকে চাণক্য ভারতের অধীশ্বর অন্যদিকে চাণক্য পথের ভিক্ষুকের চেয়েও কাঙাল। বুদ্ধিতে চাণক্য জগজ্জয়ী, অথচ হৃদয়ে চাণক্য নিঃস্ব উপবাসী। বিশ্বে অমৃতসমুদ্রের ঢেউ বয়ে যাচ্ছে, চাণক্য তৃষিত হৃদয়ে তীরে দাঁড়িয়ে ছটফট করছে। সত্য থেকে, শিব থেকে, সুন্দর থেকে নির্বাসিত চাণক্যের আত্মা আপন সামঞ্জস্য ফিরে পাওয়ার জন্য ব্যাকুল, অথচ সামঞ্জস্যে ফিরে যাওয়ার জন্য যে আশ্রয় দরকার তা' তার নেই। এ পর্যন্ত চাণক্যের চরিত্র সত্যই শোচনীয় এ কথা স্বীকার করতেই হবে। এই চরিত্র সৃষ্টিতে নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল প্রথম শ্রেণীর নাট্যকার প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। এবং গ্রীকনাটকে, এমনকি শেকস্‌পীয়রের নাটকেও চাণক্য চরিত্রের সদৃশ চরিত্র, চাণক্যের মতো গভীর ও অন্তর্দ্বন্দ্বময় চরিত্র পাওয়া যায় না। কথাটি অত্যুক্তির মতো শোনালেও কথাটি যে সত্য শেকস্‌পীয়রের প্রধান ট্র্যাজিক চরিত্রগুলি—হ্যামলেট, ম্যাকবেথ, রিচার্ড দি থার্ড, কিঙ লীয়র, ওথেলো, জুলিয়াস সীজার প্রভৃতি চরিত্রের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করলেই বুঝা যাবে। আত্মার সামঞ্জস্য হারিয়ে ফেলে, সেই হারানো সামঞ্জস্যের জন্য তৃষিত আত্মার আর্তনাদ শূন্য হৃদয়ের মর্মান্তিক হাহাকার, বিকৃত ইচ্ছার অবরোধ, বন্দী আত্মার স্বভাবের দিকে ব্যাকুলভাবে ফিরে চাওয়া চাণক্য-চরিত্রের মধ্যে যেভাবে ব্যক্ত হয়েছে, শেক্সপীয়রের ম্যাকবেথ-চরিত্রে (বিকৃত ইচ্ছার অবরোধে বন্দী চরিত্র) সে ভাবে ব্যক্ত হয়নি। এ কথা ঠিক যে শেক্‌স্‌পীয়রের ট্র্যাজিক চরিত্রগুলির মধ্যে একমাত্র ম্যাকবেথ চরিত্রটিকেই (তৃতীয় রিচার্ডকে বাদ দিচ্ছি) বিকৃত-ইচ্ছার-অবরোধে-বন্দী মানবাত্মা বলা যেতে পারে এবং এই চরিত্রটির পরিবেশেই আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডলটি স্পষ্টাকারে ফুটে উঠেছে, কিন্তু একথাও

মিথ্যা নয় যে ম্যাকবেথ চরিত্রে আধ্যাত্মিক মানটি (ডাইমেনশান) সুপরিস্ফুট হয় নি এবং হয় নি এই কারণেই যে বন্দী আত্মার স্বভাবে ফিরে যাওয়ার ব্যাকুলতা চরিত্রের আচরণে বা অন্তর্দ্বন্দ্বে সুব্যক্ত হয় নি। এই দ্বন্দ্ব সুব্যক্ত হলে, আমার মনে হয় মানবাত্মার ট্র্যাজেডি (ট্র্যাজেডি অফ হিউম্যান সোল) হিসাবে ম্যাকবেথ আরও বড় নাটক হতে পারতো। চাণক্য চরিত্রে আধ্যাত্মিক সত্তা বা মান সুব্যক্ত করে এবং বুদ্ধি ও হৃদয়ের দ্বন্দ্ব সুপ্রকট করে নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল আত্মার ট্র্যাজেডির এক অপূর্ব ও সুন্দর দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। ডাঃ ফস্টাস অথবা ফাউস্টের প্রভাব বাল্মীকি প্রতিভার বাল্মীকির অথবা রুদ্রচণ্ডের প্রভাব কতখানি কি পড়েছে না পড়েছে সে বিচারে প্রবৃত্ত না হয়ে একথা নিঃদ্বিধায় বলা যায়- চাণক্য চরিত্র সৃষ্টি করতে যেয়ে নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল মহান শিল্পীর উন্নততর ট্র্যাজেডি চেতনাকেই ব্যক্ত করেছেন - যদিও শেষ পর্যন্ত তিনি চরিত্রটিকে প্রক্রান্তস্থ তথা কমেডি-পরিণাম করেছেন।

এবার 'পরপারে' ও 'সীতা' নাটকের ট্র্যাজেডি আদর্শ সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলেই আমি এই প্রসঙ্গের উপসংহার করব। 'পরপারে' সামাজিক ট্র্যাজেডি হিসাবে সার্থক হয়েছে কি হয়নি বা ট্র্যাজেডি হিসাবে সার্থক হয়েছে কি হয়নি বা ট্র্যাজেডি-রস নাটকে সুনিষ্পন্ন হয়েছে কি হয়নি সে সম্বন্ধে আমি কোন কথাই বলছিনে, আমি শুধু নাটকে কোন্ আদর্শ অনুসৃত হয়েছে সেই দিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করছি। 'পরপারে' নাটকের ট্র্যাজেডি-বিশ্বেশ্বরের মতো একজন অতি উদার, অতি স্নেহপ্রবণ, অতি সজ্জন এবং অতি নিরীহ (ইনোসেন্ট) ব্যক্তির মর্মপীড়া ও শোচনীয় আত্মহত্যার মধ্যেই নিহিত রয়েছে। অবশ্য অতি নির্দোষ ব্যক্তির দুঃখ-দুর্দশা দেখে যে শোচনা ছাড়াও, আরও একটি বোধ এখানে আনুষঙ্গিকভাবে থাকে এবং সেই বোধটি এই যে, যে সরযূর ফাঁসি হয়েছে বলে বিশ্বেশ্বর প্রাণ দিলেন, সেই সরযূর ফাঁসির হুকুম শেষ মুহূর্তে স্থগিত হয়েছে একটা ভুলের জন্য, ঠিক সংবাদ পাওয়ার

একটু বিলম্বের বিভ্রাটে বিশ্বেশ্বর অপমৃত্যু বরণ করে নিলেন। যাই হোক 'পরপারে' নাটকে উচ্চাঙ্গের কোন ট্র্যাজেডি-আদর্শ পাওয়া যায় না, অতি নিরীহ নির্দোষ চরিত্রের ট্র্যাজেডি দেখানোর জন্য যে terrible suffering এর দৃশ্য দরকার, পরপারে নাটকে সে রকম দৃশ্য পাওয়া যায় না।

পরপারে সামাজিক হলেও এই নাটকের দ্বন্দ্বে সমাজবিধান প্রত্যক্ষভাবে কোন অংশ গ্রহণ করেনি। এই নাটকে যেটুকু ট্র্যাজেডি-রস নিষ্পন্ন হয়েছে তা হয়েছে, বিশ্বেশ্বরের স্নেহপ্রবণ হৃদয়ের জন্যই। অর্থাৎ ব্যক্তির সেন্টিমেন্ট বা ভাবপ্রবণতাই ট্র্যাজেডির নিমিত্ত কারণ হয়েছে। যথার্থ সামাজিক ট্র্যাজেডি বলা চলে সেই সব সামাজিক নাটককেই, যাদের মধ্যে ব্যক্তির ট্র্যাজেডির জন্য ব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে সমাজেরও বিশেষ দায়িত্ব থাকে। বিশ্বেশ্বরের ট্র্যাজেডির জন্য সমাজ-ব্যবস্থার বা সমাজ-বিধানের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব কিছু নেই; প্রত্যক্ষ দায়িত্ব বলছি এই জন্য যে সমাজব্যবস্থাকে পরোক্ষভাবে দায়ী করা চলে এবং চলে এইভাবেই যে সমাজে বেশ্যাবৃত্তি না থাকলে সরযূর স্বামী বেশ্যাসক্ত হতো না, আর স্বামীকে বাঁচাতে গিয়ে সরযূকে নারী হত্যার অপরাধ মাথা পেতে নিয়ে প্রাণদণ্ডে দাণ্ডিত হ'তে হতো না এবং বিশ্বেশ্বরকেও আত্মহত্যা করতে হতো না। এই দিক থেকে দেখলে পরপারে ততটা সমাজ-পটভূমিক নাটক নয়, যতটা ব্যক্তি স্বভাব-পটভূমিক নাটক।

/সমাজ-পটভূমিকতা লক্ষণীয়ভাবে যদি কোন নাটকে ব্যক্ত হয়ে থাকে তবে তা' পৌরাণিক সীতা নাটকে। সীতা নাটকে মুখ্যতঃ সমাজবিধানেরই সঙ্গে রাম-সীতাকে সংগ্রাম করতে হয়েছে, সমাজবিধানের চাপেই দুটি প্রাণ বিরহের পুটপাকে দগ্ধ হয়েছে, অবিচলিত ও ঐকান্তিক প্রেম নিয়েও বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে বাধ্য হয়েছে এবং শেষ মুহূর্তে তাদের ভাগ্যে বহু প্রত্যাশিত মিলনের মধুপাত্র মুখের কাছে উঠেও হাত থেকে মাটিতে পড়ে গেছে। অপহৃতা সীতাকে সমাজ সতী বলে গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক, চারি দিকে লোকনিন্দার চাপা সুর। অগত্যা লোকপাল রাম কর্তব্যানুরোধে, প্রজানু-

রঞ্জনের জন্য নিজের প্রাণসমা সীতাকে নির্বাসন দিতে তথা নিজের হৃদয় উপড়ে ফেলতে বাধ্য হ'লেন। সীতা স্বামীর অন্তর্দ্বন্দ্বের সংকট উপলব্ধি ক'রে স্বামীর প্রেমেই স্বামীবিচ্ছেদের দুঃখ মাথা পেতে নিয়ে নির্বাসনে গেলেন। রামের প্রতি সীতার প্রেম এবং সীতার প্রতি রামের প্রেম সমগুণ থাকা সত্ত্বেও দুটি প্রেমিক জীবনে বিচ্ছেদের ব্যবধান সৃষ্টি হ'ল। সীতা স্বামী-প্রেমেই সমস্ত দুঃখভার নীরবে বহন করতে লাগলেন। রাম কর্তব্য ও প্রেমের দ্বন্দ্বের ফলে তিলে তিলে আত্মক্ষয় করতে লাগলেন। বহুকাল পরে রাম অশ্বমেধ যজ্ঞ করতে উদ্যোগী হলেন। সীতার স্বর্ণমূর্তি তার ধর্মপত্নীর আসনে স্থাপিত হল। বাল্মীকি যজ্ঞে উপস্থিত হয়ে বশিষ্ঠের সঙ্গে বিতর্কে জয়ী হয়ে প্রেমের মহিমাকে কর্তব্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত করলেন। প্রজারা সীতাকে গ্রহণ করবার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করল। বাল্মীকি সীতাকে সভায় নিয়ে এলে আবার পরীক্ষার প্রশ্ন উঠল। সীতা সতীত্বের শেষ পরীক্ষা দিয়ে পাতালে প্রবেশ করলেন। রাম-সীতার বহু আকাঙ্ক্ষিত মিলনের তরী তীরে এসে ডুবে গেল। সীতা নাটকে যে ট্র্যাজেডি— আদর্শ প্রধানভাবে ব্যক্ত হয়েছে তা এই যে অপরাধে অপরাধী বলে একটা লোক অভিযুক্ত হয়েছে সেই অপরাধ সে না করা সত্ত্বেও নিজের প্রেমাস্পদকে সংকট থেকে মুক্ত করবার জন্য অপরাধের বা শাস্তির বোঝা মাথায় তুলে নিয়ে বিনা প্রতিবাদে শোচনীয় আত্মবিলোপ বরণ করে নিয়েছে, কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ না তুলে সমস্ত দুঃখ-কষ্ট মুখ বুজে সহ্য করেছে। এই আদর্শেই সীতার ট্র্যাজেডি কল্পিত হয়েছে। রামের ট্র্যাজেডির আদর্শ ভিন্ন। সমাজের দাবী রক্ষা করতে গিয়ে ব্যক্তি যখন মর্মের দাবীকে উপেক্ষা করে তখনই তার মধ্যে অনিবার্য এক তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়, ঐ অন্তর্দ্বন্দ্বে ব্যক্তি ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে ব্যক্তির অপক্ষয় ঘটে। এই আদর্শ ছাড়াও রাম-সীতার ট্র্যাজেডিতে আর একটি আদর্শেরও সংযোগ ঘটেছে। মিলনোন্মুখ দুটি তৃষিত প্রাণের আলিঙ্গন মুহূর্তে আকস্মিক বিচ্ছেদের বজ্রাঘাত নেমে এলে, দুটি তৃষিত

প্রাণের ওষ্ঠাধর থেকে বহুকাম্য পানপাত্র হঠাৎ স্খলিত হলে, আমাদের মনে যে শোচনা জাগে, নাটকের উপসংহারে নাট্যকার সেই জাতীয় শোচনাও জাগানোর চেষ্টা করেছেন।

এবার উপসংহার। গ্রীক ট্র্যাজেডি আদর্শ এবং শেক্সপীয়রের ট্র্যাজেডি-আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে আমি অতি সংক্ষেপে দ্বিজেন্দ্রলালের ট্র্যাজেডি চেতনার বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করতে চেষ্টা করেছি। প্রসঙ্গতঃ দুই এক ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের ট্র্যাজেডি চেতনার সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের ট্র্যাজেডি চেতনার সাধর্ম দেখতে চেষ্টা করেছি।

বলা বাহুল্য, ৩১ খানি গ্রীক ট্র্যাজেডি (এইস্কিলাসের ৭ খানি, সোফোক্লিসের ৭ খানি এবং ইউরিপিদিসের ১৭ খানি), সেনেকার ১০ খানি ট্র্যাজেডি, মার্লো-শেক্‌স্‌পীয়রের ও এলিজাবেথের যুগের বিভিন্ন ট্র্যাজেডি, কর্নেই রাসিনের ট্র্যাজেডি এবং অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর ট্র্যাজেডিগুলির আদর্শ সম্পূর্ণভাবে নির্ধারণ করবার পরেই রবীন্দ্রনাথের অথবা দ্বিজেন্দ্রলালের ট্র্যাজেডি-চেতনার মৌলিকতা সম্পর্কে জোরের সঙ্গে কিছু বলা অসম্ভব।' এখানে আমি শুধু গ্রীক ট্র্যাজেডির ও শেক্‌স্‌পীয়রের ট্র্যাজেডির আদর্শের সামান্য পরিচয় দিয়েছি এবং দেখাতে চেষ্টা করেছি—দ্বিজেন্দ্রলালের কোন কোন ট্র্যাজেডির আদর্শ গ্রীক অথবা শেক্‌সপীরীয় আদর্শ থেকে পৃথক এবং উন্নততর ও সূক্ষ্মতার জীবনবোধের তথা ট্র্যাজেডি-চেতনার পরিচায়ক।

পরিশিষ্ট

(১) আন্টিগোনাস

আলেকজান্দারের সৈন্যাধ্যক্ষদের অন্যতম। আলেকজান্দারের মৃত্যুর পরে তিনি কয়েকটি প্রদেশ লাভ করেন এবং ক্রমে সমগ্র এশিয়ার অধিপতি হইতে চেষ্টা করেন। ক্রমে সেলুকস, টলেমি, ক্যাসানডের এবং লিসিমেকস

প্রভৃতি সেনাপতিদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হয়। ৩১০ খ্রীঃ পূঃ ইপসাসের যুদ্ধে (Ipsus) তাঁহার পরাজয় ও পতন ঘটে।

(২) অ্যারিষ্টটল

সুপ্রসিদ্ধ গ্রীক দার্শনিক, ম্যাসিডোনিয়ার অন্তর্গত Chalcidice এর ষ্ট্যাগিরা নামক সহরে, খ্রীঃ পূঃ ৩৮৪ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা নিকোমেকাস ম্যাসিডোনিয়ার রাজা দ্বিতীয় আমিনটাসের (Amyntas II) গৃহচিকিৎসক ছিলেন। ৩৬৭ খ্রীঃ পূঃ তিনি পড়াশুনা করিবার জন্য এথেন্স-এ গমন করেন এবং সুবিখ্যাত দার্শনিক প্লেটোর শিষ্য হন। ২০ বৎসর এথেনস এ থাকিয়া প্লেটোর মৃত্যুর পর (৩৪৭ খ্রীঃ পূঃ) তিনি Atarneus-এ বন্ধু হারমিয়াসের কাছে যান। তারপর বন্ধুর মৃত্যুর পর তিনি মাইটিলিন (Mytilene)-এ গমন করেন। ইহার দুই বৎসর পরে ম্যাসিডোনিয়ার রাজা ফিলিপের নিকট হইতে আলেকজান্দারকে (১৩ বৎসর বয়স্ক) শিক্ষাদান করিবার জন্য আমন্ত্রণ আসে। ৭ বৎসর ম্যাসিডোনিয়ায় থাকিয়া আলেকজান্দারের সিংহাসনাধিরোহণের (৩৩৫ খ্রীঃ পূঃ) তিনি এথেনস-এ ফিরিয়া যান।

এখানে 'Apollo নামে Lyceus'র উৎসর্গীকৃত "লাইসিউম" নামক ব্যায়ামাগারটি তিনি রাষ্ট্রের নিকট হইতে লাভ করেন। এই লাইসিউমের চক্রাকারে নির্মিত ছায়াশীতল পথে চলিতে চলিতে তিনি বক্তৃতা করিতেন। অন্তরঙ্গদের কাছে (esoteric) সকালে তিনি জটিল দার্শনিক ও রাজনীতি, আর বহিরঙ্গদের কাছে অপরাহ্নে রাজনীতি, অলঙ্কার প্রভৃতি সহজবোধ্য বিষয়ে বক্তৃতা করিতেন। তাঁহার অন্যতম বিখ্যাত গ্রন্থ 'প্রাণীর ইতিহাস' (De Anima) লিখিবার উপাদান তাঁহার পূর্বতন ছাত্র আলেকজান্দার অনেক সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন। আলেকজান্দারের মৃত্যুর পরে (৩২৩ খ্রীঃ পূঃ) ম্যাসিডোনিয়ার বন্ধু বলিয়া সকলেই তাঁহাকে সন্দেহের চক্ষে দেখিতে লাগিল। কিন্তু কোনও ভাবে অপবাদে জড়িত করিতে না পারিয়া শেষে নাস্তিকতার

অভিযোগ আনা হইল। তাঁহার সমস্ত লেখা এবং গ্রন্থাগারটি থিওফ্রেসটাসকে দিয়া অ্যারিষ্টটল বিচারের পূর্বেই Chalcis-এ পলাইয়া গেলেন (৩২২ খ্রীঃ পূঃ) এবং ঐ অব্দেই সেখানে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।

এমন সার্বভৌম পাণ্ডিত্য খুব কম দার্শনিকের মধ্যেই দেখা যায়। আজও অ্যারিষ্টটলের "Poetics," "Ethics", "The Politics" প্রভৃতি গ্রন্থ সমাদৃত হইয়া থাকে। অ্যারিষ্টটল শুধু প্লেটোর "Intellect of his school" ছিলেন না—সমগ্র গ্রীসেরই intellect ছিলেন।

(৩) ইউরিপিডস

বিখ্যাত করুণ রসের কবি ও নাট্যকার – ৪৮০ খ্রীঃ পূঃ 'সালামিস'-এ জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে শরীরচর্চায় দিকে মনোযোগ দেন, পরে এনাক্সগোরাসের কাছে দর্শন এবং প্রোডিকাসের কাছে অলঙ্কার পড়িতে আরম্ভ করেন। সক্রেটিসের সহিত তাঁহার খুব বন্ধুত্ব হইয়াছিল। ৪৪১ খ্রীঃ পূঃ কাব্য প্রতিযোগিতায় তিনি 'প্রথম পুরস্কার লাভ' করেন (এইসকিলাসের পরে সফোক্লিসের পরে ইউরিপিডিস এই পুরস্কার লাভ করেন)। তিনি চরিত্র-সৃষ্টি করিতে—not as they ought to be but as they are—নীতি গ্রহণ করেন। ৪০৬ খৃঃ পূঃ তাঁহার মৃত্যু ঘটে। তাঁহার লেখা ১৮খানি "Tragedy" এখনও বর্তমান (Dr. Way এবং Prof Murray ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়াছেন)।

(৪) ইসকাইলাস

বিখ্যাত করুণ রসের কবি—Euphorion-এর পুত্র—৫২৫ খ্রীঃপূঃ Attica র অন্তর্গত Elensis-এ জন্মগ্রহণ করেন। ৪৮৪ খৃঃ পূঃ করুণ রসের কাব্যের জন্য 'প্রথম পুরস্কার লাভ করেন। ৪৬৮ খ্রীঃ পূঃ তরুণ কবি সফোক্লিসের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় তাঁহার পরাজয় ঘটে এবং মনোদুঃখে তিনি এথেনস ত্যাগ করিয়া Syracuse-এর রাজা Heiro-র সভায় চলিয়া যান। Heiro-র মৃত্যুর পরে তিনি পুনরায় এথেনস-এ ফিরিয়া আসেন। ৫৫৬ খ্রীঃ পূঃ তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

ইসকাইলাসকে Tragedy-র জন্মদাতা বলা হইয়া থাকে। তাঁহার ট্রাজেডির ৭০খানার মধ্যে ৭ খানা মাত্র পাওয়া গিয়াছে।

(৫) এরিষ্টফেনিস

এরিষ্টফেনিস হাস্যরসের বিখ্যাত কবি—আনুমানিক ৭৪৪ খ্রীঃ পূঃ জন্মগ্রহণ করেন। তদানীন্তন ঘটনা ও ব্যক্তিচরিত্র লইয়া তিনি নাটিকা রচনা করেন। "Knights", "Clouds", "Wasps" প্রভৃতি নাটিকায় তিনি সমসাময়িক বীরগণের, শিক্ষা ব্যবস্থার এবং মামলাবাজীর কঠোর সমালোচনা করেন। ৩৮০ খ্রীঃ পূঃ মৃত্যু ঘটে।

(৬) এ্যাকিলিস

হোমারের মহাকাব্য ইলিয়াড-এর নায়ক। একিলিস রাজা পিলিউস (Peleus)-এর এবং থেটিসের পুত্র। Phoenix তাঁহাকে যুদ্ধবিদ্যা ও বাগ্মিতা এবং Chiron তাঁহাকে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা দেন। গৌরবোজ্জল স্বল্পায়ু অথবা অখ্যাত দীর্ঘায়ু -এই দুইটির একটি তাঁহার ভাগ্যে আছে মাতার নিকট হইতে জানিতে পারিয়া একিলিস প্রথমটিকেই পছন্দ করেন এবং ট্রয়ের যুদ্ধে যোগদান করেন।

এ্যাগামেমনন 'Chryseis কে তাঁহার পিতার নিকট প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য হইলে, একিলিসের রক্ষিতা Briseis'-কে দাবী করিয়া বসেন। এ্যাথেনার অনুরোধে একিলিস Briseis-কে দিলেন বটে, কিন্তু তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন— যুদ্ধে যোগদান করিবেন না।

থেটিসের অনুরোধে জিউস (Zeus) এইরূপ অঙ্গীকার করিলেন যে একিলিসকে অনুরোধ এবং সম্মান না করা পর্যন্ত গ্রীকদের পরাজয় ঘটিতে থাকিবে। জিউজের অভিপ্রায়ানুসারে ঘটনা ঘটিতে লাগিল, সকলে তখন একিলিসের শরণাপন্ন হইল। কিন্তু একিলিস অটল, অবশেষে তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধুর অনুরোধে একিলিস তাঁহার বর্ম ও সৈন্য দিতে স্বীকার করিলেন। বন্ধু প্যাট্রোকোলাস নিহত হইলে একিলিস শোকে অভিভূত ও ক্ষিপ্ত হইয়া যুদ্ধে

যোগদান করিলেন এবং ট্রয়বীর হেকটরকে নিহত করিয়া রথের চাকায় বাঁধিয়া গ্রীক জাহাজের সম্মুখে টানিয়া আনিলেন। হেকটরের বৃদ্ধ পিতা Priam নতজানু হইয়া পুত্রের শব প্রার্থনা করিলে একিলিস শবটি দিলেন। কিন্তু ট্রয় অধিকারের আগেই একিলিসের জীবনের অবসান ঘটে।

(৭) কপিলের অভিশাপ

সগর রাজা শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া ইন্দ্রের প্রতিষ্ঠার সমকক্ষতা করিতে বাসনা করিয়াছিলেন। ইন্দ্র তাঁহার বাসনা পণ্ড করিতে যজ্ঞের অশ্ব চুরি করিয়া কপিল মুনির আশ্রমে বাঁধিয়া রাখিয়া দেন। সগরের ষাট হাজার পুত্র অশ্বের অনুসন্ধান করিতে করিতে কপিলের আশ্রমে আগমন করেন এবং কপিলকে অপমান করেন। কপিল অভিশাপাগ্নি দ্বারা সগরের ষাট হাজার পুত্র ভস্ম করিয়া দেন।

সাংখ্যদর্শন প্রণেতা কপিল আর এই কপিল এক কি না এই বিষয়ে স্থির কোন সিদ্ধান্ত নাই।

(৮) কাত্যায়ন

বররুচি কাত্যায়ন পাণিনির ব্যাকরণের উপর বার্তিক নামে এক টীকা লেখেন। কাত্যায়নের কাল সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানা যায় না। কাত্যায়নের অনেকগুলি নাম পাওয়া যায়; শাকটালই যে কাত্যায়ন এই মত অনুসরণ করিয়া নাট্যকার কাত্যায়নকে চন্দ্রগুপ্তের সমসাময়িক বলিয়া গণ্য করিয়াছেন।

(৯) চন্দ্রগুপ্ত

চন্দ্রগুপ্তের বাল্যজীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। ৩২২ খ্রীঃ পূঃ নন্দবংশের উচ্ছেদ সাধন করিয়া স্বয়ং রাজা হন এবং রাজ্যের সমস্ত কণ্টক নির্মূল করিয়া রাজ্যবিস্তারে মনোনিবেশ করেন (ঐতিহাসিকতার পরিমাণ প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। ২৯৮ খ্রীঃ পূঃ তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

(১০) চাণক্য

তক্ষশীলাবাসী—চণকের সন্তান। রাজনৈতিক কূটবুদ্ধির জন্য তাঁহাকে কৌটিল্য বলা হইত। অর্থশাস্ত্র কৌটিল্যের রাজনীতি বিষয়ক গ্রন্থ। চাণক্য চন্দ্রগুপ্তকে রাজ্যোদ্ধারে সাহায্য করেন এবং তাঁহার মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত হন।

(১১) থেমিষ্টক্লিস

আনুমানিক ৫১৪ খ্রীঃ পূঃ জন্মগ্রহণ করেন। ক্সারক্স (Xerxes) গ্রীস আক্রমণ করিলে থেমিষ্টক্লিস নৌ-বাহিনীর অধিনায়কত্ব গ্রহণ করেন এবং তাঁহারই উৎসাহ, বুদ্ধি ও সাহসের ফলে গ্রীকগণ পারস্যের অধীনতাপাশ এড়াইতে সক্ষম হইয়াছিল। পরবর্তীকালে পারস্য রাজ্যের সহিত গোপন সম্পর্ক স্থাপনের অভিযোগে অভিযুক্ত হইলে তিনি পলায়ন করেন এবং আর্ত-ক্সারক্সের (Artaxerxer) সভায় উপস্থিত হন। এখানেই তিনি ৩৫৯ খ্রীঃ পূঃ বিষ পান করিয়া আত্মহত্যা করেন।

(১২) ডাইওজিনিস

বিখ্যাত দার্শনিক ডাইওজিনিস আনুমানিক ৮০০ খ্রীঃ পূঃ Pontus-এর Sinope-এ জন্মগ্রহণ করেন। যৌবনে তিনি উচ্ছৃঙ্খল ভোগী ছিলেন, পরে এ্যান্টিস্থিনসের চরিত্র দেখিয়া তাঁহার মধ্যে ঘোর পরিবর্তন দেখা দিল। তিনি কৃচ্ছ্রসাধনায় মনোনিবেশ করিলেন। গ্রীষ্মকালে উত্তপ্ত বালুর উপর গড়াগড়ি দিতেন এবং শীতকালে বরফাচ্ছন্ন মূর্তিগুলিকে জড়াইয়া ধরিয়া থাকিতেন; রাস্তায় ঘাটে যেখানে সেখানে শুইতেন, মোটা কাপড় পরিতেন এবং শেষে তিনি একটি টবের মধ্যে শুইয়া থাকিতেন। Aegina যাইবার পথে জলদস্যুরা তাঁহাকে বন্দী করিয়া ফেলে এবং ক্রিট-এ বিক্রয় করিতে লইয়া যায়। তাঁহাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হইল—কি কাজ জানে? তিনি বলিলেন, "আমি মানুষকে কি করিয়া আদেশ করিতে হয় তাহাই কেবল জানি।" কোরিন্থের জেনিয়াদিস (Xeniades) তাঁহাকে ক্রয় করেন এবং তাঁহার পুত্রদিগকে পড়াইবার কাজে

নিযুক্ত করেন। এখানেই তাঁহার সহিত আলেকজান্দারের সেই বহুকথিত সাক্ষাৎকার ঘটে। আলেকজান্দার বলিলেন—আমি মহামান্য আলেকজান্দার —I am Alexander the great! ডাইওজিনিস বলিলেন, আমি বিরাগী দার্শনিক ডাইওজিনিস—I am Diogenes the cynic! আলেকজান্দার তাঁহাকে বলিলেন, আমি কি আপনার কোন উপকার করিতে পারি? তিনি বলিলেন—আলোকটুকু ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াও—yes, you can stand out of the sunshine. আলেকজান্দার নাকি বলিয়াছিলেন যে আলেকজান্দার না হইলে তিনি দার্শনিক ডাইওজিনিস হইতে চাহিতেন। ৯০ বৎসর বয়সে (৩২৩ খ্রীঃ পূঃ) ডাইওজিনিস করিন্থে মারা যান।

(১৩) ডিমস্থিনিস

সর্বশ্রেষ্ঠ এথেন্সীয় বাগ্মী অনুমানিক ৮৪ খ্রীঃ পূঃ জন্মগ্রহণ করেন। ৭ বৎসর বয়সে পিতৃহীন হন। ২০ বৎসর বয়সে তিনি সাধারণ সভায় বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু প্রথমে তিনি তেমন কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। ক্রমে অধ্যবসায়ের ফলে ৩৫৫ খ্রীঃ পূঃ বিখ্যাত বক্তা বলিয়া খ্যাতিলাভ করেন। ফিলিপ যখন সমগ্র গ্রীসের উপর আধিপত্য বিস্তার করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছিলেন, ডিমস্থিনিস ফিলিপের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন, কিন্তু ৩৩৮ খ্রীঃ পূঃ যুদ্ধে গ্রীসের স্বাধীনতা লুটাইয়া পড়িল। ডিমস্থিনিসের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ করা হইল। এই অভিযোগের বিরুদ্ধে ডিমস্থিনিস কয়েকটি স্মরণীয় বক্তৃতা করেন। কোন ভাবে না আঁটিতে পারিয়া শেষে ঘুষের ও চুরির অপরাধে তাঁহাকে কারাবদ্ধ করা হইল অবশ্য কারাগার হইতে পলায়ন করিতে তিনি সক্ষম হইয়াছিলেন। আলেকজান্দারের মৃত্যুর পর (৩২৩ খ্রীঃ পূঃ) সমস্ত গ্রীক রাষ্ট্র ম্যাসিডনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিলে ডিমস্থিনিস সগৌরবে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু পরবর্তী বৎসর (৩২২ খ্রীঃ পূঃ) সম্মিলিত রাষ্ট্রসমূহ পরাজিত হইলে পুনরায় তাঁহাকে

Calauria দ্বীপে পলায়ন করিতে হইল। এখানেই শত্রুতাড়িত অবস্থায় ৩২২ খ্রীঃ পূঃ তিনি বিষপানে আত্মহত্যা করেন। তাহার ৬০টি বক্তৃতা পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে "On the crown", মেকলের মতে, অনবদ্য সাহিত্য-সৃষ্টি।

(১৪) পেরিক্লিস

এথেনসের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ—Xanthuppus-এর পুত্র। ধনী পিতার সন্তান হওয়ায় শিক্ষার ভাল সুযোগ পাইয়াছিলেন বিখ্যাত পণ্ডিত Damon, Zeno এবং Anaxagorus তাঁহার শিক্ষাগুরু। ৪৬৯ খ্রীঃ পূঃ তিনি দেশের-দশের কাজে আত্মনিয়োগ করেন এবং দেশের গণতান্ত্রিকদলের নেতা হইয়া উঠেন। তিনি শুধু বাক্যবীর ছিলেন না, সেনাচালনায়ও বিশেষ দক্ষ ছিলেন। ৪৭৪ খ্রীঃ পূঃ তিনি Euboea নামক দ্বীপটি উদ্ধার করিয়া এথেনসের সহিত যুক্ত করেন। তাঁহার প্রতিপক্ষীয় নেতা Cimon-এর এবং পরবর্তী নেতা Thucydides-এর মৃত্যুর পর তিনি অদ্বিতীয় নেতা হইয়া উঠেন। অনেকের মত—পেরিক্লিসের উচ্চাকাঙ্ক্ষার ফলেই পেলোপেনেসীয় যুদ্ধ হইয়াছিল। এই যুদ্ধে তাঁহার দুই পুত্র মারা যায়, ৪২৯ খ্রীঃ পূঃ পেরিক্লিস রোগে ভুগিতে ভুগিতে মারা যান।

(১৫) প্লেটো

বিখ্যাত দার্শনিক প্লেটো—সক্রেটিসের প্রধান শিষ্য—খ্রীঃ পূঃ ৪২৭ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। সক্রেটিসের মৃত্যুর পরে প্লেটো জ্ঞানতৃষ্ণা নিবারণের জন্য দেশভ্রমণে বহির্গত হন এবং বহু দেশ দেখার পর দেশে ফিরিয়া দর্শন প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। দর্শনে 'Theory of Idia' প্লেটোর সর্বপ্রধান দান। উক্তি-প্রত্যুক্তির আকারে তিনি বহু বিষয়ে সাহিত্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার 'Republic' আজও অপরিহার্য রাজনীতিক গ্রন্থ।

ধনীর এবং অভিজাত বংশের সন্তান প্লেটো, কিন্তু ছোটকাল হইতেই তাঁহার মধ্যে জ্ঞানতৃষ্ণা প্রবল। ইচ্ছা করিলে প্লেটো পদস্থ আত্মীয়স্বজনকে ধরিয়া উচ্চপদেই উঠিতে পারিতেন, কিন্তু প্লেটোর সেদিকে লক্ষ্য ছিল না।

ছন্নছাড়া সক্রেটিসই তাঁহার কাছে মানুষের মত মানুষ বলিয়া মনে হইল। Philosopher should rule—প্রয়োগ করিতে যাইয়া প্লেটোকে অনেকবার অনেক বিপদের মধ্যে পড়িতে হইয়াছে। একবার ত ক্রীতদাসের হাটেই বিক্রীত হইতে গিয়াছিলেন, বন্ধুর চেষ্টায় কোন ভাবে রক্ষা পান।

৩৪৭ খ্রীঃ পূঃ প্লেটো দেহত্যাগ করেন।

(১৬) প্যান্থিয়ন

গ্রীক দেব-দেবীর কীর্তি-কাহিনী-সংগ্রহ—গ্রীকপুরাণ।

(১৭) ফিডিয়াস

গ্রীসের বিখ্যাত ভাস্কর ও স্থপতি—আনুমানিক ৪৯০ খ্রীঃ পূঃ এথেনসে জন্মগ্রহণ করেন। পেরিক্লসের শাসনকালে সমস্ত কলাশিল্পের পর্যবেক্ষণের ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত ছিল। বিখ্যাত পার্থিনন মন্দিরটি ফিডিয়াসের তত্ত্বাবধানে গঠিত হইয়াছিল। এই মন্দিরের স্বর্ণময় দেববিগ্রহটি ফিডিয়াসের নিজের হস্তে নির্মিত। পরে তিনি আলম্পিয়াতে গমন করেন এবং জিউজ (Zeus) দেবের মূর্তি গঠন করেন। পরবর্তীকালে পেরিক্লসের শত্রুপক্ষীয় লোক তাঁহার বিরুদ্ধে নানারূপ অভিযোগ প্রমাণ করিতে না পারিয়া শেষে ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগ আনয়ন করে। এই অভিযোগের বিচারে তাঁহাকে কারাগারে যাইতে হয় এবং এই কারাবদ্ধ অবস্থায়ই ৪৩২ খ্রীঃ পূঃ তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

(১৮) মিলটাইডিস

বিখ্যাত বীর ও যোদ্ধা। পারসিকদের বিরুদ্ধে ম্যারাথন যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ করিয়া তিনি অক্ষয়কীর্তি অর্জন করিয়াছেন। দেশের জন্য তাঁহার আত্মত্যাগ ও বীরত্ব স্মরণীয় হইয়া আছে।

(১৯) লাইকর্গাস

এথেনসের একজন বিখ্যাত বক্তা—৩৯৬ খ্রীঃ পূঃ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্লেটোর এবং ইসোক্রোটিসের শিষ্য এবং ডিমস্থিনিসের একজন প্রবল সমর্থক

ছিলেন। তাঁহার সময়ের শ্রেষ্ঠ ও মহৎ ব্যক্তিদিগের মধ্যে তিনি অন্যতম। ৬৭৩ খ্রীঃ পূঃ তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার বক্তৃতার একটি মাত্র এখন পাওয়া যায়।

আরও দুইজন লাইকর্গাসের নাম পাওয়া যায়। একজন স্পার্টার বিধান রচয়িতা, আর একজন থে্রসের রাজা—Dryas-এর পুত্র। প্রথম জন প্রাচীনকালে স্পার্টার বিধান-কর্তা বলিয়া সম্পূজিত হইতেন।

(২০) লিওনিডাস

লিওনিডাস (৪৯১ খ্রীঃ পূঃ জন্ম—৪৮০ খ্রীঃ পূঃ মৃত্যু) স্পার্টার রাজা Anaxandrides-এর পুত্র। যখন পারস্যরাজ ক্ষারক্ষ (Xerxes) গ্রীস আক্রমণ করেন (৪৮০ খ্রীঃ পূঃ), লিওনিডাস থার্মোপলির (Thermopylae) গিরিপথে মাত্র ৫০০০ সৈন্য লইয়া প্রতিরোধ করিতে উপস্থিত হইলেন। পারসিকগণ লিওনিডাসের বিক্রমে পশ্চাৎপদ হইতে বাধ্য হইলেন, কিন্তু Malian Ephialtes নামক এক স্বদেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক পারসিকদিগকে 'Anopaea' নামক গিরিপথের সন্ধান বলিয়া দিলে, সেই পথে পারস্য-অভিযান বন্যার মত প্রবেশ করিল। লিওনিডাস শেষ রক্তবিন্দু দিয়া প্রতিরোধ করিলেন; লিওনিডাসের রক্তে রঞ্জিত পথে ক্ষারক্ষ গ্রীসে প্রবেশ করিলেন।

(২১) সক্রেটিস

বিখ্যাত দার্শনিক প্লেটোর গুরু সক্রেটিস খ্রীঃ পূঃ ৬৯ অব্দে এথেনসের উপকণ্ঠে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা সফ্রোনিসকাস একজন ভাস্কর এবং মাতা ছিলেন ধাত্রী। তিনি দেখিতে অতি কদাকার ছিলেন। প্রথমে সক্রেটিস পৈতৃক ব্যবসায়ই আরম্ভ করেন, কিন্তু পরে হাটে মাঠে বক্তৃতা দিয়া বেড়াইতেন এবং সত্য ও ন্যায়তত্ত্ব সম্বন্ধে জনসাধারণকে শিক্ষিত করিতে চেষ্টা করিতেন। তিনি এমনভাবে প্রশ্ন করিতেন যেন কিছু জানেন না—জানিতে চাহেন; এমনি ভাবে তিনি বক্তার বক্তব্যের অযাথার্থ্য প্রমাণ করিয়া দিতেন।

ক্রমে এথেনসের যুবকগণ সক্রেটিসের খুব ভক্ত হইয়া পড়িল; স্বাধীনভাবে তাঁহারা চিন্তা করিতে লাগিল। সক্রেটিসের শত্রুরা তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনিবার সুযোগ পাইল। তাহারা অভিযোগ করিল—সক্রেটিস যুবকদের মতিগতি খারাপ করিয়া দিতেছে, আর দেবতাদের কুৎসা প্রচার করিতেছে। সক্রেটিসের উপর মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হয়। খ্রী: পূ: ৩৯৯ অব্দে হেমলক বিষ পান করিয়া সক্রেটিসকে মরিতে হইল। সক্রেটিসের চিন্তা-বীজ প্লেটোর মধ্যে মহীরুহ পরিণত হইল। সক্রেটিসকে দার্শনিকদের গুরুর গুরু বলা যায়।

(২২) সোলান

খ্রী: পূ: ৬৩৯ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন—বিখ্যাত বিধান-শাস্ত্র-প্রণেতা। সপ্ত জ্ঞানীর মধ্যে তিনি একজন। পাগলের ভান করিয়া এথেন্সবাসীদের 'সালামিস' দ্বীপ অধিকারে আনিবার জন্য এমনভাবে উত্তেজিত করিয়াছিলেন যে তাহারা যুদ্ধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। সোলানের নেতৃত্বাধীনে অভিযান চলিল। মেগারীয়রা পরাজিত হইয়া সোলানের খ্যাতির পথ উন্মুক্ত করিয়া দিল। পরবর্তীকালে রাষ্ট্রনায়ক হইয়া সোলান রাষ্ট্র-বিধান রচনা করিয়া অমরকীর্তি লাভ করিলেন। ৫৫৯ খ্রী: পূ: তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

(২৩) সফোক্লিস

সুবিখ্যাত করুণ-রসের কবি—খৃ: পূ: ৪৯৫ অব্দে এথেনসের উপকণ্ঠের একটি গ্রামে (কলোনাস) জন্মগ্রহণ করেন। প্রসিদ্ধ নাট্যকার ইসকাইলাস অপেক্ষা তিনি ৩০ বৎসরের ছোট এবং ইউরিপিডিস অপেক্ষা ১৫ বৎসরের বড। ৪৬৮ খৃ: পূ: মাত্র ২৭ বৎসর বয়সে সফোক্লিস সুবিস্তৃত-খ্যাতি ইসকাইলাসের প্রতিদ্বন্দ্বী নাট্যকার হইয়া উঠিলেন। বিচারকমণ্ডলীর বিচারে তিনি যখন 'প্রথম পুরস্কার' লাভ করিলেন, প্রবীণ নাট্যকার ইসকাইলাস মনোদুঃখে এথেনস ত্যাগ করিয়া যান। তারপর ইউরিপিডিসের আবির্ভাব পর্যন্ত (৪৪১ খৃ: পূ: 'প্রথম' ঘোষিত) তিনি শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াই ছিলেন। Antigone' তাঁহাকে যে খ্যাতির আসন দিয়াছিল, 'Oedipus' সে আসনকে

সিংহাসনে পরিণত করিল। ৪০৬ খৃঃ পূঃ তাঁহার মৃত্যু ঘটে। সফোক্লিস প্রায় ১৩০ খানি নাটক লিখিয়াছিলেন।

(২৪) সাফো

গীতি কবি সাফো—Mytilene-এর অধিবাসী কবি Alacaeus-এর সমসাময়িক ও বান্ধবী। কোন এক বিপদ এড়াইবার জন্য তাঁহাকে জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া সিসিলিতে পলায়ন করিতে হয়। সাফো Phaon-এর প্রেমে পড়েন, কিন্তু প্রেম উপেক্ষিত হওয়ায় পাহাড় হইতে লাফাইয়া পড়িয়া আত্মহত্যা করেন। গীতি-কবিতা তাঁহাকে স্মরণীয় করিয়াছে।

(২৫) সেলুকস

অ্যান্টিয়োকাসের পুত্র—দ্বিতীয় ফিলিপের সেনাপতিগণের অন্যতম। সেলুকস ৩১৮ খৃঃ পূঃ জন্মগ্রহণ করেন আলেকজান্দারের এশিয়া অভিযানে সেলুকস যোগ্যতার সহিত সেনা পরিচালনা করিয়া, বিশেষতঃ ভারতবর্ষের যুদ্ধে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দেন। আলেকজান্দারের মৃত্যুর পরে আধিপত্য বিষয়ে অ্যান্টিগোনাস জয়ী হইলেও শেষ পর্যন্ত সেলুকসই সমগ্র এশিয়া মাইনরের অধীশ্বর হইয়া উঠেন। আলেকজান্দার-অধিকৃত ভারতীয় প্রদেশ উদ্ধার করিতে যাইয়া চন্দ্রগুপ্তের সহিত তাঁহার যুদ্ধ বাধে এবং এই যুদ্ধের ফলে তাঁহাকে শোচনীয় পরাজয় ও সম্মান-হানিকর সন্ধি স্বীকার করিতে হয়। মাত্র ৫০০ হাতীর বিনিময়ে তাঁহাকে রাজ্যের অনেকাংশ এবং কন্যাদান করিতে হয়। ২৮০ খৃঃ পূঃ ৭৮ বৎসর বয়সে তিনি মারা যান।

(২৬) সেকেন্দার সাহ

দ্বিতীয় ফিলিপের এবং রাজ্ঞী অলিম্পিয়ার পুত্র আলেকজান্দার ৩৫৬ খৃঃ পূঃ পেল্লা নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র বিশ বৎসর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া শৌর্যবলে দেশের সমস্ত শত্রুকে বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য করেন। তাংপর তিনি দিগ্বিজয়ে বহির্গত হন এবং ক্রমেই পারস্য (৩৩৩ খ্রীঃ পূঃ), মিশর প্রভৃতি দেশ অধিকার করিয়া ৩২৭ খ্রীঃ পূঃ

ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। সিন্ধুনদ অতিক্রম করিয়া তিনি বীরদর্পে অগ্রসর হন, কিন্তু প্রথম বাধা পাইলেন আর্যকুল-রবি পুরুর হস্তে—শতদ্রু নদীতটে। রণক্লান্ত এবং প্রতিরোধ-ভীত সৈন্যগণ আর অগ্রসর হইতে চাহিল না। বাধ্য হইয়া তাঁহাকে ফিরিতে হইল। ৩২৩ খ্রীঃ পূঃ ১১ দিনের জ্বরে পথিমধ্যে মাত্র ৩২ বৎসর বয়সে সেকেন্দার সাহর সমস্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষার শেষ পরিনিবৃত্তি ঘটিল। ব্যাবিলনের কবর-পরিমিত স্থানটুকু ছাড়া আর কিছুই তাঁহার কাজে লাগিল না।

(২৭) হোমার

'ইলিয়ড' ও 'অডিসি' মহাকাব্য প্রণেতা হোমারের সম্বন্ধে সন্তোষজনক কোন তথ্যই পাওয়া যায় না। হোমারের জন্মভূমি, জন্ম-পরিচয় প্রভৃতি অতীতের অন্ধকারে হারাইয়া গিয়াছে। অনুমান করা হয় যে, আনুমানিক ৮৫০ খ্রীঃ পূঃ হোমার জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম খুব সম্ভবতঃ Maeon. বৃদ্ধকালে হোমার অন্ধ ও দরিদ্র হইয়াছিলেন।

(২৮) হিরোডোটাস

বিখ্যাত ঐতিহাসিক হিরোডোটাস ৪৮৪ খ্রীঃ পূঃ 'Caria'র অন্তর্গত Halicarnassus-এ জন্মগ্রহণ করেন। হেলিকারনেসাসের শাসনকর্তা লাইগ্‌ডামিসের (Lygdamis) অত্যাচারী শাসনের চাপে অল্প বয়সেই তাঁহাকে গৃহত্যাগ করিতে হয়। তিনি ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকার নানা দেশ ভ্রমণ করেন। পরে তিনি জন্মভূমিতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং লাইগ্‌ডামিসকে বিতাড়িত করিবার আন্দোলনে যোগদান করেন। ইহার পরে তিনি আবার জন্মভূমি ত্যাগ করেন এবং ইটালীর অন্তর্গত আথেনসীয় সাম্রাজ্যান্তর্ভুক্ত Thurii তে বসবাস করেন। এখানেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে। থুরিয়াইতে বসিয়াই তিনি তাঁহার বিখ্যাত ঐতিহাসিক গ্রন্থ লেখেন—যাহার জন্য তাঁহাকে ইতিহাসের জন্মদাতা বলা হইয়া থাকে।

(২৯) সাজাহান

জাহাঙ্গীরের চারি পুত্র—(১) খুসরু, (২) পরভিজ, (৩) খুরম্, (৪) শাহরিয়র। প্রথম পুত্র খুসরু পিতার বিদ্রোহী হইয়া বন্দী অবস্থায়, মৃত্যুমুখে পতিত হন (১৬২২)। চারিপুত্রের মধ্যে তৃতীয় পুত্র খুরম্ যোগ্যতায় শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তৃতীয় পুত্রের নামই সাজাহান। জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর কয়েক মাস পরে, নূরজাহান প্রভৃতির ষড়যন্ত্রের ব্যূহ ভেদ করিয়া সাজাহান সিংহাসনে আরোহণ করেন। সাজাহান বিখ্যাত যোদ্ধা ছিলেন; উত্তর-ভারতে আসাম পর্যন্ত তিনি অধিকার বিস্তার করেন এবং দাক্ষিণাত্যে আহম্মদনগর অধিকার করেন এবং গোলকুণ্ডা ও বিজাপুরকে বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য করেন। ১৬৩৮ খ্রীঃ সাজাহান কান্দাহার হস্তগত করেন। মোগল সাম্রাজ্যের চরম উন্নতি সাজাহানের সময়েই ঘটে। ১৬৫৭ খ্রীঃ কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইলে পুত্রদের মধ্যে ভীষণ ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব বাধিয়া গেল। ঔরংজীব আগ্রা অধিকার করিয়া সাজাহানকে বন্দী করেন (১৬৫৮), এই বন্দী অবস্থার মধ্যেই ১৬৬৬ খ্রীঃ তিনি পরলোকগমন করেন।

(৩০) আসফ খাঁ

জাহাঙ্গীরের প্রধানা মহিষী নূরজাহানের ভ্রাতা। ইহার এক কন্যাকে সাজাহান বিবাহ করেন এবং ইহারই সাহায্যে সাজাহান নূরজাহানের ষড়যন্ত্র ভেদ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন।

(৩১) পরভিজ

জাহাঙ্গীরের দ্বিতীয় পুত্র। ইহার কন্যা নাদিরার সহিত দারার বিবাহ হয়। বুরহানপুরে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

(৩২) ধর্মাটের যুদ্ধ

উজ্জয়িনীর চৌদ্দ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে ধর্মাট। এখানে বাদশাহী সেনাপতি যশোবন্ত সিংহের সহিত ঔরংজীব ও মোরাদের মিলিত সৈন্যের যুদ্ধ হয় (১৫ই এপ্রিল, ১৬৫৮ খ্রীঃ)। এই যুদ্ধে যশোবন্ত সিংহ ঔরংজীব কর্তৃক পরাজিত হইলেন।

(৩৩) সামুগড়ের যুদ্ধ

আগ্রার আট মাইল দূরে ইমাদপুর (সাজাহানের শিকার-নিবাস) ইহার এক মাইল পূর্বে সামুগড় গ্রাম। এই সামুগড়ের প্রান্তরে দারা শুকো ঔরংজীব কর্তৃক পরাজিত হইলেন। (২৯শে মে, ১৬৫৮ খ্রীঃ)।

(৩৪) বাহাদুরপুরের যুদ্ধ

১৬৫৮ খ্রীঃ ১৪ই ফেব্রুয়ারীতে কাশীর নিকটে বাহাদুরপুরে যশ ... সুজা সুলেমান শিকো কর্তৃক পরাজিত হন।

(৩৫) খাজুয়া যুদ্ধ

খাজুয়া ফতেপুর জেলায়। উত্তরবর্তী গঙ্গা নদী হইতে দশ মাইল ... দক্ষিণবর্তী যমুনা হইতে দশ মাইল। ইহার আট মাইল পশ্চিমে "... " এখানে ঔরংজীবের সঙ্গে সুজার যুদ্ধ হয়—১৬৫৯, জানুয়ারী মাসে পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন।

(৩৬) দেবরাই যুদ্ধ

দেবরাই আজমীরে। দারা পাঞ্জাব হইতে মুলতানে, মুলতান সিন্ধুতে, সিন্ধু হইতে গুজরাটে এবং গুজরাট হইতে রাজপুতনায় করেন। যোধপুরের রাজা যশোবন্ত সিংহ সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত ... প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন। ১৬৫৯ খ্রীঃ মার্চ মাসে দেবরাইয়ের যুদ্ধে দারা ঔ... কর্তৃক পরাজিত হন

(৩৭) রাণা রাজসিংহ

১৬৫৪ খ্রীঃ সিংহাসনে আরোহণ করেন। ঔরংজীবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করি... তিনি রাজপুত-মহিমাকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছিলেন। জয়সিংহ ও ভীম ... তাঁহার দুই পুত্র। ১৬৮১ খ্রীঃ তাঁহার মৃত্যু ঘটে।